“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com
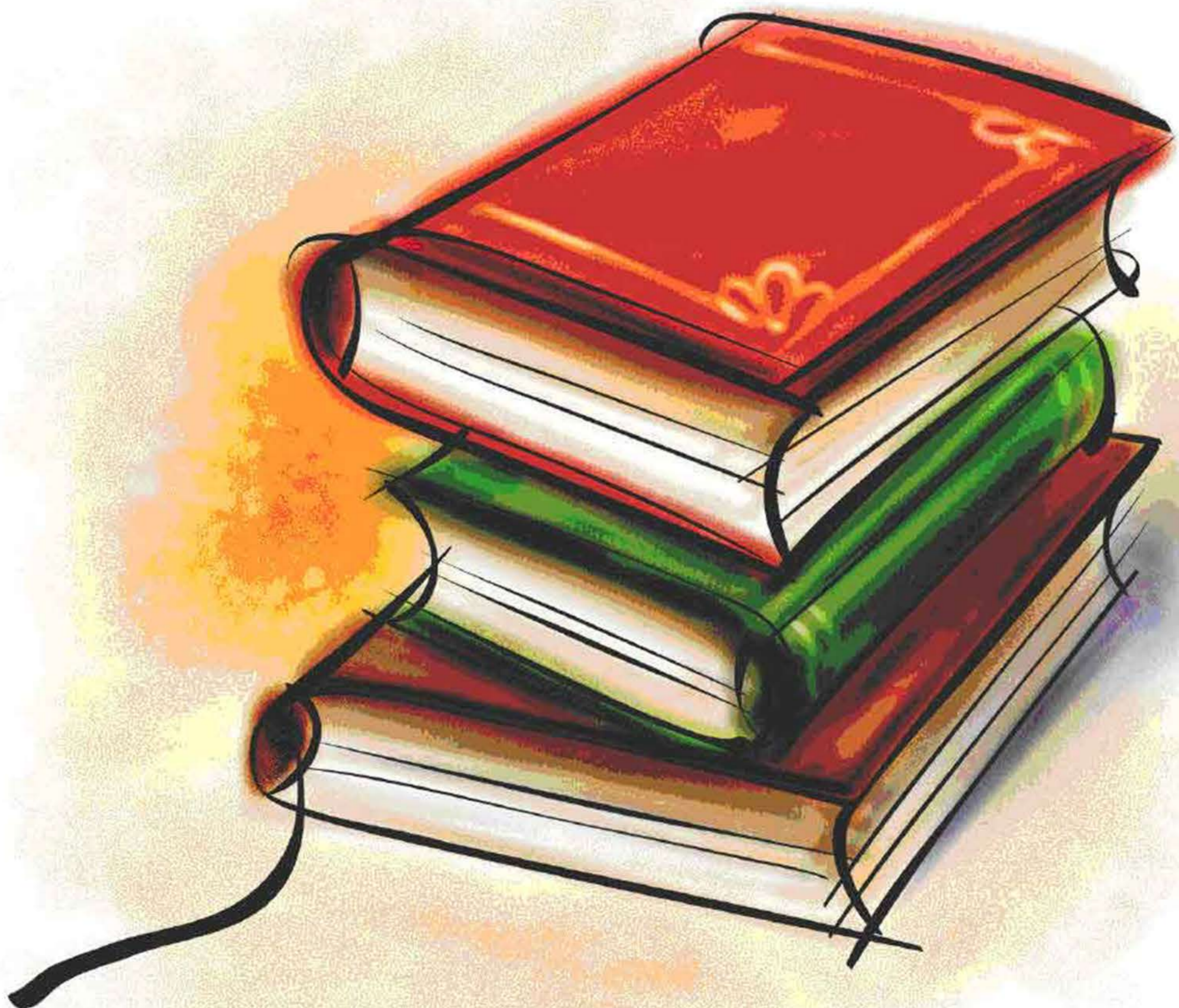
ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ॥ প্রথম সংখ্যা
জুলাই ১৯৮১
খেয়াল খুশী
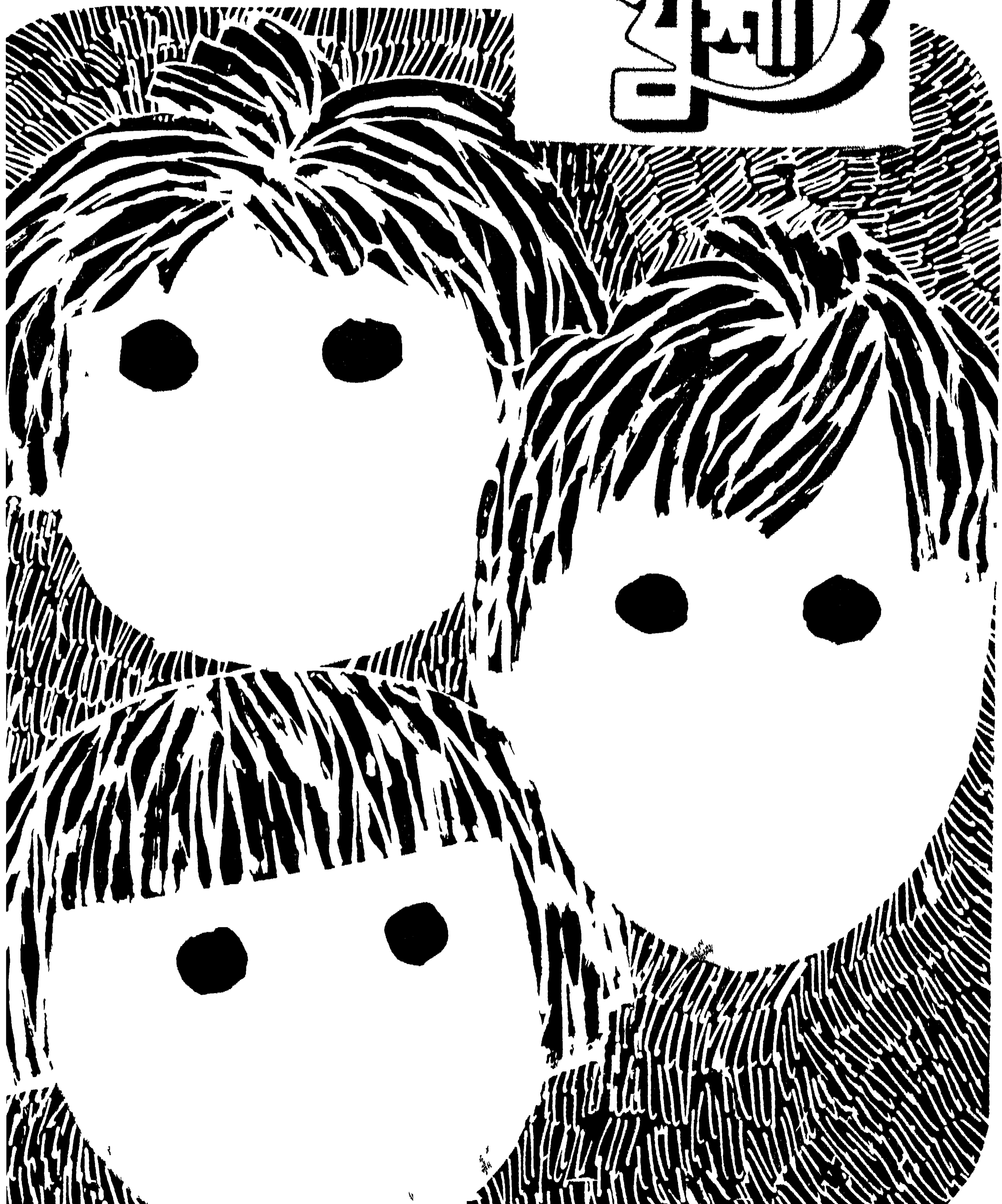
॥ বিজ্ঞাপনের হার ॥

মুদ্রিত জায়গার মাপ

পূর্ণ পৃষ্ঠা :—
১৪'৫ সি. এম × ২০ সি. এম
৬০০'০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (হরাইজেণ্টাল)
৯'৫ সি. এম × ১৪'৫ সি. এম
৩০০'০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা [ভারটিকাল]
৭ সি. এম × ২০ সি. এম
৩০০'০০ টাকা

¼ পৃষ্ঠা :
৭ সি. এম × ৯'৫ সি. এম
১৭৫'০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

বিজ্ঞপ্তি নং ৬৮৩ (১৬) টি-বি-সি/২এ—৬টি/৭৯, ২৪. ১২. ৮০.
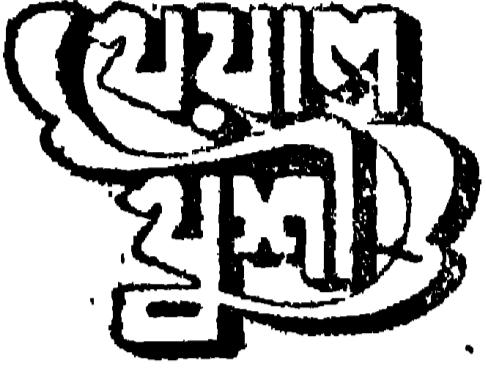
৪র্থ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ ১লা জুলাই ১৯৮১॥ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮৮

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা ॥ দাম : এক টাকা

প্রধান উপদেষ্টা : গৌরকিশোর ঘোষ ॥ সম্পাদিকা : ইন্দিরা রায়।

আমাদের কথা ☐ ২

একটি আবেদন ☐ ৩

বিধান বাণী ☐ ৪

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ☐ ৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণী ☐ ৮

প্রবন্ধ ☐ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রসঙ্গে ॥ অতুল্য ঘোষ ৯ তিনি কবিও, তিনি রূপকার ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ১২ বিধানচন্দ্রের গল্প ॥ শান্তিকুমার মিত্র ১৪ পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র ॥ পল্লব গঙ্গোপাধ্যায় ১৬ আমাদের উত্থান ॥ চয়ন সমাদ্দার ১৮ আমাদের বিধানচন্দ্র ॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ বিধানচন্দ্র রায় ॥ চন্দ্রনাথ রায় ২০ সার্থকনামা পুরুষ ॥ সুপর্ণা সান্যাল ২২ জন্মদিনের টুকরো-টাকরা ॥ অংশুমান আচার্য ২৩ চিকিৎসক বিধানচন্দ্র ॥ অরিন্দম ঘোষ ২৫ বিধান চরিত্রের কয়েকটি ঘটনা ॥ ডাঃ অনিল মৈত্র ২৭ নতুন জন্মের সনদ ॥ প্রণবেশ চক্রবর্তী ৩১ বিধান শিশু উদ্যান ॥ অভিজিৎ বিকাশ পাল ৩৫ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ॥ মিঠু সাহা ৩৮ ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র ॥ বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ॥ অমৃত কুমার সরকার ৪২ অমর নেতা ॥ ইন্দিরা রায় ৪৪ বিধানচন্দ্র, এক নাম ॥ সুনন্দন রায়চৌধুরী ৪৮ প্রাণপুরুষ বিধানচন্দ্র ॥ সুমথনাথ ঘোষ ৪৯

কবিতা ☐ গজাধরের ঘুমপাড়ানি ॥ সুকুমার সেন ১১ বঙ্গ বিধাতা বিধানচন্দ্র ॥ ভবানী প্রসাদ মজুমদার ১১ শতবর্ষের প্রণাম ॥ কৌশিক দত্ত ১৩ খেয়ালখুশী ॥ সুজয়া ঘোষ চৌধুরী ২১ শিশু উদ্যান ॥ কৃষ্ণা দে ২১ জন্মদিন ॥ সৌমেন মুখার্জী ২২ খেয়াল খুশী ॥ নীলাঞ্জন গুহ ২৬ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ॥ নির্মাল্য হালদার ৩০ তোমায় প্রণাম ॥ নীলাঞ্জনা গুহ ৩০ খেয়াল খুশী ॥ সুমিতা বাগচী ৩০ খেয়াল খুশীর জন্মদিন ॥ পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ আমার কথা ॥ রঞ্জন ভাদুড়ী ৩৭ শতবার্ষিক ॥ মৃত্তিকা দে ৩৭ খেয়াল খুশী ॥ প্রান্তর চক্রবর্তী ৩৭ বিধানচন্দ্র ॥ অমিতাভ বসু ৪১ বঙ্গ-যীশু ॥ প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১

জন্মশত বর্ষ কার্যক্রম ☐ ৪৬

খেলাধূলা ☐ খেলার খোশ-খবর ॥ শ্রীকলমচি ৫৩ মজিদই মানদণ্ড ॥ দিলীপ দত্ত ৫৫

ধাঁধা ☐ ৫৬

প্রচ্ছদ ☐ পূর্ণেন্দু পত্রী

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি

১ বিধান শিশু সরণী কলকাতা-৭০০ ০৫৪

৩৫৫৪০০ ৩৫৫০৮৬

আমাদের কথা

তোমরা জান, তোমরা যারা বিধান শিশু উদ্যানের সদস্য, কিংবা আমাদের মত বুড়ো যারা তোমাদের ভালবাসি, এ বছরের ১ জুলাই তাদের কাছেই শুধু স্মরণীয় নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কাছেই এই দিনটি বিশেষভাবে আদরনীয়। কেন না, আজ বিধানচন্দ্র রায় নামক একজন কর্মী পুরুষের জন্মশতবার্ষিকী। পশ্চিমবঙ্গে নানা ধরণের মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। কিন্তু বিধানচন্দ্রের মত এমন একজন আধুনিক ভাবুক এবং কর্মী আর জন্মান নি। বিদ্যাসাগরের মত যাঁর বিশ্বাস ছিল, মানুষ যদি নিজের উপর বিশ্বাস রাখে, ঠিকমত যদি তার বুদ্ধি ও পরিশ্রমকে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে তার পুরুষকার দিয়েই সে নিজের ভাগ্যকে জয় করতে পারে।

এই কথাটাই তিনি তাঁর সারা জীবনের কাজ দিয়ে আমাদের সকলের জন্য লিখে রেখে গিয়েছেন। তাঁর এই লেখা কোনও বইতে নেই। আজকের পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সংক্রান্ত যা কিছু দেখছ, কল কারখানা, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জনের নতুন শিল্প নগরী, মশানজোড়ের জলাধার, কলকাতা শহরের সরকারি বাস ও সরকারি দুধ প্রকল্প, লবণ হ্রদের নতুন নগর, দামোদর কাঁসাই নদীর সুনিয়ন্ত্রিত জলধারাকে সেচ ও কৃষি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার, পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা, ও চিকিৎসা বিজ্ঞান-এর উন্নততর গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা। কত কিই না এই একটি লোক করে গিয়েছেন। এই সবই তাঁর লেখা। তাঁর কাজের চিহ্ন আজ শুধুই শহরেই আটক হয়ে নেই। ছড়িয়ে আছে গ্রামে গঞ্জের দিকে দিকেও। কোন কাজটা তুমি বাদ দেবে বল? আজ যে আর্থিক ফলনশীল ধানের চাষ, এরও পত্তন তিনি করে গিয়েছেন। গ্রামের মানুষেরা যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায় তার জন্য ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন। গ্রাম গ্রামান্তরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, গ্রামের ছেলে ছিলাম, তখন পাঁচ ছয় মাইল হেঁটে আমাদের সব চাইতে কাছের ইস্কুলে পড়তে যেতে হত। আজ কেউ তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে?

এখন গ্রামের ছেলেমেয়েদের যখন বই পত্তর নিয়ে ইস্কুলে যেতে দেখি, তখন তাদের দেখে আমাদের মত বুড়োদের হিংসে হয়। হ্যাঁ, হিংসে। কেন না কাউকেই তো আজ পাঁচ ছয় মাইল হেঁটে ইস্কুলে যেতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে আজ এখন গ্রাম কমই আছে যার থেকে নিকটস্থ ইস্কুলের দূরত্ব এক মাইলও নয়। আর তাও সেটা বড় ইস্কুল। প্রাথমিক বিদ্যালয় তো ঘরের কাছাকাছি। আজকাল লোককে মাইলের পর মাইল হেঁটে হাসপাতাল কি হাটে গঞ্জেও যেতে দেখিনে। কেন না, রাস্তা ঘাট মোটামুটি এতই তৈরি হয়েছে যে দুই মাইলের মধ্যেই বাস পাওয়া যায়। এর সবই ডাঃ রায়ের কীর্তি। আগে তো পচনশীল আনাজ, আলু কি পেঁয়াজ বর্ষাকালে পচে নষ্ট হয়ে যেত, কই এখন তো তা আর হয় না। কেন না গ্রামের দিকে অনেক কোল্ড স্টোরেজ তৈরি হয়ে গিয়েছে। কার মাথা দিয়ে এ সব বেরিয়েছে? তাঁর নাম বিধানচন্দ্র রায়। আজ ১লা তাঁর জন্মদিন। আবার এই দিনটি তাঁর তিরোধানের দিনও বটে। জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে পাশাপাশি।

এস, আজ আমরা সবাই তাঁর কর্মময় জীবন থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করি। এস, আজ আমরা তাঁকে দেখে কাজের মানুষ হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। দেখবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই কেমন সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবে। নিজেকে নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলার চাইতে বড় কাজ আর কিছু নেই বিধানচন্দ্রের জীবন আমাদের কেবল এই কথাই শোনায়।

"তোমার হোলো সুরু, আমার হোলো সারা"

ডাঃ বি, সি, রায় মেমোরিয়াল কমিটি

১, বিধান শিশু সরণি
কলকাতা-৭০০০৫৪
ফোন : ৩৫-৮০৮৬
৩৫-৫৪০০

বিধানচন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসব

(জুলাই ১,১৯৮১—জুলাই ১, ১৯৮২)

একটি আবেদন

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে আগামী ১ জুলাই ১৯৮১ থেকে ১ জুলাই ১৯৮২ পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বৎসবই কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দান করা হবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে শতবার্ষিক বক্তৃতা দেবার জন্য, এবং একটি ব্যায়ামাগারও প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ডাঃ রায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য উন্নয়ন-পরিকল্পনার জনক ও রূপকার। এ রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে তিনি একটি আদর্শ পরিমণ্ডলের স্রষ্টা। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালী জনসাধারণের সম্মুখে সুষ্ঠু কর্মসংস্থানের বহু নব নব সম্ভাবনাব দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। কমিটি একথা স্মরণে রেখে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পেব একটি প্রদর্শনীর আয়োজনও এই উপলক্ষ্যে করছেন।

ভাবতের রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি আগামী ১লা জুলাই ১৯৮১ তারিখে শতবর্ষ-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন।

শতবার্ষিকী তহবিলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং ২৫,০০০. টাকা দান করে এই তহবিলের উদ্বোধন করেছেন।

শতবর্ষ অনুষ্ঠান যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার জন্য আমরা আপনার সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করি।

আপনি ও আপনার বন্ধুবর্গ যে সক্রিয়ভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়তা পোষণ করি।

সর্বপ্রকার সাহায্য ও চিঠিপত্র ডাঃ বি. সি. বায় মেমোরিয়াল কমিটির নামে প্রেরিতব্য।

সভাপতি
তুষারকান্তি ঘোষ

সহ-সভাপতি
অশোককুমার সরকার
চেয়ারম্যান
জন্মশতবর্ষ উৎসব কমিটি

অতুল্য ঘোষ
সম্পাদক

২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

বিধান-বাণী

জনসাধারণের সেবা করার যে সুযোগ আমি পেয়েছি, তার আমি পুরো সদ্ব্যবহার করব। এ এ বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি হবে না।······

—বিধানচন্দ্র

যদিও আমি অনেক অনেক বছর ধরে জনগণের সেবা করে এসেছি, কিন্তু তার পরিবর্তে কোন দিনই ক্ষমতা বা উচ্চ আসনে বসার ইচ্ছা পোষণ করিনি। আমি উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি নই। যদি জনজীবনে কোন স্থান বা গুরুত্ব পেয়ে থাকি, তার জন্য কোনদিন আমি চেষ্টা করিনি, কারণ আমার কোন মাহাত্ম্য বা বিশেষ ক্ষমতা নেই। আমি আশ্চর্য হই কেমন করে আমি তা পেয়েছি···

—বিধানচন্দ্র

৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে ডাঃ রায়ের স্বহস্ত লিখিত শেষ বাণী

"চিকিৎসকদের নির্দেশমত আমার জন্মদিনে আপনাদের সম্ভাষণ ও শুভ ইচ্ছা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমার আশীর্ব্বাদ সকল আগন্তুক বন্ধুর উপর কামনা করি।"

বিধানচন্দ্র রায়

Our President : Neelam Sanjiva Reddy

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২—১৯৬২)

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই বিধানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন পাটনা শহরে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায় শ্রীপুর গ্রামে। তাঁর পিতা প্রকাশচন্দ্র প্রগতিশীল একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। তিনি একজন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর ছিলেন এবং তাঁর পদ ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য সকলের সম্মান ভাজন হন। বিধানচন্দ্রের মাতা অঘোরকামিনী, অত্যন্ত ভক্তিমতী এবং একজন উৎসাহী সমাজ সেবিকা ছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণও তিনি সমানভাবে অনুভব করেছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পাটনা কলেজ থেকেই ম্যাথামেটিক্সে অনার্স সহ বি. এ. পাস করেন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কর্ণেল লিউকিস বিধানচন্দ্রকে সাহায্য করেন ও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এক ইউরোপীয় অধ্যাপকের কু-নজরে পড়ে বিধানচন্দ্র রায় এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এল. এম. এস. ডিগ্রী লাভ করেন এবং যথাক্রমে এম. ডি. পরীক্ষাতেও পাস করেন। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও লণ্ডনের সেন্ট বার্থলোমিউ ইনষ্টিটিউটে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভর্তি হন এবং মাত্র দুবছরের মধ্যে যুগপৎ লণ্ডনের এম. আর. সি. পি. এবং ইংলণ্ডের এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষা দুটিতে পাস করেন। এক সঙ্গে পাস করায় শুধু দুর্লভ কৃতিত্বের (সম্মানের, গৌরবের) অধিকারীই হলেন না, তিনি এম. আর. সি. পি. পরীক্ষায় প্রথম স্থানও অধিকার করেন। ভারতবর্ষে ফেরার পর তদানীন্তন সরকার বিধানচন্দ্রকে ক্যাম্প্‌বেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) সহকারী সার্জেন পদে নিয়োগ করেন, কিন্তু কিছু কিছু ইউরোপীয় রাজপুরুষদের দাম্ভিক (গর্বিত) আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমান আর. জি. কর. মেডিকেল কলেজ) অধ্যাপকরূপে যোগ দেন পরে গৃহ চিকিৎসক হিসেবে ভাল পসার জমিয়ে তোলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (Fellow) হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের ছাপ রাখেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই তরুণ ডাক্তার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য পার্টির সমর্থনে নির্দলীয় প্রার্থীরূপে প্রবীন স্বদেশী নেতা, যিনি বাংলার মন্ত্রীরূপে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছিলেন সেই স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে নাটকীয়ভাবে পরাজিত করেন।

বাংলার বিধান পরিষদে বিধানচন্দ্র অনতিকালের মধ্যে একজন বিচক্ষণ পার্লামেন্টেরিয়ান রূপে পরিগণিত হন। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করে বিধানচন্দ্রকে উক্ত ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি মনোনীত করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে এই ট্রাস্টের নামকরণ হয় দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টই চিত্তরঞ্জন সেবাসদন পরিচালনা করেন এবং বিধানচন্দ্র বেশ কয়েক বছর যাবৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পদে যোগ্যতার সঙ্গে আসীন ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বিধান পরিষদে স্বরাজ্য পার্টির নেতা হন শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। বিধানচন্দ্র দলের সরকারী নেতা নির্বাচিত হন এবং বেশ কিছু সময়ের জন্য বাংলার রাজনীতি পরিচালনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

একজন জাতীয় নেতারূপে বিধানচন্দ্রের অগ্রগতি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি তাঁর সাংগঠনিক শক্তি প্রমাণিত করেন। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু এবং আরও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বিধানচন্দ্র ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এই সব নেতাদের অনেকেই বিধানচন্দ্রের চিকিৎসাধীন ছিলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেসের নির্দেশমত অন্যান্যদের সঙ্গে বিধানচন্দ্রও বিধান পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। সেই বৎসরেই কংগ্রেসের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তিনি সদস্য মনোনীত হন। এই সময়ে কংগ্রেস দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করবার চেষ্টার ফলে বিধানচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়।

জেল থেকে বেরোবার পর ১৯৩১ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উপর্যুপরি তিনি কলকাতার মেয়র এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছেড়ে দেন এবং পেশাগত চিকিৎসা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। 'রয়াল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এ্যাণ্ড হাইজিনে'র এবং 'আমেরিকান সোসাইটি'র ফেলো হিসাবে এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হিসাবে তিনি বহু সম্মান লাভ করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর অনুরোধে বিধানচন্দ্র আবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মনোনীত হন, কিন্তু পর বৎসর তিনি ওই পদে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে অন্তরীণ অবস্থায় গান্ধীজীর ঐতিহাসিক অনশনের সময় তিনি চিকিৎসক হিসাবে গান্ধীজীকে দেখাশুনা করেছিলেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বিধানচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি সম্মানসূচক 'ডকটর অব সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। এর অব্যবহিত পরে ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ (রাজ্য) যুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী বিধায়কগণ তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ আমৃত্যু তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে কাজ করেন। তাঁর এই নিরবিচ্ছিন্ন কার্যকাল পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সংকুল শাসন কার্যের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। উদ্বাস্তু সমস্যা, জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান চাপ, পর্যায়ক্রমে খাদ্য সংকট এবং ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী বেকার সমস্যা—এসব সত্ত্বেও তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই রাজ্য সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি, জমির

সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে আসল কৃষকদের রক্ষা, সেচ প্রকল্প, সার ও উন্নত বীজের ব্যবসা কৃষিক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। নতুন শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহদান করা হয় এবং ছোট্ট দুর্গাপুর গ্রাম একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়। নতুন নতুন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, নতুন নতুন রাস্তা, গৃহ, হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মাণ, রাজ্য থেকে ম্যালেরিয়ার অভিশাপকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এই রাজ্যের জনসাধারণের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। বিধানচন্দ্র যাতে এই রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন এই জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। ১৯৫২, ১৯৫৭, ও ১৯৬২ তে তিনি নিজে নির্বাচিত হন। একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি দেশে ও বিদেশে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। এই দেশের সর্বোচ্চ সম্মান "ভারতরত্ন" উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হয়। তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে অনেক বিদেশী রাষ্ট্র পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রীত্বের গুরু দায়িত্ব সত্ত্বেও বিধানচন্দ্র প্রতিদিন বিনাপারিশ্রমিকে তাঁর রোগীদের চিকিৎসা চালিয়ে যান। অল্প রোগভোগের পর তাঁর জন্মদিনেই তাঁর মৃত্যু হয় (১লা জুলাই ১৮৮২—১লা জুলাই ১৯৬২)! প্রায় দশলক্ষ দেশবাসী তাঁর শোক মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।

বিধানচন্দ্র একজন সুদক্ষ প্রশাসক ও সত্যকারের গণতান্ত্রিক ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনীহা। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের হরিজন সেবক সমাজের প্রথম সভাপতি বিধানচন্দ্র ছিলেন আন্তরিকভাবে অহিংস। প্রয়োজনের সময় কঠিন ব্যবস্থা নিতে তিনি কুণ্ঠা করতেন না। বহু প্রবীন নেতা তাঁকে তাঁদের অভিভাবক হিসাবে জ্ঞান করতেন। ১৯৪৮ থেকে আমৃত্যু তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ পুরুষোচিত গঠন ও ব্যক্তিত্ব সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আদায় করত। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের সকলকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন তাঁর স্নেহসিক্ত মানসিকতা, ঔদার্যে এবং বদান্যতায়। বাইরে কঠিন হলেও তাঁর হৃদয় ছিল কোমল এবং তিনি তার বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রতি ছিলেন সহিষ্ণু। ডাক্তারী ছিল তাঁর প্রথম ভালবাসা। ডাক্তার হিসাবে তিনি খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন। জীবনের সমস্ত ভাল বস্তুই তিনি ভালবাসতেন, যেমন ফুল, সাহিত্য ও ললিত কলা। পোষাক তাঁর খুব সাধারণ হলেও ছিল খুব পরিপাটি। তিনি খুব সূক্ষ্ম রস বোধের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দাক্ষিণ্য ছিল সহৃদয় এবং উদার। অকৃতদার হলেও অতিথি আপ্যায়নে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি (সযত্ন দৃষ্টি) সুবিখ্যাত ছিল।

ন্যায়পরায়ণ, সৎ, মহৎ, ধর্মভীরু, উদার, দেশপ্রেমিক বিধানচন্দ্র ছিলেন একাধারে আদর্শবাদী এবং বাস্তববাদী। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের রূপকার হিসাবে তিনি জনগণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে গেছেন।

ডাঃ বি, সি, রায় মেমোরিয়াল কমিটি

১, বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৭০০০৫৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ৪ঠা জুলাই ১৯৬২ কলিকাতা ময়দানের এক বিশাল জনসভায় ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি গঠিত হয়। ঐ সভায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। উক্ত সভায় কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় যে, ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ডাঃ রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শিশু হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

এর কয়েকদিন পরে ১২ই জুলাই বিধিসম্মতভাবে কমিটির গঠন সম্পূর্ণ করা হয় এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। কিন্তু চীন কর্তৃক আমাদের দেশ আক্রান্ত হওয়ায় অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এই অল্প তিন মাসের মধ্যেই ২৫ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে ৫১ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়।

১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শিশু হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৯৬৬ সালের ১৪ই নভেম্বর পণ্ডিতজীর জন্মদিনে শ্রী এস. কে. পাতিল হাসপাতালের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। হাসপাতালটি ৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আধুনিক যন্ত্রপাতিদ্বারা সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত।

এরপর একটি শিশু-উদ্যান গঠন করার সিদ্ধান্ত কমিটি গ্রহণ করে, যে উদ্যানে ছেলেমেয়েদের অবাধ ঘোরাফেরা ছাড়াও নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ১লা জুলাই ১৯৬৮-তে শ্রী ওয়াই. বি. চ্যবন এই উদ্যানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬-এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ শিশু-উদ্যানের উদ্বোধন করেন।

শিশু-উদ্যানে একটি পাঠাগার ও ১০০ জন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বসে পড়ার পাঠগৃহ আছে, আছে ৫০০ জনের বসার মত একটা প্রেক্ষাগৃহ। এছাড়া আছে গান, নাচ, নাটক শেখার ও সাঁতার শেখার ব্যবস্থা, ছবি আঁকার ঘর। আছে খেলার মাঠ, যেখানে ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েরা যোগব্যায়াম, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যাণ্ডবল, কাবাডি, খো-খো, জিমন্যাস্টিক, অ্যাথলেটিকস্, ব্রতচারী, পি. টি শিখতে পারে! প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞ দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোনও বিভাগেই শিক্ষার জন্য কোন অর্থ নেওয়া হয় না। এমনকি পাঠাগারের জন্যও নয়। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

এছাড়া উদ্যানে পিকনিকের ব্যবস্থা আছে, যেখানে ১৫০ জন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পিকনিক করতে পারে। রান্নাঘর, খাবারঘর, খেলার জায়গা নিয়ে এই পিকনিক-স্থান।

একটা পার্কল্যাণ্ড আছে, সেখানে বাইরের ছেলেমেয়েরা আনন্দ করতে পারে—অসংখ্য দোলনা, স্লাইড, ঢেঁকি—ছেলেমেয়েদের আনন্দের সব আয়োজন আছে।

আর আছে ভি. আই. পি. রোডের উপর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৮ ফুট উঁচু একটি মর্মর-মূর্তি।

শ্রী অতুল্য ঘোষ

ডাঃ বিধানচন্দ্র-রায় প্রসঙ্গে

অতুল্য ঘোষ

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি ১৯৮১র ১লা জুলাই থেকে ১৯৮২র ১লা জুলাই পর্যন্ত ডাঃ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালন করবে। ঠিক ১লা জুলাই থেকেই নয়, ৩০শে জুন থেকে শতবার্ষিকী কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এই শতবার্ষিকী কার্যক্রমে আছে বৃত্তি প্রদান করা, জিমন্যাসিয়াম গঠন করা, ছোটদের উপযুক্ত ডাঃ রায়ের জীবনী প্রকাশ করা। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করবেন। যত অনুষ্ঠানই করা হোক, আমাদের যে ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল শিশু হাসপাতাল ও শিশু উদ্যান আছে, সব অনুষ্ঠানগুলো এই দুটি কাজে আনুষঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ডাঃ রায় যে কী ছিলেন তা বুঝিয়ে বলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যা করতে গেছেন তাতে সফল হয়েছেন এবং তার পুরোধা হয়েছেন। জীবনের নানাদিক—সব দিকেই উনি গঙ্গার বানের মত ভর্তি, কোন ফাঁক নেই। পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. বি. পরীক্ষায় ফেল হলেন, সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. ডি হলেন। বিলেতে পড়তে গেলেন, সেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছুতেই নেবেন না। দু'বছরের মধ্যে এম. আর. সি. পি. ও এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। ওঁর কাছে অসম্ভব বলে যেন কিছুই ছিল না। পড়ার খরচ যোগাতে পারতেন না, পুরুষ নার্সের কাজ করে এমন কৃতিত্ব দেখালেন যে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ওঁর ওপর। অল্প বয়সে ভারতবর্ষের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান সেই ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভাপতি। এতো গেল ডাক্তারীর কথা। রাজনৈতিক জীবনেও তাই। কলকাতায় বাস করেন। কলকাতার এদিক ওদিক ঘুরে কর্পোরেশনে ঢুকলেন। কিছুদিন বাদেই সর্বপ্রধান মেয়র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স কমিটিতে ছিলেন। তারপরই দেখা গেল সর্বোচ্চ পদে আসীন—ভাইসচ্যান্সেলর। রাজনীতিতে ঢুকবেন! তখন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে পরাজিত করে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হলেন। কোন দলের মাধ্যমে নয়। কংগ্রেসে গেলেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, আমৃত্যু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। চিকিৎসা করেন—প্রধান রোগী হলেন মহাত্মা গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যদিও চোদ্দ বছর ছিলেন, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর আসনের মর্যাদা বেড়েছে, ওঁর পক্ষে হয়েছে আরেকটি বিভাগের প্রধান।

মেমোরিয়াল কমিটি যে হাসপাতাল বা শিশু উদ্যান করেছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যারা হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছে, শিশু উদ্যানে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নানারকম শিক্ষালাভ করছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনও যদি জীবনের যে কোন একটা দিকে ডাঃ রায়ের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তাহলেই মেমোরিয়াল কমিটির কাজ সার্থক হতে পারে। যাঁর নামের সঙ্গে মেমোরিয়াল কমিটি যুক্ত, তিনি দেখিয়ে গেছেন, জীবনে অসাফল্য বলে কিছু নেই, জীবনের গতিছন্দ এমন করা যায়, যা সাফল্য থেকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে পারে।

ওঁর সব কথা শুনে মনে হয় গল্প। কিন্তু তাতো নয়, সত্যিই রক্তমাংসের ছেলে ছিলেন বাংলা দেশের পাঁচটা ছেলেমেয়েদের মত। সেই মানুষই যাতে হাত দিয়েছেন, তাতেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাহলে আজকের ছেলেমেয়েরা তা পারবে না কেন? এটা তো একটা পরম গর্ব ও আনন্দের কথা যে তাঁর মত লোকের নামের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এরা যুক্ত। গর্ব এজন্য যে তিনি বর্তমান কালের ছেলেমেয়েদের পূর্বপুরুষ। আর আনন্দ হয় এইজন্য যে ডাঃ রায় যে পথ দেখিয়ে গেছেন সেই পথ অনুসরণ করবার সুযোগ পেয়েছে বর্তমানকালের ছেলেমেয়েরা।

ডাঃ রায়ের টেবিলে কতগুলো শ্বেতপাথর দিয়ে কাগজ চাপা থাকত। তাতে লেখা থাকত—কাজ ফেলিয়া রাখিও না, এখনই কর। এ যে কত বড় কথা এ তো ঠিক লিখে বোঝানো যাবে না। তিনি জীবনে এই নীতিই অনুসরণ করতেন এবং এই নীতি অনুসরণ করেই তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েরা তাঁর সম্বন্ধে এত কথা শুনছে, শুনবে—তাদের ভাবনা কি? ডাঃ রায় কথায় কথায় বলতেন—আমার কোন বড় হবার ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে ছিল না এটা সত্য, কিন্তু কাজ করবার ইচ্ছা ছিল পুরো। কোন কাজই ফেলে রাখতেন না। সে কারণে যে কাজই করতে গেছেন, সে কাজেই সফল হয়েছেন। কোন কালেই তো বড় হবার ইচ্ছে ছিল না, ইচ্ছে ছিল কাজ করার। যখন যে কাজে হাত দিয়েছেন, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে সে কাজই করেছেন। তার ফলেই সাফল্য এসেছে। তাঁর স্মৃতিজড়িত বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েরা এবং 'খেয়ালখুশী' যারা পড়ে তারা এখন যে কাজ করে তা মনপ্রাণ দিয়ে যদি করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাদের কাজে সফল হবে। ভয়ের তো কিছু নেই। বলভরসা অনেক—সামনেই তো ডাঃ রায়ের আদর্শ আছেই। ডাঃ রায় যেমন কোন কাজকেই ছোট ভাবতেন না, ছেলেমেয়েরাও তেমনি ভেবে কাজ আরম্ভ করবে—যারা উদ্যানের ছেলেমেয়ে এবং 'খেয়ালখুশী' যারা পড়ে। পথ দেখাবার জন্য ধ্রুবতারার মত ডাঃ রায়ই তো আছেন। এই ছেলেমেয়েরা চেষ্টা করলেই ডাঃ রায়কে আবার বাঁচাতে পারে, তাদের চেষ্টার মধ্য দিয়ে, তাদের কাজের মধ্য দিয়ে, তাদের সংকল্পের মধ্য দিয়ে।

আনন্দ সংবাদ

ডাঃ বি, সি, রায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় উদ্যানের সভ্য শ্রীঅভিজিৎ বিকাশ পালের রচনা শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রীমানের বয়স ১৩। বিষয় ছিল 'বিধানশিশু উদ্যান'।

গজাধরের ঘুমপাড়ানি

সুকুমার সেন

দাদি গো দাদি,
কলার কাঁদি।
একটা কলা দিলে পরে
খেতে খেতে যাই মাসির ঘরে।
মাসি বলে—আজকে এলি।
আজ তো আমার ভাঁড়ার খালি।
মুড়ির নাড়ু আছে দুটো,
ফুরিয়ে গেছে খই নাড়ুটো।
মুড়ির নাড়ু কামড়ে চোটে
দন্ত ভেঙে রক্ত ছোটে।
মাসি বলে—বাড়ি যা না,
এর পরে রোদ দেবে হানা।
গেলুম তখন পিসির বাড়ি,
পিসি পেতে দিলে পিঁড়ি।
মণ্ডা মিঠাই সন্দেশ গজা
জিলিপি পানতুয়া খাজা,
খেয়ে পেটটা বোঝাই করে
মনটা হ'ল পালাই ঘরে।
পিসি বলে—তা হয় না,
ঝোল ভাত দুটি খেয়ে যা না।
নইলে মা দুষবে আমায়,
"আক্কেলখাকী দিলে বিদায়—
না খাইয়ে ভর দুপুরে
কচি ছেলেকে পাঠায় ঘরে।"
মাসিপিসির স্বপ্ন ভেঙে
জেগে উঠে পরে,
গজাধর বায়না ধরে
'জিজিবি' খাবার তরে॥

[গজাধর জিলিপিকে বলে জিজিবি।]

বঙ্গ-বিধাতা বিধানচন্দ্র

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

নব বাংলার রূপকার তুমি
তোমাকে পেয়েই ধন্য এ'-ভূমি

চেয়েছিলে তুমি যে-রূপে সাজাতে
তিলোত্তমার বুকেতে বাজাতে

যে-বাঁশির সুর, নয় সে তো দূর
হে বীর ভারতরত্ন!
সারা বঙ্গের অঙ্গে বোলানো
তোমার স্নেহ ও যত্ন !!

আজ বাংলার যেদিকে তাকাই
তোমার প্রীতি স্মৃতি-ছোঁয়া পাই

প্রীতিমাখা স্মৃতি-গীতির পরশে
সবার হৃদয় ভরে যে হরষে

তোমার স্বপ্ন সফল হবেই
হে বীর বঙ্গ-বিধাতা!
বাঙালীর বুকে, চির সুখে-দুখে
তোমার আসন-পাতা !!

তিনি কবিও, তিনি রূপকার

সন্তোষকুমার ঘোষ

নাম ডাক তাঁর তখনও যথেষ্টই, আমরা যখন বালক, তবে সেটা বিশেষ করে ডাক্তার হিসাবে। স্যার নীলরতনের সঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের কথাও তখন ঘরে ঘরে ঘোরে। নেতা বলে তাঁর নাম কানে আসে—আমি যখন কৈশোরে। শুধু নেতা নন, বঙ্গ কংগ্রেসের শীর্ষ-পঞ্চকের তিনি একজন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বেড়াই, খেলি, আর তাঁর পশ্চিমদিকের বিশাল বাড়িটার বড় ঘড়িটাকে অবাক চোখে চেয়ে দেখি। লোকের মুখে মুখে শুনি যিনি ধন্বন্তরি এটাই তাঁর বাড়ি। একটা সম্ভ্রম জড়িত কৌতূহল সেই অল্প বয়সেই মিলেমিশে মনে একটা রহস্যলোক তৈরি করত।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা কতটা, ওই বয়সে সেটা জানবার কথা নয়। বরং যখনই বড় কোনও নেতার অসুখ, তখনই তাঁর ডাক পড়ছে, এইটেই বারে বারে শুনতাম। যাঁরাই রোগী তাঁরাই সুবোধ শিশু হয়ে তাঁর কথা শুনছেন, কী নেহরু, কী গান্ধীজী। গর্ববোধ করতাম বৈকি।

এর চেয়েও ঢের বড় ভূমিকা যে তাঁর অপেক্ষায় ছিল, সেই স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের সময়ে সেকথা তাঁর নিজেরও জানা ছিল কি? বোধহয়, না। অন্ততঃ অন্যান্য নেতৃমণ্ডলীর তো নয়ই। বিধানচন্দ্রের নির্দিষ্ট নিয়তি তাঁদেরও জানা থাকত যদি, তবে তাঁরা গোড়ায় উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবে তাঁকে মনোনীত করতেন না। বিধানচন্দ্র তখন বিদেশে। ওই মনোনয়ন যে তাঁর মনঃপূত নয়, সেটা জানতে দেরি হয়নি জনগণের। দূর উত্তরপ্রদেশে তিনি যাবেন কেন, যে ডাক্তার অচিরে হবেন এই বাংলার রূপকার?

মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর বরণ—এই রাজ্যের ইতিহাসের সে এক স্মরণীয় দিন। তাঁর আগে অল্পকালের জন্য, এবং পরে একের পর এক কত গণ্যমান্য ব্যক্তিই না পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার হয়েছেন। কিন্তু কই, অমন বিরাট, বিস্তৃত কল্পনা আর তো দেখা গেল না। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর বিভোর দর্শন। কবিত্ব কি শুধু পদ্য মেলানো? একেই তো কবি বলে। আমার কাছে তিনি কবিও। যে দিকে চাই, যে ক'টি নতুন প্রকল্পের আবির্ভাব ঘটেছে এই ভঙ্গবঙ্গে, প্রায় প্রত্যেকটির পিছনেই তাঁর সৃজনী মেধা, তাঁর উৎসাহ, তাঁর উদ্দীপনা। স্টেট বাস? তাঁর সৃষ্টি। বেবি ট্যাকসি? সে-ও তাঁর। সব শিশু হয়তো অভিপ্রেত আকার পায়নি—অনেকগুলো বিকলাঙ্গ আজ। তবে সে দোষ কি স্রষ্টার? বাঙালীকে তিনি কাজ দিতে চান, করতে চান কাজের জাতে পরিণত করতে।

এইভাবেই এসেছে হরিণঘাটা, এসেছে কল্যাণী। হলদিয়া, দুর্গাপুর, সল্ট লেক সিটি, যাকে অধুনা বিধাননগরও বলি। একবার তো জাপান থেকে ঘুরে এসে "মনোরেল" চালাবেন বলেও চঞ্চল হয়ে ওঠেন—সেই চাঞ্চল্য যা তারুণ্যকেও হার মানায়।

বাঙালী তিনি, একটার পর একটা প্রকল্প আদায় করে আনছেন দিল্লি থেকে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে যিনি ডাকেন শুধু জওহরলাল বলে ("জওহরলাল, এটা করে দিতে হবে")—শুনে আমাদের বুক ফুলে দশ হাত হত।

সিদ্ধার্থ রায় (তখন মুখ্যমন্ত্রী) একবার নাকি

বলেন, "আজ সারা দিন যত প্রকল্পের শিলান্যাস করলাম, কিংবা উদ্বোধন, তার প্রত্যেকটাই দেখি ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা।" তাই ছিল। তিনি আরও আয়ু পেলে না জানি আরও কত কল-কারখানা প্রজেক্ট প্রভৃতি বাঙালীর করায়ত্ত হত, অন্তত এই রাজ্যে যে স্থাপিত হত, তাতে সন্দেহ নেই।

শুধু দু'তিনটি বস্তুর জন্যে কোনও কৃতিত্ব নেই তাঁর। অন্তত আমি তো দেব না। ধরা যাক শিশু হাসপাতাল, কিংবা তোমাদের এই সজলা শ্যামল উদ্যান। এই দুটি তাঁর যোগ্য স্মরণ, যাঁর উদ্যোগ শ্রদ্ধেয় অতুল্য ঘোষের। এরা তাঁর ভাবনার সৃষ্টি, বিধানচন্দ্রকে মনে রেখে সকলের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি আমাদের এই সর্বতো-রক্ষণীয় অমূল্য উত্তরাধিকার।

শতবর্ষের প্রণাম

কৌশিক দত্ত (**সভ্য, সিনিয়র**)

আঠারোশ' বিরাশি সালে
বিহারের পাটনায়
জন্মালেন এক মহাপুরুষ
বিধানচন্দ্র রায়।
প্রকাশচন্দ্র পিতা তাঁর
অঘোর কামিনী মাতা—
অসাধারণ কর্মসাধনা
গভীর স্বাদেশিকতা।
এ সমস্ত গুণের তিনি
অধিকারী হ'লে
সকল জনে জানল তাঁকে
কর্মযোগী বলে।
পেলেন যখন ডিগ্রীগুলো
এম.আর.সি.পি., এফ.আর.সি.এস.
চিকিৎসক হিসেবে তাঁর
নাম ছড়াল বেশ।
চিকিৎসক হয়ে তিনি
করলেন রোগমুক্ত
ধনী, দরিদ্র সকলেরে
যারা ছিল রোগযুক্ত।
মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি
পশ্চিম বাংলার
'ভারতরত্ন' দিল তাঁকে
ভারতের সরকার।
আজ আর তিনি নেই
আমাদের মাঝে,
অমর হয়ে আছেন তিনি
তাঁর বিভিন্ন কাজে।
উনিশশ' একাশির
পয়লা জুলাই
তাঁর জন্মশতবার্ষিকী, তাঁকে
প্রণাম জানাই।

বিধানচন্দ্রের গল্প

শান্তিকুমার মিত্র

তোমরা নিশ্চয় সকলেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনকথা পড়েছ। তাঁর ছাত্রাবস্থার কিছু কিছু কাহিনীও তোমাদের জানা। সেই যে যখন তিনি মেডিকেল ছাত্র, ইংরেজ অধ্যাপকের টমটমের সঙ্গে ট্রামের ধাক্কার ঘটনায় তাঁর ট্রাম-চালককে দোষারোপ করে সাক্ষী দিতে রাজী না হওয়ার বিবরণ নিশ্চয়ই তোমাদের চমৎকৃত করে। তাই না? তা আজ তোমাদের বিধানচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু অজানা গল্প বলব। অজানা, কেননা এগুলি কোথাও লেখা হয়নি। তা ছাড়া হয়ত, তেমন চমকপ্রদও নয়। তবে কী জান, এসব টুকরো ছবি থেকে মানুষ বিধানচন্দ্রকে অনেক বেশি জানা যায়। সেজন্যই বলতে চাই। তোমরা বিধানচন্দ্রের ছবি দেখেছ তো বটেই। ঋজু, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ। যাকে বলে বড় মানুষ, তেমনি মানুষ। বড় মানুষ না হলে অত বড় বড় কাজ করতে পারতেন? পশ্চিমবঙ্গের জন্য কতই না ভেবেছেন।

তাঁর সব সময়ের ভাবনা ছিল, কী কী করলে পশ্চিমবঙ্গের ভাল হয়। বিধানচন্দ্র তখন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা তিন সাংবাদিক পশ্চিম জার্মানী যাচ্ছি নিমন্ত্রণ পেয়ে। যাবার ক'দিন আগে রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাঁর আশীর্বাদ নিতে গিয়েছি। প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। রাইটার্সে তাঁর ঘরে চাঁদের মতো বড় টেবিলের একধারে বসে কতদিন তাঁর মন্তব্য, বিবৃতির নোট নিয়েছি। নামও না বলিনি, তা নয়। তবে তিনি ঐরকমই, কী হে, শোন বলে ডাকতেন। যেমন গলার স্বর, তেমনি ডাক। ও সব নামধামের বালাই বড় একটা ছিল না তাঁর কাছে। অন্ততঃ আমরা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে যতটুকু দেখেছি, তা থেকে বলতে পারি। হাঁ, সেই দেখা করতে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। আমার বেশ মনে আছে, বিধানচন্দ্র আমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ওহে, তুমি অতুল্যর ছেলে না? তোমরা ভাবছ তো, এ কীরে বাবা। তাহলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। আমি তখন তোমাদের দাদুর সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরতাম। নানা সফরেও থাকতাম, বিধানচন্দ্রও গেলে আমাকে দেখতেন। তাছাড়া আমার সাংবাদিকতারও হাতে খড়ি তোমাদের দাদুর সম্পাদিত কাগজে। এই অর্থেই আমি অতুল্যর ছেলে—যাকে বলে দলের ছেলে, সাথি। বিধানচন্দ্রের এইরকম বলার ধরণ ছিল। সেইদিনকার আসল কথা তিনি কী বলেছিলেন জান? বিধানচন্দ্রের সে কথাগুলি এখনও যেন কানে বাজে। 'বেশ, বেশ, যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েও জার্মানী কত তাড়াতাড়ি নিজেদের নতুন করে গড়ে তুলেছে। ভাল করে দেখে আসবে তারা কী করে সফল হল? এ দেশে কাজে লাগে, এমন সব জিনিস মন দিয়ে বুঝবে। বুঝলে হে?'—এই আমাদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ। তিনি প্রচলিত ধারায় কোনও শুভেচ্ছা জানাননি। বল তো, আমাদের কেমন মনে হয়েছিল? এক কথায়, আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

কেউ যদি বলেন, বিধানচন্দ্র কবি ছিলেন, হয়তো ঠিক বলা হয় না, কিন্তু আমি অবশ্যই বলব,

তাঁর কবি-মন ছিল। অত কর্মব্যস্ত মানুষ, যাকে বলে কেজো মানুষ, তা সত্ত্বেও তিনি সৌন্দর্যদ্রষ্টা ছিলেন। বা বলা চলে, তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী। বিভিন্ন সময়ে তার পরিচয় পেয়েছি। এখন আপশোস হয় সে সব দিনের টুকিটাকি কথা লিখে রাখিনি ও সে সব দৃশ্যের ছবি তুলে রাখিনি বলে। একবার তাঁর সঙ্গে একদল সাংবাদিক আমরা কালিম্পং চলেছি জনতা কলেজের এক অনুষ্ঠানে। মোটরের, জিপের কনভয় চলেছে। কনভয় বুঝতে পারছ তো? মোটরবাহিনী। সে কী ভীষণ খাড়াই, দুপাশে অতলস্পর্শী খাদ। হঠাৎ কনভয় দাঁড়িয়ে গেল। কী? না, ডাঃ রায় নেমে চারদিক দেখছেন। ভয়ে আমাদের বুক দুর দুর করছে। গুটি গুটি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে কী দেখলাম জান? আমরা প্রকৃতির যে ভয়াল রূপ দেখে কাঁপছি, তিনি দু চোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখছেন। কলকাতায় তাঁকে সব সময় ধুতি পাঞ্জাবী পরতেই দেখতাম। ঠাণ্ডার জায়গা বলেই বোধ হয়, তিনি সেদিন কালো স্যুট পরেছেন। তাঁর কাছাকাছি অফিসারকুল দাঁড়িয়ে। তিনি হাত তুলে এদিক ওদিক দেখাচ্ছেন, হয়ত জানতে চাইছেন, কোন্ জায়গাটার কী নাম। হয়ত তখন তাঁর মনে টুরিস্ট সেণ্টার করার পরিকল্পনা জাগছিল। তোমরা অনেকেই হয়তো দীঘায় গিয়েছ। এই দীঘা বিধানচন্দ্রেরই মানসকন্যা। দীঘায় আবাস বা কটেজ তৈরিতে তাঁরই সব আগ্রহ, যাতে মধ্যবিত্ত মানুষ কলকাতার বদ্ধ পরিবেশ থেকে দু' চারদিন পালিয়ে গিয়ে সমুদ্র সৈকতে মুক্তবায়ু সেবন করতে পারে। দীঘায়ও তাঁকে দেখেছি। কী মমতা নিয়েই না তিনি দীঘার চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন। সমুদ্র সৈকতে জীপে ঘুরতেন।

আজ বিধান শিশু উদ্যানে গাছগাছালি দেখলে বার বার তাঁকে মনে পড়ে। প্রকৃতিকে তিনি মনে মনে খুবই ভালবাসতেন। কল্যাণী উপনগরী আসলে তাঁর মনোমত হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিল, কল্যাণীতে প্রকৃতির ক্রোড়ে মনুষ্যবসতি হোক, অনেক পার্ক থাকুক, খোলামেলা পরিবেশ গড়ে উঠুক। গার্ডেন-সিটি অর্থাৎ উদ্যান নগরী তাঁর মনে স্বপ্নের মতো জড়িয়ে ছিল। সেদিন নদীয়া জেলার চাকদহে গিয়েছিলাম। কল্যাণীর কাছেই। আগে কল্যাণীও চাকদহ থানার অন্তর্গত ছিল। চাকদহে দেশ বিভাগের পর বহু উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে ওঠে। চাকদহ বহুদিন থেকেই একটি পৌর অঞ্চল, অথচ দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখনও চাকদহ গ্রাম বললেই চলে। চাকদহের প্রাক্তন পৌরপতি, প্রবীণ মানুষ শৈলেন্দ্রনাথ দে বলছিলেন, সে সময় দার্জিলিং-এ এক পৌর সংক্রান্ত সম্মেলনে তাঁরা গিয়েছিলেন। ডাঃ রায় তাঁকে বলেছিলেন, ওহে, চাকদহকে 'মেক এ গার্ডেন সিটি অব ক্যালকাটা।' মানে হল, চাকদহকে কলকাতার উদ্যান নগরী কর। চাকদহ অবশ্য প্রকৃত বাস্তবে তা হয়নি, আর পাঁচটা মফঃস্বল শহরের মতোই শহর একটা মাত্র আজ। কিন্তু এটুকু নিশ্চয়ই তোমরা এখন বুঝছ, বিধানচন্দ্রের মনে একটা প্রচণ্ড সৌন্দর্যস্পৃহা ছিল। তবে সব সময়ই তাঁর কাছে মানুষই প্রধান। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি প্রকৃতির সেবা করার কথা ভাবতেন।

পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র

পল্লব গঙ্গোপাধ্যায় (সভ্য, ১১)

স্বাধীনতার পর বিদেশীদের শোষণে শোষণে ভারতমাতা নিঃস্ব, রিক্ত ! দেশ দ্বিধা বিভক্ত, বাংলাদেশের তিনভাগের একভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সমস্যার ভার সীমাহীন—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষতচিহ্ন তার বুকে। বেকার সমস্যা, অর্থ সমস্যা ছাড়াও শরণার্থী সমস্যা অক্টোপাসের মত ছেঁকে ধরেছে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গকে। বাঙ্গালী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্বাধীনতা অর্জিত হ'ল, কিন্তু এই স্বাধীনতা সফল করবে কে ?

কিন্তু যে ব্যক্তিটি এগিয়ে এলেন তিনি সাত্তষট্টি বছরের বৃদ্ধ, কিন্তু দেহে ও মনে তরুণের শক্তি, উৎসাহে ও কর্মে নিরলস, তিনিই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। পৃথিবীর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। কথা উঠেছিল, মানবদেহের জটিলতা অবসানকারী এই চিকিৎসক কি পারবেন দেশ ও জাতিকে সুস্থ করে তুলে প্রতিষ্ঠার মুকুট পরিয়ে দিতে ? উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদ পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সেখানে যেতে মন চাইল না।

সবিনয়ে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন, তখনকার ক্ষুদ্রতম প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নিলেন আপন কর্মক্ষেত্ররূপে। দৃঢ় হাতে তিনি এই সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের হাল ধরলেন। ১৯৪৮ সালে নেতাজীর জন্মদিনে (২৩শে জানুয়ারী) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন। সেদিন বক্তৃতা দিতে উঠে ডাঃ বিধানচন্দ্র বললেন—"অতীত দিনের কাহিনীকেই ইতিহাস বলা হয়। বর্তমানের কাহিনীকে কেউ ইতিহাস বলে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। সুভাষচন্দ্র নিজেই একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।" সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে আহ্বান জানালেন বাঙ্গালীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সেই ১৯৪৮ সাল থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত (১লা জুলাই ১৯৬২) তিনিও এক নতুন ইতিহাস। এইসব দিনগুলিতে তিনি ছিলেন সংবাদের শিরোনাম ; বাঙ্গালী জাতির গর্বের ,বস্তু এবং সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রদ্ধার পাত্র।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি নানাবিধ পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চললেন যে কঠোর পরিশ্রম করে জীবনে উন্নতি করেছিলেন ; তেমনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের বৈষয়িক উন্নতির জন্য আমৃত্যু কঠোর পরিশ্রম করে চললেন। রাজ্যের শিক্ষা, শিল্প, কল কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনে নতুন পথের সন্ধান দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের আজ যা কিছু গর্বের বস্তু সে সব কিছুতেই তাঁর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ।

কারিগরী শিক্ষার উন্নতির দিকে ছিল তাঁর প্রথম দৃষ্টি। তাঁরই চেষ্টায় যাদবপুর কলেজ আজ ভারতের অন্যতম ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়। খড়্গপুরে টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট স্থাপন। বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা সব তারই প্রচেষ্টার ফল। দুর্গাপুর ইস্পাত শিল্প ও শিল্পনগরী, দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, হলদিয়া পরিকল্পনা, বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন, কলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ এ সকলই তাঁর হাতে গড়া। কলকাতার উপকণ্ঠে সল্ট লেক উপনগরী স্থাপন প্রসঙ্গে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন জলা লবণ হ্রদ গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে বুজিয়ে সেখানে নগরী স্থাপন করে কলকাতার ভীড় কমাবার

পরিকল্পনা নেন, তখন তাঁর এই পরিকল্পনার যৌক্তিকতায় অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর যুক্তির সারবত্তা সবার কাছেই স্পষ্ট ও পরিষ্কার। লবণ হ্রদ আজ এক জীবন রসে স্পন্দিত নগরী। সমুদ্র দেখার জন্য বহু অর্থ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যায়। সেইজন্য তিনি দীঘা সমুদ্র সৈকত গড়ে তুললেন। কত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এই রাষ্ট্রনায়ক সে পরিচয় আমরা অনেক ঘটনা থেকে পাই।

মানুষ কর্মের দ্বারা অক্ষয় যশলাভ করে। পশ্চিমবাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনী আমাদের কাছে কর্মের আদর্শের প্রতীক। নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে তা সাফল্যমণ্ডিত হবেই। সে শিক্ষা বিধানচন্দ্র রায় তাঁর জীবন এবং তাঁর আয়োজিত কর্মযজ্ঞ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। বাঙালীর হতাশ প্রাণে তিনি সঞ্চার করেছিলেন নব আশা, নবশক্তি। এতই আর্তবন্ধু ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে মৃত্যুর পর তাঁর বসত-বাটিখানিও যাতে জাতির সেবায় নিয়োজিত হয় তার ব্যবস্থা করেন। আজ সেখানে গবেষণামূলক চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। দেশবাসী আজ কৃতজ্ঞচিত্তে বিধানচন্দ্রকে স্মরণ করে এবং ডাঃ বি, সি, রায় মেমোরিয়াল কমিটি তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে 'ডাঃ বি, সি, রায় শিশু হাসপাতাল' নামে এক বিরাট হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন এবং 'বিধান শিশু উদ্যান' নামে একটি দীঘি সমেত পুষ্পশোভিত সুসজ্জিত উদ্যান স্থাপন করেছেন।

স্কেচ : আশিস্ চট্টোপাধ্যায় (সভ্য, সিনিয়র)

আমাদের উদ্যান

চয়ন সমাদ্দার (সভ্য, ৯)

আমরা উদ্যান বলতে বুঝি বাগান বা বেড়ানোর জায়গা। কিন্তু আমাদের শিশু উদ্যান এমনই একটি উদ্যান যার অর্থ শুধু বেড়ানোর জায়গা নয়, আরও অনেক কিছু। আমি আজ এক বছর হল এই উদ্যানের সভ্য। প্রথম যেদিন বেড়াতে এসেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম যদি এর সভ্য হতে পারতাম, তাহলে কী মজাই না হত! তাই যেদিন আমি গ্রন্থাগার ও যোগব্যায়াম বিভাগের সভ্য হলাম, সেদিন আমার এত আনন্দ হয়েছিল বলার নয়। আমি এই উদ্যানকে প্রথমদিন থেকেই ভালবাসি। আমাদের সৎ ও সুন্দর হয়ে বড় হবার সব ব্যবস্থা এখানে আছে। আছে যোগ-ব্যায়াম, ব্রতচারী, খো-খো, কাবাডি, এ্যাথলেটিকস, ভলিবল, বাস্কেটবল প্রভৃতি বিভাগ। আর আছে পাঠাগার, গ্রন্থাগার, অংকন, কলাকেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভা বিকাশের বিভাগ। আছে সাঁতার শেখার ব্যবস্থা। আমি অবশ্য সবচেয়ে ভালোবাসি আমার গ্রন্থাগারকে, কারণ, আমি যে বই পড়তে খু-উ-ব ভালবাসি। এই উদ্যানের সব দাদা দিদিরা আমাদের ভাল হবার শিক্ষা দেন। আমরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারি সেইজন্যে গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে আবাসিক শিবির হয়। এছাড়া, বছরের বেশিরভাগ দিনেই লেগে আছে নানা আনন্দ অনুষ্ঠান। আমাদের কলাকেন্দ্রের ও অন্যান্য বিভাগের সভ্য-সভ্যারা নানা ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। আমিও যোগদান করি নাটকে, আবৃত্তিতে। অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা এইসব অনুষ্ঠানে আসেন।

আর আছে 'খেয়াল-খুশী'। আমাদের নিজেদের পত্রিকা। আমাদের লেখা তাতে ছাপা হয়। আমাদের উদ্যানের বৈশিষ্ট্য হল—আমরা উদ্যানের সভ্যরা নববর্ষ শুরু করি বিদ্যা শিক্ষার গুরু বিদ্যাসাগরকে প্রণাম জানিয়ে। আর আছেন আমাদের দাদু। তাঁর কঠোর ও সস্নেহ দৃষ্টি সব সময়ে আমাদের প্রতি আছে। আমাদের উদ্যানের নাম—'বিধান শিশু উদ্যান।' কার নামে এই উদ্যান আশা করি সকলেরই জানা। সেই মহামান্য বিধানচন্দ্রের শতবর্ষ উৎসব পালন করছি এই বছরে।

আমার একটাই কামনা—আমি যেন বড় হয়ে ভাল হয়ে এই উদ্যানের সম্মান বজায় রাখতে পারি। আমি চাই আমাদের এই ফুলে ভরা, খেলায় ভরা উদ্যান আরও ভাল হোক, আরও বড় হোক।

স্কেচ: তাপস পাল (বয়স-১৩)

আমাদের বিধান চন্দ্র

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (সপ্তম, ১২)

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র রায় এবং অঘোর কামিনী দেবীর পুত্র বিধান চন্দ্র রায় পাটনা শহরে ১লা জুলাই ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর নাম রাখেন। তাঁর শিক্ষা জীবন পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে শুরু হয়। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৮৯১ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন। অতি মেধাবী ছাত্র বিধানচন্দ্র ১৯০৯ সালে এল. এম. এস. পাস করেন এবং ১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. ডিগ্রি পান, এরপর ১৯০৯ সালে তিনি বিলেত যাত্রা করেন এবং সেখানে তিনি এম. আর. সি. পি. (M. R. C. P.) এবং এফ. আর. সি. এস. (F. R. C. S.) উপাধি লাভ করেন। শীঘ্রই তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায়ও নিজেকে জড়িত রাখেন এবং এর ফলস্বরূপ তিনি ১৯৪৪ সালে ডি. এস. পি. উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে বিধানচন্দ্র ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি পদে বৃত হন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিধানচন্দ্র উৎসাহী ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে বিধানচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ান ও জয়ী হন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন। এর পরেই ১৯২৮ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে বিধানচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য হন। নিজের দেশকে ভালবাসার এই অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বিধানচন্দ্র কংগ্রেসের নেতা রূপে ১৯৪৮ সালের ২২শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী রূপে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রূপকার নামে খ্যাত হন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের যা কিছু উন্নতি, তার মূলে ছিলেন বিধানচন্দ্র। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী শহর, কলকাতার কাছে লবনহ্রদ উপনগরী, দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল, হলদিয়ার নতুন বন্দর সবকিছুই বিধানচন্দ্রের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি তাঁর স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল হওয়ার আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে তিনি অবশ্যই একটি উন্নত সুন্দর রাজ্যে পরিণত করে যেতেন। দেশসেবার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে ১৯৬১ সালে 'ভারতরত্ন' উপাধি দেওয়া হয়।

শিশুরা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতাল ও বিধান শিশু উদ্যান স্থাপন করেন তাঁর স্মৃতিরক্ষণ সমিতি।

৮০ বছর বয়সে, জন্মদিনের দিন, ১ জুলাই ১৯৬২ সালে বিধানচন্দ্র আমাদের চিরকালের জন্য ছেড়ে যান।

বিধান চন্দ্র রায়

চন্দ্রনাথ রায় (সভ্য, ১৩)

বিধানচন্দ্র রায়ের যখন জন্ম হয় তখন ভারত পরাধীন ছিল। পবাধীন জাতির ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় ভারতবর্ষে ছিল ইংরেজদের রাজত্ব। ইংবেজ প্রভুবা নিজেদের খেয়াল খুশী মত দেশ পবিচালনা করত। ভারতীয়দের গায়ের বক্ত জল করা পয়সা দিয়ে করত আমোদ প্রমোদ। চিন্তা করত না এই পরাধীন জাতির কি হবে। ভারতীয়দের তারা মানুষের মধ্যেই গন্য কবত না, কিন্তু এই সময়ে এমন কয়েকজন মানুষ ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যাঁরা ইংরেজদের তাঁদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। তারা ইংরেজদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মানুষও কোন দিকে কারুর থেকে কম নয়। এই সময়কার মহাপুরুষদের অধিকাংশই বাঙালী, অধিকাংশ মহাপুরুষদের জন্ম হয়েছে বঙ্গদেশের মাটিতে।

এই যে একশ বছব ধরে ভাবতে এইসব আদর্শবান মহাপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেছেন, এই সময়টাকে ইতিহাসে ভারতের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এই সময়ে জন্ম নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, বিধান চন্দ্র রায়, প্রমুখ মহামানবগণ, শুধু একটি বিশেষ দিকেই এই সময়ে ভারতের খ্যাতি নয়, বিজ্ঞানের জগতে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সাহিত্যের জগতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং আরও নানা দিকে, নানা ক্ষেত্রে নানা মহা-পুরুষদেব অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তেমনি বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন চিকিৎসা বিদ্যা, রাজনীতি অধ্যাপনা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিখ্যাত। যখন যে দিকে তিনি গিয়েছেন, যখন যে বিষয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন, সেখানেই তিনি সফল হয়েছেন। গলায় পরেছেন বিজয়েব মালা। কোনদিনই কোন বিষয়ে তিনি ধৈর্য হাবিয়ে ফেলেন নি। ভাবত স্বাধীন হবার পব তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন সে সময় ভাবতেব প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল না। কিন্তু সেই দুঃসময়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পেবেছেন। দীর্ঘ ১৪ বছব ধরে ধৈর্যের সাথে তিনি আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি করে গেছেন। সেই কাবণেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেনও।

ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষে অনেক মানুষই রাজা উপাধি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর পেয়েছেন প্রিন্স উপাধি। কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে বঙ্গদেশে কোন কোন মহাপুরুষ রাজা উপাধি পেয়েছেন, তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম মনে পড়ে রাজা রাজমোহন রায়েব কথা। তেমনি যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার কে ? তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের মনে পড়ে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নামটি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনেক মহৎ কর্ম করে গেছেন। এইসব মহৎ কর্মের জন্য উপকৃত হয়েছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। তিনি সুশিক্ষার জন্য বহু স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, নির্মাণ করেছেন লবন-হ্রদ, দুর্গাপুব, কল্যাণী প্রভৃতি

উপনগরী। সৃষ্টি করেছেন রাজ্য পরিবহন করপোরেশন, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, দীঘা উন্নয়ন সংস্থা। দুর্গাপুর, জলঢাকা, ম্যাসাঞ্জোর এবং ব্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা গড়ে তুলেছেন। ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী সেচ ব্যবস্থা এবং দামোদর উপত্যকা করপোরেশন প্রকল্প তিনি প্রচলন করে গেছেন।

বিধানচন্দ্র রায় অনেক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন তাঁর গুরু। তাঁর কথাতেই বিধান চন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও নেহরু পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর কথাতেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে রাজী হয়েছিলেন।

এই মহান মানুষটি ছিলেন বজ্রের মত কঠোর আবার কুসুমের মত কোমল প্রকৃতির। কর্মক্ষেত্রে কোনদিন কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। বজ্রকণ্ঠে তার প্রতিবাদ তিনি করে গেছেন। আবার কথা দিলে তিনি তা রাখতেন। তার জন্য শত বাধা পেরোতেও তিনি রাজী ছিলেন। দারিদ্রের জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। বিনা অর্থে তাদের চিকিৎসা করেছেন এবং দরকার হলে নিজের পয়সা খরচ করে তাদের ওষুধ কিনে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি চিকিৎসা করেছেন অনেক মানুষের। এর জন্য তাঁর নির্দিষ্ট সময় ছিল। এইসব কারণেই আজ তিনি আমাদের মনের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। এইজন্যই আজ আমরা তাঁকে স্মরণ করি, আমরা তাঁকে অমর মানুষ বলে আখ্যা দিই—আমরা তাঁকে ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র বলে জানি।

বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম হয় ১লা জুলাই, মৃত্যু ও ১লা জুলাই। তাঁর জন্মদিন পালন করার সময় এসেছিল মৃত্যুর ডাক। বেঁচে থাকলে আজ তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের অনেক উন্নতি করতে পারতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রতি মুহূর্তে আমরা তাঁকে স্মরণ করি, তাঁর স্মৃতিকে পূজা করি।

খেয়ালখুশী

সুজয়া ঘোষ চৌধুরী (সভ্যা, সিনিয়র)

খেয়ালখুশী, খেয়ালখুশী,
তোমায় বড় ভালবাসি।
তুমি আমার প্রিয় পুঁথি
তোমাকে তাই করেছি সাথি।
এস আবার হাসি হাসি
করব আদর রাশি রাশি।
তোমায় পেয়ে হই যে খুশী
তাইতো তোমায় ভালবাসি।

শিশু উদ্যান

কৃষ্ণা দে (সভ্যা, সিনিয়র)

অনেক জায়গায় ঘুরেছি বটে
কিছুই ভাল লাগে না ;
শিশু উদ্যানে ঘুরতে এসে
বাড়ি যেতে মন চায় না।
পার্কল্যাণ্ডে পাহাড় আছে
আছে দোলনা ঢেকু
তার চেয়ে আরও প্রিয়
শিশু উদ্যানের দাদু।

সার্থক নামা পুরুষ

সুপর্ণা সান্যাল (সভ্যা, ১০)

বিধানচন্দ্র ডাক্তার ছিলেন। বাবা বললেন প্রেসক্রিপশন্ এই কথাটির বাংলা হল বিধান বা ব্যবস্থা পত্র। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রোগ নিরাময়ের বিধান দিতেন। শুধু কি মানুষের রোগ। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক চোখ দিয়ে রাজ্যের, সমাজের রোগও ধরতে পারতেন। বাবার কাছে শুনেই গল্পটা লিখে ফেললাম।

এই কলকাতা শহরটাই যেন রোগে ধুঁকছে। মানুষজন, লোক-লস্কর, সবকিছু যেন উপছে পড়ছে। বিধানচন্দ্র বিধান দিলেন কলকাতাকে বাড়াতে হবে। পশ্চিম দিকে কলকাতার গায়ে লেপটে আছে হুগলী নদী। সেদিকে তো বাড়ান যায় না। তাই পুবদিকের মজানদী বিদ্যাধরীকে বুজিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হল হুগলী নদীর পলিমাটি দিয়ে।

বিধানচন্দ্র লবণহ্রদের রূপায়ণ পুরোপুরি দেখে যেতে পারেন নি। শুধু কি লবণহ্রদ? দুর্গাপুরের শিল্প নগরী, কল্যাণী আরও অজস্র কত পরিকল্পনা বিধান চন্দ্রের নির্দেশে রূপায়িত হয়।

আমি বিধানচন্দ্রকে দেখিনি। বিধান শিশু উদ্যানের সামনে শ্বেত পাথরের মূর্তিটাকে দেখে ভাবি—উনি কত লম্বা ছিলেন। আমি নিজে ছোট বলে যাঁরা বড় তাঁদের একটু সমীহ করি।

মনে পড়ে পাঁচ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে প্রথম বিধান শিশু উদ্যানে বেড়াতে এসে বলেছিলাম—উনি কত লম্বা। নিশ্চয়ই অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পান। বাবা বলেছিলেন, সত্যিই তাই। মানুষ তো শুধু চোখ দিয়েই দেখে না, মন দিয়েও দেখে। বিধানচন্দ্র ভবিষ্যৎও দেখতে পারতেন। সেই জন্যেই তো এত কিছু করতে পেরেছেন। সেই জন্যেই তাঁকে কর্মবীর বলা হয়। কর্মবীর বলা হয় তাঁদের যাঁরা কথা বলেন কম, কাজ করেন বেশি। আরও একটা ব্যাপার আমার কাছে কেমন অদ্ভুত মনে হয়। ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই জন্ম, ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই মৃত্যু। গুণে গুণে আশি বছর। এক দিন কমও নয়, বেশিও নয়। এ যেন সেই মহাভারতের ভীষ্মের মতই ইচ্ছা মৃত্যু। বাবাকে বলেছিলাম কথাটা। বাবা বললেন---সত্যিই তাই, দুজনেই দৃঢ়চেতা কর্মী পুরুষ। বেঁচে থাকলে বিধানচন্দ্রের বয়স হত একশ বছর। আমি এখন ভাবি ইচ্ছা মৃত্যুই যদি হবে; তবে তিনি একশ বছর বাঁচলেন না কেন?

সৌমেন মুখার্জী (সভ্য, ৯)

বলতো ভাই কোন্ দিন?
'খেয়ালখুশী'র জন্মদিন?
জুলাই মাসের প্রথম দিন।

জন্মদিনের টুকরো-টাকরা

অংশুমান আচার্য (সভ্য, সিনিয়র)

দূর থেকেই দেখতে পেলাম সারা বাড়িটা আলোয় ঝলমল করছে। বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই বেশ বুঝতে পারলাম পুরো বাড়িটা আনন্দে মেতে উঠেছে। হৈ চৈ সোরগোলে একেবারে জমজমাট।

বাড়িটা খুব সুন্দর। চারপাশে খালি ফুল আর গাছ। দেখে মনে হয় যেন ফুলবাগানে একটা মৌচাক! মধুর লোভে রোজই এখানে কত না রঙবেরঙের মৌমাছি এসে হাজির হয়। বাড়িটার নামটাও খুব সুন্দর—'বিধান ভবন'।

আজ তো সেই ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিরা সকলে আসবেই! আজই যে তাদের সকলের আপনার, স্নেহের 'খেয়ালখুশীর' জন্মদিন। দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম জন্মদিনের গান গাইছে সবাই মিলে—

'খেয়ালখুশী'। 'খেয়ালখুশী'!
সবাই তোমায় ভালবাসি—।
দেশবিদেশের গল্পে ভরা,
ছবিও থাকে মনোহরা
বাচ্চাবুড়ো সবাই পড়েন
হরেকরকম মজা লোটেন।
তুমি মোদের সবার প্রিয় .
জন্মদিনের চুমো নিও—

বাড়িতে ঢুকেই দেখি 'খেয়ালখুশীর' সব বন্ধুরা দাদা, দিদি, কাকা, জ্যেঠা সব গুরুজনেরা উপস্থিত। সকলের মুখেই এক বিস্ময়। এই তো মাত্তর চার বছর আগে খেয়ালখুশীকে জন্মাতে দেখলাম আর এরই মধ্যে কেমন দাঁড়াতে শিখে গেছে। আবার টকাটক সুন্দর সুন্দর কথাও আউড়াচ্ছে।

আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমায় দেখতে পেয়ে বলে উঠল, খেয়ালখুশী কবে দারুণ জোরসে দৌড়তে শিখবে বল তো? তাহলে আমরাও বেশ ওর সঙ্গে দৌড়ব—। আমি বললাম, একটু সবুর করে দেখ না। এখন তো সবে হাঁটতে শিখেছে। তাও হাঁটার মধ্যে এখনও টলোমলো টলোমলো ভাব আছে। কদিন যাক—দেখবে তোমাদের খেয়ালখুশী প্রতিযোগিতায় দৌড়চ্ছে। তাবৎ পশ্চিমবঙ্গের সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে দৌড়ে দৌড়ে পৌঁছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। আর সেই সুবাদে তোমাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়ে যাবে সারা বাংলার শিশুদের, কারণ তোমাদের সঙ্গে করেই তো খেয়ালখুশী দাঁড়াতে পেরেছে আর যখন দেশেবিদেশে তোমাদের বন্ধু পাড়ি জমাবে তখনও নিশ্চয় তোমরা সঙ্গে থাকবে। কাজেই দেখ তো তোমাদের কত লাভ হচ্ছে। কত লোকে খেয়ালখুশী মারফৎ তোমাদের জানছে চিনছে। খেয়ালখুশী যেন তোমাদের জন্যে বড় হতে পারছে আবার তোমরাও এত ভাল একজন বন্ধু পেয়ে তাকে সাথি করে টপাটপ বড় হবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে, আরও ওপরে উঠে যেতে পারছ। কাজেই দেখছ তো খেয়ালখুশীকে বড় করার জন্যে তোমাদের অনেক দায়িত্ব, অনেক যত্ন নেওয়া উচিৎ

আমার বন্ধু একটু হতাশ হয়ে বললে, 'আমরা আর কি করে যত্ন নিতে পারি? আমি একটু ভেবে বললাম—

কেন, খেয়ালখুশী যাতে দিনদিন তরতর করে বেড়ে উঠতে পারে সেইদিকে একটু নজর দিতে তো তোমরাই পার। তোমরা তো প্রায়ই খেয়ালখুশীকে হরেক রকম উপহার দিয়ে থাক। তোমাদের এই সমস্ত উপহারগুলো যাতে উপাদেয় হয়, পুষ্টিকর হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে পার। একই উপহার যদি বার বার দাও তাহলে খেয়ালখুশীর অরুচি হয়ে যাবে না? তোমরা যত ইচ্ছে উপহার দাও, কিন্তু নিত্যনতুন উপহার দেওয়ার চেষ্টা কর। যাতে খেয়ালখুশী সবদিক দিয়ে সমান-ভাবে বেড়ে ওঠে। পুষ্টির ঘাটতি যেন না হয়। এটা তো মান—খেয়ালখুশী তোমাদের আপনজন? তাই তারজন্যে একটু সময় পেলেই ভেব। কি আশ্চর্য এক উপহার দিয়ে সবাইকে চমকে দেবে সেটা ভেব, একটু থেমে আমি আবার বললাম, আরেকটা ব্যাপার আমি দেখেছি অনেক সময় তোমরা খেয়ালখুশীকে উপহার দেওয়ার পরও সেটা সকলকে না জানানোয় তোমরা অভিমান করে উপহার দেওয়া বন্ধ করেছ। খেয়ালখুশী যে এখনও ছোট, তাই একসঙ্গে সবার উপহারের কথা কি করে সকলকে জানাবে বল? তাই বলে তোমরা যদি অভিমান কর তাহলে খেয়ালখুশীকেই দুঃখ দেওয়া হয়, হয় না? হুম। তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু। তা আর কিভাবে আমরা খেয়ালখুশীর যত্ন নিতে পারি বলতে পার? বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলল আমার বন্ধুটি। আমি মাথা চুলকে বললাম, সত্যি কথা বলতে কি জান খেয়ালখুশীর আপনজন বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তোমাদের খেয়ালখুশীর সুহৃৎ সংখ্যা বাড়াতে হবে। তোমার পরিচিত সকলের সঙ্গে যদি খেয়ালখুশীর বন্ধুত্ব করিয়ে দাও আবার তারা যদি একইভাবে এই বন্ধুত্বের হাত অন্যদের দিকে বাড়িয়ে দেন তাহলেই খেয়ালখুশীর অনেক অনেক বন্ধু হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, খেয়ালখুশীকে কিভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা যায় বল দেখি—।'

একটু হেসে বললাম, 'এতো খুবই সোজা ব্যাপার। খেয়ালখুশীর যাঁরা গুরুজন আছেন তাঁদের তোমরা জানাবে কি রকমের জামা জুতোয় কি রকমের পোষাক আশাকে সুন্দর ফুটফুটে লাগবে আর মানাবে। তাহলেই তোমাদের পছন্দ অনুসারে তাঁরা-খেয়ালখুশীকে সাজাতে সক্ষম হবেন। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে যা কিছু খেয়ালখুশীর কল্যাণে করছ তাতে শুধু খেয়ালখুশীর উপকার হচ্ছে না তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হচ্ছে।

বন্ধুটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখি দেরি হয়ে গেছে। এদিকে আজকের দিনের প্রধান নায়কের সঙ্গেই দেখা হয়নি।

হঠাৎ খেয়ালখুশীকে কাছে পেয়ে একান্তে তাকে জানালাম শুভদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ভালবাসা। কামনা করলাম দীর্ঘায়ু আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

ও তোমরা বুঝি ভাবছ খেয়ালখুশী আমার কথাগুলো বুঝল কিনা? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক, জন্মলগ্ন থেকেই নানা গুণীজনের আশীর্বাদে খেয়ালখুশীর বাংলা ভাষার ভাঁড়ার খুব সমৃদ্ধ।

শিবাস্তে সন্তুঃ পন্থানঃ—খেয়ালখুশীর পথ সুগম হোক।

চিকিৎসক বিধানচন্দ্র

অরিন্দম ঘোষ (সভ্য, ১৩)

…"A best man in every sense…"
—Indira Gandhi

হ্যাঁ, সত্যিই তিনি সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেমনই ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক তেমনই ছিলেন একজন অতুলনীয় চিকিৎসক। ধন্বন্তরী বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না, তার চিকিৎসক জীবনেরই কয়েকটি ঘটনা জানাচ্ছি।

১৯৫০-৫১ সাল। ভবানীপুরে আশুতোষ মুখার্জী রোডে আশুতোষের বাড়িতে সেদিন ভীষণ বিপদ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় [তৎকালীন ক্যাবিনেট মিনিস্টার (কমার্স)] দিল্লী থেকে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে অবিরাম হেঁচকি। কলকাতার খ্যাতনামা সব ডাক্তাররা বিফল হলেন। কবিরাজী ওষুধ, দেবদেবীর জলপড়া সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। সেই সর্বনাশা হিক্কা ক্রমশঃ ভীষণতর রূপ নিল। রোগী বুঝি আর রক্ষা পায় না। পারিবারিক চিকিৎসক বিধানচন্দ্র তখন কলকাতার বাইরে ছিলেন।

তারবার্তা পাঠান হল। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই উপস্থিত বিধানচন্দ্র। বললেন, 'রেডিওতে খবর পেয়ে চলে এলাম'। রোগীর তখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থা। পাশের ঘরে তখনও ডাক্তাররা আলোচনায় মগ্ন। বিধানচন্দ্র ঘরে ঢুকে রোগীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চাদরটি সরিয়ে পায়ের তলা দেখলেন, ব্যাস বেরিয়ে এলেন বাইরে। বললেন, 'ঘাম বসে গিয়ে ঐ রকম হয়েছে। সেরে যাবে।' পাশের ঘরে ডাক্তারদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। কী ওষুধ দিতে হবে বললেন। এর কয়েকদিন পরেই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে দিল্লী ফিরলেন শ্যামাপ্রসাদ।

কী অদ্ভুত রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা।

আরেকবারের কথা। ডাঃ রায়ের কাছে এক অফিসার এল ফাইল নিয়ে দেখাতে। এক মনে ফাইলের লেখা পড়তে পড়তে অফিসারটির মুখের দিকে চেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এক্ষুণি যাও, চলে যাও সোজা পি. জি. হাসপাতালে।' ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ডাঃ রায় চাপরাশিকে বললেন, 'ওকে ডাক তো।' ভয়ে ভয়ে ভদ্রলোক ফিরে এলে একটা স্লিপে কী সব লিখে দিয়ে বললেন, 'এটা নৃপেনের হাতে দেবে।' [ডাঃ এন. সি. চ্যাটার্জী তখন পি. জি. হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট] পরে কারণ জিজ্ঞেস করায় হেসে উত্তর দিলেন, 'ওর খুব সিরিয়াস টাইপের ইরিসিপ্‌লাস হয়েছে, ঠোঁট ফুলতে আরম্ভ করেছে। একটু পরে সব মুখ ফুলে যাবে। তাই নৃপেনের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বেঁচে যাবে', এই বলে তক্ষুণি ফোনে ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথা বললেন। সবাই অবাক।

চিকিৎসা করেছেন গান্ধীজীর,—সে আরেক গল্প। গান্ধীজী কিছুতেই তাঁর চিকিৎসা নেবেন না। বললেন যে, ডাঃ রায় যখন চল্লিশ কোটি মানুষের সেবা করতে পারেন না, তখন তিনিই বা কেন তার চিকিৎসা নেবেন। ডাঃ রায় উত্তর দিলেন যে চল্লিশ কোটি মানুষের আশা ভরসা তাঁর চিকিৎসার ভার সেই চল্লিশ কোটি মানুষ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং, গান্ধীজীর চিকিৎসা তিনি করবেনই। গান্ধীজী তখন বললেন যে তাঁর পক্ষে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব নয়। ডাঃ রায় প্রত্যুত্তরে বললেন যে গান্ধীজী যদি বিশ্বাস

করেন সব কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি তখন এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাও তাঁরই সৃষ্টি। গান্ধীজীও বললেন যে, ডাঃ রায়ের চিকিৎসক না হয়ে তাঁর ব্যারিষ্টার হওয়া উচিত ছিল। তখন ডাঃ রায় বললেন যে তা যখন হয়নি তখন বুঝতে হবে, গান্ধীজীর চিকিৎসা করাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন গান্ধীজী হেসে অনুমতি দিলেন।

চিকিৎসা করেছেন জয়প্রকাশের। জয়প্রকাশ তখন কলকাতায় গুপ্তভাবে অবস্থান করছেন, রুগী দেখতে গিয়ে তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'জয়প্রকাশ, তুম কলকাতা সে চলা যাও।' সবাই অবাক, এত ছদ্মবেশের ভেতর থেকে কি করে আসল মানুষটিকে তিনি চিনতে পারলেন।

বর্ধমানের একজন হেডমাস্টার হাঁপানিতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। ডাঃ রায় এক চামচ এনগার্স ইমালসন আর দুটো সিডানটন একসঙ্গে খেতে বললেন। তিনি ওষুধ শুনেই মুষড়ে পড়লেন! বললেন যে এই দুটো ওষুধ তিনি অনেক খেয়েছেন। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি যেভাবে বলছেন সেভাবে খেয়েছেন, কি?' 'তিনি বললেন, না, তবে সিডানটনও অনেক খেয়েছি, এনগার্সও অনেক খেয়েছি।' কিছুদিন পরে শোনা গেল ভদ্রলোক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, পরে প্রায়ই বলতেন, 'সেদিন কি ভুলই না করেছিলুম—বিধান রায় বলেই সম্ভব। এক ওষুধকে প্লাস-মাইনাস করা।'

এমনি ছিল তাঁর প্রতিভা। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অজস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি রোজ সকালে নিজের বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে রুগী দেখতেন। আর বেশি কথা বলে চিত্র বর্ণাঢ্য করে তুলব না। এই বিশাল প্রতিভাকে প্রণাম জানিয়ে লেখা শেষ করছি।

খেয়াল খুশী

নীলাঞ্জন গুহ (সভ্য, ১২)

খেয়াল খুশী, খেয়াল খুশী
তোমার জন্ম মাসে
মনে আমার লক্ষ তারা
ঝিকমিকিয়ে হাসে।
তোমার ভেতর-লুকিয়ে আছে
হাজার মজার কথা—
দেশ বিদেশের গল্প কত
পদ্য, ছবি, ধাঁধা।
চেহারাটা মজার বটে,
পক্ষীবাজে চড়ে
পৌছে দেবে সবায় বুঝি,
অচিন দেশের পাড়ে।
কখনো বা হাতির পিঠে,
কিম্বা হয়ে মাছ
নয়ন লোভন ছবি হয়ে
রইবে বুকের মাঝ।

খেয়াল খুশী খেয়াল খুশী
বলছি তোমায় সোজা
বুন্নু তোমার নাম রেখেছে
হাজার কথার মজা।''

ডাঃ বিধান চরিত্রের কয়েকটি ঘটনা

ডাঃ অনিল মৈত্র

মানুষকে দেখে তার ভিতরকার মানুষকে চিনতে পারা নিশ্চয়ই একটা বিশেষ গুণ। স্বল্প পরিচয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষকে তার নিজের স্বরূপে চিনতে পারা আরও কষ্টসাধ্য। একটা বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার পক্ষে এই গুণটি থাকা তাঁর কর্মনিষ্ঠার সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য। কর্মজীবনে বহুলোকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেশার সুযোগ আমার হয়েছে। তাতে এইটুকুই বুঝতে পেরেছি যে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থান্বেষী এবং এইসব লোকের পক্ষে লোকচরিত্র বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও সীমিত। অতি অল্প সংখ্যক যে ক'জন স্বার্থবিমুখ লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দুই একটা কথার মাধ্যমেই তিনি কোনটা সত্য বা কোনটা মিথ্যা এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারতেন যে সময় সময় আমার মনে হত তিনি বোধহয় সত্য মিথ্যার গন্ধ বুঝতে পারতেন। অসম্ভব ধীশক্তিসম্পন্ন এই মানুষটি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ ছিলেন। স্বল্প বাক্ বজ্রগম্ভীর এই মানুষটি সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে থাকলেও অন্তরটি ছিল তাঁর ঠিক বিপরীত। তিনি পরের দুঃখে দুঃখিত হতেন এবং পরের কষ্ট সম্যক রূপে উপলব্ধি করতেন। বাহির ও ভেতরে তিনি ছিলেন সবটুকুই বাঙালী। তাঁর বাঙালী প্রীতি দেশভাগের পর যে সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পুনর্বাসনের দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে বহু বৎসর বাঙালীর সুষ্ঠু পুনর্বাসন তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কর্মনিষ্ঠা, সত্য ও সততা তাঁর কাছে মানুষের পরিচয়ের মানদণ্ড ছিল। আমার নিজের কর্ম জীবনে কয়েকবার এই মানদণ্ডের পরিচয় উপভোগ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আজ এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

১৯৪৮ সাল। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কিছুদিন হল মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।

আমি তখন পি. জি. হাসপাতালের হাউস সার্জেন। বেলা তিনটা, আমি এমারজেন্সী ডিউটিতে আছি এমন সময় ৩০।৪০ জন লোক একটা লোকের পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল এমারজেন্সীতে। জানলাম যে সেণ্টপলস্ গীর্জার বাগানে ঘাসকাটার সময় তাকে সাপে কামড় দিয়েছে। লোকটার নাম আমার এখনও মনে আছে দেবেন দাস এবং থাকত সে দেবেন্দ্র ঘোষ রোডের এক বস্তীতে আমি তখন টেম্পোরারী এ্যাসিসটেণ্ট সার্জেন। সে সময় সরকারের নির্দেশ ছিল টাকা দিয়ে পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে এবং ওষুধ কিনে দিলে তবে চিকিৎসা হবে। দেবেনের দৈনিক আয় ছিল এক টাকা থেকে দেড় টাকা। এই আয়ে তার ও তার মায়ের মাত্র চলত। তার চিকিৎসার খরচ দেওয়ার সামর্থ্য নেই জেনেই আমি তাকে বিনে পয়সায় ভর্তি করে বিনা খরচে হাসপাতালের ষ্টক থেকে সিরাম ও স্যালাইন এনে প্রয়োগ করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে আমার মা প্রতিদিনই হাসপাতাল থেকে বাড়ি পৌঁছলেই আমাকে প্রশ্ন করতেন যে আজ আমি কতজন লোকের উপকার

করতে পেরেছি। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রবণতাই আমাকে সরকারের প্রচলিত নিয়ম অমান্য করে দেবেনকে ভর্তি করতে সাহস জুগিয়েছিল।

যথা সময়ে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেট্রন সালঙ্কারে ব্যাপারটা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্ট কর্ণেল চ্যাটার্জীর কাছে পেশ করলেন। এবং তিনি আইন অমান্য করে ভর্তি করার জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। আমি যথা সময়ে আমার কৈফিয়ত দিলাম কুমারদাকে (ডাঃ কুমার কান্তি ঘোষ) দেখিয়ে। আমার মাইনে এই সময় ২২৫ টাকা মাসে। মহাকরণ থেকে অর্ডার এল কর্ণেল চ্যাটার্জীর সুপারিশ সমর্থন করে যে ঐ চিকিৎসার বাবদ আমাকে ৯০ টাকা দিতে হবে। সরকারের অর্ডারের কথা আমি আমার মাকে জানালাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যে মাসে মাসে ১০।১৫ টাকা করে কেটে নেবে নিশ্চয়ই, এত টাকা একমাসে নেওয়া সম্ভব নয়। টাকা কাটে কাটুক ওতে যেন আমি মন খারাপ না করি। এই সময় আমার কলেজের সহপাঠি এক বন্ধু আমাকে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করাব পরামর্শ দেয়। ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার একান্ত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল এইসময় কিছুদিনের জন্য। পি. জি হাসপাতালের Wood Burn Ward এ পশ্চিম-বাংলাব অনেক I. C. S Officer ভর্তি থাকতেন এবং তাদের চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই ডাঃ রায়ের পরামর্শ মত হত। আমি ছিলাম হাউস সার্জেন কাজেই এসব V. I. P রোগীর দৈনন্দিন অবস্থা সকালে এসেই আমি ডাঃ রায়কে জানাতাম তাঁর আদেশানুযায়ী। একদিন সকাল ন'টায় রাইটার্সে গিয়ে ডাঃ রায়ের একান্ত সচিবের সাহায্যে ১০ মিনিটের মধ্যেই তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। সরকাবের অর্ডারটা আমার পকেটেই ছিল। আমার বক্তব্যটি অল্প কথায় শেষ করেই আমি বললাম আপনি পশ্চিমবাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ ডাক্তার এবং রাজ্যের সর্বময় কর্তা। এই সাপেকাটা লোকটি যদি চিকিৎসিত না হয়ে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার পথে মরে যেত তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমা করতেন না। সরকারের আদেশ আমি জেনেছি, জেনেও একদিকে মৃত্যু অন্যদিকে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্য সরকারের নির্দেশ অমান্য করে। এই দুয়ের মধ্যে আপনার কাছে কোনটা গ্রহণীয় এইটুকু বুঝেই আমি করেছিলাম। আমার দিকে একটু তাকিয়েই বললেন অর্ডারটা রেখে চলে যাও। কাজ করগে। 'কাজ করগে' এই কথাটিতেই আমি এই বজ্র কঠোর মানুষটির ভেতরের মানুষটিকে বুঝতে পেরে নিশ্চিন্তে হাসপাতালে ফিরে এলাম। পরে জেনেছিলাম যে এই লোকটি সম্পর্কীয় সমস্ত কাগজপত্র দেখে তিনি ঐ অর্ডার তুলে নিতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্যসচিবকে বলেছিলেন রোগীর অবস্থা বুঝে কর্তব্যরত ডাক্তারের রোগী ভর্তি করা এবং তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার সুযোগ দিতে। বলাবাহুল্য সেই ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত চালু আছে।

১৯৫৯ সাল। আমি তখন টালীগঞ্জ বাঙ্গুর হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্ট। ডাঃ রায়ের বাড়িতে (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে) ডাক্তারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তার একান্ত সহকর্মী ছিলেন আমাদের মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান করণিক মাখন চন্দ্র সরকার মহাশয়। গৌরবর্ণ বৃদ্ধ গরদের

কোট গায়ে, মাথায় একটা গেরুয়া কাপড়ের টুপী ও কপালে একটি বিরাট হোমের শান্তির ফোঁটা। আমি অনেকবার ওঁকে ডাক্তার রায়ের চেম্বারে চেক্ সই করাতে দেখেছি কাজেই ডাঃ রায়ের সঙ্গে মাখন সরকার মহাশয়ের সম্পর্ক আমার বেশ ভালই জানা ছিল। প্রকৃতপক্ষে মাখন সরকার মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ির অলিখিত অভিভাবক ছিলেন ডাঃ রায়। এ খবরটি আমার মত কলকাতার আরও বহুলোক জানতেন।

লেক হাসপাতাল উঠে যাওয়ার পর বাঙ্গুর হাসপাতালের পত্তন হল। টালীগঞ্জে ডাঃ মণি ছেত্রী ও ডাঃ সত্য কোণারকে দিয়ে হাসপাতাল প্রথম চালু হয়েছিল ১৯৫২ সালে।

৫।৭ বছরে হাসপাতালের সুনাম হওয়ায় ওই সময় প্রত্যহ রোগীর সংখ্যা অন্তর্বিভাগে থাকত ৪০০।৪২০ জন। হাসপাতালের বারান্দা, আনাচে কানাচে সর্বত্রই রোগী। এই সময় স্বাস্থ্যসচিব জেনারেল চক্রবর্তী এলেন হাসপাতাল দেখতে। ২৫০ বেডের হাসপাতালে ৪২০ জন রোগী দেখে একটু রুষ্ট হয়েই আমাকে বললেন ২৫০ জন রোগীর হাসপাতালে ৪০০ জনের উপরে রোগী ভর্তি করার খরচ সরকার তো দেবে না এবং অবিলম্বে এই ব্যবস্থা বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে নাকি আমাকে খুব মুস্কিলে পড়তে হবে। জেনারেল চক্রবর্তীর এই উক্তিতে আমি তখন একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। যা হোক সুযোগ আমার মিলেছিল কয়েকদিন পরেই। মাখন সরকার মহাশয়ের এক ছেলে সেরিব্রাল থ্রম্বসিস হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল অজ্ঞান অবস্থায়। রোগীর অবস্থা খারাপ দেখে এবং মাখন সরকার মহাশয়ের সঙ্গে ডাঃ রায়ের পরিচয় আমার পূর্বে জানা থাকায় আমি আমার মাষ্টার মহাশয় শ্রদ্ধেয় ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ব্যানার্জীকে এই রোগীটিকে দেখতে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি আমার সে অনুরোধ রেখেছিলেন। চিকিৎসা ডাঃ ব্যানার্জীর নির্দেশ মতই চলছিল এমন সময় একদিন হঠাৎ ফোনে খবর এল ডাঃ রায় ঐ রোগীটিকে দেখতে আসছেন বেলা ১২টায়। নির্দিষ্ট সময়ে ডাঃ রায় এলেন রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা দেখে বেশ খুশিই হলেন। বারান্দায় রোগী দেখে মোটেই অসন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, রোগীর চাপ খুব বেশি বোধ হয়।

এতে আমি একটু সাহস পেয়ে জেনারেল চক্রবর্তীর আদেশটির কথা তাঁকে জানালাম। ডাঃ রায় অল্প কথায় বললেন, "হাসপাতালটি আমারও নয়, জেনারেল চক্রবর্তীরও নয়, এটা পশ্চিমবাংলার মানুষের। তাদের জন্য যদি বাড়তি খরচের দরকার হয় তবে সে টাকা আমাকে ও জেনারেল চক্রবর্তীকে জোগাড় করতে হবে"। তবে এতে আমারও যে একটা দায়িত্ব আছে সেটাও তিনি উল্লেখ করে বললেন সমস্ত পর্যায়ে চুরি বন্ধ করতে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিছুদিন পর পশ্চিমবাংলার Council (আপার হাউসে) কাউন্সিল সদস্য মাননীয় শশাঙ্ক শেখর সান্যাল মহাশয় ডাঃ রায়ের কাছে মৌখিকভাবে উল্লেখ করে বলেছিলেন সে বাঙ্গুর হাসপাতালের ওষুধ বহরমপুরে বিক্রি হচ্ছে। ডাঃ রায় তাঁকে লিখিত ভাবে এই বিষয়টি জানাতে বলেন তিনি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যে ঐ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টকে তিনি বিশেষভাবে চেনেন বলেই অভিযোগটি লিখিত ভাবে দিতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় লিখিতভাবে ঐ অভিযোগটি আর পেশ করেননি।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়

নির্মাল্য হালদার (সভ্য, সিনিয়র)

বিধান চন্দ্র রায়
দেখিনু তোমায় ঐ ছবিটায়।
নাকের ওপর গোল চশমা
মুখে মধুর হাসি
যখন দেখি তোমার ছবি
ভাবি তখন বসি—।
জন্মেছিলে সাধারণ ঘরে
তবুও হলে মহান্,
নিজের চেষ্টায় বড় হওয়ার
করেছ তুমি প্রমাণ।

ভারত যখন স্বাধীন হতে
লড়ছে প্রাণ পণ,
তুমিও তখন সবার সাথে
লড়লে কি ভীষণ।

চিকিৎসা ছাড়াও নানান গুণের
ছিলে তুমি আধার
রাজনীতি ও মানব সেবায়
তুলনা নেই তোমার।

একই দেহে এত গুণ
কোথা হতে পেলে?
জানি তুমি খুশি হবে
তোমার আদর্শ নিলে।

ছবি হতে কর আশিস্
(যেন) তোমার মত হই,
তুচ্ছ করি সকল বিপদ
জীবনে হই জয়ী ॥

তোমায় প্রণাম

নীলাঞ্জনা গুহ (সভ্যা, ১০)

বিধানচন্দ্র তোমায় প্রণাম
শুভ এ জন্মদিনে।
সেবায় শাসনে বাসিয়াছ ভাল
মানুষকে কাছে টেনে।
ভুলি নাই কেউ তোমাকে আমরা
রেখেছি বুকের মাঝে—
প্রদীপের মত জ্বলিছ সদাই
শিশু উদ্যান মাঝে।

খেয়াল খুশী

সুমিতা বাগচী (সভ্যা, সিনিয়র)

খেয়ালখুশী পত্রিকাটির
ভারি সুন্দর নাম,
দেখলে পরেই পড়া ছাড়া
নেই যে কোন কাম।
মজার কথা লেখা আছে
কত সুন্দব ছবি;
শিশুরাই শিল্পী এতে
শিশুরাই কবি।
বেশি মোটা নয় কো এটা
মাত্র কয়েক পাতা,
তারই মাঝে আছে লেখা
সবার মনের কথা।
খেয়াল খুশীর জন্মদিনে
তাই তো সবাই মাতে,
শিশুর সাথে উদ্যানটাও
ভরে আনন্দেতে।

নতুন জন্মের সনদ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

আমি তখন এম. এ ক্লাসের ছাত্র। কলেজ জীবন কেটেছে স্কটিশ চার্চ কলেজে। তাই, স্কটিশ চার্চ কলেজের মাধ্যমেই এম-এ পড়ি। সেটা ১৯৬২ সাল। কলেজের অবসর সময়টা আমাদের কাটত একটা দর্জির দোকানে। কলেজের ঠিক সামনেই ছিল সেই দর্জির দোকানটা। দোকানের মালিক একজন সমাজকর্মী ছিলেন। সেই সুবাদে ওই দোকানদারের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের ফ্রী নাইট স্কুলের অবৈতনিক হেডমাস্টার। আবার গোয়াবাগান এলাকায় মাস্টারদা স্মৃতি পাঠাগার এবং বস্তি উন্নয়নের কাজের সঙ্গে জড়িত।

মাঝে মাঝেই ওই দর্জির দোকানে গিয়ে বসি। অনেকটা সময় কাটে। এরকম একদিন দুপুরবেলা ওই দোকানে বসে আছি। দোকানের মালিক বাড়িতে গেছেন খেতে। কর্মচারীরা কাজ করছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে কথাও বলছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। আমার এরকম ব্যক্তিগত কথাবার্তায় বরাবরই দারুণ আগ্রহ। বাইরে থেকে একজন মানুষকে দেখে যেরকম মনে হয়, ভিতরটা হয়ত তাঁর ঠিক আলাদা এরকম অনেক পরিচয় পাই। পেয়েছিও।

সেদিন কথাবার্তা শেষ করে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ওই দোকানের একজন কর্মচারী, ধরা যাক তাঁর নাম অজয় (সঙ্গত কারণে আসল নামটা গোপন রাখছি), হঠাৎ আমার সামনে এসে বলল, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে। বল কি বলবে? আমি বললাম। অজয় একটু চুপ করে থেকে বলল, ব্যাপারটা একটু গোপনে বলতে চাই। একথা শুনে আমি অবাকই হলাম। আমার সঙ্গে কী এমন গোপন কথা থাকতে পারে? যাক, আমরা দুজনে দোকানের বাইরে এলাম। বাইরে এসে হেদুয়াব মোড়ে গিয়ে দাড়ালাম।

অজয়কে আমি অনেকদিন ধরেই ওই দোকানে কাজ করতে দেখছি। বয়স আন্দাজে মাথায় ছোট, দেখতে ভীষণ রোগা। চোখেমুখে কেমন যেন রক্ত শূন্যতার ছাপ। কথা বলে আস্তে আস্তে। যখন হাসে তখন সেই হাসিটাও বড় করুণ দেখায়। ওদের বাড়ি ছিল ঢাকা জেলায়। এখন বাগমারির দিকে কোন একটা বস্তিতে থাকে, তার সম্পর্কে এটুকুই জানতাম।

তাই হেদুয়াব মোড়ে এসে তার দিকে তাকাই, বলি: বল, কি বলবে? অজয় একটু চুপ করে থাকে। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে তাকায় দেখি তার চোখে জল টলমল করছে। আমি একটু বিব্রত হই। অপেক্ষা করি অজয়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে সে। বলে, জানেন, আমি আর বাঁচব না।

—সে কি? আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ দাদা। সে বলে। একটু থেমে তারপর আবার বলে, আমার টি. বি. হয়েছে। আমি আর বাঁচব না। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, আমার মা, ভাই, বোন সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মরে গেলে তাঁরাও সবাই না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

—আরে তোমার টি. বি. (যক্ষা) হয়েছে একথা তোমাকে কে বলল? আমি জানতে চাই।

— অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। সবাই বলেছে। তার গলায় হতাশার সুর। তারপরই হঠাৎ আমার

হাতটা চেপে ধরে বলে, দাদা আমাকে একবার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারেন? একবার যদি ডাক্তার রায়কে দেখাতে পারতাম, তাহলে হয়ত আমি ভাল হয়ে যাব। আমার রোগ সেরে যাবে।

আচমকা আমি কথা দিয়ে ফেললাম, ঠিক আছে; আমি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তখন বুঝিনি কীভাবে ব্যবস্থা করব। ডাঃ রায় মানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং অনেক বড় মানুষ। তাঁর কাছে আমিই যাব কীভাবে জানি না, তার উপর অজয়কে নিয়ে যাওয়া। যাই হোক, অজয়কে আশ্বাস দিয়ে ফেরৎ পাঠালাম।

সে সময় ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। ডাঃ রায় আবার যথারীতি পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার। তখন সম্ভবতঃ মে মাস। সেবার বারাসাত থেকে নির্বাচিত হন অশোক কৃষ্ণ দত্ত এবং তিনি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক হন। তাঁর সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সোজা গিয়ে ধরলাম তাঁকে। বললাম, আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত তিনিই যোগাযোগ করে একটা চিঠি দিয়ে দিলেন, বললেন, সকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সামনে ডাঃ রায়ের বাড়িতে যাবে। গিয়ে এই চিঠিটা ডাঃ রায়ের সহকারী অমুক ডাক্তারকে দেবে। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি গিয়ে অজয়কে বললাম। সব শুনেটুনে অজয় বলল, দাদা আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমি একলা যেতে পারব না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, অজয় আমার চাইতে বয়সে বড় ছিল, তবু আমাকে 'দাদা' বলেই সম্বোধন করত।

সেদিন সকাল বেলা আমরা দু'জন গেলাম ডাঃ রায়ের বাড়িতে। অজয় আগাগোড়া আমার হাত ধরে রেখেছিল। আর আমার বুক করছিল টিপ টিপ। ওই সহকারী ডাক্তারকে চিঠিটা দিতেই তিনি অজয়ের সব কাগজপত্র চেয়ে নিলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শুনলেন। সব কিছু লিখলেন। তারপর অপেক্ষা করতে বললেন। একটু বাদেই ডাক পড়ল। আমার হাত ধরে অজয় গিয়ে ঢুকল ডাঃ রায়ের ঘরে। একটা বিশাল ঘরের এককোণে একটা বড় টেবিলের সামনে ডাঃ রায় বসে আছেন। তাঁর হাতে অজয়ের সব কাগজপত্র। হঠাৎ তিনি চোখ তুলে তাকালেন দুই মূর্তির দিকে। তারপর সেই ভরাট গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন:
রোগী কে? আমি তাড়াতাড়ি অজয়কে দেখিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুকুম ভেসে এল: তুমি ওদিকে গিয়ে বস। আমি তৎক্ষণাৎ দেওয়ালে লাগান একটি চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম।

এবার ডাক পড়ল অজয়ের। অজয় কিছুটা এগিয়ে গেল। আর বারবার আমার দিকে তাকাতে থাকল। সম্ভবতঃ সে ভয় পাচ্ছিল যে, আমি পালিয়ে যাব। অবশ্য ওখান থেকে পালাতে পারলেই তখন আমি বাঁচি, তবে পালাব যে, তেমন শক্তিও আমার ছিল না। এ যেন বাঘের মুখে পড়ার অবস্থা। ঠায় বসে আছি আর আড় চোখে অজয়ের দিকে তাকাচ্ছি।

ডাঃ রায় অজয়কে ইসারায় সামনে আসতে বললেন। তারপর গুরুগম্ভীর আদেশ দিলেন: ওঠ-বস কর। না বলা পর্যন্ত থামবে না। এ আবার কী? আমি ভাবি। কিন্তু নিরুপায় অবস্থা। অজয় সেই ক্ষীণ দেহ নিয়ে ওঠ বস করা শুরু করে দিল। আর ডাঃ রায় ফাইল পত্র নিয়ে কাজে

ডুবে গেলেন। এক—দুই—তিন···দেখতে দেখতে ত্রিশ···চল্লিশ হয়ে গেল, তবু ডাঃ রায় সেদিকে তাকান না। এদিকে অজয়ের সারা শরীর দিয়ে ঘাম ছুটেছে। হাপরের মত বুক ওঠানামা করছে। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, সে যে কোন সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। ভাবছি, ডাঃ রায় এদিকে দেখছেন না, কিছু বলছেন না—এ আবার কি?

হঠাৎ তিনি আদেশ দিলেন, এবার থাম। অজয় থামল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে খুব জোরে জোরে। ডাঃ রায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে তারপর তিনি শোনালেন সেই দৈববাণী: তোমার টি.বি. হয় নি। এ কথা শুনে অজয়ের চোখে মুখে যেন আলো জ্বলে উঠল। তারপর ডাঃ রায় একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, বললেন, এই বড়ি রোজ দুটো করে খাবে আর রোজ সকালে থানকুনি পাতার রস খাবে। এ ভাবে তিন মাস খাওয়ার পর আবার আমার কাছে আসবে। বুঝেছ।

অজয় পথে বেরিয়েই নাচতে থাকে আনন্দে। এ যেন তার নবজন্ম হল। তারপর অল্পদামের ওই বড়ি আর থানকুনি পাতার রস খেয়ে অজয়ের সব রোগ সেরে গেল। ও নতুন মানুষ হয়ে নতুন জীবন লাভ করল। কিন্তু তিন মাস পরে সে আর ডাঃ রায়ের কাছে যেতে পারেনি। তার আগেই ১লা জুলাই ডাঃ রায় অজয়ের মত লক্ষ মানুষকে কাঁদিয়ে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। আর অজয়ের ঘরে এখনও ডাঃ রায়ের হাতে লেখা সেই প্রেসক্রিপশনটা ফ্রেম করে দেওয়ালে বাঁধান। অনেকদিন পর আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছি সেই নতুন জন্মের সনদ।
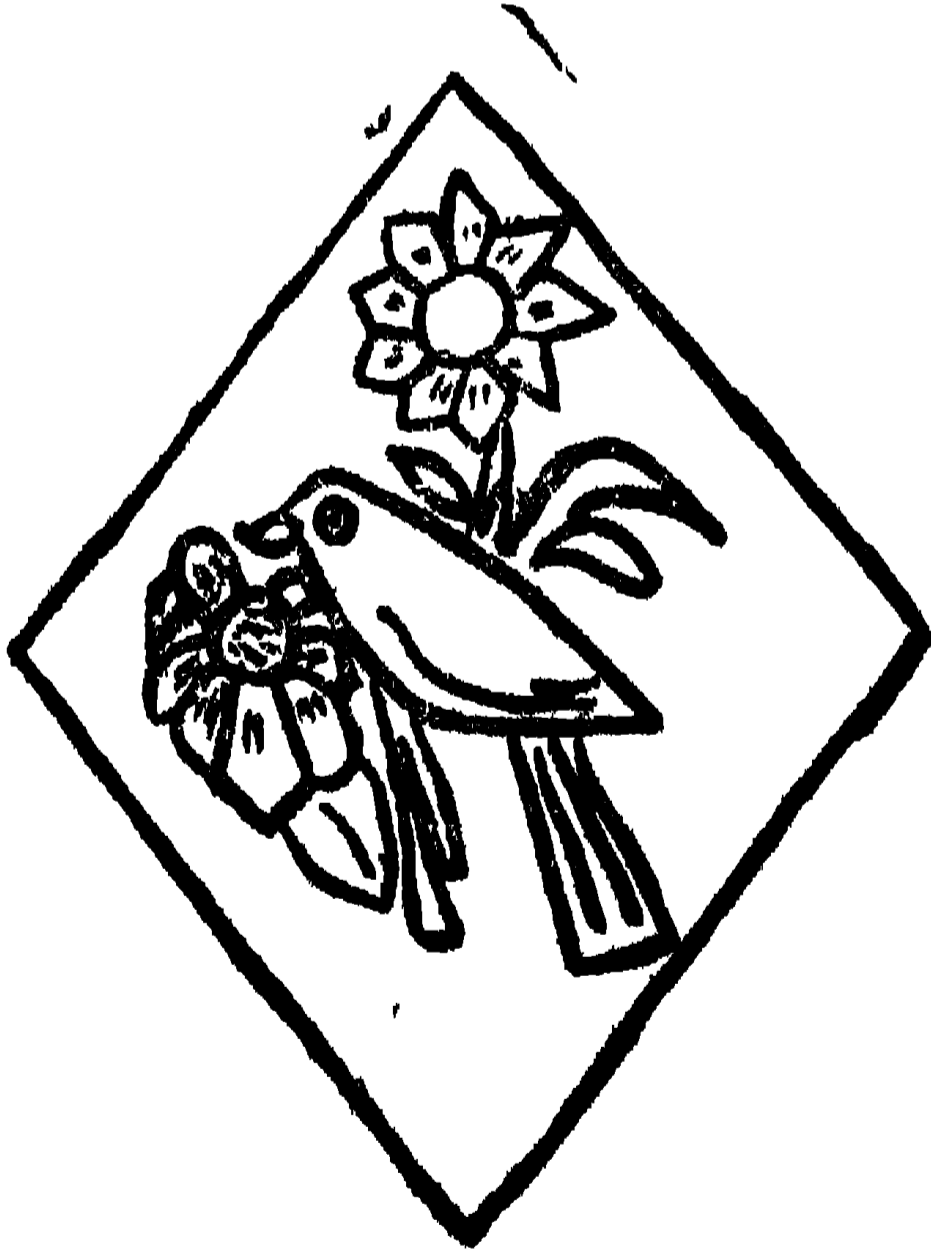
স্কেচ: অর্পিতা মজুমদার (সভ্যা, ১২)

খেয়ালখুশীর জন্মদিন

পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, সিনিয়র)

'খেয়ালখুশীর' জন্মদিনে
মনটা খুশী আজ—
খুশীর ঝড়ে এলোমেলো
হল যে সব কাজ।
'খেয়ালখুশী' মোদের প্রিয়
তুলনা মেলে না—
তার বুকেতে থাকে লেখা
মনের খেয়ালীপনা।
শিশুমনে খেলা করে
নানান ভাবনা,
নাইকো তার সঠিক দিশা
নাইকো নিশানা।

কচি কচি ঐ ভাবনা
মুক্তি পেতে চায়—
সযতনে তাই-তো লেখা
'খেয়ালখুশীর' পাতায়।
বড়রাও লেখেন এতে
শিশুর মতো ক'রে
'খেয়ালখুশী' পড়লে যে তাই
মনটি ওঠে ভরে।
'খেয়ালখুশী' সবার প্রিয়
শিশুমনের সাথি
তাইতো আজি জন্মদিনে
জানাই তারে প্রীতি।

স্কেচ : অনসূয়া আচার্য (সভ্যা, ১০)

(ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রবন্ধ বিভাগে বিশেষ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ রচনা)

বিধান শিশু উদ্যান

অভিজিৎ বিকাশ পাল (সভ্য, ১৩)

মানুষ চিরদিনই স্বর্গকে এক অসীম সুখের স্থান বলে কল্পনা করে এসেছে। সেখানে দেবতার বাস। সেটি কোথায় মানুষ এখনও তা বার করতে অপারগ। কিন্তু আরেকটি স্বর্গসম স্থান হল নজরুল ইসলাম এভিন্যুর লাগোয়া "বিধান শিশু উদ্যান।" সেখানে দেবতার বাস নয় সেটা ঠিক। সেখানে ফুলের মত সুন্দর শিশুর মেলা। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের একটি শ্বেত মর্মর শুভ্র পূর্ণাবয়ব মূর্তিকে শঙ্খের মত দুহাতে ধরে একটি সুন্দর রাস্তা চলে গেছে সোজা এই উদ্যানে বা মহা উদ্যানের সামনে। এবার এগিয়ে দেখা যাক।

শিশু উদ্যানের প্রধান রাস্তা ধরে এগোলে বাঁ দিকে পড়বে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মেমোরিয়াল কমিটির প্রধান কার্যালয়। বিধান শিশু উদ্যান গ্রন্থাগার, বিশাল অডিটোরিয়াম। সামনে আছে মুক্ত মঞ্চ। অডিটোরিয়ামে রয়েছে শ'পাঁচেক দর্শকের বসার ব্যবস্থা। রয়েছে গ্রন্থাগারের উপরেই পাঠাগার। রাস্তার ডান পার্শ্বে বিশাল ক্রীড়াক্ষেত্র। খো-খো, জিমন্যাসটিকস্, বাস্কেটবল খেলার জায়গা। আরও এগোলে ডান দিকে দুটি হাতি ও বাঁদিকে বিধানচন্দ্রের আবক্ষ শুভ্র মূর্তি। সামনে মাছের চৌবাচ্চা। সেখানে ছোট বড় রঙিন মাছেরা আছে। সামনে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী এবং বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। গোল টেবিল বৈঠকের মত সারি সারি বেঞ্চ পাতা। মাছের চৌবাচ্চা অপর পার্শ্বে। এর পরই একটি বিশাল মাঠে শিশুদের আনন্দের সকল জিনিসই হাজির, দোলনা, স্লিপ, স্লাইড, দড়ির মই-সী-স সকল জিনিসই পর্যাপ্ত। এরই সামনে ডান দিক দিয়ে একটি ছায়া ঢাকা পথ চলে গেছে। পথটির বাঁ দিকে আছে বিরাট সরোবর। এবার আরেকটি মাঠ। মাঠটি শেষপ্রান্তে। সামনের মাঠে আছে কলরব, কিন্তু এখানকার পরিবেশ শান্ত, কারণ, স্লিপ, চরকি বা দোলনা এর আগেই পেরিয়ে আসা হয়েছে। এখানেই আছে ছবি আঁকার মণ্ডপ, পিক্‌নিক্ স্পট এবং উদ্যানের সজ্জা ভাণ্ডার। সাড়ে চৌষট্টি বিঘার উপর অবস্থিত উদ্যানে চলতে চলতে পথ যেন ফুরোয় না। বিধান সরোবরের পাশ দিয়ে ছায়া ঢাকা বন পথ দিয়ে যেতে সব ক্লান্তি যেন নিমেষে মিলিয়ে যায়। সারা উদ্যানে এখানে সেখানে ছোট ছোট জলের কল—তেষ্টা পেলে চিন্তার কিছু নেই।

শিশু উদ্যানে শুধু খেলার বা দেখারই জিনিস আছে সেটা ভাবলে ভুল করা করা হবে। এখানে হবি সেন্টারের মাধ্যমে নাচ; গান, অঙ্কন, ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ পক্ষে যে সব বিষয়ে পারদর্শিতা না থাকলে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হয় সেই সব বিষয়ই

শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কর্মবীর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নানা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, এখানে সেই হিসাবেই নানা বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে সারা বছরে ছুটি বিরাট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। একটি হল ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম শনিবারের বার্ষিক মুক্তাঙ্গন প্রতিযোগিতা। এটি ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের সকল স্থানের ছেলেমেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। প্রবন্ধ, অঙ্কন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, হাতের কাজ প্রভৃতি সব বিষয়ে ছুটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিনই পুরস্কার দেওয়া হয়। স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়ে পুরস্কার নিয়ে সকলে হাসিমুখে বাড়ি ফেরে। অপর প্রতিযোগিতাটি উদ্যানের সভ্য সভ্যাদের একান্তই নিজস্ব। যে সব বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই সব বিষয়েই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়; যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় সে প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা করে একবছর বৃত্তি পায়। এখানে বছরে ছুটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সভ্য সভ্যারা, বাবা-মা, অভিভাবকদের ছেড়ে নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যে সাতদিন কাটায়। শিবিরের সময় হল গরমের ছুটির সাতদিন ও শীতের সাতদিন। শিশু উদ্যানের এই শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স সীমা চোদ্দ বছর পর্যন্ত এবং অবৈতনিক। উদ্যানের সর্বপ্রধান উৎসব হয় ১লা জুলাই-এ। যাঁর নামে এই উদ্যান সেই কর্মবীর ও মহাত্মা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ১লা জুলাই। সেদিন বৃত্তি প্রতিযোগিতায় কৃতি সভ্য সভ্যাদের মানপত্র, পদক ও বৃত্তি দেওয়া হয়। এছাড়া শিশু মেলা, সরস্বতী পূজা, নববর্ষ, ২৫শে বৈশাখ প্রভৃতি নানা সময়ে উৎসব হয়। এই সব উৎসব সবই প্রধানতঃ মুক্তাঙ্গনে হয়ে থাকে। কিন্তু ১লা জুলাই-এর উৎসব এই সব উৎসবকে ছাপিয়ে যায়।

স্কেচ : ডালিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, সিনিয়র)

আমার কথা

রঞ্জন ভাদুড়ী

আমার 'নামটি 'খেয়ালখুশী'
কচি কাঁচাদের মন তুষি,
অনেক বছব পরমায়ুর
উচ্চ আশাও পুষি।
আমি বেরোই মাসে —মাসে
ফুল ফুটিয়ে ঘাসে—ঘাসে,
আমায় পেয়ে তোমরা খুশী
আনন্দে উল্লাসে।
আমি ছোটবড়োর প্রিয়
সবাই আমাব প্রীতি নিয়ো,
আমার পাতায় তোমার কিছু
মনেব খবব দিয়ো।

শতবার্ষিক

মৃত্তিকা দে (সভ্যা, ৭)

আয়রে তোরা আয় সবে
শত বৎসরের উৎসবে
উৎসব হবে উদ্যানে
চল সবে আজ সেইখানে।
উদ্যান মোদের নানা সাজে ভরা
দেখলে তোমার চোখ জুড়াবে,
বাড়ি ফেরার থাকবে না কোন তাড়া

খেয়াল খুশী

প্রান্তর চক্রবর্ত্তী (বয়স, ১০)

খেয়াল খুশী, খেয়াল খুশী
বল কোথায় তোমার স্থান?
তোমাব স্থান কি এখনও
বিধান শিশু উদ্যান।

তোমার বাস কি এখানে
অনেক দিন ধবে?
জন্মদিনে এবার তোমায়
সাজাব যত্ন করে।

তোমায় দেব অনেক গল্প
অনেক রকম ছড়া,
তোমায় দেব হাজাব হাজার
গোলাপ ফুলেব তোড়া।

পায়েস খাব সবাই মিলে
অনেক মজা করে,
তোমায় নিয়ে নাচব সবাই
হৈ হল্লা কবে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

মিঠু সাহা (সভ্যা, ১২)

উনিশ শতকের সীমা পার হয়ে এই বিংশ শতকে যে সকল বঙ্গ সন্তান নিজ নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালীর মনে স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিধানচন্দ্র একজন। ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা হবে অন্যভাবে। লেখা হবে—এই দেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে আজ অবধি এরকম সর্ব কর্মে সমান দক্ষতার পরিচয় দেবার উপযুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন বলিষ্ঠ মানুষ এদেশে খুব কম জন্মেছে।

১৮৮২ সালে ১লা জুলাই তারিখে পাটনায় বিধানচন্দ্রের জন্ম। পিতা প্রকাশচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র কর্মদক্ষতা, সততা, সদ্ব্যবহার এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। বিধানচন্দ্রের মাতা অঘোরকামিনী ধর্মাচরণ, সমাজসেবা এবং লোকহিতকর কার্যাদির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধালাভ করেন। সেকালে এই পরিবারটি একটি আদর্শ পরিবাররূপে গণ্য হয়েছিল এবং শিক্ষিত সমাজ এই পরিবারটিকে 'অঘোর-পরিবার' আখ্যা দিয়েছিল।

বিধানচন্দ্রের জন্মের পর কুড়ি বছর কাটে বিহারে। এইখানেই তাঁর স্কুল কলেজের অধ্যয়ন শেষ হয়। ১৯০২ সালে তিনি বি. এ পাশ করেন। তারপর তিনি কলকাতায় আসেন। এইবার বিধানচন্দ্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যা ঘটল তা প্রায় জুয়োখেলার মত। পিতা প্রকাশচন্দ্র ছেলেকে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কোনটাতে ভর্তি করবেন সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারলেন না। অতএব মেডিকেল কলেজ এবং শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ দুটোতেই ভর্তির আর্জি পেশ করলেন। ঠিক হল, যেটার উত্তর আগে আসবে সেইখানেই বিধানচন্দ্র ভর্তি হবেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই এ বিষয়ে একমত হলেন। অর্থাৎ, কোন একটি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল না। একদিনেই দু' জায়গা থেকে খবর এল। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিধানচন্দ্র মেডিকেল কলেজেই ভর্তি হলেন। যদি ডাকের কোন গোলযোগ কিংবা চিঠি বিলির হেরফের হয়ে যেত, তবে বিধানচন্দ্রের ভবিষ্যৎই বা কী হত এবং বর্তমানই বা কী হত, জানি না। হয়ত আমরা একজন খুব বড় দরের ইঞ্জিনীয়ার পেয়ে যেতাম।

এরপরে মেডিকেল কলেজের পাঠ শুরু হল। ১৯০২ সালে এখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এম. এস ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৮ সালে বিধানচন্দ্র লাভ করলেন এম. ডি ডিগ্রী। এখানকার ডিগ্রী লাভের পর উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত রওনা হলেন এবং মাত্র দু' বছরের মধ্যেই তিনি এম. আর. সি. পি এবং এফ. আর. সি. এস দুটি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৫ সালে রয়াল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এ্যাণ্ড হাইজিনের এবং ১৯৪০ সালে আমেরিকান সোসাইটি অব চেষ্ট ফিজিসিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে বিধানচন্দ্র বাংলার ষ্টেট মেডিকেল কাউন্সিলের ফেলো নির্বাচিত হন, পরে ১৯৪৪ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হন। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতার জন্য অল্পকালে মধ্যেই তাঁর নাম ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে।

দেশ স্বাধীন হবার পর ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ হলেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু, বেশিদিন তিনি এই পদে আসীন থাকেননি, কয়েকমাস পরেই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। তারপর, ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরও তিনি সেই পদে আসীন ছিলেন।

১৯৪২ সালে ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি. এস. সি. উপাধিতে ভূষিত করেন।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ক্যানসার ইনষ্টিটিউট, ক্যালকাটা মেডিকেল এসোসিয়েশন, যাদবপুর টি. বি হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনে বিধানচন্দ্রের অক্লান্ত শ্রম জড়িয়ে আছে।

বিধানচন্দ্র বলেন—"আমি স্কুলে অন্যান্য ছাত্রদের মতই ছিলাম সাধারণ একজন। শিক্ষককে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারলে খুশি হতাম। আবার, পরীক্ষায় পাশ করেছি জানলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। ক্লাসে প্রথম হব কিংবা সবচেয়ে বড় হব—এ ধরণের কোন আগ্রহই ছিল না। যখন ডাক্তারি করতে আরম্ভ করলাম, তখনও মনে করিনি সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর ডাক্তার হব। মেডিকেল কলেজে যখন প্রথম ঢুকি, দেখি বোর্ডে লেখা আছে—'যাহা কিছু করিবে, সর্বশক্তি দিয়া করিবে।' আমার জীবনের আদর্শের সঙ্গে এ উপদেশ মিলে গেল।"

আমার জন্মদিনে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমার প্রতি দেখানো হয় তার মধ্যে আমি নিজের প্রতিফলন দেখতে পাই। জনসাধারণের আন্তরিক প্রীতি শ্রদ্ধার আমি অনেক মূল্য দিই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেই যদি তাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন সেটা আমার পক্ষে হবে খুবই বিস্ময়ের ঘটনা।

বিধানচন্দ্র রায়

ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্য, ১০)

বাঁকিপুরে জন্ম তোমার
প্রকাশচন্দ্রের ধামে
সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ তুমি
বিধান চন্দ্র নামে।

ভারত রত্ন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মানব জাতির কাছে এক অতি পরিচিত নাম। তাঁর মতো কর্মবীর সমগ্র ভারত তথা এশিয়া মহাদেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই সেদিন প্রকাশ চন্দ্রের বাড়িতে এক বাংলা মায়ের সুসন্তানের জন্ম হয়। তিনি হলেন বিধানচন্দ্র। তাঁর পিতা হলেন প্রকাশচন্দ্র রায় ও পিতামহের নাম প্রাণকালী রায়। মাতা হলেন গুণবতী অঘোরকামিনী দেবী। বিধানচন্দ্রের আরও দুই দাদা ও দিদি ছিলেন।

শোনা যায় "বিধান" এই নাম নাকি কেশব চন্দ্র সেন রেখেছিলেন।

বিধান চন্দ্র প্রথমে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তারপর তিনি এফ. এ. ও বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর বিধান চন্দ্র মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস ও এম, বি পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর অধ্যাপক লুকিসের পরামর্শ অনুযায়ী ও সহায়তায় তিনি এম. আর. সি. পি এবং এফ. আর. সি. এস পড়ার জন্য ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। এরপর তিনি বার্থোলোমিউ ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে তাঁকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি সেখানে ভর্তি হবার জন্য আবেদন পত্র পেশ করেন। কিন্তু এখানকার অধ্যক্ষ ডাঃ শোর বলেন আপনি অন্য কোন ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করুন। কিন্তু বিধানচন্দ্র বললেন, আমি এই কলেজে ভর্তি হব বরাবর ভেবে আসছি। ডাঃ রায় ইনষ্টিটিউটে অধ্যক্ষের কাছে যাওয়া আসা করেন ও একই কথা বলেন।

একদিন হঠাৎ ডাঃ শোর বিধান চন্দ্রকে ভর্তি হবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু দু বছরের মধ্যেই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া গেল। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল বিধানচন্দ্র এম. আর. সি. পি ও এফ. আর. সি. এস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দেশে ফেরার আগে তিনি অধ্যক্ষের কাছে দেখা করেন ও ফলাফল দেখান, তখন তিনি বিধান-চন্দ্রের সঙ্গে ভর্তি হওয়ার আগে যে ব্যবহার করেছিলেন তার জন্য লজ্জিত হন ও বলেন একবার এক বাঙালী ছাত্র এম. আর. সি. পি এবং এফ. আর. সি. এস পাশ করেছিল ১১ বছর সময় নিয়ে। তাই তিনি মনস্থির করেছিলেন আর কোন সময় ভারতীয়দের এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নেবেন না।

দেশে ফিরে এসে তিনি ১৯৩৪ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৪৮ এর ২৩শে জানুয়ারী তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। এবার তিনি দেশের ও দশের সেবায় লেগে যান। বাংলাদেশ থেকে আগত বাস্তু-হারাদের তিনি বাস্তু দিয়েছিলেন। এখন আমরা যে ডবল ডেকার বাসে চড়ি সেই বাস তৈরির প্ল্যান তিনিই করে গেছেন। তিনি হাসপাতাল তৈরি করেছেন। কল্যাণী শিল্পনগরী, দুর্গাপুর উপনগরী

তাঁর নিজের গড়া সম্পূর্ণ নতুন দুটি শহর। কলকাতার জনসংখ্যার চাপ কমাবার জন্য লবণহ্রদ উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা রচনা করে যান ও কাজের সূত্রপাত্র করে যান। তার ফল আজ আমরা উপভোগ করছি।

তিনি ছিলেন প্রকৃত জন দরদী। তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন ও ঔষধ দিতেন।

শোনা যায় ডাঃ রায়ের ঘরে কেউ যদি শুয়ে থাকত, এবং রাত্রিবেলা যদি ডাঃ রায় উঠতেন, এত সাবধানে টর্চ জ্বালাতেন যে ঘরে শুয়ে থাকত যে সে টেরই পেত না। এইরকম ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ। তাঁর মতো ডাক্তারী বিদ্যায় এমন পারদর্শী লোক সমগ্র ভারত তথা এশিয়া মহাদেশে খুব কম জন্ম-গ্রহণ করেন। তাই তাঁকে সবাই ধন্বন্তরি বলত। সে সম্বন্ধে নানবিধ ঘটনার কথা জানা যায়।

১৯৬২ সালের ১লা জুলাই তাঁর বাড়িতে যখন চলছে জন্মোৎসবের আয়োজন, তখন সময় ঠিক ১২টা বেজে ৫ মিনিট তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কিন্তু তিনি বইয়ে, মানুষের মুখে, ছড়ায়, গানে, প্রবন্ধে ও উদ্যানের শিশুদের কাছে অমর হয়ে থাকবেন।

বিধানচন্দ্র

অমিতাভ বসু

নববঙ্গের রূপকার তুমি
বিধানচন্দ্র নাম ;
স্মরিয়া তোমারে আজি এ প্রভাতে
জানাই শত প্রণাম।
ব্যাধির বিধান তুমি যা দিয়েছ—
রোগীকে দিয়েছ প্রাণ ;
সে কথা আজিকে রূপকথা শুধু
হবে না কখনও ম্লান।

তুমি একজন যে জন বুঝেছে—
দলমত সব শেষে ;
আগে ভালোবাস দেশকে সকলে
কাঁধে কাঁধ রেখে মিশে।
তাই তো পেয়েছ রাজনীতি করে
এত বড় সম্মান,
যা কিছু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে—
সবই তো তোমার দান।

বঙ্গ-যীশু

প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ বিধান
দিতে তুমি,
বিধান, ভবে এলে—
ধন্য মায়ের
পুণ্য বলে
সোনার চাঁদ ছেলে!
অকুতোভয় চিত্ত তোমার
মহান কর্ম-যোগী,
দেশের সেবায় প্রাণ সঁপেছ
বাঁচিয়ে হাজার রোগী॥
সবার প্রিয়
তোমার প্রিয়
সকল বঙ্গ শিশু—
সেই শিশুদের
বিকাশ পথে
তুমিই বঙ্গ-যীশু॥

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

অমৃত কুমার সরকার

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসকরূপে বিধানচন্দ্রের উন্নতির মূলে রয়েছেন মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কর্নেল লিউকিস। এই আচার্যের কাছ থেকে তিনি চিকিৎসকের আদর্শ বাণী পান। সেটি হল-

"এমন একটি হৃদয়
কঠোর হয় না যে কভু
এমন একটি প্রকৃতি
বিরাম চায় না যে কভু
এমন একটি পরশ
বেদনা দেয় না যে কভু।"

চিকিৎসকরূপে বিধানচন্দ্র আক্ষরিক অর্থে এই আদর্শ বাণীটি অনুসরণ করতেন। তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা থেকেই এটি প্রমাণিত হবে। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পর তিনি কিছুদিন তাঁর দাদা শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়-এর সাথে তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে বাস করতেন। একদিন মাঝ রাতে তাঁর দাদা দেখতে পেলেন যে বিধান ঘরে নেই। তিনি অত্যন্ত চিন্তায় পড়লেন। শেষ রাতে বিধানচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেন। দাদার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন যে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটা বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রেসক্রিপশনে একটা ওষুধের মাত্রা ঠিকমতো দিয়েছিলেন কিনা দেখতে। ওষুধের মাত্রা খুব কম না হলে রোগীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। রাতে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিধানের এ কথা মনে হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা দেন রোগীর বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেই গভীর রাত্রে যাওয়া আসায় তাঁকে ছয় মাইল হাঁটতে হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাবস্থাপত্রে কোন ভুল ছিল না।

ডাক্তার হিসেবে তাঁর দরদী অন্তঃকরণের পরিচয় দিতে হলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হবে। মনোরঞ্জন চৌধুরী নামে শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন ছাত্র স্ত্রী ও দুটি মেয়ে নিয়ে রাসবিহারী এভিনিউ এর এক ফ্ল্যাটে বাস করতেন। হঠাৎ মনোরঞ্জন বাবুর কঠিন অসুখ হল। অনেক বড় বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করা হল। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবুর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে থাকল। অবশেষে স্থির হল যে ডাঃ রায়কে একবার ডাকা হোক। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন শোচনীয়। মনোরঞ্জন বাবুর একার উপার্জনের উপর সংসার চলত। দীর্ঘকাল তিনি শয্যাশায়ী। তার উপর চিকিৎসার খরচ। কাজেই ডাঃ রায়কে ডাকার ক্ষমতা তাদের ছিল না বললেই চলে। তবুও স্বামীকে বাঁচানর শেষ চেষ্টা হিসেবে স্ত্রী অনেক কিছু বিক্রি করে ডাঃ রায়কে আনার টাকা যোগাড় করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে ডাঃ রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে রোগীর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখেই যেন রোগীর জ্বালাযন্ত্রণা অনেকটা প্রশমিত হল। মনোরঞ্জনবাবু শুয়ে শুয়েই হাত তুলে নমস্কার করলেন। ডাঃ রায় তাঁর সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে সমগ্র ঘরখানি একমুহূর্ত দেখে নিলেন। রোগীর মার্জিত রুচি ও আর্থিক অবস্থার কথা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। ডাঃ রায় রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। এতদিনের চিকিৎসার খুঁটিনাটিও জেনে নিলেন। তারপর মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী ইন্দুলেখাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের পুরুষ আত্মীয় পাশে কেউ

আছেন নাকি ?" ইন্দুলেখা দেবী বললেন, "আছেন আমার দেওর। কালীঘাটে থাকেন। মাঝে মাঝে এসে দেখে শুনে যান।" ডাঃ রায় বুঝে নিলেন পরিবারটি বড় বেশি অসহায়। তিনি বললেন, "তাকে একবার ডেকে আনুন না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি আপনার মেয়েরা গিয়ে একবার তার কাকাকে ডেকে নিয়ে আসুক। আমি ততক্ষণ রোগীর সঙ্গে একটু কথা বলি।" ইন্দুলেখা দেবী বিস্ময়ে হতবাক। ভারত বিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, তিনি গাড়ি পাঠাচ্ছেন একজন রোগীর ভাইকে আনার জন্য। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রোগীর ভাই সরোজবাবু এসে হাজির হলেন। পরস্পর সম্বোধনের পর ডাঃ রায় তাঁকে বললেন, "সরোজবাবু আপনি রোগীর ছোট ভাই। আপনার দাদা দীর্ঘদিন ভুগছেন। অসুবিধা সত্ত্বেও এ সময় একটু ঘন ঘন খোঁজখবর নেওয়া আপনার পক্ষে সঙ্গত হবে। আমি দেখছি যে এঁরা খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি রোগী সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা বলতে। আমি বুঝতে পেরেছি মনোরঞ্জন বাবু ও তাঁর স্ত্রী কবিগুরুর যথার্থ ভক্ত। তাঁরা এত দুঃখেও ভেঙে পড়েন নি। শেষকালে আমাকে 'কল' দিয়েছেন, যদি আমি কিছু করতে পারি বলে। কিন্তু আমি কিছু আশা দিতে পারছি না। আগা-গোড়া ভুল চিকিৎসা হয়েছে। আরও পনের দিন আগে পেলে আমি হয়ত এর একটা সমাধান করতে পারতাম। কিন্তু এখন একেবারেই অসাধ্য। কিন্তু এতে আপনার ঘাবড়ানো সাজে না। যাঁরা বিশ্ব কবির সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা অনেক উন্নত বলেই, বিশ্বাস করি। মরতে আমরা সকলেই বাধ্য। মনোরঞ্জন বাবুর শেষ সময় এসে গিয়েছে। এতে আর দুঃখ করে লাভ নেই। মনোরঞ্জনবাবু ভাগ্যবান পুরুষ। তিলে তিলে দারিদ্র্য বরণ করেও তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা তাঁর সেবা করেছেন ও তাকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছেন। দরিদ্র হলেও এই পরিবার মনের দিক থেকে বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। আমার উপদেশ হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক মতে আর কিছু না করাই ভাল। আপনারা এখন রোগীকে শান্তিতে থাকতে দিন। আর এই কটা দিন আপনি দুবেলা এসে এদের দেখে যান। এই আমার অনুরোধ।" ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ডাঃ রায় মনোরঞ্জনবাবুর বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সমস্ত ফী দিয়ে এলেন মনোরঞ্জন বাবুর মেয়েটির হাতে।

ডাঃ রায় রোগীর এরূপ যত্ন নিতেন যে, কোন রোগীর বিছানা ঠিকমতো পাতা না থাকলে তিনি নিজে বিছানা ঠিক করে দিতেন। কোন কোন সময় রোগীর পথ্য কেমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে তা রোগীর ঘরে নিজ হাতে প্রস্তুত করে দেখিয়ে দিয়ে আসতেন।

তাঁর জীবনের ধর্মই ছিল সেবা। মানুষের সেবাকে তিনি ভগবানের সেবা বলে মনে করতেন।

জন সমাজের শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে একটা সন্তুষ্টিবোধের অবকাশ আছে। জনসাধারণের এই শ্রদ্ধা, আমাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

বিধানচন্দ্র রায়

অমর নেতা

ইন্দিরা রায়

খুব ভালভাবে মনে নেই। যতদূর সম্ভব দুপুরবেলা—খাওয়া দাওয়ার পর সবাই বিশ্রাম করছি। বাড়িতে বাবা, দাদা রেডিও শুনছেন, হঠাৎ বললেন রেডিও শুনে—ইস! বিধান রায় মারা গেলেন! বাইরে থেকে যাঁরা এলেন, তাঁদের মুখেও একই কথা। বিধান রায় নেই! সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার—জন্মদিনেই মৃত্যুদিন! তখন তাঁকে জানি শুধু নামে ডাঃ বিধান রায়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মারা যাওয়ায় এমন কি ক্ষতি হল, তখনও তা বুঝতে পারিনি।

যতদিন চলে গেছে, এখন পরিণত বয়সে ডাঃ বিধান রায়ের কথা জেনেছি, তাঁর পরিকল্পিত কাজ-গুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, লোকের মুখে মুখে তাঁর ধন্বন্তরী বিদ্যার কথা শুনেছি। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।

'বিধান' নামটা তাঁর সত্যিই অর্থবহ। 'বিধান' কথার অর্থ কোন কিছুর নির্দেশ দেওয়া, কোন কিছুর বিধি-ব্যবস্থা করা। উনি সত্যি-সত্যিই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশের অনেক বিধি-ব্যবস্থা করেছেন, যা তাঁর পক্ষেই হয়ত করা সম্ভব হয়েছে। শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগতভাবে ডাঃ হিসেবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এমন বিধান দিয়েছেন রোগীদের, যাতে রোগীরা অদ্ভুত উপকার পেয়েছেন—যার জন্যই তাঁরা তাঁকে 'ধন্বন্তরী' বলে মনে করতেন। রাজনীতি করার প্রকৃত অর্থ যা অর্থাৎ দেশ সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করা, দেশবাসীর মংগল করা, তাদের সুবিধা-অসুবিধের দিকে তাকানো, দেশবাসীর উপকার করা ইত্যাদি, বিধান রায় রাজনীতিমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠিক প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের আদর্শ পালন করেছেন। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় যা উন্নয়ন সবই তাঁরই প্রচেষ্টায়, পরিকল্পনায়। দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন বলেও ভবিষ্যতেরও একটা রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন, যা তিনি বাস্তবায়িত করতে পারেন নি, তা হল আজকের লবণ হ্রদ উপনগরী।

তাঁর জীবনের অন্যান্য দিকগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে সবক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী ছিলেন তিনি। এরকম সচরাচর দেখা যায় না। অথচ, অতি সাধারণ ঘরেই জন্ম তাঁর, মানুষও হয়েছেন কষ্টের মধ্য দিয়ে, মায়ের স্নেহ ও যত্নও বেশিদিন পাননি—তবুও কোনদিনের জন্যেও কোনভাবেই অন্যরকম হননি। সকল রকম কাজে দায়িত্বশীল পদে আসীন থাকায় স্বভাবতই মনে হতে পারে, মানুষটি নেহাৎই গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, কাজ ছাড়া বুঝি কিছুই জানেন না। কিন্তু, তা মোটেই

নয়। রসিক ছিলেন, আমুদে ছিলেন, এবং সকলের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন। তাঁর রসিকতার অনেক কথাই জানা যায় বিভিন্ন ঘটনা থেকে।

আজ বিশ বছর হল তিনি আর নেই। কিন্তু, তিনি চিরদিনই বেঁচে থাকবেন প্রতিটি বাঙালীর মনে। কারণ, পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজনেই তাঁর পরিকল্পিত প্রকল্পগুলো কাজে লাগছে। শুধু যে বর্তমান কালের জনসাধারণই তাঁকে মনে করবে তা নয়, যারা আজ ছোট এমন কি যারা ভবিষ্যতে জন্ম নেবে তারাও বিধান রায়কে চিনবে, কারণ, যখনই বড় হবে, তখনই বাস দেখে, ইলেকট্রিক দেখে, কল্যাণী, দুর্গাপুর, লবণহ্রদের মত উপনগরী দেখে প্রশ্ন করবে—কে এর স্রষ্টা? তখনই জানবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। আবার, ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তার হিসেবে তাঁর পরিচয় সর্বাগ্রে।

সুতরাং, তিনি চির অমর। সকল যুগের দেশবাসী তাঁকে ভক্তিভরে শ্রদ্ধা জানাবে।

সর্বোপরি আমরা বাঙালীরা আবেগপ্রবণ। কি ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত জীবনে আমরা বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হই।

—বিধানচন্দ্র

ডাঃ বি, সি, রায় মেমোরিয়াল কমিটি

১, বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৭০০০৫৪,

ডাঃ রায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসব প্রতিপালন

(১লা জুলাই, ১৯৮১—১লা জুলাই, ১৯৮২)

ডাঃ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হবে একবছরের কার্যসূচীর মধ্য দিয়ে ১লা জুলাই, ১৯৮১ থেকে ১লা জুলাই ১৯৮২ পর্যন্ত।

কার্য্যক্রম :

১। (ক) জন্মশতবার্ষিকী বৃত্তি (প্রতি বছর এই বৃত্তি দেওয়া হবে)।
চিকিৎসাবিদ্যায় যে সকল চিকিৎসক গবেষণা করবেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রতিমাসে ৭৫ টাকা হিসাবে এক বছর বৃত্তি দেওয়া হবে।

(খ) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীকে প্রতি মাসে ৭৫ টাকা করে এক বছরের জন্য 'ডাঃ বি. সি· রায় জন্মশতবর্ষ' বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(গ) প্রত্যেক মাসে ৫০ টাকা করে একবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী একটি ছেলে ও মেয়েকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

(ঘ) বিধান শিশু উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদে মধ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে যারা উত্তীর্ণ হবে, তাদের মধ্যে অন্যান্য বিষয় বিচার করে মাসিক ৪০ টাকা করে 'সুগত রায়' স্মৃতি বৃত্তি একবছর দেওয়া হবে।

২। **জন্মশত বর্ষ স্মারক বক্তৃতা :**

প্রতি বছর চিকিৎসাবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের বিশিষ্ট পারদর্শীদের দ্বারা তিনটি করে বিধান শতবার্ষিকী বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হবে।

৩। **শিল্প ও কুটীর শিল্প প্রদর্শনী :**

প্রদর্শনীতে শিল্প ও কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদি ছাড়া মাটির পুতুলে ডাঃ রায়ের পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও অঙ্কন প্রদর্শনী হবে।

৪। **জীবনী :**

ডাঃ রায়ের জীবনী প্রকাশ করা হবে।

৫। **ব্যায়ামাগার :**

বিধান শিশু উদ্যানে ডাঃ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি 'জিমনাসিয়াম' তৈরি হবে।

৬। **উৎসবাদি :**

জন্মশতবর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

৭। **স্মারক গ্রন্থ .**

১লা জুলাই, ১৯৮১ দ্বি-ভাষায় স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে।

শিল্প ও কুটীর শিল্প প্রদর্শনী—

৩০শে জুন বিকেল ৪টেয় শ্রী প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী) প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রী কানাইলাল ভট্টাচার্য (পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী)।

৩০শে জুন ও ১লা জুলাই প্রদর্শনী খোলা থাকবে সন্ধ্যে ৬টা—রাত্রি ৯টা।

অন্যান্য দিন দুপুর ৩টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য—৫০ পয়সা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রবেশ মূল্য—২৫ পয়সা।

উৎসবাদি

১লা জুলাই থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন ৬-৩০ মিনিটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক মঞ্চস্থ হবে—অংশগ্রহণে বিধান শিশু উদ্যানের সভ্য-সভ্যাবৃন্দ।

আনন্দ সংবাদ

বিধান চন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৯৮১র মাধ্যমিক পরীক্ষায় উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে শ্রীমান অংশুমান আচার্যকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য "সুগত রায় স্মৃতি" বৃত্তি দান করা হল।

সাহিত্যিক শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয় ঘোষিত এপ্রিল সংখ্যার "খেয়ালখুশী" (বিদ্যাসাগর সংখ্যা) ওপর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত রচনার প্রতিযোগিতায় শ্রীমান অরিন্দম ঘোষ (সভ্য, ১৩) শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। ৫০ টাকা মূল্যের বই শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে দেওয়া হবে।

বিধানচন্দ্র রায়, একটি নাম

সুনন্দন রায় চৌধুরী (বয়স, ১২)

একটি বাঙালী যুবক ইংল্যাণ্ডে ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে গেছেন। মৌখিক পরীক্ষা। পরীক্ষক একটি রুগীকে দেখিয়ে যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন রুগীটির রোগ কি। আসলে রুগীটিকে একজন ডাক্তারের কাছ থেকে আনা হয়েছিল। রুগীর সামান্য জ্বর। এক ঝলক দেখার পর যুবকটি পরীক্ষকটিকে বললেন রুগীর বসন্ত হয়েছে, শুনে পরীক্ষক একটি শূন্য বসালেন। তিনি হেসেছিলেন কারণ তার আগের একশো বছরে ইংল্যাণ্ডে বসন্ত রোগ হয়নি। কিছুদিন বাদে রুগীর ডাক্তার পরীক্ষককে জানালেন রুগী বসন্ততে আক্রান্ত। বিনা মেঘে বজ্রপাত হলেও বোধহয় তিনি এরকম চমকে উঠতেন না। তক্ষুণি সেই ভারতীয় যুবকই ডাকা হল। তারপর তার রোগ ধরার ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক। আর বোধহয় বলতে হবে না যে এই যুবককে পরবর্ত্তী কালের বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাক্তার এবং পশ্চিম বাংলার রূপকার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।

ডাঃ রায় শুধু শারীরিক রোগ সারাতেন না, মানসিক কষ্টও সারাতেন। একবার এক বৃদ্ধাকে তাঁর কাছে আনা হয়েছিল। বৃদ্ধা হৃদরোগে আক্রান্ত। ডাঃ রায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর জীবনের কামনা কি। বৃদ্ধার উত্তর—ডাক্তারবাবু আমি যদি রোজ বাড়ির আধ মাইল দূরে শিব মন্দিরে যেতে পারি, তাহলে আমি ধন্য। ডাঃ রায় বললেন, আপনি যাবেন। তারপর বৃদ্ধার অসুখ সেরে গেল। আসল কারণটা ছিল, বৃদ্ধা রোজ এক মাইল হাঁটাচলা করতেন এবং তার রক্ত ভাল চলাচল করত। কাজেই একই সাথে মানসিক কষ্ট ও শারীরিক রোগ সারিয়েছিলেন। একবার এক ধনী ব্যাক্তি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর পুত্রকে দিয়ে ডাঃ রায়কে ডেকে পাঠান। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ডাঃ রায় রুগীর কাশি শুনতে পান এবং বলে দেন যে রুগী সাত কি আট ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন এবং এখন তাঁকে শুধু দুধ খাওয়ানো উচিত। এইসব ছোট ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ডাক্তার হিসাবে তিনি কত বড় ছিলেন।

সাড়ে তের বছর পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানচন্দ্র। পশ্চিম বাংলাকে, স্বাধীনতার পর বেশ কিছু মানুষ সমৃদ্ধ করেছেন। তবে মনে হয়, উন্নয়ন,-শিল্প ও সমৃদ্ধিতে ডাঃ রায়ের দানই শ্রেষ্ঠ। একটি জলা জায়গা। মৎস্য চাষ হয় সেখানে অনেক জায়গা জুড়ে জমি। তাই দেখেই বিধান রায় লবণ হ্রদ করার পরিকল্পনা করলেন। একটা ঘন বনাঞ্চলকে করেছেন দুর্গাপুরের মতন পরিকল্পিত শিল্প শহর। তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বড় বড় কারখানা, সেচ প্রসার, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বড় জলাধারসমূহ, ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠান। কল্যাণী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই চিন্তার ফল।

(এরপর ৫২ পৃষ্ঠার শেষাংশ দেখুন)

চরিত্র বিচিত্রা-১০

প্রাণপুরুষ বিধানচন্দ্র

সুমথনাথ ঘোষ

ভারত সরকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে 'ভারত-রত্ন' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাঁর জন্মদিন (বর্তমান) উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে সারা ভারতব্যাপী তাঁর স্মৃতিরক্ষার যে গৌরবময় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার জন্য স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই বিধানচন্দ্রের নাম এক উজ্জ্বলতম রত্ন হিসাবে চিরভাস্বর থাকবে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাঁর জন্মভূমি এই বাংলাদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে, বিধানচন্দ্রের নাম একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে, অন্য নামে পশ্চিমবঙ্গের নবরূপকার, স্রষ্টা, প্রাণপুরুষরূপে।

তিনি ছিলেন ডাক্তার। এতবড় ডাক্তার আর ভারতবর্ষে দ্বিতীয় ছিল না। লোকে তাঁকে ধন্বন্তরি মনে করতেন। তাঁর চিকিৎসায় মুমূর্ষু রুগীও প্রাণ ফিরে পেত। কিম্বদন্তী ছিল যে, ডাঃ রায়ের চিকিৎসায় মরা মানুষও নাকি বেঁচে ওঠে।

সত্যি কথা বলতে কি এই পশ্চিমবাংলার শাসনভার হাতে তুলে নিয়ে যেদিন তিনি মুখ্য-মন্ত্রীর আসনে বসেন, সেদিন সারা দেশের অবস্থা মুমূর্ষু রুগীর চেয়েও আরো সাংঘাতিক। সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। দুশো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে যে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভারত অন্যান্য প্রদেশে তার আনন্দ প্রবাহে মেতে উঠলেও পশ্চিমবাংলা তাতে কণ্ঠ মেলাতে পারেনি। তার চোখের জল তখন শুকোয়নি। হাজার লক্ষ উদ্বাস্তুর দীর্ঘশ্বাসে ও হাহাকারে আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত। এই স্বাধীনতার জন্যে সবচেয়ে বেশি দিয়েছিল যে বাংলাদেশ, এমন কি তার বুক চিরে দু'খানা করে পাকিস্তানকে দান করেছিল, সোনার বাংলার সোনা ফলানো যে অংশটা তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ বুক পেতে নিতে হয়েছিল এই হাজার হাজার লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীকে। যারা পিতৃপিতামহের ভিটা ত্যাগ করে, মান ইজ্জত খুইয়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পশ্চিমবাংলায় পালিয়ে এসে যারা পথে, ঘাটে, রাস্তায় যেখানে সেখানে আশ্রয়হীন হয়ে জানোয়ারের মত জীবন কাটাচ্ছিল। চারিদিকে শুধু হাহাকার শুধু নেই—নেই। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, রোগের ওষুধ নেই। দেশব্যাপী যেন একটা মহামন্বন্তর, আসন্ন মড়কের ছায়া। সারা দেশের সর্বাঙ্গে যেন বিষাক্ত ঘা দগদগ করছে। মনুষ্যত্বের এতবড় অপমান কল্পনা করা যায় না। সেকথা মনে হলে, আজ চোখে জল ভরে আসে। লেখনীর কালির সব কালিমা দিয়েও বুঝি সে কলঙ্ক ঢাকা যায় না।

মানুষের দুর্দশার এই চরম ক্ষণে বিধাতার আশীর্বাদের মত এসে দাঁড়ালেন এই বিধানচন্দ্র। ত্রাণকর্তারূপে না প্রাণদাতা রূপে। একদিন যাঁর হাতে মুমূর্ষু পুনর্জীবন লাভ করত, তিনি এবার ভার নিলেন গোটা বাংলাদেশের। সেই ছিন্নভিন্ন, জরাজীর্ণ অভাবগ্রস্থ দারিদ্র পীড়িত, সহস্রসমস্যায়

জর্জরিত বাংলাদেশকে সর্বরকম ব্যাধিমুক্ত করে আবার সুস্থ সবল জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

বিধানচন্দ্র ছিলেন সত্যসাধক, দেশপ্রেমিক ও কর্মবীর। যেমন বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁকে বলা হত পুরুষসিংহ। যে কাজে তিনি হাত দিতেন যতক্ষণ না তা সার্থক হয়, সম্পূর্ণতা লাভ করে, ততক্ষণ তা থেকে বিরত হতেন না। তাই পশ্চিমবাংলার প্রতিটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা তার সেই সার্থকতার স্বাক্ষর বহন করছে।

তিনি ছিলেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, তাই দেশবাসীর অভাব অনটন, দুঃখ দারিদ্র কিসে ও কেমন করে কত তাড়াতাড়ি দূর করতে পারবেন, সবসময় সেই চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। সত্যিকথা বলতে কি, বিধানচন্দ্র দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই যে বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিলেন তা কল্পনাতীত। বিশ্বকর্মার মত দেখতে দেখতে দেশবাসীর কল্যাণার্থে যেসব বিরাট প্রকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন অল্পদিনের মধ্যেই তাদের কর্মে রূপায়িত করে বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ দুর্দশার ভার অনেকখানি লাঘব করেছিলেন। তিনি যে বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, তারই সুফল যে এখনকার মানুষ কতরূপে কতভাবে ভোগ করছে, অনেকেই হয়ত তা জান না। সত্যিকথা বলতে কি বিধানচন্দ্রের কাছে, সারা বাংলা, বাঙ্গালীজাতি চিরকাল ঋণী থাকবে।

তিনিই প্রথম, বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের জন্যে স্টেট ট্রান্সপোর্ট-এর সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ স্টেট বাস যার জন্য আজ আমাদের এই জনসঙ্কুল নগরীর মানুষদের যাতায়াতের এত সুযোগ সুবিধা হয়েছে, এ সেই মহান দেশপ্রেমিক বিধানচন্দ্রেরই পরিকল্পনা। কেবল বাঙ্গালীর ছেলে যারা মোটর চালাতে জানে, তাদের উপার্জনের কথা ভেবে তিনি সর্বপ্রথম তাদেরই ট্যাক্সির লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হতভাগ্য যুবকরা নিজেদের সে সৌভাগ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে, অবাঙ্গালীদের কাছে কিছু বেশি মুনাফায় সেই ট্যাক্সির লাইসেন্স বিক্রী করে দেয়।

তারপর জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে যাতে মা বাপরা বিশুদ্ধ দুধ খাইয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে পারে, সেই জন্যে তিনি হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প নামে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া দুর্গাপুর তাঁর এক অভিনব সৃষ্টি ও পরিকল্পনা। বহু ধরণের কলকারখানা নিয়ে 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' বিলাতের মত 'রুর অফ ইণ্ডিয়া' নামে সমৃদ্ধ হয়ে বহু মানুষের কেবল অন্নবস্ত্র জোগাবে না সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে, এই ছিল তাঁর মনের সাধ।

'কল্যাণী' উপনগরী স্থাপনের পরিকল্পনাও অভিনব। তিনি চিকিৎসক তাই এই জনাকীর্ণ ব্যবসাবাণিজ্য ও অফিস আদালত সঙ্কুলিত কলকাতা থেকে অল্পদূরে যাতে বিশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ কাজকর্ম ব্যবসাবাণিজ্য করে অর্থের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সঙ্গতি রক্ষা করে বাঁচতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে একটা গোটা নগর বসিয়েছিলেন। সস্তায় লোকজনের বসতির জন্যে পথ ঘাট জল, আলোর সঙ্গে বহু ছোট বড় বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ যে তাঁর কতবড় অবদান, এখন যারা সেখানে সুস্থ সবল দেহে বাস করছেন, তারা কোনদিন

ভুলতে পারবেন না এই কর্মবীর বাংলার প্রাণ পুরুষকে। দেশের সর্বত্র তিনি নতুন প্রাণ ও সুস্থ জীবনের স্বপ্ন যেমনি দেখেছিলেন, তেমনি তাদের সফল ও সার্থক করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। নইলে একই মানুষের পক্ষে এতগুলি সুবিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান কখনও সম্ভব হত না। তিনি ছিলেন প্রকৃত কর্মবীর। তাই বক্তৃতা দিয়ে কথার রঙীন ফানুষ উড়িয়ে দেশের মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে না দিয়ে তাদের চোখের সামনে গেঁথে তুলেছিলেন চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষার কর্মমন্দির।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এসব কিছুর আগে তাঁর মনে আসে চাষীদের কথা। তিনি ভোলেননি যে এই চাষীভাইরাই দেশের সমৃদ্ধির ভিত্তি স্বরূপ। জলাভাবে কত জমি শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হয়ে আছে। এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশের প্রাণ হল জল। এই মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে জলে। তাই ময়ূরাক্ষী, পাঞ্চেৎ, দুর্গাপুর ব্যারেজ প্রভৃতি দ্বারা এই জলাভাব দূর করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। কিন্তু ভোলেননি যে আমাদের মন্ত্রে আছে—'আপো অস্মান্ মাতরঃ শুভয়ন্ত।' জল আমাদের মায়ের মত পবিত্র করুক।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যাঁর নাম তিনি হলেন এই বিধান শিশু উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়—তিনি তখন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টরূপে কেবল বিধানচন্দ্রের মন্ত্রদাতা নন. একাধারে সঙ্গী, সহচর ও মন্ত্রদাতা। এছাড়াও অতুল্যবাবু তদানীন্তন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ তীক্ষ্ণধী পুরুষ।

যেমন রাজা তেমনি যোগ্যতম তাঁর মন্ত্রী। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের যেমন চাণক্য, তেমনি ছিলেন এই অতুল্যবাবু। বিধানচন্দ্রের সর্বকর্মে, সর্বক্ষেত্রে পরামর্শদাতা যাকে বলে friend, Philosopher and Guide! বিধানচন্দ্রের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন প্রায় সমদর্শী!

বিধানচন্দ্রকে তিনি সব চেয়ে বেশি জানতেন এবং চিনতেন তাই তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য এই সু-বিরাট বিধান শিশু উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করলেন। বাইরে ফটকের সামনে বিধানচন্দ্রের যে দীর্ঘকায় মর্মরমূর্তি, তাতে সেই পুরুষ সিংহের দৈহিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি ওই বাগানের ভিতরে ঢুকলে সেই কর্মবীর সত্যসাধকের অন্তরের ছবি যেন চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। হাঁ, তিনি চেয়েছিলেন একদিন এমনিভাবে বৃক্ষ লতায় ফলে ফুলে সুশোভিত শস্যশ্যামল হয়ে ভরে থাকে যেন তাঁর এই সাধের বাংলার মাটি আর ওই সুগভীর দীঘির স্বচ্ছ নির্মল জল, যেন তার কূলে কূলে ভরা থাকে চিরদিন মাতৃস্নেহের মত।

এত কাজের মধ্যেও কিন্তু তিনি ভোলেন নি যে তিনি মুখ্যতঃ চিকিৎসক। রুগীর সেবাই তাঁর ধর্ম। তাই এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রতিদিন পাঁচটি করে রুগী দেখতেন। তখন তিনি চিকিৎসক, তিনি ধন্বন্তরি, রুগীর বন্ধু যেমন করে হোক সময় করে নিতেন, অন্য সব কাজ ফেলে রেখে।

একদিনের ঘটনা আমি ভুলতে পারব না, মৃত্যুর বোধহয় দু'তিনবছর আগের কথা। আমাদের

পাড়ার একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত দরিদ্র ভদ্রলোক দেখি বিধানচন্দ্রের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

কি ব্যাপার? আপনি এখানে যে।

তিনি যা বললেন, শুনে হতবাক। বিধানচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর আজ রাত্রে এক জায়গায় রুগী দেখতে যাবার কথা আছে: সেকি! উনি যাবেন বলেছেন? আমার মুখে চোখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠে। তিনি বললেন, জানি একথা কাউকে বললে বিশ্বাস করবে না। সত্যিকথা বলতে কি, আমারও মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু যখন তাঁকে গিয়ে বললুম যে আপনি যখন ডাক্তারী পাশ করে পটলডাঙ্গায় এসে প্রথম প্র্যাকটিশ করতে বসেন, তখন আমি আপনার নাম পাড়ায় প্রচার করেছিলুম। আপনি বলেছিলেন যখনই দরকার হবে যেন আপনার কাছে আসি। অবশ্য সে বহুকালের কথা। আপনার মনে থাকার নয়। তবু তিনি আমার নামটা জিজ্ঞেস করে মুহূর্তকয়েক চুপ করে কি যেন ভাবলেন তারপর হঠাৎ যেন নামটা মনে পড়ে গেল। বললেন, কোথায় যেতে হবে তাহলে?

বললুম বজবজ লাইনের মুঙ্গি ষ্টেশনের কাছে। আমার শালীর খুব অসুখ। ওখানকার ডাক্তাররা এলে দিয়েছে, বাঁচবেনা বলেছেন। তাইহঠাৎ আপনার সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যেতে ছুটে এসেছি।

তিনি গম্ভীর ও ভারী গলায় বললেন, বেশ, আমি যাব, কিন্তু গাড়ির ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রুগী দেখতে সরকারী গাড়িতে যেতে পারব না। তুমি রাত্তির নটার সময় বিধানসভার পিছনের ফটকের কাছে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কোর। আজ একটা জরুরী মিটিং আছে সেখানে।

বৃদ্ধ হয়েছেন ভদ্রলোক। গরীব। প্রথম বয়সে ব্রাহ্মসমাজের হয়ে কাজকর্ম করতেন। মিথ্যা যে বলেন নি, তা আমি জানতুম। তবু পরের দিন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কাল কি হল, উনি গিয়েছিলেন?

বললেন, হাঁ। নিশ্চয়। ওঁর কথার কি কখনও নড়চড় হয়?

আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। ডাঃ রায়ের এই কৃতজ্ঞতার কথাটা ভাবতে গিয়ে বারবার তাঁর চরণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলুম।

(৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে, তিনি এমন কিছু আহামরি ছাত্র ছিলেন না। বাঁকিপুরে ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই, বিধানচন্দ্রের জন্ম। পিতা শ্রী প্রকাশচন্দ্র রায়, মাতা অঘোরকামিনী দেবী, ডাক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং দুই রকমই পড়তে পারতেন, কারণ সুযোগ ছিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৯৪৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী হবার পর অনেক কাজ করে গেছেন। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই। ডাঃ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা পশ্চিমবাংলায় উৎসব হচ্ছে। হঠাৎ বেতার যন্ত্রে শোনা গেল ডাঃ রায় আর নেই। জন্ম-মৃত্যু একদিনে পৃথিবীর আর একজন মানবের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, নাম তাঁর বুদ্ধদেব, ডাঃ রায়ও কি আরেক বুদ্ধ!

খেলার খোশ-খবর

শ্রীকলমচি

ক্রিকেটের হাল হকিকৎ—'নতুন অধিনায়ক—নতুন কানুন'

আগামী ১৮ই অক্টোবর ইন্দোরে ইরাণী কাপের খেলা চলাকালীন ভারত ভ্রমণকারী ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচন করবেন, নতুন নির্বাচক সমিতি। ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের পর্যবেক্ষক দল সুপারিশ করেছেন যে, আগন্তুক দলগুলির দৈনিক খেলার সময় মোট সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা হোক। এই সুপারিশ টেষ্ট সহ সমস্ত প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতার জন্য—একদিনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কেবল ব্যতিক্রম হবে। অবশ্য সমস্ত স্থানীয় খেলাগুলি দৈনিক ছয় ঘণ্টাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পর্যবেক্ষক দলের আরও সুপারিশ যে, কোনও বোলারের দুর্ব্যবহারের জন্য আম্পায়ার 'ডেডবলের' সঙ্কেত জানাবেন এবং ঐ ইনিংসে ঐ বোলারকে বাতিল করা হবে। যদি কোন ফিল্ডার দুর্ব্যবহার করে। তাহলে আম্পায়ার অধিনায়ককে ঐ ফিল্ডারকে মাঠের বাইরে পাঠাতে বলবেন এবং তার অনুপস্থিতিতে কোনও বদলী খেলোয়াড়কে খেলতে অনুমতি দেবেন না। ঐ পর্যবেক্ষক দলে আছেন পলি উমরিগর, সুনীল গাভাসকার, আর নাদকানি ও কে তারাপোর।

মারডেকা ফুটবলের নতুন আকর্ষণ—আর্থিক পুরস্কার—

মালয়েশিয়ার ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন স্থির করেছে যে, এই বছর অর্থাৎ মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার রৌপ্য জয়ন্তী (২৫ বৎসর) উৎসব থেকে এই প্রতিযোগিতার জয়ী দল চল্লিশ হাজার ডলার ও বিজেতা কুড়ি হাজার ডলার আর্থিক পুরস্কার পাবে। এই প্রতিযোগিতায় বিদেশী দলগুলির কাছে এই আর্থিক পুরস্কার অতিরিক্ত আকর্ষণ হবে। এখনও পর্যন্ত সাতটি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদানে সম্মতি জানিয়েছে। দেশগুলি যথা—ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়ায়েত, নিউজিল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড ও সম্মিলিত আরবশাহী। চারটি দেশ এখনও সম্মতি জানায়নি। যথা—ইরাক, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও গত বছরের বিজয়ী মরক্কো। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৩১শে আগস্ট।

যখন ভাগ্য মন্দ—

ল্যারী হোমসের কাছে বিশ্ব হেভী ওয়েট মুষ্টি যুদ্ধে পরাজিত হবার সাতদিনের মধ্যে পূর্বতন বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান লিওঁ স্পিঙ্কস ডেট্রয়েট শহরে পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছে। তার

বিরুদ্ধে অভিযোগ লাইসেন্স প্লেটটির সময় অতিক্রান্ত তাই নিয়েই গাড়ি চালাচ্ছিল এবং তার গাড়িতে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও পাওয়া গেছে। দুর্ভাগ্য স্পিঙ্কসকে তাড়া করে চলেছে মনে হয়।

কো—নতুন নজীর সৃষ্টি করেছে, করবে

ব্রিটেনের এ্যাথলীট সেবাষ্টিয়ান কো সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ৮০০ মিটার দৌড়ে তার নিজের সর্বশেষ বিশ্ব নজীরের চেয়ে উন্নততর সময়ে (১ মিনিট ৪১'৭২ সেকেণ্ডে) নতুন বিশ্ব নজীর করেছে। কো'র পূর্বতন সময়ের (১ মিনিট ৪২'৩২ সেকেণ্ড) চেয়ে নতুন নজীর আধ সেকেণ্ডের কিছু বেশি কম সময়ের করেছে। বলেছে যে, তার স্বদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী ষ্টিভ ওভেটের ১৫০০ মিটার দৌড়ের বিশ্বনজীর সে ম্লান করার চেষ্টা করবে।

চৌত্রিশ বছরে এই প্রথম—

ঘন্টি কার্লোর টেনিস প্রতিযোগিতার চৌত্রিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ঐ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের (Final) খেলা পরিত্যক্ত হল। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিমি কোন্নরস ও আর্জেন্টিনার গুইলারমো ভিলাসের মধ্যে খেলার দিন স্থির করা নিয়ে মতানৈক্য ঘটায় এ বছর বিজয়ীর খেতাব কারুরই জুটল না।

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের পাদপ্রদীপে হোমস—যবনিকার অন্তরালে মহম্মদ আলি—

ডেট্রয়েটে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল (W B C) হেভীওয়েট বিশ্বখেতাবী মুষ্টিযুদ্ধে ল্যারী হোমস প্রতিদ্বন্দ্বী লিওঁ স্পিঙ্কসকে তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত করে দশমবার তার বিশ্বখেতাবী লড়াইয়ে জিতে গেল। তৃতীয় রাউণ্ডে ২ মিনিট ৫৪ সেকেণ্ডে হোমসের প্রচণ্ড মারে স্পিঙ্কস যখন রিংয়ের দড়ির ওপর হাঁফাচ্ছে তখন রেফারী লড়াই শেষের সঙ্কেত দেন। জো লুই এরেনায় অনুষ্ঠিত এই লড়াইটি প্রয়াত সর্বশ্রেষ্ঠ হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইয়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। এই লড়াইতে হোমস প্রায় কুড়ি লক্ষ ডলার পেয়েছে আর স্পিঙ্কস পেয়েছে পাঁচ লক্ষ ডলার (এক লক্ষ ভারতীয় মুদ্রায় আট টাকা)।

STIPEND GIVEN BY DR. B. C. ROY MEMORIAL COMMITTEE

(Monthly : For one year)

List of Stipend holders for the year 1981

	Subject	*Name of the Stipend*	*Name of the Stipend holders*
1	Yoga Bayam	Shree Shree Ramakrishna	Km. Sampa Chanda
2	Bratachari	Mahatma Gandhi	Km Barnali Bagchi
3.	Basketball (Girl)	Sisir Kumar Ghosh	Km Krishna Das
4.	Basketball (Boy)	Motilal	Shri Apu Das
5.	Volleyball	Shri Jatindra Nath Sen	Shri Debasish Karmakar
6	Handball	Parul Dasgupta	Shri Abhijit Chowdhury
7.	Kho Kho (Girl)	Prafulla Kumar Sarkar	Km. Geeta Roy
8.	Kho Kho (Boy)	Suresh Chandra Majumdar	Shri Rabin Kundu
9.	Kabadi	Bistoo Charan Dey	Shri Sankar Dutta
10.	Gymnastics	Pabitra Kumar Das	Shri Jagannath Poddar
11.	Archery.	Air Marshal Subrata Mukherjee	Shri Shekhar Saha
12.	Athletics (Boy)	Vidyasagar	Shri Anamitra Mondal
13.	Athletics (Girl)	Gosto Paul	Km. Ruma Roy
14.	Painting	Rabindranath	Km. Sukla Sarkar
15.	Essay	Bankimchandra	Shri Arindam Ghosh
16.	Music	Alauddin	Km Piali Banerjee
17.	Dance	Suresh Chakraborty	Km. Kanta Dutta
18.	Attendance, and Good Behaviour	Dr. B. C. Roy	Shri Prasanta Ghosh
19.	Acting (Boy)	Girish Chandra	Shri Abir Dutta Chowdhury.
20.	Acting (Girl)	Kalidas	Km. Tinku Khanna
21.	Madhyamik Exam.	Sugata Ray	Shri Ansuman Acharya

Competition for Medal.

P.T. Shri Gorachand Saha.

BIDHAN SISHU UDYAN

VARIOUS DEPARTMENTS & THE NUMBER OF TRAINEES (1981)

Sl No.	Subject	No. of Boys	No. of Girls	TOTAL
1.	Volleyball	76	—	76
2.	Basketball	65	50	115
3.	Kho-Kho	62	50	112
4.	Yoga Bayam	205	185	390
5.	Kabadi	52	—	52
6.	Archery	52	—	52
7.	Handball	82	—	82
8.	Athletics	70	55	125
9.	Gymnastics	64	42	106
10.	Bratachari	—	85	85
11.	P. T.	66	50	116
12.	Painting	115	105	220
13.	Swimming	225	200	425
14.	Library (Reading)	—	—	655
15.	Library (Lending)	—	—	620
16.	Dance	—	76	76
17.	Music	10	61	71
18.	Recitation	45	50	95
19.	Play	85	76	161
20.	Band	45	30	75
21.	Volunteer	—	—	200
				3919

বৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফল—১৯৮১

	বৃত্তির বিষয়	বৃত্তির নাম	বৃত্তিপ্রাপকের নাম
১।	যোগব্যায়াম	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	শম্পা চন্দ
২।	ব্রতচারী	মহাত্মা গান্ধী	বর্ণালী বাগচী
৩।	বাস্কেটবল (বালিকা)	শিশিরকুমার ঘোষ	কৃষ্ণা দাস
৪।	বাস্কেট বল (বালক)	মতিলাল	অপু দাস
৫।	ভলিবল (বালক)	যতীন্দ্রনাথ সেন	দেবাশিস কর্মকার
৬।	হ্যাণ্ডবল	পারুল দাশগুপ্ত	অভিজিৎ চৌধুরী
৭।	খো খো (বালিকা)	প্রফুল্লকুমার সরকার	গীতা রায়
৮।	খো খো (বালক)	সুরেশচন্দ্র মজুমদার	রবীন কুণ্ডু
৯।	কাবাডি (বালক)	বিষ্টুচরণ দে	শঙ্কর দত্ত
১০।	জিমন্যাসটিক্স	পবিত্রকুমার দাস	জগন্নাথ পোদ্দার
১১।	ধনুর্বিদ্যা	এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী	শেখর সাহা
১২।	এ্যাথলেটিক্স (বালিকা)	গোষ্ঠ পাল	রুমা রায়
১৩।	এ্যাথলেটিক্স (বালক)	বিদ্যাসাগর	অনমিত্র মণ্ডল
১৪।	অঙ্কন	রবীন্দ্রনাথ	শুক্লা সরকার
১৫।	প্রবন্ধ	বঙ্কিমচন্দ্র	অরবিন্দ ঘোষ
১৬।	সঙ্গীত	আলাউদ্দিন	পিয়ালী ব্যানার্জী
১৭।	নৃত্য	সুরেশ চক্রবর্ত্তী	কান্তা দত্ত
১৮।	উপস্থিতি, আচরণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য	ডাঃ বি, সি, রায়	প্রশান্ত ঘোষ
১৯।	নাটক (বালক)	গিরীশচন্দ্র	আবীর দত্তচৌধুরী
২০।	নাটক (বালিকা)	কালিদাস	টিঙ্কু খান্না
২১।	মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব	সুগত রায়	অংশুমান আচার্য

পদক প্রতিযোগিতা

পি,টি,	গোরাচাঁদ সাহা

বিভিন্ন বিভাগ ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা—১৯৮১

১।	ভলিবল--	বালক--৭৬		--	৭৬
২।	বাস্কেটবল--	বালক--৬৫	বালিকা-- ৫০	--	১১৫
৩।	খো-খো--	বালক--৬২	বালিকা-- ৫০	--	১১২
৪।	যোগব্যায়াম--	বালক--২০৫	বালিকা--১৮৫	--	৩৯০
৫।	কাবাডি--	বালক--৫২	--	--	৫২
৬।	ধনুর্বিদ্যা--	বালক--৫২	--	--	৫২
৭।	হ্যাণ্ডবল--	বালক--৮২	--	--	৮২
৮।	এ্যাথলেটিকস্--	বালক--৭০	বালিকা-- ৫৫	--	১২৫
৯।	জিম্‌ন্যাসটিকস্--	বালক--৬৪	বালিকা-- ৪২	--	১০৬
১০।	ব্রতচারী--	--	বালিকা-- ৮৫	--	৮৫
১১।	পি.টি.--	বালক--৬৬	বালিকা-- ৫০	--	১১৬
১২।	অঙ্কন--	বালক--১১৫	বালিকা--১০৫	--	২২০
১৩।	সাঁতার--	বালক--২২৫	বালিকা--২০০	--	৪২৫
১৪।	লাইব্রেরী--	রিডিং--৬৫৫	লেনডিং--৬২০	--	১২৭৫
১৫।	নৃত্য--	--	বালিকা-- ৭৬	--	৭৬
১৬।	সঙ্গীত--	বালক--১০	বালিকা-- ৬১	--	৭১
১৭।	আবৃত্তি--	বালক--৪৫	বালিকা-- ৫০	--	৯৫
১৮।	নাটক--	বালক--৮৫	বালিকা-- ৭৬	--	১৬১
১৯।	ব্যাণ্ড--	বালক--৪৫	বালিকা-- ৩০	--	৭৫
২০।	স্বেচ্ছাসেবক--	বালক	বালিকা--২০০	--	২০০
				মোট--	৩৯১৯

ওরা সফল

বৃত্তি প্রতিযোগিতা

১৯৮১

বর্ণালী বাগচী
(ব্রতচারী)

শঙ্কর দত্ত
(কাবাডি)

রুমা রায়
(এ্যাথলেটিক্‌স্)

শম্পা চন্দ
(যোগ ব্যায়াম)

গীতা রায়
(খো খো)

কান্তা দত্ত
(নৃত্য)

শুক্লা সরকার
(অঙ্কন)

দেবাশিস কর্মকার
(ভলিবল--বালক)

অংশুমান আচার্য
(মাধ্যমিক পরীক্ষা)

প্রশান্ত ঘোষ
(জিমন্যাসটিকস্)

পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়
(সঙ্গীত)

আবীর দত্ত চৌধুরী
(অভিনয়)

শেখর সাহা
(ধনুর্বিদ্যা)

অপু দাস
(বাস্কেটবল)

জগন্নাথ পোদ্দার
(জিমন্যাসটিকস্)

টিংকু খান্না
(অভিনয়)

অনমিত্র মণ্ডল
(এ্যাথলেটিকস্)
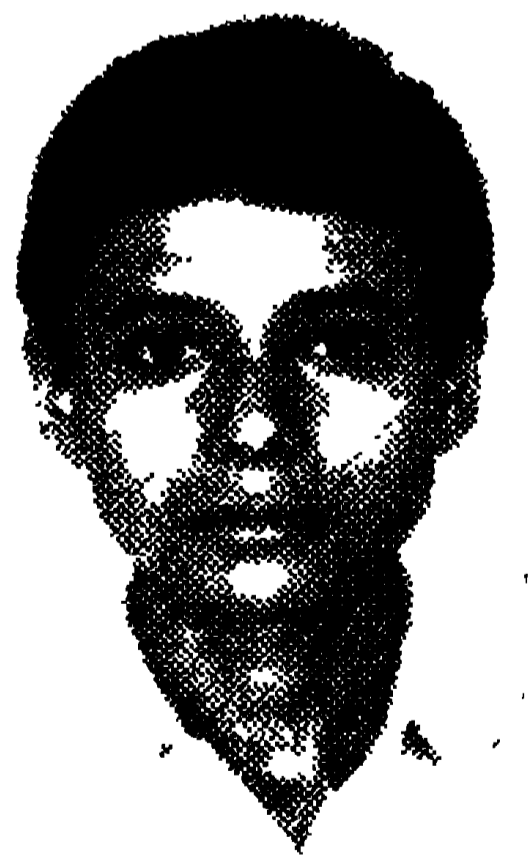
কৃষ্ণা দাস
(বাস্কেটবল--বালিকা)

অরিন্দম ঘোষ
(প্রবন্ধ)

রবীন কুণ্ডু
(খো-খো--বালক)

অভিজিৎ চৌধুরী
(হ্যাণ্ডবল)

মজিদই মানদণ্ড

দিলীপ দত্ত

কলকাতার ফুটবল মরশুম শুরু হয়েছে। প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের তিন প্রধান দাবীদার মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহঃ স্পোর্টিং দল তাঁদের এ পর্যন্ত যে কটি খেলা হয়েছে তার প্রতিটিতেই জয়লাভ করেছেন। অবশ্য এখনও তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হননি।

তিনটি প্রধান দল তাঁদের খেলাগুলিতে জয়লাভ করলেও তাঁদের খেলা দর্শক ও সমর্থকদের খুশি করতে পারেনি। ফেডারেশন কাপ, ষ্ট্রাফোর্ড কাপ, নাগজী ট্রফিতে কিছু উচ্চাঙ্গের ফুটবল খেললেও কলকাতার মাঠে তাঁরা কোন এত অসংলগ্ন ফুটবল খেলেছেন তা বোঝা যায় না। অসুস্থতা এবং প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগানের জন্য কিছু খেলায় মহঃস্পোর্টিংএর সাবির আলি, প্রশান্ত ব্যানার্জি, আকবর, মোহনবাগানের পায়াস,, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, ইষ্টবেঙ্গলের ফ্রান্সিস, শেখরণ সব ম্যাচে একসঙ্গে খেলতে পারেননি, কিন্তু তাই বলে সমগ্র টিম এমন ছন্নছাড়া ফুটবল খেলবে কেন। খেলোয়াড়দের যেন আগ্রহ নেই, খেলায় পরিকল্পনার কোন চিহ্ন নেই। যার ফলে কলকাতার ফুটবল এখন প্রাণহীন। বড়দলগুলি জিতেছে বটে, কিন্তু সে জয়ে বড়দলের কোন অবাধ আধিপত্য নেই এবং প্রত্যেক বড়দলই ছোটদলের বিপক্ষে নিজেদের রক্ষণভাগ সামলাতে ব্যস্ত হয়েছে এবং গোলও খেয়েছে।

দলগতভাবে কোন বড় দলই সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় দিতে পারেননি। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ইষ্টবেঙ্গলের মজিদ বাকসর এবং মোহনবাগানের সুরজিৎ সেনগুপ্ত উজ্জ্বল। দল যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে খেলতে পারছে না তখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বেও এবছরেও লীগ বিজয়ী নির্ধারিত হবে। ইষ্টবেঙ্গলের মজিদ বাকসারই প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের প্রধান মানদণ্ড।

ইষ্টবেঙ্গল দলকে তিনি একাই খেলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করবে বড় খেলাগুলির ফলাফল।

আর একটি কথা, এবার খেলার মাঠে প্রবেশ করার ব্যাপারে কড়াকড়ি হচ্ছে, কিন্তু দর্শক গ্যালারী থেকে ইঁট পড়া বন্ধ হয়নি। সে বিষয়ে দর্শক, সমর্থক, খেলোয়াড় এবং পুলিস প্রত্যেকেই সচেষ্ট হতে হবে। তা না হলে খেলার মাঠে সুস্থ পরিবেশ গড়ার চেষ্টা সুদূর পরাহত হবে।

ধাঁধা
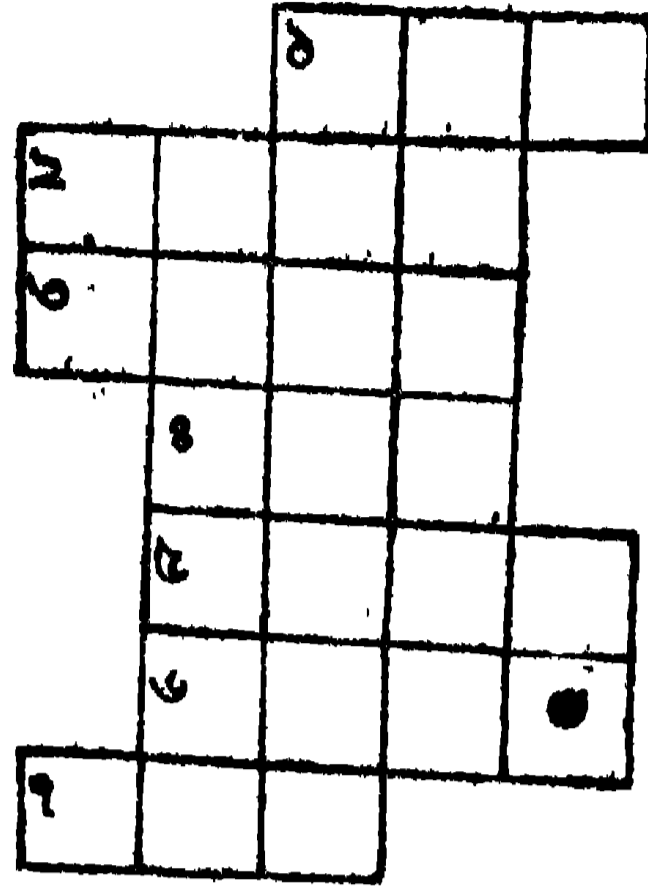
সমাধান : উপরে-নীচে যে ঘরটি সম্পূর্ণ, আমাদের দেশের অমর একজন কর্মবীরের নাম দিয়ে পূর্ণ করলে তবে সমাধান শুরু করা যাবে।

পাশাপাশি

১ যার অভাবে সারা দেশ ভুগছে ও ধুঁকছে
২ সকল সমস্যার সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত
৩ সাধারণ মানুষ ও দেশেরও এই একই অবস্থা
৪ তার ফলে এই অবস্থা
৫ এখান থেকে অন্ধকার থেকে মুক্তির কথা ছিল
৬ কিন্তু এই অবস্থার জন্য সব থেকেও কিছুই নেই
৭। এখন ঈশ্বরই একমাত্র ভরসাস্থল

—জি. ডি. কে. আন্তরবাস

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

(ক) নিখুঁতি (খ) চিত্তরঞ্জন (গ) পাটিসাপটা (ঘ) নিমকি (ঙ) ল্যাংচা (চ) মোতি-চুড় (ছ) মোহনভোগ গোলাপজাম (ঝ) শোনপাপড়ি, (ঞ) লেডিকিনি।

সঠিক উত্তর পাঠিয়েছে

দশটির মধ্যে দুএর বেশি সঠিক উত্তর দাতাদের নাম—বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সভ্য) ; সোমনাথ দাশ-গুপ্ত (সভ্য,), পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা), সুজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা), সোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্য)।

এ সংখ্যায় যারা ছবি এঁকেছে

আশিস চট্টোপাধ্যায়, (সভ্য. সিনিয়র) ; তাপস পাল. অনসূয়া আচার্য (সভ্যা, ১১) অর্পিতা মজুমদার (সভ্যা, ১২)।

আগামী সংখ্যা থেকে 'খেয়ালখুশী' তোমাদের সামনে নতুন স্বাদের গল্প, কবিতা, ধাঁধা, প্রবন্ধ পরিবেশন করছে। এ ছাড়া থাকছে তোমাদের জন্য ধারাবাহিক রোমাঞ্চকর আন্দামান অভিযানের কাহিনী।

নতুন বিভাগও একটি থাকছে হাতের কাজের। হাতের কাজ শেখ এবং শেখাও।

তোমরাও তোমাদের মনের মত লেখা তোমাদের বন্ধুদের জন্য পাঠাও।

Regdn. No. WB/EC-179 July 1981 Re. 1·00

নিয়মাবলী

১. জুলাই মাস থেকে "খেয়াল খুশীর" বছর শুরু। বছরের যে কোন মাস থেকে খেয়াল খুশীর গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে খেয়াল খুশী প্রকাশিত হয়।

২. প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা এবং বছরে ১২ টাকা। সডাক টাকা ১৩·২৫।

৩. খেয়াল খুশীর চাঁদা নগদে অথবা মানিঅর্ডারে পাঠানো যায়। চাঁদা চেকেও পাঠানো যায়। চেক লিখতে হবে ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির নামে।

৪. গ্রাহক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

৫. ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েরাই লেখা, ছবি, ধাঁধার উত্তর প্রভৃতি সম্পাদিকার নামে খেয়াল খুশীতে পাঠাতে পারবে।

৬. গ্রাহক চাঁদা ইত্যাদি পাঠাতে হবে খেয়াল খুশীর ম্যানেজারের নামে।

৭. অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। যারা লেখা পাঠাতে চাও তারা লেখার একটি নকল রাখবে। লেখা পাঠাবার সময় কাগজের দু'পিঠে লিখবে না। যারা আঁকা পাঠাতে চাও, তারা পেন্সিল স্কেচের উপর "চাইনিজ ইঙ্ক" বুলিয়ে দেবে।

৮. কোন কিছু জানতে চাইলে খেয়াল খুশীর কার্যালয়ে এসে দেখা করতে অথবা চিঠিও লিখতে পারো। চিঠির উত্তর পেতে হলে জোড়া পোষ্টকার্ড অথবা ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

৯. পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশকপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে।

"খেয়াল খুশী কার্যালয়"
১, বিধান শিশু সরণী
কলিকাতা—৭০০০৫৪
ফোন: ৩৫-৮০৮৬

কার্যাধ্যক্ষ

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে শ্রীদুলাল ভৌমিক কর্তৃক ১, বিধান শিশু সরণী কলিকাতা-৭০০০৫৪ হইতে প্রকাশিত ও গ্রাফিকো, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
আগষ্ট ১৯৮১
অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
এ—৬টি, ১৭, ২৪. ১২. ৮০.
॥ ১লা আগস্ট ১৯৮১ ॥
পত্রিকা ॥
ঘোষ ॥ সম্পাদিকা :
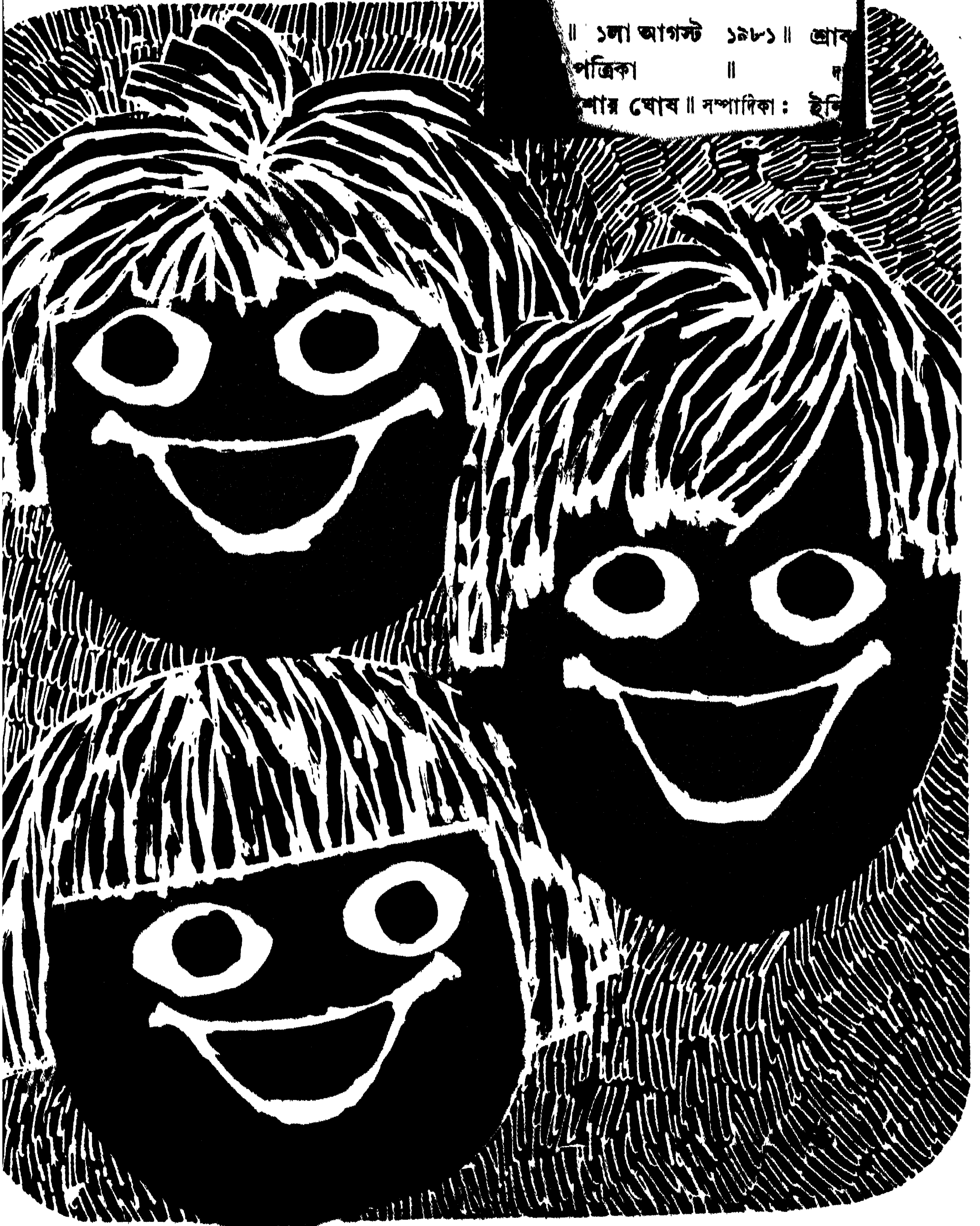
॥ বিজ্ঞাপনের হার ॥

মুদ্রিত জায়গার মাপ

পূর্ণ পৃষ্ঠা :—
১৪·৫ সি. এম × ২০ সি. এম
৬০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (হরাইজেন্টাল)
৯·৫ সি. এম × ১৪·৫ সি. এম
৩০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা [ভারটিক্যাল]
৭ সি. এম × ২০ সি. এম
৩০০·০০ টাকা

¼ পৃষ্ঠা :
৭ সি. এম × ৯·৫ সি. এম
১৭৫·০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৬৮৩ (১৬) টি-বি-সি/২এ—৬টি, ১৭, ২৪. ১২. ৮০.

৪র্থ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ১লা আগস্ট ১৯৮১ ॥ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮৮
ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা ॥ দাম : এক টাকা
প্রধান উপদেষ্টা : গৌরকিশোর ঘোষ ॥ সম্পাদিকা : ইন্দিরা রায়।

আমাদের কথা ☐ ২

গল্প ☐ এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ॥ অশোক কুমার সেনগুপ্ত ৫ পরিবর্তন ॥ নির্মাল্য হালদার ১২ প্রতিদান ॥ মানব নন্দী ১৮ ফাঁদ ॥ অভীক মুখোপাধ্যায় ২৯ সকালবেলার গল্প ॥ কুমার শংকর রায়শর্মা ৩১ ভুতুড়ে বাড়ি ॥ অনন্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ মুক্তির রূপকথা ॥ কণাদ মল্লিক ৩৭

প্রবন্ধ ☐ স্বাধীনতা দিবস ॥ অতুল্য ঘোষ ৩ আন্দামান অভিযানের ডায়েরী থেকে ॥ পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ১৫ কমলি আমার গাই ॥ সীমা গুহ ১৭ ভারতের চিত্রকলা ॥ অহিভূষণ মালিক ২৩ ডাকাবুকোদের কাহিনী ॥ সিন্ধবাদ ২৫ রথযাত্রা ॥ শ্যামল চক্রবর্তী ২৮ তীর্থের পথে ॥ বনানী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫ ভারতই মহাভারত ॥ শ্রীহর্ষ মল্লিক ৪৫ ঠাকুর দেবতার বাহন ॥ প্রণবেশ চক্রবর্তী ৪৭

কবিতা ☐ দাদাদের ফিস্টি ॥ আশিস চট্টোপাধ্যায় ২১ ইলিশ ॥ অলোক কুমার সাহা ২২ ছবি তুলতে নাকাল ॥ রঞ্জন ভাদুড়ী ২৪ গোবর্দ্ধন ॥ অমিত লাহিড়ী ২৪ হিতবাণী ॥ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ দাদুর ভুঁড়ি ॥ সোমা দে ৩৪ রাঁচী ॥ প্রীতম বাগচী ৩৪ সন্ধ্যাকালে ॥ পার্থদেব দত্ত ৩৬ আমরা ভারতবাসী ॥ কৌশিক ঘোষ ৩৬ বাণিজ্য ॥ প্রদীপ হালদার ৪১ জন্মভূমি ॥ সুব্রত দাস ৫২

ডাঃ বি, সি, রায় জন্মশতবর্ষ উৎসব প্রতিপালন ☐ ৪২

হাতের কাজ ☐ ৫১

খেলাধূলা ☐ কয়েকটি বিচিত্র ওভার বাউণ্ডারী ॥ দিলীপ দত্ত ৫৩ খেলার খোশ-খবর ॥ শ্রীকলমচি ৫৫

ধাঁধা ☐ ৫৬

প্রচ্ছদ ☐ পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের কথা

তোমরা খবরের কাগজে নিশ্চয়ই একটা আশ্চর্য খবর পড়েছ। আমেদাবাদে মৃণালিনী সরাভাই এবং তাঁর দর্পণা গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করলেন। আর সেই নৃত্যনাট্য বাঙ্গালোরের মহাকাশ যান কেন্দ্র ইস্রোর দপ্তরে বসে টেলিভিশনে দেখলেন একদল সাংবাদিক। কোথায় আমেদাবাদ আর কোথায় বাঙ্গালোর। কিছুদিন আগে বৃটেনের উইম্বলডনে টেনিস খেলায় যে ফাইনাল হয়ে গেল সেটা তক্ষুনি তক্ষুনি বোম্বাই আর দিল্লীর লোকেরা তাঁদের টেলিভিশনে চাবি ঘুরিয়ে দেখে ফেললেন।

কী করে এই সব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছে, ভাবলে আজ আর তোমরা আমাদের বুড়োদের মত একটু বিস্মিত হও না। জিজ্ঞাসা করলেই পট করে বলে দেবে, এ আর এমন আশ্চর্য কী। এ সব তো হচ্ছে বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ।

সত্যিই তোমরা যে যুগে জন্মেছ, আর এই বয়সে যত কিছু জেনে ফেলেছ, তাতে আমার তো তোমাদের দেখে রীতিমত হিংসে হয়। আমাদের ছেলেবেলায় রেলগাড়ি কি ইস্টিমার দেখলেই আমাদের বুকটা যে কত তোলপাড় করত, তা বোঝানো মুস্কিল। আমাদের যুবা বয়সে ওয়েন্ডল উলকি বলে একজন ভাবুক সাংবাদিক ছিলেন। তিনি এক পৃথিবী, তাঁর কথায়, ওয়ান ওয়ারলডের স্বপ্ন দেখতেন। আমরাও দেখতাম। রবীন্দ্রনাথও দেখতেন।

তখনকার কমিউনিস্টরাও, আজকের মত তখন তাঁদের বার রাজপুতের তের হাঁড়ি হয়নি, তখন ওরাও গাইত "ইনটারন্যাশনাল মেলাবে মানব জাত।" জাতের কথায় চণ্ডালিকার কথা মনে পড়ল। তোমরা শুনেছ তো রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের শিষ্য আনন্দের মুখ দিয়ে কী অসাধারণ বাণী প্রকাশ করে গিয়েছেন। চণ্ডালকন্যাকে তিনি বলেছেন, "যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।" সেই বাণী আমেদাবাদ থেকে বাঙ্গালোরের ইসরো মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে বহন করে নিয়ে গেল ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ "অ্যাপ্‌ল্"। এর পর ভারতের শহরে শহরে পৌঁছে যাবে আরও কত মহামানবের অনুপম সব মিলনের বাণী। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে আত্মীয়তাবোধ। আমরা বিজ্ঞানের কৃপায় দেখতে পাব আমাদের কত ভাই বোনের চেহারা। তাদের রীতি নীতি চালচলন আমরা জানতে পারব, বুঝতে পারব। চিনতে পারব। এমনি করেই একদিন এক প্রান্তের ভারতবাসীর অন্য প্রান্তের ভারতবাসীর মধ্যে ভাবের, প্রেমের আদান প্রদান হবে। এক বাণী উপলব্ধ হবে হৃদয়ে হৃদয়ে। "যে মানব আমি সেই মানব তুমি"।

এমনি একটা সম্ভাবনার দরজা আজ খুলে দিয়েছে প্রথম ভারতীয় বার্তাবাহী উপগ্রহ "অ্যাপ্‌ল্"। অ্যাপ্‌লের স্রষ্টা সেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জানাই আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

স্বাধীনতা দিবস

অতুল্য ঘোষ

প্রতি বছর আমবা ১৫ই আগস্টকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। সমগ্র দেশ ও জাতির কাছে স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ মানে আছে। এবারের 'স্বাধীনতা দিবস' আমাদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিধানচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যে 'স্বাধীনতা দিবস' আরও আকর্ষণীয় করে পালন করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে দেশের অধিবাসীদের জাতিব মঙ্গল ও কল্যাণ করাব পথ বন্ধ হয়েছে। এখন পুরোদায়িত্ব আমাদেরই হাতে। আমবা যেরকম খাটব, যেভাবে পরিকল্পনা নোব, এবং তাকে রূপায়িত করব, তারই ওপর জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করবে। অনেক নেতার মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, এত বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে, তবুও এখনও আমরা বিশেষ কিছু করতে পারিনি। কী কী তারা করতে চেয়েছিলেন, কী কী তারা পাবেন নি, এটা পরিষ্কার করে না বললে তাদের উক্তি বোঝা শক্ত। ন্যাশনাল ইনট্রিগেশনের কথাই ধরা যাক। অনেকেই এখন আক্ষেপ করেন যে জাতীয় সংহতির ব্যাপারে এখনও আমরা পিছিয়ে আছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, সমস্যা কি? তা কি সকলের কাছে পরিষ্কার? ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে এও যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে বর্তমান ভারতবর্ষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভাবতবর্ষ স্বাধীন হবাব পরই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যে ছ'শ পঁয়ত্রিশটি দেশীয় রাজ্য ছিল, তাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কথাই বলা হচ্ছে। রাজনীতিজ্ঞরা মাঝে মাঝে দেশীয় রাজ্যকে ভারতবর্ষের মধ্যে বলে ঘোষণা করতেন, বাস্তবিক তা ছিল না। যদি বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তৎকালীন প্রিন্সেপ ইণ্ডিযার কথা তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে আচার, ব্যবহার, জীবনযাত্রার প্রণালী, টাকাপয়সা প্রভৃতি সব ব্যাপারেই একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। ভারতবর্ষের ফ্ল্যাগ ছিল পরাধীনতার প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক। দেশীয় রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন জ্যাকের সঙ্গে রাজাদের নিজস্ব ফ্ল্যাগও ছিল। সারা ভারতবর্ষের মোটর গাড়ির নম্বর প্লেট একরকম, দেশীয় রাজ্যের নম্বর প্লেট আর একরকম হত। দেশীয় রাজ্যের একটা নিজস্ব ধারা ছিল, সেখানকার কৃতি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে ছুটি ঘোষিত হত। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে আলাদা রেললাইন ছিল, নিজস্ব মুদ্রা ছিল। তারা ইংরেজদের অধীনে ছিল বটে,

কিন্তু, ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির তার সঙ্গে কোন মিল ছিল না। বার্মাও তো ব্রিটিশ এম্পায়ারের অধীনে ছিল একই বড়লাট সর্বময় কর্তা ছিল। তাহলে কি বার্মাকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলতে হবে ?

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র অনুযায়ী এ সকল দেশীয় রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হল, তখন সে এক কঠিন অবস্থা। পশ্চিমবাংলার কুচবিহারে গেলে দেখা যাবে কুচবিহারের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের পার্থক্য। রাজপ্রাসাদ যেখানে ছিল, সেখানটি ছিল ছবির মত, বাকী অঞ্চল সম্পূর্ণ অনাদৃত ও অবহেলিত ছিল। বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। উড়িষ্যায় গেলে বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে ছটি জেলা ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যে সাতটি জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে উড়িষ্যা সরকার হয়েছে তাদের মধ্যে কত পার্থক্য। মানসিক ও আর্থিক বৈষম্য দূর করতে অনেক বছর সময়ের প্রয়োজন। সেইজন্যই যে এত বছর হয়ে গেছে কিছু করতে পারেন নি—তা নেতাদের শোভা পায় না। যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার রূপায়ণের যদি ত্রুটি হয়, তা অবশ্যই নিন্দাবহ। প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে সমস্যা সমাধানেব চেষ্টায় কখনও সমৃদ্ধি আসতে পারে না। 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'—কথা শুনতে খুব ভাল। কিন্তু আমরা কি তাই ছিলুম। ব্রিটিশ ভারতেব মধ্যে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের অনেক পার্থক্য।

যতটা নজর ইস্পাত তৈরি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিক্ষাপ্রসার, নতুন নতুন রাস্তা তৈরির বহুবিধ শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে, তার একশো ভাগের দশ ভাগও মানসিক ক্ষেত্রে বর্তমান ভারতবর্ষ যে এক এই বোধ জাগতে দেওয়া হয় নি। নেতারা যে সব বক্তৃতা দেন, সব বক্তৃতাতেই কত ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল কত তৈরি হয়েছে, কত কলকারখানা গড়ে উঠেছে, সে কথাই জোর দিয়ে বলেন, কিন্তু, ত্রিবান্দম, কোচিন এবং তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্য নিয়ে কেরল রাজ্য গড়ে উঠেছে, সে কথা ক'জন বুঝেছেন বা আগে যাকে রাজপুতানা বলা হত, এখন যাকে বলে রাজস্থান তার উদয়পুরের সঙ্গে জয়পুরেব কোন মিল ছিল না। আবাব উদয়পুরের সঙ্গে কোটার কোন মিল ছিল না, অথচ এ সমস্যাও খুব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য প্রতি বছর ১৫ই আগস্ট, এ সব জিনিস পর্যালোচনা করা দরকার, প্রকৃত সমস্যা বুঝতে পারলে তবেই তার সমাধান করা যায়, গোঁজামিল দিয়ে কোন সাফল্য অর্জন করা যায় না।

জন্মশতবার্ষিকীতে বিধানচন্দ্রের মত বহু বিষয়ে প্রতিভাশালী বাংলার সুসন্তানকে সামনে রেখে আমরা সব কিছু বোঝাবার চেষ্টা করি, তাহলেই স্বাধীনতা দিবসের যথার্থ মূল্য দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে এ কথা মনে রাখতে হবে—বিধানচন্দ্র বাল্যকালে অতি সাধারণ স্তরের ছিলেন। নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টায় জীবনকে সার্থক করে তুলতে পেরেছিলেন। বিধানচন্দ্রকে পশ্চিমবাংলার রূপকার বলে। বিধানচন্দ্র সমস্ত সমস্যা বুঝে তার খুঁটিনাটি বিচার করে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন, কোথাও এতটুকু গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করেন নি, সেই কারণেই তাঁর পক্ষে নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ গড়া সম্ভব হয়েছিল। স্বাধীনতা দিবসে আমরা ভারতবাসী, ভারতের সকল সমস্যা আমাদের সমস্যা এই বোধ নিয়ে যদি আগ্রহ দেখাই, ও সমাধানের চেষ্টা করি, তবেই ১৫ই আগস্ট সার্থকভাবে পালন করা হবে।

জন্মদিনের উপহার

আনন্দ তার বোন শীলাকে নিয়ে মেলায় এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে এক বেদে কুকুরছানা বিক্রি করছে।
-ইস্, কি মিষ্টি আমি এটা কিনবো।
-মাত্র ১০০ টাকা।

ওরা ভেঙ্গে পড়লো।
-আমাদের যে মাত্র ৫ টাকা আছে চলো শীলা- কাঁদেনা। দেখো, এবারে তোমার জন্মদিনে আমি তোমায় একটা কুকুরছানা দেবই দেবো।

ঐ দিনই আনন্দ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো-
-বাবা, শীলার জন্মদিনে উপহারের জন্যে আমি কিছু জমাতে চাই। কি ভাবে জমাই বলো তো।
-খুব সোজা। রোজ একটু করে জমাও। আমি ইউকোব্যাঙ্কে তোমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেবো।

-ইউকোব্যাঙ্ক! আমি যা জমাবো, তা কি ওরা নেবে? সে তো খুবই কম।
-নিশ্চয়ই নেবে। নিয়মিত জমিয়ে যাও, বছরের শেষে দেখবে অনেক জমেছে।

United Commercial Bank
সেদিন থেকেই আনন্দ জমাতে শুরু করল।

শীলার জন্মদিনের ঠিক আগে আনন্দ তার পাশবই বাবাকে দেখায়।
-বাবা, ব্যাঙ্কে আমার ১৫০ টাকা জমেছে। এইবারে নিশ্চয়ই শীলাকে কুকুরছানা কিনে দিতে পারবো।
-চমৎকার!

জন্মদিনের সকাল
-আনন্দকে ধন্যবাদ দাও। তোমাকে এই কুকুরছানা কিনে দেবার জন্যে সে তার হাত খরচ থেকে এ টাকা জমিয়েছে।

-শীলার আজ ভারী আনন্দ কিন্তু সেটা তো ইউকোব্যাঙ্কের জন্যেই

ভৌ! ভৌ!

এলিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড
লুইস ক্যারল

শুঁয়োপোকার উপদেশ
পাঁচ

অনুবাদক: অশোককুমার সেনগুপ্ত

এলিসের সঙ্গে শুঁয়োপোকার চোখাচোখি হল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ দুজনের দিকে চেয়ে রইল। শেষে শুঁয়োপোকা মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা বের করে ঘুম-জড়ান অলস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

শুঁয়োপোকার হাবভাব পরিচয় শুরু করাব পক্ষে মোটেই উৎসাহদায়ক নয়। এলিস একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আমি—আজ্ঞে—মানে, আমি নিজেই ঠিক জানি না—আজ সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম তখন আমি কে ছিলাম বলতে পারি। কিন্তু তখন থেকে বেশ কয়েকবাব আমি বদলে গিয়েছি।'

শুঁয়োপোকার সুর পালটে গেল। এবার বেশ কড়া মেজাজে বলল, 'তার মানে? ব্যাখ্যা কর।'

এলিস বলল, 'আজ্ঞে, ব্যাখ্যা করা শক্ত। আমি আর আমি নেই।'

'বুঝলাম না।'

'আজ্ঞে, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না তো বোঝাব কি? একদিনের মধ্যে এতবার আয়তন বদলে যাওয়াটা বড়ই গোলমেলে।'

'এতে আবার গোলমাল কি?'

'আজ্ঞে, এখনও আপনি সেটা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু একদিন তো আপনি শুঁয়ো থেকে গুটি হবেন আর তারপর গুটি থেকে প্রজাপতি, তখন কি আপনার একটু কি রকম কি রকম লাগবে না?'

'মোটেই না।'

'তা আপনার ভাবগতিক হয়ত একটু আলাদা রকমের। আমার কিন্তু এটা বড় অদ্ভুত মনে হয়।'

আমার মানে? আমি—'মানে, তুমি—কে?' শুঁয়োপোকার কণ্ঠে এবার বেশ তাচ্ছিল্য।

ঘুরে ফিরে আবার সেই শুরুর প্রশ্নেই ফিরে আসা। এলিস বেশ বিরক্ত হল। সে কথা বলে যাচ্ছে আর শুঁয়োপোকা শুধু ছোট ছোট মন্তব্যেই তার কাজ সারছে এতে সে আরও খাপ্পা হল। বেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'আগে বলুন আপনি কে।'

'কেন ?'

মহা মুস্কিল। এলিস এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেল না। শুঁয়োপোকার মেজাজ ও রকম-সকম দেখে সে পিছন ফিরে চলে যেতে লাগল।

শুঁয়োপোকা ডাকল, 'ফিরে এস। তোমাকে একটা জরুরী কথা বলার আছে।'

এটা আশার কথা। এলিস ফিরে এল।

শুঁয়োপোকা বলল, 'কখনও মেজাজ খারাপ করো না।'

এলিস দাঁতে দাঁত দিয়ে কোনরকমে রাগ চেপে বলল, 'ব্যস, এই কথা ?'

'না।'

এলিস ভাবল, কিছু তো করার নেই, একটু বরং অপেক্ষা করা যাক। আর শুঁয়োপোকা হয়ত কোন দরকারী কথাও বলতে পারে,. কে জানে। কিছুক্ষণ শুঁয়োপোকা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টেনেই চলল, তারপর এক সময়ে গড়গড়ার নল সরিয়ে রেখে মুখ খুলল, 'তা হলে তোমার ধারণা তুমি বদলে গিয়েছ ? তাই না ?'

এলিস বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। যা সব পড়েছিলাম কিছু মনে করতে পারি না, আর তা-ছাড়া একসঙ্গে দশ মিনিটও এক সাইজের থাকছি না।'

'যা সব পড়েছিলাম মানে ? কি সব ?'

'এই ধরুন "ছোট্ট ছানা" কবিতাটি আমি আবৃত্তি করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বলার সময়ে কথাগুলো সব বদলে গেল।' এলিসের কণ্ঠ বড়ই করুণ !

'আচ্ছা, "বুড়ো বাপ" কবিতাটা আবৃত্তি কর তো।'
এলিস হাত মুড়ে পড়া বলার ভঙ্গীতে শুরু করল :

বাপকে ডেকে বললে তাকে জোয়ান মর্দ ছেলে,
'বৃদ্ধ তুমি, চুলগুলি আব নেই তো মোটেই কালো,
অহর্নিশি শীর্ষাসনে করছ অবহেলে,
কারণটা কি ? এই বয়সে এই করা কি ভালো ?'

বাপ বললে, 'বয়স যখন ছিল আমার অল্প,
বলত লোকে শীর্ষাসনে মগজ হবে ভোঁতা।
এখন জানি সে সব নিছক ভয়-দেখান গল্প,
ভোঁতা হবার কই অবকাশ, মগজ আমার কোথা ?'

'বলেছি তো বৃদ্ধ তুমি,' আবার বলে ছেলে,
'আর তা ছাড়া শরীর তোমার হাতির মত মোটা,
তবু সেদিন দোরগোড়াতে ডিগবাজি যে খেলে—
বুঝিয়ে বল কেমন করে করলে তুমি ওটা।'

'হাত পা আমি সারা জীবন রেখেছি ঝর ঝরে,'
বৃদ্ধ বলে নেড়ে তাহার পাকা চুলের ঝুঁটি,
'এক টাকাতে এক শিশি এই মলম মালিশ করে,
কাজ না হলে মূল্য ফেরত, কিনবে নাকি দুটি?'

ছেলে বললে, 'বৃদ্ধ তুমি, এই বয়সে কারো
চর্বি কিংবা মেটে ছাড়া খাওয়া কঠিন ভারি,
খাচ্ছ গোটা হংস কোন অংশ নাহি ছাড়,
এমন শক্তি কোথায় পেল বল তোমার মাড়ি।'

বাপ বললে, 'আইন পড়েছি আমি বয়স কালে,
হারিয়ে দিতাম সূক্ষ্ম জটিল তর্কে গৃহিনীকে,
শক্ত চোয়াল সেই যে হল কঠিন বাক্যজালে
তার ফলে আজ মণ্ড বানাই রাজহংসটিকে।'

'বৃদ্ধ তুমি, বললে ছেলে, 'তাই তো প্রশ্ন জাগে,
চোখের দৃষ্টি যখন কিছু ঘোলা হওয়ার কথা,
কি কৌশলে দাঁড় করালে নাকের অগ্রভাগে
লতার মত পাঁকাল মাছটি? কোন দেশের এ প্রথা?'

বাপ বললে, 'ঢের হয়েছে, এবারে দাও ক্ষান্ত,
অনেক বকা বকলে বাছা, বকছ খালি মিছে,
তোমার কেন-র জবাব দিতে শরীর হল ক্লান্ত,
এবার লাথি মারব এমন গড়িয়ে যাবে নীচে।'

শুঁয়োপোকা বলল, কবিতাটি তো এ রকম ছিল না।'

এলিস আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে না, ঠিক এ রকম ছিল না। কতগুলি শব্দ বদলে গিয়েছে।' শুঁয়োপোকা বেশ কঠিন স্বরে বলল, 'আগাগোড়াই বদলে গিয়েছে।' কয়েক মিনিট আর কেউ কোন কথা বলল না।

তারপর শুঁয়োপোকাই আবার মুখ খুলল, 'তুমি কি মাপের হতে চাও?'

এলিস সোৎসাহে বলে উঠল, 'আজ্ঞে, মাপ যা হয় একটা হলেই হল। আসলে বারে বারে মাপ বদলে যাওয়াটা ভাল লাগে না বুঝতেই তো পারছেন।'

শুঁয়োপোকা বলল, 'না বুঝতে পারছি না।'

এলিস আর কিছু বলল না। সারা জীবনেও তার প্রতি কথায় এরকম কেউ প্রতিবাদ করে নি। তার বেশ রাগ হচ্ছিল।

শুঁয়োপোকা বলল, তুমি কি এখনকার মাপে খুশি?'

এলিস বলল, 'আজ্ঞে, আর একটুখানি বড় হলে ভাল হত। তিন ইঞ্চি কোন উচ্চতাই নয়।'

শুঁয়োপোকা রেগে সোজা হয়ে দাঁড়াল (দেখা গেল তার উচ্চতা ঠিক তিন ইঞ্চি)। বলল, 'তিন ইঞ্চিকে তুচ্ছ করছ? এটা খুবই ভাল মাপ।'

এলিস করুণভাবে নিবেদন করল, 'আজ্ঞে আমার তো অভ্যেস নেই, তাই।' মনে মনে ভাবল, 'জীবজন্তুদের মেজাজ এত সহজেই বিগড়ে যায় কেন?'

'আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে,' এই বলেই শুঁয়োপোকা আবার গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে তামাক টানতে লাগল।

এবারে এলিস শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন আবার শুঁয়োপোকা কথা বলে। দু এক

মিনিট পরেই সে নলটা মুখ থেকে বের করে দু একবার হাই তুলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তারপর ব্যাঙের ছাতা থেকে নেমে ঘাসের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, 'এক দিকটা খেলে লম্বা হবে, আরেক দিকটা খেলে বেঁটে।'

'কিসের একদিক? কিসের আরেক দিক?' এলিস ভাবতে লাগল।

এলিস যেন প্রশ্নটা তাকে শুনিয়ে জোরেই করেছে এমনভাবে শুঁয়োপোকা জবাব দিল, 'ব্যাঙের ছাতার।' বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এলিস ব্যাঙের ছাতার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল এর আবার এদিক ওদিক কি, এটা তো গোল। ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে শেষকালে সে তার ছোট দু হাত যতদূর যায় বাড়িয়ে ব্যাঙের ছাতা থেকে দু'হাতে দু'টুকরো ভেঙে নিল।

সে নিজের মনেই বলল, 'এর কোনটা কোন দিকের?' পরীক্ষা করার জন্য সে ডান হাতের টুকরোটা থেকে একটুখানি কামড়ে নিয়ে চিবোতে লাগল। পর মুহূর্তেই তার থুতনিতে এক জোর ধাক্কা লাগল। আসলে থুতনিটা পায়ের পাতার সঙ্গে লেগে গিয়েছে।

কাণ্ডটা এমন হঠাৎ ঘটল যে এলিস ভয় পেয়ে গেল। সে দ্রুত ছোট হয়ে চলেছে। সে বুঝল যে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না। সে তাড়াতাড়ি বাঁ হাতের টুকরোটাতে কামড় লাগাতে গেল। পায়ের সঙ্গে থুতনি এমন সেঁটে গিয়েছে যে মুখ খোলাই মুস্কিল। যা হোক, অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কোনরকমে এক কামড় লাগাতে পারল।

এলিস আনন্দে নেচে উঠল। 'যাক বাবা, মাথাটা তা হলে ছাড়া পেল—যে রকম পায়ের পাতার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল, বাব্বাঃ।' কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বিপদ। তার কাঁধ অদৃশ্য। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে যতদূর চোখ যায় শুধু গলা। গাছের পাতাগুলি অনেক অনেক নীচে আর তার ভিতর থেকে তার গলাটা সোজা ফুঁড়ে বেরিয়েছে উপরের দিকে।

এলিস ভাবল, 'নীচের ওই ঢেউ-খেলান সবুজ কিসের? আর আমার কাঁধই বা কোথায় গেল? আর আমার হাত? হায়, হায়, ওগো আমার হাত দুখানি, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে হাত দুখানি নাড়াচাড়া করল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না, শুধু নীচের সবুজ সাগরে আরও কিছু ঢেউ খেলে গেল।

না, হাত দুটোকে যখন মুখের কাছে আনাই যাবে না, তখন মুখটাকেই নামিয়ে হাতের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক। এলিস সেই চেষ্টাই করল। বাঃ, গলাটা তো বেশ সাপের মত এঁকেবেঁকে যে কোন দিকেই যেতে পারছে। সে গলাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবুজ ঢেউগুলির কাছে নামিয়ে আনল; দেখল, সে এতক্ষণ, যে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করেছে ওই সবুজ ঢেউগুলি সেই জঙ্গলেরই গাছগুলির মাথা। গলাটাকে বেঁকিয়ে গাছগুলির ফাঁক দিয়ে মুখটা আরও নীচে নামিয়ে আনতে যাবে, হঠাৎ একটা হুস হুস শব্দ শুনে থমকে গেল। একটা বিরাট পায়রা তার মুখের কাছে উড়ে এসে মুখের উপর ডানার ঝাপটা মারছে।

পায়রাটা চেঁচিয়ে উঠল, 'সাপ !'

এলিস রেগে গেল। 'আমি মোটেও সাপ নই। আমাকে ছেড়ে দাও।'

পায়রা বলল, 'একশবার সাপ!' হঠাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'সব রকম করে দেখেছি, কিছুতেই রেহাই নেই।'

এলিস বলল, 'কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পায়রা এলিসের কথায় কান না দিয়ে বলে যেতে লাগল, 'গাছের গোড়ায়, পুকুরের পাড়ে, ঝোপের ধারে, সব জায়গায় চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু এই সাপগুলোর হাত থেকে কিছুতেই রেহাই নেই।'

এলিস মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। সে চুপ করে রইল। পায়রার বকবকম শেষ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলে লাভ নেই।

পায়রা বলে চলল, ডিমে তা দেওয়াই কি কম ঝামেলা? তার উপরে এই দিনরাত পাহারা দেওয়া—কখন সাপ আসে, কখন সাপ আসে। আজ তিন সপ্তাহ ধরে দু' চোখের পাতা এক করতে পারি নি।'

এইবারে এলিস পায়রার কথার মানে কিছু কিছু বুঝতে পারছে। বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত যে তোমাকে বিরক্ত করেছি।'

পায়রা হাঁউমাঁউ করে বলল, 'বনের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু গাছটা বেছে নিয়ে ভাবছি এইবারে আর ভয় নেই, তাও দেখি আকাশ থেকে এঁকেবেঁকে নেমে এলে তুমি সাপ।'

'কিন্তু আমি সত্যিই সাপ নই, বিশ্বাস কর। আমি—'

'তুমি কি? একটা কিছু বানিয়ে বলার চেষ্টা করছ তো?'

'আমি—আমি একটা ছোট্ট মেয়ে।' কথাটা এলিসের নিজের কানেই কেমন যেন লাগল। সত্যি, সে কি? সারা দিনে কতবার যে বদলে গিয়েছে।

পায়রা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'বেশ গল্প ফেঁদেছ যা হোক? আমি অনেক ছোট্ট মেয়ে দেখেছি। তাদের গলা কি এইরকম হয়? তুমি সাপ, যতই অস্বীকার কর আর বানিয়ে বানিয়ে যতই যা বল। এরপর হয়তো বলবে জীবনে কোনদিন ডিমই খেয়ে দেখ নি, তাই না?

এলিস তো কখনও মিথ্যে কথা বলে না, তাই সে বলল, 'তা কেন? ডিম খেয়েছি বই কি। তা ডিম তো শুধু সাপেরা খায় না। ছোট মেয়েরাও খায়।'

পায়রা বলল, 'বাজে কথা। আর তারা যদি তা খায় তবে তাদেরও একরকমের সাপই বলতে হবে।'

আজব কথা। এলিস চুপ করে রইল। পায়রা বলে চলল, 'তুমি যে এখানে ডিম চুরি করতে এসেছ সে কথা আমি বেশ ভাল করেই জানি। তুমি ছোট মেয়ে না সাপ তাতে আমার ভারি বয়েই গেল।'

এলিস বলল, 'তোমার বয়ে না গেলেও আমার যায়। যাই হোক, আমি মোটেও ডিম চুরি

করতে আসি নি। আর তা যদি আসতামও তো তোমার ডিম নিতাম না আমি, কাঁচা ডিম খাই না।'

বিরস মুখে 'তাহলে কেটে পড়' বলে পায়রা তার বাসায় ঢুকে গেল। এলিস আবার মাথাটা নীচু করতে গেল, কিন্তু গাছের ডালপালায় বারেবারেই তার গলা জড়িয়ে যাচ্ছে আর থেকে থেকেই তাকে থামতে হচ্ছে তা ছাড়িয়ে নেবার জন্য। তার মনে পড়ল ব্যাঙের ছাতার টুকরো দুটি তার দুহাতে এখনও আছে। খুব সাবধানে গলা বাঁচিয়ে মাথাটা আস্তে ঝুঁকিয়ে শেষপর্যন্ত হাতের কাছে নিয়ে এল। তারপর একবার এ হাতের টুকরোতে এক কামড়, একবার ও হাতের টুকরোতে এক কামড়—বারে বারে এই রকম করতে করতে একবার বড় একবার ছোট হতে অনেকক্ষণের চেষ্টায় অবশেষে একসময়ে সে নিজের স্বাভাবিক মাপে এসে পৌছল।

এতক্ষণ ধরে ছোটবড় নানা মাপে থেকে এখন ঠিক মাপটাই এলিসের কাছে কেমন অদ্ভুত লাগছিল। যা হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এটাই স্বাভাবিক মনে হতে লাগল। সে আবার আপন মনে বকবক শুরু করল, যাক, আমার পরিকল্পনার অর্ধেক তো হাসিল হল। বাব্বা, এত ঘন ঘন মাপ বদলান কি কম ঝকমারি। কখন যে কিরকম হয়ে যাব বোঝাই মুস্কিল। এবার নিজের মাপে পৌছে গিয়েছি—বাঁচা গেল। এখন বাকি রইল ওই সুন্দর বাগানটায় পৌছন। কি করা যায়?'

এই বলতে বলতেই এলিস দেখে তার সামনে খানিকটা খোলামেলা জায়গা—বন কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। আর সেখানে চার ফুট মত উঁচু ছোট একটা বাড়ি। এলিস ভাবল, 'এই ছোট্ট বাড়িতে যারাই থাকুক না কেন, এ মাপে তাদের সামনে যাওয়া চলবে না—বেচারারা ভয়ে চুপসে যাবে।' এই ভেবে সে আবার ডান হাতের ব্যাঙের ছাতার টুকরোতে এক কামড় লাগাল। নিজেকে ন ইঞ্চি করে নিয়ে তবে সে বাড়িটার দিকে এগোল।

[ক্রমশঃ]

যেখানে দেখবে রয়েছে মহৎ পরিণাম, সেখানেই জানবে নিশ্চয়ই রয়েছে মহান আরম্ভ। যেখানে বিকট মর্মন্তুদ ধ্বংস দেখে তোমার মন বিহ্বল, সেখানে তাকে এই সান্ত্বনা দিও যে, এক বৃহৎ, মহান সৃষ্টি আসন্ন।

—শ্রী অরবিন্দ

পরিবর্ত্তন

নির্মাল্য হালদার (সভ্য, সিনিয়র)

সেদিনটা ছিল রবিবার।

বিশুর সেদিন জন্মদিন। এগারো পূর্ণ হয়ে বারোয় পড়বে।

সকালবেলা থেকেই বিশুর আনন্দের শেষ ছিল না। মাসি-মেসো এসেছে। মামা আসবে। ও কিন্তু আগেই ওর প্রিয় বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে ফেলেছিল, আর বিকেলবেলা ওরা সবাই আসবে বলে কথাও দিয়েছিল।

বিশু অন্যান্য দিন বাড়িতে কি রান্না হল—এর খোঁজ খবর খুব কমই রাখত। কেবল খাওয়ার সময় দেখতে পেত কি রান্না করেছে ওর মা। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। সেদিন কিন্তু ওর অন্য রকম ব্যাপার। বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল, মা যে রকম তরিতরকারী ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে বলে দিয়েছিলেন বাবাকে মনে করিয়ে দিয়ে সব নিয়ে এসেছিল।

তখন বেলা ন'টা। বিশু জলখাবার খেয়ে ভাবছে কি করা যায়। না—আজকে যে ওর মা-বাবা ওকে পড়তে বসতে বলবে না, এটা ও জানে। তাই ত মনে মনে খুব খুশি। আর কেনই বা হবে না? ও তো জানে যে ওর জীবনের লক্ষ্য কেবল মাত্র পড়াশুনা নয়, অন্যরকম কিছু। 'জীবনের লক্ষ্য'
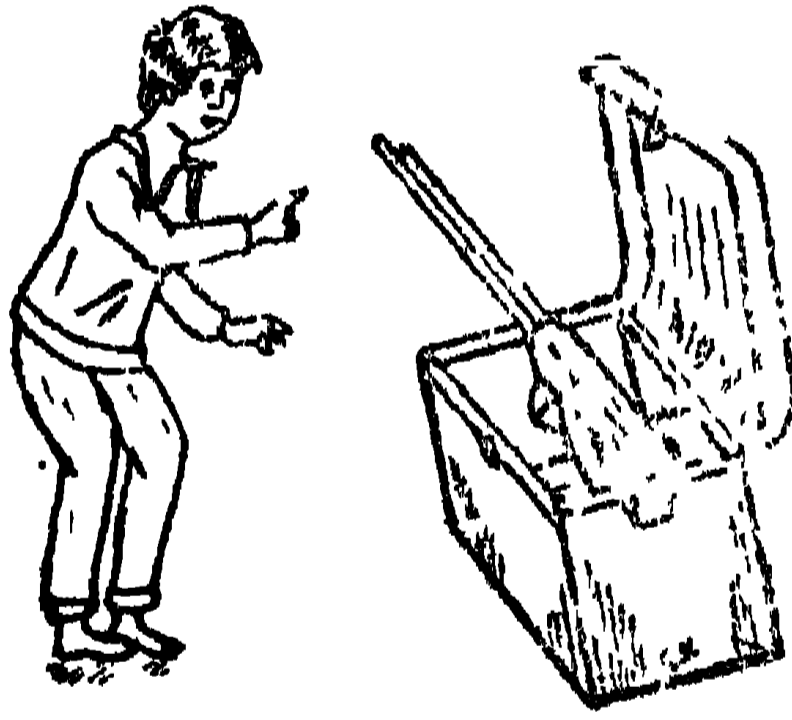
কথাটা মনে হতেই ও উঠে পড়ে যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় একটা বাক্সের কাছে। ঐ বাক্সটায় একটা বন্দুক আছে। তবে সত্যিকারের নয়, খেলনা বন্দুক। পুরোটা পিতলের তৈরি। বিশু বাক্স খুলে ওটা হাতে তুলে নেয়। বন্দুকটা দেখে আর ভাবে কী সুন্দর বন্দুক আর নকল হলেও মডেলটা একেবারে আসলের মতন। ঐ টা দেখিয়ে অনেককেই ভয় দেখান যায়।

কিন্তু বন্দুকটা ও কোথা থেকে পেল সেটা বলে রাখা দরকার। বন্দুকটা দিয়েছিল ওর মামা দিদির জন্মদিনে। কিন্তু দিদির ওটা বিশেষ পছন্দ নয়। তাই দিদি বিশুকে বন্দুকটা দিয়ে

দিয়েছে। বিশু বন্দুকা টেপলেও মনে কিন্তু একটু খুঁত রয়ে গেছে কেন না, মামা যদি সরাসরি ওকে বন্দুকটা দিত তবে ও আরও খুশি হত।

বিশু প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে নানারকম খেলা খেলে থাকে, কিন্তু এর মধ্যে চোর পুলিস খেলা খেলতে ও খুব ভালোবাসে। বিশেষতঃ পুলিস সেজে চোরদের ধরে শাস্তি দিতে পারলে ওর খুব আনন্দ। ও কিন্তু চোর সেজে শাস্তি পেতে নারাজ।

ও মাঝে মাঝে ভাবে যে পুলিসেরা কত বুদ্ধি খাটিয়ে চোরেদের গোপন আস্তানায় হানা দেয়, তারপর চোরদের ধরে আনে, তাদের শাস্তি দেয়, কত খুনের তদন্ত করে, তারপরে এইসব সাহসিকতার জন্য অন্যান্য লোকেরা কত প্রশংসা করে তাদের। ও কিন্তু এটাই বিশ্বাস করে যে, পুলিসেরা কখনই চোরেদের কাছে পরাস্ত হয় না, আর পরাস্ত হবেই বা কেন? পরাস্ত হলে তো পুলিসেরা লোকের প্রশংসা পাবে না। এইসব নানান কথা চিন্তা করে ও ঠিক করেছে যে, বড় হয়ে পুলিস কনস্টেবল হবে।

একদিন হয়েছে কি—ও ওর দিদির কাছে কথায় বথায় ওর জীবনের লক্ষ্যটা বলে ফেলেছে। এই না শুনে দিদির কি হাসি। একেবারে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। এটা দেখে ওর কিন্তু সেদিন ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিল দিদিটা ভীষণ বোকা। সবারই কি জীবনের লক্ষ্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা প্রোফেসার হওয়া? অন্য কিছু হতে নেই? আর সেই শুনেই বা এত হাসি কিসের?

ও ঠিক করল যে বন্ধুদের নিয়ে চোর-পুলিস খেলবে সেদিন। ও কিন্তু বন্ধুদের এতদিন বন্দুকটা দেখায় নি আর ওটা সম্বন্ধে কোন কথা বলে নি। সেদিনই ও ভাবল যে বন্ধুদের ওটা দেখাবে। বন্দুকটা যথাস্থানে রেখে দেয় ও।

বাড়িতে মাসির ছেলে শান্ত এসেছিল, ওকে নিয়ে ও পাশের বাড়িতে মুন্নু থাকে তার কাছে গেল। মুন্নু বিশুর প্রিয় বন্ধু। এছাড়া আছে পাশের ব্লকের বাপী আর বুবাই। এরাও ওর প্রিয় বন্ধু। বন্ধুদের চোর পুলিস খেলার প্রস্তাব দিতেই ওরা মেনে নিল। কিন্তু যে সমস্যা ওদের প্রতিদিনের, সেই সমস্যা দেখা দিল। বাপী জিজ্ঞাসা করল, 'বন্দুক পাবি কোথায়?' বিশু বলে, 'ওসবের চিন্তা নেই, এমনিই খেলা যাবে।' মনে মনে ওর কিন্তু হাসি পেয়ে যায়। যাই হোক খেলা শুরু হল। বাপী আর বিশু হল পুলিস। আর বুবাই, মুন্নু আর শান্ত চোর। খেলা চলাকালীন ও একবার বাড়ি গিয়ে ঢোকে। ঢুকে ও যে জায়গায় বন্দুকটা রেখেছিল সেইখানে গিয়ে বন্দুকটা নিতে যাবে—কিন্তু এ-কি? বন্দুকটা তো নেই? বিশু চারিদিকে ভালো করে খুঁজতে থাকে। কিন্তু না। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা ভীষণ গোলমালে বলে মনে হয় ওর। ও ভালো করে চিন্তা করতে থাকে শেষবার সে কোথায় বন্দুকটা রেখেছিল। কিন্তু যতদূর ওর মনে পড়ে ও ঠিক জায়গায়ই রেখেছিল বন্দুকটা। তাহলে গেল কোথায়? বন্দুকটার 'ত আর হাত-পা নেই যে হেঁটে

চলে যাবে? তবে। ও বাড়িতে কাউকে কিছু না বলেই বাইরে বেরিয়ে যায়। বন্ধুদেরও কাউকে কিছু বলে না।

ওদিকে বাপী ওকে খবর দিল যে চোরেরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুঠ করে পালিয়ে গেছে। বাপী আর বিশু ওদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তিনজনকে দেখতে পায় যে, ওরা টাকা ভাগাভাগি করছে এক জায়গায় বসে। আসল টাকা কিন্তু নয়, সবই কাগজ। আর ব্যাঙ্কও হল যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয় তারই পাশের একটা ঘর মত সেটা। ওরা চুপি চুপি গিয়ে যেখানে ওরা টাকা ভাগ করছিল, সেখানে বুবাই আর মুন্নুকে দুজনে ধরে ফেলে। শান্ত এই অবস্থায় এক লাফ দিয়ে দূরে সরে যায়, আর বিশুর বন্দুকটা বার করে গম্ভীর গলায় বলে 'ওদের ছেড়ে দাও নইলে তোমাদের দুজনের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।' এই ঘটনায় বিশুর বন্ধুরা এবং বিশুও হতবাক হয়ে যায়। বাপী বিশুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বিশু কিন্তু তখন খুব রেগে গেছে শান্তর উপর। ও ভেবে পায় না যে কি করবে তখন। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে শান্তর জামা টেনে ধরে। হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বন্দুকটা। বিশু চোরের কাছে হেরে যাওয়ার ঘটনাটা নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করে ও শেষ পর্যন্ত শান্তকে মেরে বন্দুকটা কেড়ে নেয়।

এদিকে শান্ত মার খেয়ে ওর মায়ের কাছে এসে বলে যে বিশু ওকে মেরেছে। তখন বিশুর মা বিশুকে ডেকে পাঠায়। বিশু যেই বাড়িতে ঢোকে অমনি ওর মা ওর হাতটা চেপে ধরে, বলে 'শান্তকে কেন মেরেছিস?' বিশু বলে, 'ও আমার বন্দুক কেন নিয়েছিল?' ওদিকে শান্ত বলে ওঠে: 'বারে! তুই-ই ত বললি যে চোর পুলিস খেলবি আর আমাদের চোর বানিয়ে তুই আর বাপী পুলিস সাজলি। তা, আমি তোর বন্দুকটা চুরি করেছিলাম।' তখন বিশু বলে, ওঠে, 'সেই জন্যেই তো আমি তোকে মেরে বন্দুকটা কেড়ে নিয়েছি।'

যাই হোক তখনকার মত সব মিটমাট হয়ে যায়। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা বিশুর মামা, অন্যান্য বন্ধুরা সবাই এসেছিল। কিন্তু বিশু সেদিন আর তেমন আনন্দ করতে পারে নি। ওর খালি মনে হচ্ছিল বন্দুকটা যদি সত্যিকারের হত তাহলে ত তার কিছু করার ছিল না। আর ও ত তাহলে পরাজিত হয়ে যেত। সাহসিকতার প্রশংসা ত পেতই না, উল্টে প্রাণহানি ঘটে যেত? চোরের কাছে পুলিসের হার এ ব্যাপারটা যেমনই অপমানজনক, তেমনি লজ্জাকরও বটে।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। ওর জীবনের লক্ষ্য এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ও আর বড় হয়ে পুলিস হতে চায় না। এই ঘটনায় বিশুর বাবা-মা কিন্তু খুব খুশি।
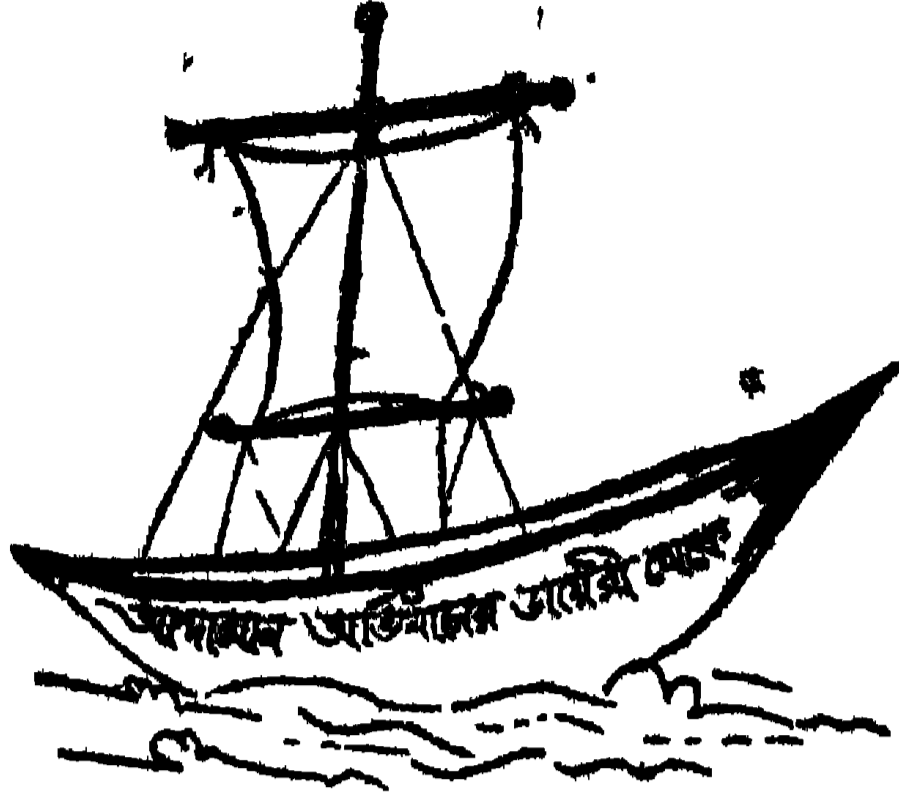
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

Lat 20° Long 13″ সে আজকের কথা নয়, ১৯৬৯ সাল। এখন চারধারে নীল আর সাদা ফেনা। আংগ্রে ভেসে চলেছে, আপন মনে হেলে দুলে।

নৌকোর আরোহী আমি আর ইণ্ডিয়ান নেভীর জর্জ এ্যালবার্ট। টুকরো টুকরো কথা মনে পড়ছে এখন। আজকের এই অভিযানে আমার জড়িয়ে পড়ার কথা, বাড়ির কথা, আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় অনাত্মীয়দেব উপদেশ, উৎসাহ, বাধা দেবাব কথা।

সে দিনটা আমার আজও মনে আছে। খবরের কাগজের পাতায় বিখ্যাত সাঁতারু মিহির সেনের আহ্বান। দাঁড়ের নৌকায় আন্দামান যাও সব ডাক, সাহসী বাঙালী ছেলেদের জন্য আহ্বান।

অনেক আশায় বুক বেঁধে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তা মিহিরদার অফিস একসপ্লোরার ক্লাবে। কিন্তু সেই নিদারুণ কথা আজও মনে আছে। আমার সব কথা শুনে এক ঘর পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে হেসে উত্তর—খুব ভাল কথা। আপনি লেকে রোয়িং করতে জানেন, কিন্তু সমুদ্রে কি পারবেন?

কেন আমি পারব না? ভীরুতা, কাপুরুষতা ছাপিয়ে জন্ম নিল আত্মবিশ্বাসের ভাষা। মরতে যদি হয় কোনদিন, কি এসে যায় আজকে কিংবা কালকে।

১৯৬৫ সাল। ফিজিওলজি নিয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ছি। রোয়িংটাও ইতিমধ্যে সড়গড় হয়ে এসেছে। তারপরে ১৯৬৭ সাল। শুনলাম মিহির সেনের ডাক—দাঁড় টানা নৌকায় আন্দামান যেতে হবে। ব্যাপারটা আমাকে খুব একটা নাড়া দেয় নি, কিন্তু হঠাৎ কিছু বিপরীত চিন্তা এসে আমাকে নাড়া দিয়ে গেল। সময় চলে যাচ্ছে কে জানে আর কোনদিন এ সুযোগ আসবে কিনা। তাই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। মিহির সেনের ফোন নম্বর যোগাড় করে ফোন করলাম। আমার কথা সব শুনে একসপ্লোরার ক্লাবে আমায় দেখা করতে বললেন।

এতদূর পর্যন্ত এক নাগাড়ে কাজ করে গেছি। ভাবার সময় ছিল না। এবার একসপ্লোরার ক্লাবে যাবার নামে কেমন যেন বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে চাপা উত্তেজনায়। সময়কে আটকে রাখা যায় না। একদিন এক সন্ধ্যেতে বেরিয়ে পড়ি দেখা করার সময়ের অনেক আগেই। বাস থেকে নির্দিষ্ট স্থানে

নামার অনেক আগে নেমে পড়ি, কারনানি স্টেটের পথ ধরি। হঠাৎ মনে হল আমি যদি সত্যি সুযোগ পাই ?-তা হলে ? গাটা শির শির করে ওঠে।

একসপ্লোরার ক্লাব—কারনানি স্টেটের তিন তলার এক ক্লাব ঘরে দু'তিনজন বসে আছেন। আলাপ হল অসিতব সঙ্গে, নাড়ুর সঙ্গে। এঁরা সব উৎসাহী ক্লাব-মেম্বার। মিহিরবাবু তখনও আসেন নি। বসে আছি চুপচাপ, কখন মিহিরবাবু আসবেন। সময়ের খুব একটা নড়চড় হল না। আন্দাজে বুঝলাম বিশাল বপু যে লোকটি ঘরে ঢুকছেন তিনিই মিহিরবাবু। আলাপ হল, অনেক কথা হল। জানতে পারলাম এই ধরনের সমুদ্র যাত্রার জন্য অভিজ্ঞতার দরকার। আমার অভিজ্ঞতার কথা ভেবে আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করল না। হাঁটা পথে এসেছি, হাঁটা পথেই বেরিয়ে পড়লাম। কেমন মেনে নিতে ব্যথা লাগছে জলের মত স্পষ্ট ব্যাপারটা যে আমি এ কাজে অযোগ্য। জীবনটাকে চিরকাল আমার গোলমেলে লেগেছে, আজও আবার ধাঁধায় পড়লাম, অথচ সবকিছুকে চুকিয়ে দিতে আবার মন চাইল না।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ দেখা হল সুধীরদার সঙ্গে। সম্প্রতি অধ্যাপনা ছেড়ে সরকারী চাকুরীতে ঢুকেছেন। অনেক কথার ভীড়ে সুধীরদা বললেন, জানিস এবার একজন নেভির লোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনি পোর্ট কমিশনারের একটা সার্ভেশিপের কমাণ্ডার। আর একবার চমকে উঠলাম, কেন জানি নাড়া পেল আমার সুপ্ত বাসনা।'

সেদিন আর বেশি কিছু কথা আমার কানে ঢোকে নি, খালি ভেবেছি ক্যাপ্টেন শাঠের (Cap sathay) কথা (যাঁর কথা সুধীরদা বললেন), অনেক ব্যাপার মাথায় খেলে গেল। একটু সময় লাগল নিজেকে গুছিয়ে নিতে। তারপর একদিন ফোন করলাম টেলিফোন গাইড দেখে পোর্ট কমিশনারের ক্যাপ্টেন শাঠেকে। ভদ্রলোক প্রথমটায় অবাক হয়ে গেলেও আমাকে দেখা করতে বললেন তাঁর জাহাজে-এস. এস. ত্রিবেণী।

যথা সময়ে হাজির হলাম। সাধাসিধে পোশাক পরা ক্যাপ্টেন সাহেব আমার সব কথা শুনে কেমন যেন চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ঠিক আছে, তবে আমাকে পরিষ্কার করেই বলে দিলেন যে নেভিগেশন শিখতে লোকের অনেক বছর সময় লাগে। আবার তারপরের সপ্তাহে গেলাম দেখা করতে তাঁর সঙ্গে। আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন এক আমারই বয়সী ছেলের সঙ্গে, তাঁর আত্মীয় সুভাষ ভাটে, ডাফরিন থেকে সদ্য পাশ করে এসে ঢুকেছে পোর্টের কাজে। সুভাষ আমায় ডেকে নিয়ে গেল ত্রিবেণী জাহাজে তার ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে আমার জ্ঞান পরীক্ষা করে আমায় কিছু নোট আর কয়েকটা বই দিল, যা আমার কাজে লাগবে। শুরু হল আমার দীক্ষা।

দিন কাটে। ভেঙে পড়া আত্মবিশ্বাস সুভাষের একান্ত চেষ্টায় আবার জোড়া লাগে। এমনি করে দিন এগিয়ে এল, আমি আবার একদিন গিয়ে হাজির হলাম মিহিরবাবুর কাছে। আশ্চর্য হয়েছিলেন

কিনা জানি না, আমার খাটুনির দাম দিলেন, আশ্বাস দিলেন, সিলেকসন বোর্ডে আমার দাঁড়াবার সুযোগ দেবেন।

মনের কাজের কোন বিরাম নেই, আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে ওঠে আমার মাস্টার প্ল্যান। সিলেকসন বোর্ড আমায় না নিলেও আবেদন করব ঠিক করলাম। আমার রিসার্চ গাইড ডাঃ মৈত্রর সঙ্গে কথা বললাম একদিন একান্ত গোপনীয়ভাবে। তিনি প্রথমে চুপ করে রইলেন তারপর তাঁর পাকধরা চুলের তলার তরুণ মনটা ভাষা পেল। উৎসাহের শেষ নেই। আমার কাছে মেঘ না চাইতেই জলের মত ব্যাপার। এখনও পর্যন্ত আমার চেনাশোনা লোকের কাছে ঘুনাক্ষরেও বলিনি কি করতে যাচ্ছি। দু' একবার চেনা লোকদের সাথে গল্পের আসরে প্রসঙ্গটা তুলে তাঁদের মনের প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছি মাত্র।

এদিকে খুব সাধারণ সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাপারটাকে একটা বৈজ্ঞানিক রূপ যে দেওয়া যায়, ডাঃ মৈত্রের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম।

হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল একসপ্লোরারস ক্লাবের স্ট্যাম্প মারা। আমাকে সিলেকসন বোর্ডে আসার জন্যে ডেকেছে। দিন কেটে গেল দ্রুত। মনের ভেতরের চাঞ্চল্য সবসময় অনুভব করি। একদিন মেরিন হাউসে বসল সিলেকসন বোর্ড।

(চলবে)

কমলি আমার গাই

রীমা গুহ (সভ্যা. ৭)

আমার দেশের বাড়িতে একটা গরু আছে। আমি তার নাম রেখেছি কমলি। ওর গায়ের রঙ সাদা। তার ওপরে ছোট ছোট কালো ছোপ আছে। কমলির কালো ডাগর চোখ দুটি তোমরা যদি দেখতে, তাহলে তোমরা কিছুতেই ভুলতে না। সোনা গয়লানি রোজ ওর দুধ দুইয়ে দেয়। কি সুন্দর দুধ, আমার খেতে খুব ভাল লাগে।

কমলির একটা ফরসা ধবধবে বাছুর আছে। ওর নাম ধবলি। ওদের রোজ সকালে খড় বিচালি ও ভাতের ফেন খেতে দেওয়া হয়। সকাল বেলায় ওরা মাঠে যায়। কচি ঘাস খায়। এদিক ওদিক ঘোরে আর সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে আসে। আমি ওদের ভীষণ ভালবাসি। তাই প্রত্যেক ছুটিতে যাই ওদের কাছে।

প্রতিদান

মানব নন্দী (সভ্য, সিনিয়র)

কিশোর—এই কিশোর—

নীচ থেকে সুমন ডাকছে। তখন একপায়ে বুট পরেছি। সেই অবস্থাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে জানলার সামনে গিয়ে বললাম—'দাঁড়া আসছি।' 'বেশি দেরি করিস না, স্কুলে একটু আগে পৌঁছতে হবে।'

আমি আর উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি অপর জুতোটা পরতে লাগলাম।

সুমন আমার প্রিয় বন্ধু। আমরা এক পাড়ায় থাকি, একই স্কুলে পড়ি। ওদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই আমাদের বাড়ি। সব সময়ই আমরা বাড়িতে বসেই কথাবার্তা বলি। ওর বাবা একজন নামকরা ডাক্তার। আমরা শিয়ালদহের একটা স্কুলে পড়ি, যাতায়াত করি বাসে।

'সুমন, তোদের বাড়িতে কাল অনেক রাত্রে চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন রে?' সিঁড়ি দিয়ে নেমেই ওকে জিজ্ঞাসা করি।

'আর বলিস না,' সুমন উত্তর দেয়, 'এক ভিখারী নিয়ে যত কাণ্ড। তুই তো জানিস্ তখন লোড শেডিং। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়িতে সবে কয়েক পা দিয়েছি, এমন সময় তীব্র চিৎকার। বাপী তো উল্টে পড়ে যায় আর কি। চেঁচামেচিতে আমরা আলো নিয়ে আসতেই দেখি সিঁড়িতে একটা লোক শুয়ে আছে। সহজেই বোঝা যায় লোকটি ভিখারী। বাপী তো রেগেই আগুন। প্রায় মারতে যায় আর কি। অন্ধকারে ও যে সিঁড়িতে শুয়ে আছে, তা বাপী কি করে জানবে বল্। লোকটা তখন বাপীর বুট দিয়ে মাড়িয়ে দেওয়া পা ধরে মুখ নীচু করে বসেছিল। আমরা সবাই মিলে বাপীকে থামালাম। কি রকম সাহস বল দেখি। লোকটা তো চোরও হতে পারে। আবার চলে যেতে বলতেই বলে কি যে, আজকের মত থাকতে দিন। আমি ওর পুঁটলিটা কেড়ে নিতেই কাকুতি মিনতি করতে লাগল। দিন, বাবু, দিন, এখনই চলে যাচ্ছি। আমি পুরোপুরি গেটের বাইরে যাবার পর ওকে পুঁটলিটা দিলাম। কি রকম সাহস থাকলে'…'বাস আসছে রে সুমন রেডি হয়ে নে,'—আমি বলে উঠি, সুমনও হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেলে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, বাসটাতে উঠতেই হবে।'

কিন্তু ওঠা গেল না, বাসটার যা অবস্থা তাতে বাসে ওঠা অসম্ভব একেবারে বাদুড় ঝোলা অবস্থা, তথাপি সুমন চেষ্টা করতে লাগল যদি কোন রকমে একটু জায়গা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি ওকে নিরস্ত করলাম, 'এইভাবে বাসে উঠে প্রাণটা খোয়াবী নাকি? পরের বাসটাতে যাব।'

বাসটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। তারপর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল—আমরা কেবল বাসটার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

'বাবু, দুটো পয়সা দেবেন?'—দেখি অতি বৃদ্ধ ভিখারী আমার সামনে হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে। ভিখারীটির চেহারা অদ্ভুত। মাথার ওপর মস্ত এক আলুর মত ফোঁড়া, খালি গা, পরিধানে একটি শতচ্ছিন্ন ধুতি। কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুলছে অতি ময়লা একটি পুঁটলি। মানুষের বুকে কটা হাড় আছে এবং তা কিভাবে সাজানো

যে কেউ এই মানুষটিকে দেখেই যেন বলে দিতে পারবে। লোকটির সর্বাঙ্গে কাদার ছোপ। লোকটির একটি চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে—এই জল অনেকক্ষণ ধরেই যে পড়ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—তার মুখের দিকে তাকালেই—তার মুখের উপর দিয়ে একটি সরু রেখা চলে গেছে যেখানে কোন কাদার চিহ্ন নেই পরিষ্কার। তার চোখের জলের সরু নদীটি ঐ লাইন দিয়ে বয়ে চলেছে কিনা, হয়ত লোকটা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, তাই তার অজ্ঞান্তেই তার চোখ দিয়ে এই জল প্রবাহমান। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে একটি ধনুক। তার ডান পায়ের গোড়ালির কাছে একটি ক্ষত। 'আরে—এই লোকটিকেই কালকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম'—সুমন বলে ওঠে, 'কিছু নেই আমাদের কাছে। দেখছ না স্কুল যাচ্ছি। আমরা কি চাকরি করি? অন্য লোকের কাছে যাও।'

কিন্তু আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। লোকটাকে দেখে আমার মনের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আমি অভিভূতের মত প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর পকেটে যা ছিল, তাই সমস্তটাই লোকটাকে দিয়ে দিলাম। লোকটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে দুহাত জড় করে নমস্কার করল এবং ধীর পদক্ষেপে চলে গেল।

'এত দাক্ষিণ্য দেখানোর কোন দরকার ছিল না। কিছু পয়সা তো দিলে পারতিস। সবটাই দিয়ে দিলি। এখন স্কুলে যাবি কি করে?' সুমন বলে ওঠে। 'তাইতো আমার কাছে তো আর কিছুই নেই। কি হবে। সুমন প্লিজ তোর টিফিনের পয়সা থেকে আজকের মত আমার বাস ভাড়াটা দে। আমার যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল জানিস। কেন যে লোকটাকে সমস্ত পয়সাগুলো দিয়ে দিলাম জানি না।'

সুমন কোন উত্তর দিল না। লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে অবাক নয়নে কিছু সময় পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর আস্তে আস্তে রাস্তা পার হয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়সাগুলো দিয়ে ঠোঙা ভর্তি মুড়ি কিনল। মুড়িগুলো দেখে লোকটার অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে। আমি দূর থেকেও তা সহজেই বুঝতে পারলাম তার মুখ দেখে। তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে ভর করছে। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে এক অনাবিল আনন্দে আমার মন ভরে উঠছে। আবার ভাবছি এতখানি দাক্ষিণ্য দেখান কি ঠিক হল।

সুমন পকেট থেকে পয়সা বার করে বলল, 'এখনই বাসভাড়াটা নিয়ে রাখ, পরে বাসে ভিড়ের মধ্যে আর দেওয়া যাবে না।' আমি লোকটার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিলাম—কিন্তু একটা সিকি আমার হাতে না পড়ে হাতের পাশে লেগে গড়িয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে গেল। সুমনও পয়সাটার পিছনে পিছনে ছুটে গেল সিকিটি তুলে আনতে।

এমন সময় লক্ষ্য করলাম একটি মিনিবাস প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসছে। আমি "সুমন" বলে চিৎকার করে উঠলাম। সুমন তাড়াতাড়ি পয়সাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর সামনেই প্রচণ্ড গতির মিনিবাসকে দেখে কেমন যেন হয়ে

গেল। একটুও নড়তে পারল না। দেখলাম বিপরীত দিক থেকে ভিখারীটি ছুটে আসছে। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় আমি আমার দুই চোখ দুই হাত দিয়ে ঢেকে ফেললাম। আমার প্রিয় বন্ধু সুমন—আমি আর ভাবতে পারলাম না। কানে এল বাসের ভীষণ জোরে ব্রেক কষার শব্দ, লোকের কোলাহল ও একটি আর্ত চিৎকার, চিৎকারের অর্থ আমার আর বুঝতে বাকি রইল না। ঘটনার দ্রুততায় আমার সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। আমার মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন কাঁপছে। চোখের থেকে হাত দুটো কিছুতেই সরাতে ইচ্ছে করছিল না। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল। আমার জন্যই সুমনের এই দশা হল। চোখের থেকে হাত দুটো কিছুতেই সরাতে পারছিলাম না।

যা হোক্, অনেক কষ্টে হাত দুটো সরিয়ে নিলাম। রাস্তার চারিদিকে রক্ত ছিটকে গেছে। আর একটা রক্ত মাখামাখি মাংসপিণ্ডের চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক। অব্যক্ত বেদনায় আমার বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। বন্ধু বিচ্ছেদের বেদনায় আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আরে—আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি! ঐ তো সুমন দাঁড়িয়ে আছে, গা-হাত-পা ঝাড়ছে। তবে কার আর্তনাদ শুনলাম। এ রক্ত কার।

তবে কি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভিখারীটি জীবন দিয়েছে, যাকে সুমন তাড়িয়ে দিয়েছিল। দেখলাম মুড়ির ঠোঙাটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়েছে। ঠোঙাটা থেকে চারিদিকে মুড়ি ছড়িয়ে পড়েছে—একটা কুকুর সেই মুড়িগুলো খাচ্ছে। লোকটা যেন মারা যাবার আগে আমার দান আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

ব্যাপারটা কি বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। বৃদ্ধটি দৌড়ে এসে সুমনকে ধাক্কা দিয়ে ওকে বিপদমুক্ত করে নিজেকে আর রক্ষা করার সময় পায় নি। তার আগেই মিনিবাসের কালো চাকা বৃদ্ধের বক্ষ রাঙা করে দ্রুত চলে গেছে।

সুমন আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি কি ছোট না রে।" রাত্রের আশ্রয় থেকে যাকে বঞ্চিত করেছিলাম সে তার প্রতিদান আমাকে ভালভাবেই দিল। হঠাৎ এক ফোঁটা অশ্রু আমার পিঠের উপর পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম সুমন কাঁদছে।

দাদাদেল ফিস্তি

আশিস চট্টোপাধ্যায় (সভ্য, সিনিয়র)

বুবুন—"বিস্তি পলে, ঝিম্‌ঝিমিয়ে
কি মজাল, বিস্তি লে।
দাদারা সব, যুক্তি ক'লে,
কলছে দালুন, ফিস্তি লে।
দাদালে শোন একটা কথা,
নইলে খাস, আমাল মাথা,
—তোদেল সাথে, আমিও
ফিস্তি কলব লে······
যদিও আমি চাঁদা দেব
একটি কানা কলি লে—।
···   ···   ···
কি মজা! ভাই, কি মজা!
নান্না হয়ে গেছে,
খিচুলি আলু বেগুন ভাজা,
গন্ধ ভেসে আচে।
দাদা ভোলা খুব ভালো,
এবাল খেতে বসি,
একটু দাঁড়া, দৌলে···
আমাল, আসন নিয়ে আসি।

দাদারা (ব্যঙ্গ করে)—'ফিস্তি করবে যা ভাগ
কাজের বেলায়, লবডঙ্কা
খাবার বেলায় ভাগ ?
যা ভাগ, ভাগ, ভাগ্‌।

বুবুন (কাঁদতে কাঁদতে) দিদা। দিদা, দাদা মালছে
একটু এসে দেখ,
আমি কত কাজ কলেছি
খেতে নিচ্ছে না কো।

দিদা (দাদাদের প্রতি)—এই ভোলা, এই পদা,
বড্ড তোরা বেড়েছিস্‌,
তোরা না ওর বড় দাদা
তোরাই ওকে মেরেছিস ?
ছোট্ট ভাই দিয়েই দেনা
একটুখানি খিচুড়ি···।

বুবুন—'আমি কিছুই খাব না
(যাও), ভাগ নেবনা কিছুলই।
দাদারা সব বসল খেতে
খিচুড়ি যেই ঢালা পাতে
করল শুরু খাওয়া
আর কোথায় যাওয়া ?
এ তাকায় ওর মুখের দিকে
চেঁচিয়ে সবাই উঠল হেঁকে—'

বড়দা—গলাটা যে শুকিয়ে আসে,
একটু দে তো জল,
বুবুনটাকে, না নেওয়ার ফল।

মেজদা—ছুঁচোর জায়গায় ভুল করে
কেউ লঙ্কা দেছে ছুঁশো
যতসব উজবুক (আর)
নির্বোধ হুমমুশো।
দিদার সাথে হাতটি ধরে
যাচ্ছিল ঘর ফিরে—
কাণ্ড দেখে, মুণ্ডুটাকে
একটুখানি নেড়ে
ব্যঙ্গ করার সুরে
বলল বুবুন ঘুরে—

[ছোটদা চড় মারল বুবুনকে]

বুবুন—আমাদেল ওই লঙ্কা
লাখাল কৌটটা উজাল করে
আমিই দিচ্ছি ঢেলে।
এবার বোঝ আমাকে না
নিলে কেমন মজা হয়?
আমি কাউকে কলি ভয়!

[মেজদা তেড়ে আসতেই]

বুবুন—ওলে বাবা! দিদা—
মেজদাতা আসছে তেলে
এবাল আমায় ফেলবে মেলে,
আমায় তুমি বাঁচাও বাঁচাও
আমাল সাথে, দৌলে চল
দৌলাও। দৌলাও। দৌলাও।
সিন্টু নামে বুবুনের বন্ধুটা
বলল ওকে,—শোন্, কথাটা।
ঘরের মধ্যে করলে পরে ফিস্টি
হবেই এখন অনেক অনাছিস্টি।
উদ্যানেতে ফিস্টি কর
সেথায় হবে মজা বড়।
বিধান রায় কোথা থাকে?
জিজ্ঞাসা আজ করব মাকে।
কান্নাকাটি রেখে ভাই
সবে মিলে উদ্যানে যাই।

ইলিশ

অলোককুমার সাহা

ইলিশ দেখি না; গল্প তুমি যে
প্রাচীন যুগের দাদুর
স্বাদটি তোমার পাইনি কভুও
জানি শুধু সুস্বাদু।
গঙ্গা পদ্মা বাসাটি তোমার
দেশটি তোমার সেখানে
আজকে সকল ফুরিয়ে গেছে
তোমায় পাইনে এখানে।
যদিও বা পাই জমেছ বরফে
রয়েছ অনেক উচ্চে
কেমনে তোমায় পাই আমি বল
নাচিছ টাকার পুচ্ছে।
শুধু যে স্বপ্ন দেখি, কল্পনা
করি বা ধূসর আকাশে
তোমার গন্ধ মাখা আছে গায়ে
বাংলার মিঠে বাতাসে॥

ভারতের চিত্রকলা

বকাটক

(শেষাংশ)

অহিভূষণ মালিক

একটা ছবিতে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন বোধি বৃক্ষের নিচে। মহাজ্ঞান লাভ করতে চান তিনি। কিন্তু দুষ্টদের মৎলব, ঐ ত্যাগী পুরুষের ধ্যান ভাঙতেই হবে। মার আর তার সুন্দরী কন্যারা নানা ভাবে সাধককে প্রলোভন করে চলেছে। অসাধুরা তাকে ভয় দেখাচ্ছে, আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে, কিন্তু স্থির গম্ভীর বুদ্ধ অবিচলিত। তাঁর সংকল্প—বোদ্ধত্ব লাভ করবেনই। অপূর্ব কাহিনী, অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব কলা কৌশল।

সুন্দরী বধু সুন্দরীকে নন্দ কুমকুম চন্দনে সাজিয়ে আরও সুন্দরী করে তুলল, এমন সময় বুদ্ধ এলেন দ্বারে। নন্দকে বললেন "ত্যাগ কর ভোগ লালসা, ত্যাগ কর সুখ, নাও হাতে ভিক্ষার ঝুলি। কিন্তু নন্দ সুন্দরীকে ছেড়ে এক পাও নড়বে না।" যাদু মন্ত্রে স্বর্গের উর্বশীদের নিয়ে আসা হল নন্দর সামনে। নন্দ চোখ ফেরাতে পারে না। বুদ্ধের কথা শুনলে সে পুরস্কার পাবে ঐ উর্বশীদের। রইল পড়ে সুন্দরী, নন্দ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। পরে নন্দ আর কোনও দিন স্ত্রীলোকের চিন্তা করেনি, ঘরেও ফিরে যায়নি। বুদ্ধের শিষ্য সে, ধর্মই তার একমাত্র ভাবনা। এমন রচনাই বা কি কম যায়?

অবদান কাহিনীতে আছে নানা বীরত্বের কথা। এক জাহাজডুবির পর সওদাগর যাত্রীরা সাঁতার কেটে উঠল গিয়ে একটা দ্বীপে। ঐ দ্বীপে থাকত মায়াবিনী রাক্ষসীরা। সুন্দরী রমনীর রূপ ধরে রাক্ষসীরা সম্মোহিত করে ফেলল যাত্রীদের। অশ্বরূপী বুদ্ধদেব পিঠে চাপিয়ে উদ্ধার করলে অনেককে। কয়েকজন কিন্তু চমকে গেল। চোখ ধাঁধান রূপের মায়া কি ত্যাগ করা যায়। বলাই বাহুল্য, পরে সওদাগরদের ঐ সুন্দরীদের উদরস্থ হতে হয়েছিল। সিংহল নামে এক সওদাগরের সঙ্গে একটি সুন্দরী চলে আসে এদেশে। এদেশের রাজা রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাণী করে ফেললেন। রাজপ্রাসাদের আবাসিকরা একে একে কমতে লাগল। ব্যাপারটা বোঝা খুবই সহজ। সিংহলের তলোয়ারের ঘায়ে খতম হল রাক্ষসী রাণী। রাক্ষসীদের দ্বীপটিও দখল করলেন সিংহল। এমন উপভোগ্য অবদান কাহিনীও নিতান্ত কম নেই অজন্তায়।

কতকাল আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে অজন্তার শিল্প সম্ভার বলা বড় কঠিন। দেয়ালে ফাটল ধরেছে ফাটল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে। ছবি সংরক্ষণের জন্য যা ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাও অনেক ক্ষেত্রে সমর্থনীয় নয়।

একটি গুহার মাথার উপর বিশাল বিশাল পাথর ছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসারের চোখে পাথর গুলো দৃষ্টিকটু লাগছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি খাটিয়ে পাথরগুলো গড়িয়ে দেওয়া হল নিচে। বলাই বাহুল্য অফিসারটি পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। যাঁরা সে সময় অজন্তায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে শোনা, সে কি শব্দ। সারা অঞ্চল কাঁপিয়ে পাথর পড়ল মাটিতে। কিছুদিন পর দেখা গেল

যেখান থেকে পাথর সরানো হয়েছে তার ঠিক তলায় গুহার শিলিং এর ছবি ফুলে ফেঁপে উঠেছে, এবং কিছু কিছু জায়গায় খসেও গেছে। আরেকটি ঘটনা—গাইডরা ভীড়ের সময় ব্যস্ত হয়ে পড়লে পাহারাদাররা গাইডের ভূমিকা নেয়, পাব্‌নি মোটামুটি ভালই। এক পাহারাদারকে কোনও কারণে শাস্তি স্বরূপ এমন এক গুহায় ডিউটি ফেলা হল যেখানে দর্শকের সমাগম কম, পাব্‌নির কোনও আশা নেই। রেগে গিয়ে পাহারাদারটি করল কি, সবাইয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে বিশ্ববিখ্যাত কৃষ্ণবর্ণা রাজকন্যার বুকে ছুরি বসিয়ে এক চাকলা রঙ তুলে নিল। ছবিটি মেরামত করা হয়েছে বটে, কিন্তু ও দাগ ঢাকা পড়বার নয়। এরকম একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরাও হার মানবেন অজন্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

এমন আধিকারিকের ওপর অজন্তার ভার দেওয়া দরকার যাঁর প্রশাসনিক জ্ঞানও আছে, আবার শিল্পের প্রতি অনুরাগও আছে। আর সেখানকার প্রত্যেকটিই কর্মচারীরই বোধ থাকা উচিত, ঐ মহামূল্য শিল্প সম্পদ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাঁদের কতটা গুরুত্ব পূর্ণ।

ছবি তুলতে নাকাল

রঞ্জন ভাদুড়ী

টুকাইবাবু হলেন ফোটোগ্রাফার
তাঁর ক্যামেরায় তুলবে ফোটো পুষি।
সেই ছবিটা যোগ্য হলে ছাপার
টুকাইবাবু বড্ড হবেন খুশী।

ক্যামেরাটা কায়দা করে ধরে
বলেন টুকাই, "শোন-না পুষি ওরে,
ঠোঁটে ফোঁটা আলতো হাসির রেখা
এ সব বিদ্যে নেই বুঝি তোর শেখা?"

খুটুস আওয়াজ খেলনা ক্যামেরাতে,
তার আগেতেই বেড়াল হল হাওয়া।
টুকাইবাবু দন্ত চেপে দাঁতে
বলেন, "দাঁড়াও বন্ধ রাতের খাওয়া।"

গোবৰ্দ্ধন

অমিত লাহিড়ী (সভ্য, ১১)

শরীরটা ছিল তার তাগড়া—
পায়ে পরত শুধু দামী নাগড়া।
নাম ছিল তার গোবর্দ্ধন—
বড় বেশি ভুলো মন।
যেতে নাকি পাক ঘরে
গিয়েছিল ডাক ঘরে।

ডাকসুকোদের কাহিনী

বরফের দেশে বরফের বাড়ি

সিন্ধবাদ

বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—এ সব কিচ্ছু সেখানে নেই। সেখানে ঋতু বলতে কেবল দুটো। শীত আর গ্রীষ্ম। কিংবা, বলা উচিত শীত আর কম শীত। আমাদের এখানকার মত কাঁঠাল পাকানো গরম সেখানে কখনও পড়ে না। আর, ঋতুর কথা তো ছেড়েই দাও, সেই আজব দেশে তো দিন-রাতেরই কাণ্ড-কারখানা, শুনলে তাজ্জব লাগে। বছরে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত। অবশ্য ছ'মাস রাত বলে মনে কোর না একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। সূর্যের মুখ সেই ছ'মাস দেখা যায় না বটে, কিন্তু আকাশে এক আশ্চর্য আলোর খেলা চলে তখন। সে আলোর নাম অরোরা বরিয়ালিস। তার ছটায় একটা স্তিমিত আভা জেগে থাকে সেই সুদীর্ঘ নিশাকালে।

সে কোন্ দেশ? যেতে ইচ্ছে করে সেখানে? টাকা-কড়ি খরচ করতে পারলে সে আর এমন কি অসম্ভব কাজ? আজকাল তো যাত্রীবাহী বিমান নিয়মিত সে দেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। টিকিট কাটলেই যাওয়া যায়। যাবে উত্তর মেরুতে?

আগেকার দিনে কিন্তু সেখানে যাওয়া অত সহজ ব্যাপার ছিল না। মানুষ অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে সেখানে পৌঁছতে। কেউ কেউ পৌঁছেও গেছে। যীশু খৃষ্টের জন্মের ৩২৫ বছর আগে একজন গ্রীক, তার নাম পিথিয়াস, জাহাজে চেপে নরওয়ের উত্তর উপকূলে সেই সুমেরু অঞ্চলের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন, যদিও একেবারে সুমেরু বিন্দুতে নয়। তারপরেও অনেকে সুমেরু বৃত্তর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিমি মাছ শিকারীদের আড্ডা সেখানে স্থাপিত হয়েছে। তারপর আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে কারো কারো মনে এমন চিন্তাও জেগেছে যে সেই উত্তর মেরু সাগরের মধ্যে দিয়ে চীন এবং ভারতবর্ষ যাবার রাস্তা কি পাওয়া যায় না?

তার মানে, মেরু সাগর দিয়ে উত্তর পশ্চিম মুখে যেতে হবে। উত্তর পশ্চিম মুখী এই পথ নর্থ ওয়েষ্ট প্যাসেজের অনুসন্ধান পাশ্চাত্য অভিযাত্রীদের সামনে তখন একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।

শত শত বছর কেটে যায়, সেই পথটা আর বেরোয় না। মেরু সাগর পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছান আর হয়ে ওঠে না। ১৮২৭ খৃঃ ইংল্যাণ্ডের লেফটন্যানেন্ট প্যারি সুমেরু বৃত্ত থেকে উত্তর মুখে যাত্রা করলেন। বরফের একটা বিশাল আস্তরণের ওপর দিয়ে—তিনি এগোতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যত না উত্তর দিকে এগোন, বরফটা

তার চেয়ে বেশি বেগে দক্ষিণ দিকে ভেসে যায়। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি সামনের দিকে এগোচ্ছেন, কিন্তু আসলে চলেছেন পেছন দিকে। কি জ্বালা বল দেখি। তারপর ১৯০৯ সালে আমেরিকার রবার্ট পেয়ারী উত্তর মেরুতে পৌঁছুলেন। এখন তো সেই মেরুর ওপর দিয়ে নর্থ ওয়েষ্ট প্যাসেজ ধরে যাত্রীবাহী বিমান নিয়মিত যাতায়াত করছে।

এই বিমান-পথটা খুঁজে- বের করবার- জন্যে ১৯৩০-৩১ সালে একটা অভিযাত্রী দল গিয়েছিল। বৃটিশদের এই দলটির নেতা ছিলেন ওয়াটকিনস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্কট বলে একজন। ইনি দক্ষিণ মেরু অভিযানের সেই বিখ্যাত ক্যাপটেন স্কট নন, আরেক স্কট।

ইনি, এই জে. এম. স্কট তাঁদের সেই যাত্রায় একটা বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। তার থেকেই একটা ঘটনার কথা আজকে তোমাদের শোনাই।

মেরু বৃত্তের মধ্যে সব জায়গাতেই যে খুব শীত তা নয়। কোথাও কোথাও তো রীতিমত গরমই পড়ে যায়। এমন কি ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠে যায় (আমাদের এই কলকাতাতেও তাপমাত্রা ১০৫, ১০৬ ডিগ্রীর ওপরে সাধারণত ওঠে না)। কিন্তু মেরু-বৃত্তের ভেতর দিকে যে পুরু বরফের আস্তরণে ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলগুলো আছে সেখানে অসম্ভব ঠাণ্ডা। স্কট লিখেছেন সেই হিমে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাঁবুর ভেতরে স্টোভ্‌টা নিভিয়ে ফেললেই তুষারে তাঁবুর চাদর ঢেকে যায়। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে অনেক সময়ে দেখা যায় মাথার চুল জমে গিয়ে তাঁবুর চাদরের সঙ্গে আটকে গেছে। সকালে উঠে ঠাণ্ডা রান্নার বাসন হাত দিয়ে ছোঁয়া মাত্র আঙুল আটকে যায় তার গায়ে; মস্তিষ্ক কাজ করে অতি ধীর-গতিতে। হাত-পা যেন নড়তেই চায় না। চলতে গেলে অনবরত তেষ্টা পায়, কেন না সেখানকার বাতাস ভীষণ শুকনো। সত্যিকারের শীত যখন পড়ে তখন বরফ হয়ে যায় পাথরের মত, তুষার-কণাগুলো বালির কণার মত শুকনো খরখরে হয়ে যায়।

আর, তার ওপরে ঝড়। ঝড়ের সময়ে ঠাণ্ডা যেন দশগুণ বেড়ে যায়। সেই ঝড় যখন হঠাৎ এসে পড়ে তখন আর কোন সন্দেহ থাকে না, এইবার শীত এল।

মেরু-বরফের বিশাল ঢাকনিটার ওপরে একটা ঘাঁটি ছিল। সেখান থেকে দলটা যখন রওনা হল তখনও গ্রীষ্মকাল। যদিও শীতের আর বেশি দেরি নেই। দিনে পনেরো মাইল হিসেবে তাঁরা এগোতে পারবেন, হিসেবটা এই রকম ছিল। তিন সপ্তাহে তিন শো মাইলের মত তাঁরা অতিক্রম করবেন বলে আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন এইভাবে তাঁরা একটা রেকর্ড করবেন।

তারপর, যত দিন যায় তাঁরা দেখেন, কোথায় রেকর্ড করা? এতো দেখছি এগোনই যায় না। শেষকালে কি ধীরে চলার রেকর্ড হবে না কি? এমনিতে খুব বাধা-বিঘ্ন কিছু দেখা যাচ্ছে না। মোটামুটি সমতল জায়গা দিয়েই যাচ্ছেন, পায়ের নিচে বরফও মোটামুটি স্থির। আবহাওয়া ভাল। স্লেজ গাড়ি টানবার কুকুরগুলোরও স্বাস্থ্য ভালই আছে। খেতেও পাচ্ছে পেট পুরে। অভিযাত্রীরাও সুস্থ, এগিয়ে যাবার জন্য খুবই ব্যস্ত। কিন্তু হিসেব

করে দেখা গেল, দিনে পাঁচ মাইল অভিযানের গতি কিংবা তার চেয়েও কম।

তা হলে কি কুকুরগুলোও কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। তাদের কত পিঠ চাপড়ানো হচ্ছে, কত উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, আবার দুচার ঘা মারও পড়ছে তাদের পিঠে। এমনকি মানুষের খাদ্য থেকেও তাদের ভাগ দেওয়া হচ্ছে। তাদের বোঝাও ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কুকুরগুলোর যেন কি হয়েছে, নড়তেই চাইছে না তারা। একবার যদি বসে পড়ে তো আর উঠতে চায় না। আসলে দোষ কুকুরের নয়। দোষ সেই অবশ করা শীতের। সেই শীতে সব কিছুই, সমস্ত গতিই শ্লথ হয়ে আসে।

সে রাত্তিরে আমরা সবাই তাঁবুর ভেতরে শুয়ে পড়েছি, বাতিটা নিভিয়ে দিয়েছি। এমন সময় থরথর করে তাঁবু কেঁপে উঠল, আওয়াজ উঠল প্রচণ্ড, মনে হল যেন বিরাট একটা ঢেউ ভেঙ্গে পড়ল তাঁবুর উপর এসে। তারপর এক মুহূর্ত চুপচাপ। সবাই কান খাড়া করে আছে। আবার সেই প্রচণ্ড ধাক্কা, সেই ঢেউ ভাঙ্গার আওয়াজ। বাঁশের খুঁটি-গুলো মড় মড় করে উঠল। তাঁবুর চাদর পাগলের মতো ঝাপটা ঝাপটি করছে।

কোন রকমে রাত কাটল। ভোরবেলায় তাঁবুর ভেতর থেকে সন্তর্পনে গলা বের করে দেখা গেল ১০০ ফুট উঁচু তুষার প্রবাহ তাঁবুর গা বেয়ে এগিয়ে গেছে। প্রচণ্ড তুষার ঝঞ্ঝা মুখে আমাদের তাঁবুটাই একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁবুর পেছনে মস্ত একটা তুষারের পাহাড় খাড়া হয়ে উঠেছে। কুকুরগুলোর দুর্দশা দেখলে কান্না পায়। তাদের আশ্রয় দেবার জন্য বরফের মধ্যে যে গর্তগুলো খোঁড়া হয়েছিল সেগুলো কোথায় মিলিয়ে গেছে। তাদের ল্যাজ ঢুকে গেছে দুপায়ের ফাঁকে, চোখ ঢাকা পড়ে গেছে তুষারে।

শীত এসে গেছে। দিনের পর দিন সেই সাংঘাতিক ঝড়ের কামাই নেই। ঝড়ের ফাঁকে ফাঁকে একটু যে তারা এগোবে, সেও অতিশয় কঠিন ব্যাপার। যেখানে সেখানে তুষার সরে সরে যাচ্ছে। বিরাট বিরাট ফাটল জেগে উঠেছে চলার পথে। তখন কিন্তু সেই কুকুরগুলোই বীরের মতো অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। কিছুতেই যেন তারা কাবু হবার নয়। বুঝতে পেরেছিল এবার তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

বই সম্বন্ধে মজার খবর

গত পাঁচ বৎসরে যে কজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবির রচনাবলী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাদের প্রথম হচ্ছেন রাশিয়ার কার্ল মার্কস এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হচ্ছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চমৎকার সংবাদ একটা মনে রাখার মতো সংবাদ, তাইনা?

রথযাত্রা

শ্যামল চক্রবর্তী (সভ্য. ১১)

আষাঢ় মাস, আঠারো তারিখ—আজ কী আনন্দ। বিকালে দেখি আকাশে খুব মেঘলা। দেখি আস্তে আস্তে কত রথই না বেরোতে শুরু করেছে। কারো একতলা, কারো দোতলা, তিনতলা, চারতলা। কারো রথে সব থেকে উপরের ঘরে জগন্নাথ, বলরাম দুপাশে, মাঝখানে সুভদ্রা। আরো কারো দেখি উপরে সুভদ্রা, নীচে জগন্নাথ বলরাম। মা আমাকে

জিজ্ঞাসা করলেন সবচেয়ে বড় রথ কোথায় বের হয় জান? অনেক ভেবেও আমি তখন বলতে পারলাম না। মা তারপর বলে দিলেন সব থেকে বড় রথ বের হয় পুরীতে। অনেক বড় রথ। তখন আবার আমি মাকে প্রশ্ন করলাম, মা এই রথের দিনে সব-চেয়ে বড় মজা কি? 'মা বললেন' পাঁপড় ভাজা। এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ১৫ পয়সা নিয়ে পাঁপড ভাজা কিনতে গেলাম, গিয়ে পাঁপড়ের দাম জিজ্ঞেস করলাম, বলল ২০ পয়সা। এই কথা শুনে আমার আর পাঁপড় ভাজা কেনা হল না। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি পাঁপড় ভাজার সঙ্গে বিক্রি করছে ফুলুরি, আলুর চপ, পিঁয়াজী ও বেগুনী। আরও কত রংবেরঙের পুতুল নিয়ে বসেছে দোকানদারীরা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট রথগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে রথ টানছে। দেখতে ভারি ভাল লাগছিল। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বোন যে রথ চালিয়েছিল, সেই রথ পুজো করলাম কলা, পেয়ারা ও বাতাসা দিয়ে। তারপর খানিকক্ষণ পরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পরলাম। রথযাত্রার দিন এইভাবেই কাটল।

তুমি জন্ম হইতে পাপী ও অসৎ—এইটি সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা, যিনি নিজে পাপী, তিনি কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন।

—বিবেকানন্দ

ফাঁদ

অভীক মুখোপাধ্যায় (সভ্য, ১২)

সুন্দরবনের গায়ে ছোট্ট গ্রাম গোবিন্দপুর। গ্রাম বলতে কতকগুলো খড়ের চালের ঘর। গ্রামের লোকেদের অধিকাংশই মুসলমান। কয়েক ঘর হিন্দুও রয়েছে। কিন্তু কখনও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া বাধেনি এই গ্রামের সুপ্রাচীন ইতিহাসে। শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে নিভৃত শান্ত গ্রাম এই গোবিন্দপুর।

গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা বড় কঠিন। কাছে পিঠে জলাশয় বলতে আছে একটা পুকুর। অধিকাংশ লোকেরই উপজীবিকা কৃষিকার্য। ভোরবেলা তারা চাষ করতে যায়। মেয়েরা কলসী কাঁখে জল তুলে আনে। বাচ্চারা খেলাধূলা করে; যুবকেরা চাষের কাজে সাহায্য করে। যুবতীরা ঘর-দোর গোছায়, বুড়ো বাপ-মার সেবা করে। সন্ধ্যাবেলা সকলে একসঙ্গে বসে খায়। তারপর গোল হয়ে বসে গল্প করে যতক্ষণ না ঘুম আসে চোখে।

শহর থেকে দূরে এই শান্ত গ্রামেও একদিন উঠল অশান্তির ঢেউ। একটি মেয়ে দুপুরবেলা পুকুর থেকে জল তুলতে গিয়েছিল, তারপর আর ফেরেনি। সকলে হ্যারিকেন জ্বেলে অনুসন্ধান করতে বের হল। কিন্তু বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না তাকে। সকলে অনুমান করল যে জলে ডুবে তার মৃত্যু ঘটেছে। সকলে একদিনের শোক পালন করল। তারপর বহুদিন কেটে গেল। ক্রমে তাদের স্মৃতির অন্তরালে চাপা পড়ে গেল ঘটনাটা।

কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে একদিন আবদুল নামে এক চাষী চাষ করছে। তখন পড়ন্ত বিকেল। হঠাৎ সেইদিক থেকে ভেসে এল এক চাপা আর্তনাদ। সকলে ছুটে এল ব্যাপার দেখতে। সূর্যাস্তের লাল আভায় তারা স্বচক্ষে দেখতে পেল একটা বিশাল 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার'। তার মুখে সেই নিরীহ চাষী আবদুল। সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সবার মনেই তখন সন্দেহ, তবে কি মেয়েটিও এই নরখাদকেরই শিকার হয়েছে।

এই ব্যাপারটা ভুলতে না ভুলতেই রাক্ষসটা ধরে নিয়ে গেল একটা বাচ্চাকে। তখন গ্রামবাসীরা হয়ে উঠল ভীত ও সন্ত্রস্ত। ইতিমধ্যে চারিদিকে সজাগ পাহারা বসাল। ক্যানেস্তারা পিটিয়ে, হ্যারিকেন জ্বেলে বাঘকে দূরে রাখা হল রাত্রে। উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় রাত্রে কারো চোখে ঘুম নেই। কিন্তু এত সত্বেও বাঘের উপদ্রব কমল তো না-ই, উপরন্তু দিন কে দিন বেড়েই চলল। গোয়ালের গরু, মোষ খোয়া যেতে লাগল।

তখন সকলে একদিন পরামর্শ করতে বসল কি করে বাঘের উপদ্রব দূর করা যায়। সকলে মিলে পরামর্শ করল যে বাঘের জন্য ফাঁদ পাতা হবে। যেখানে বাঘটা আবদুলকে মেরেছিল, সেখানে একটা বড় গর্ত খোঁড়া হল। তারপর নরম ঘাস পাতা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ বাঘটা এলে তার মধ্যে ভুস করে ঢুকে যাবে, আর বার হতে পারবে না। একদিন গেল, দুদিন গেল। বাঘ আর আসে না। সকলে হতাশ হয়ে পড়েছে। তৃতীয় দিন রাত্রে সকলে ঘুমোচ্ছে। তখন মাঝরাত। হঠাৎ 'হালুম'। ভীষণ গর্জনে বিদীর্ণ হল রাত্রির নিস্তব্ধতা। ঘুমন্ত গ্রামবাসীরা চমকে জেগে উঠল সেই শব্দে। সবাই ছুটল সেই ফাঁদের কাছে।

দেখা গেল, তাদের ফন্দী কার্যকরী হয়েছে। একটা বিশাল বাঘ ছটফট করছে, ভীষণ গর্জন করছে লতাপাতার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। সেই ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল করিম। হাতে তার দামী সেগুন কাঠের লাঠি। কিন্তু লাঠির মায়া ত্যাগ করে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে সে সাহসের ওপর ভর করে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল সেইদিকে। তারপর হাতের লাঠিটা দিয়ে বাঘটার মাথায় সজোরে মারল এক ঘা। বাঘটা যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। তারপর বাঘের পিঠে আরেকটা লাঠির বাড়ি পড়তেই সব শেষ। মরণ ঘুমে ঢলে পড়ল সেই নরখাদক পিশাচ। সবাই মিলে টেনে বার করল বাঘটাকে। চারিদিকে আনন্দের রব উঠল।

সে রাত্রে কারও চোখে ঘুম এল না। পরদিন সকালে সেই ছোট্ট গ্রামটার সব অধিবাসীরা মেতে উঠল। করিমকে নিয়েই সে উৎসব। গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই যোগ দিয়েছে তাতে। দীর্ঘদিনের ভীতি কেটে গিয়ে আজ তাদের মুখে ফুটেছে হাসি। সকলে তাই করিমকে মাথায় তুলে নাচছে। কারণ তারই জন্য আজ তাদের ভয় কেটেছে। কিন্তু এই গৌরব শুধু একার নয়, অংশীদার তারা সমান ভাবে। কারণ, তাদের পরিকল্পনাতেই তো ফাঁদ তৈরি।

হিতবাণী

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যাহারে যা দিতে চাও বুঝে শুঝে দাও তা
কেহ যেন আঁখিধারে দিতে নারে ভাঁওতা
দেখায়ে অযথা প্রীতি কেহ নারে পটাতে,
'কাতু' দিয়ে হাসাতে বা গালি দিয়ে চটাতে।
মন্দজনের সাথে বেশি ভাল না মেশাই
সঙ্গীর দোষে ভাল-মানুষেরা হামেশাই
পা টলে, পাপের পথে ক্রমে চলে নাবিয়া।
কাহারা হাসিবে কারা কী বলিবে ভাবিয়া
ভালো কাজে পিছিও না—যা বলুক বিজ্ঞে।
সঙ্গীরা যদি দেয় টিটকারী টিক গে—
নেশা না করিলে—ফাঁকি করণীয় কার্যে
নাহি দিলে। প্রবলের ঝুটা ঔদার্যে
ভুলি তার অন্যায়ে দিও নাকো প্রশ্রয়
ভয়ে কারো করিও না হীন কাজ। যশ রয়
তাহাদেরি যারা দুঃখেরে করি তুচ্ছ
সৎ পথে চলে সদা মাথা রাখি উচ্চ।

সকালবেলার গল্প

কুমার শংকর রায়শর্মা

সকাল বেলা। জানলার সামনে টেবিলের উপরে আয়না। চেয়ারে চুল আঁচড়াতে বসল মাসি। পাশের চেয়ারে খোকন এসে বসল। মাসিকে বলল, 'তুমি এখন গল্প বলবেনা?'

—'বিকেল বেলায় তোমাকে গল্প বলব!'—বলল মাসি।

খোকন বলল, 'তুমি বলেছ না, রোববার-রোববার সকালবেলায় আমাকে গল্প বলবে?'

মাসি বলল, 'ও তাই তো, আজকে যে রোববার এটা আমি ভুলেই গিয়েছি।'

খোকন বলল, 'না, তুমি দুষ্টুমী করছ। আমি একদিন কাকুর সংগে বাজার গিয়েছিলাম, তোমার জন্যে ফিতে আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি বলেছ, আমি দুষ্টুমী করেছি।'

মাসি কেবল একটু হাসল, কিছু বলল না। চুল বাঁধতে লাগল।

খোকন বলল, 'গল্প বল?'

—'গল্প। কিসের গল্প বলব?'—বলল মাসি।

বাইরে একটা করবী ফুলের গাছ আছে, আয়নায় সেটা দেখা যাচ্ছে। থোকা-থোকা গোলাপী রঙের অনেক করবী ফুল ফুটে আছে। ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছে খোকন চেয়ারে বসে। ও বলল 'তুমি একদিন বলেছিলে বাড়ির গল্প বলবে; আজকে তুমি গাছের গল্প বল।'

মাসি একটু চুপ করে থাকল। আয়নার মধ্যে খোকনকে দেখল। খোকন করবী ফুল দেখছে।

খোকন বলল, 'তুমি গল্প বলছ না যে। তুমি আমাকে ফুল দেবে মাসি? করবী ফুল?'

মাসি বলল, 'আমি তো তোমার জন্য গাছের গল্প তৈরি করছি মনে মনে। তুমি ফুল চাইলে। আমার গল্প ভুল হয়ে গেল।'

—'ফুল চাইনা, তুমি গল্প বল!'—বলল খোকন।

চুল বাঁধতে বাঁধতে মাসি বলল, 'শোন তাহলে। গাছ তো প্রথমে ছোট্ট থাকে। মাটিতে হয়, বীজ থেকে। যখন বড় হয়, মনে হয়, মাটির উপরে ও যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওর কত সুন্দর সবুজ সবুজ ডালপালা। দেখে মনে হয় আমাদের যেন হাত বাড়িয়ে ডাকছে। ওর ডালে-ডালে কত ফুল হয়। তুমি আম খাওনা?'

খোকন বলল, 'হ্যাঁ!'

মাসি বলল, 'প্রথমে আমের তো মুকুল হয়, ওগুলোই ওর ফুল। তারপর গাছভর্তি আম হয়। লাল হলুদ রঙ নিয়ে আমগুলো পেকে যায় আস্তে আস্তে। তখন দেখে মনে হয় গাছটা আমাদের বলছে,

যত খুশি আম পেড়ে নাও আর মজা করে খাও। ওর ছায়ায় বসে থাকতেও ভালো লাগে, গরমের দিনে খুব আরাম হয়।'

খোকন বলল, ' গাছ খুব ভাল। তুমি এবার গাছের ছড়া বল !'

মাসি বলল,—

'মাটির উপরে গাছ—
আছে দেখ দাঁড়িয়ে—
ডালপালাগুলো সব
যেন হাত বাড়িয়ে।
দেখ ঐ দোলে ফুল
আর ফল কত
আমাদের ডেকে বলে
নাও খুশি যত !
সবুজের ছায়া তার—
আছে কত শান্তি।
তাতে ঠিক দূর হয়
গরমের ক্লান্তি।'

চুল বাঁধা হয়ে গেল মাসির। মাসি এবার কপালে টিপ পরছে। খোকন বলল, 'তুমি আর একটা ছড়া বল তারপরে আমি পড়া করব।'

মাসি তখন একটু ভেবে নিয়ে বলল—

সূয্যি মামা, আকাশ মাটি
গাছকে সবাই দেখে শুনে
গাছ আমাদের ছায়া ফল দেয়—
আর ফুল দেয় দশগুনে।
আমরা যে তাই গাছকেও দেখি
গাছের গোড়ায় জল ঢালি
শিকড়েতে গাছ ধরে রাখে মাটি
মাটি ফসলের দেয় ডালি।
আকাশ মাটি গাছকে যে নিয়ে
আমরা সবাই আছি বেঁচে
সূর্যও আছে, আছে বাতাস
চলি তাই সব হেসে নেচে ॥'

'তুমি তো গাছের গল্প বলেছ, ছড়া বলেছ। এখন গাছের সংগে মাটি সূর্য্যিমামা আকাশ বললে যে!'—বলল খোকন।

মাসি বলল, 'তুমি ঠিকই বলছ। গাছ তো খুব ভাল, তাই না! এখন গাছ কেমন করে ভাল হয় তাই আমি বললাম। গাছ তো মাটিতেই হয় মাটি না থাকলে গাছ দাঁড়াতেই পারত না। আবার সূর্য্যিমামা আলো দেয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে—মানে জল পড়ে। তাই মাটি সূর্য্যিমামা, আকাশ আছে বলেই তো গাছ ওরকম ভাল হতে পেরেছে। গাছ আমাদের ছায়া দেয় ফুল দেয় ফল দেয়। তাই আমরাও গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে নরম করে দিই, তারপর সেখানে জল দিই। তাহলে গাছ তাড়াতাড়ি বড় হতে পারবে। একাই তো কেউ ভাল হতে পারেনা, তাই। একাই কেউ বাঁচতেও পারেনা। তুমি তো পড়াশুনা করে ভাল হবে। মাস্টার মশাইরা তাই তোমাকে কত কিছু শিখিয়ে দেন। তুমি যে জামাপ্যান্ট পরে আছ—কত লোক তোমাদের এই জামাপ্যান্ট তৈরি করছে। তুমি যে জুতো পরে ইস্কুলে যাবে—কত লোক তোমাদের জন্যই সে জুতো তৈরি করছে। তুমি ভাত খাও তো! কত লোক মাঠে-মাঠে ধান লাগাচ্ছে—তোমাদের ভাতের জন্য। তাই তো তোমাদের মতন ছেলে মেয়েরা বেঁচে আছে। তারা বড় হবে, ভাল হবে।'

খোকন মাসির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, 'মাটি ভাল, সূর্য্যিমামা ভাল, আকাশ ভাল মাষ্টার মশাইরা আমাদের কত কিছু শিখিয়ে দেন—মাষ্টার মশাইরা ভাল। লোকেরা আমাদের জন্য জামাপ্যান্ট করে, জুতো করে, ভাত খাওয়ার জন্য ধান লাগায়—ওরা সব্বাই খুব ভাল।

—'তুমি ঠিক বলেছ।'—বলল মাসি। তারপর চেয়ার থেকে উঠে খোকনের গালে হাত দিয়ে একটু আদর করে বলল, 'মার কাছে গিয়ে মুড়ি খেয়ে একটু খেলা করে এস।'

মাসির কথা মতন খোকন আস্তে আস্তে চলে গেল মা-র কাছে মুড়ি খাবার জন্য।

স্কেচ : সুশান্ত দত্ত (সভ্য, সিনিয়র)

ভুতুড়ে বাড়ি

অনন্তা বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, ৭)

আমরা যে আগের বাড়িতে ছিলাম, বাড়িটা কেমন ভাঙা ভাঙা। একদিন দুপুর দুটোর সময় মা ঘুমচ্ছিলেন, আমি জেগে। আমি তখন খুব ছোট্ট ছিলাম, বয়স হবে তিন বছর। প্রথমে আমি শুয়েছিলাম মার পাশে, তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখি সব পরদাগুলো হাওয়ায় উড়ছে। জানলা দরজাগুলোর ঠাস্ ঠাস্ করে শব্দ-হচ্ছে। তখন আমার খুব ভয় হল। তখন আমি দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছে চলে গেলাম। এরকম প্রায়ই হয়। যখন আমি একটু বড় হলাম তখন ভয়ও কমল। কিন্তু দিনের বেলায় হঠাৎ হঠাৎ জানলা দরজা বন্ধ হওয়ার উৎপাত কমল না। পরীক্ষার জন্য যখনই পড়তে বসতাম, তখনই হঠাৎ কোথা থেকে বাতাস এসে দরজা জানলা বন্ধ করে দিত, আমার বইএর পাতা উল্টো পাল্টা করে দিত অথচ বাইরে বাতাস নেই।

গাছের পাতা থমথমে। খুব ভয় করত। একবার, একদিন আমার প্রচণ্ড জ্বর হল। সেই জ্বরে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। জ্বরের ঘোরে নাকি কেবলই বলতাম বাতাস বইছে দেখ। আমার ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ করে দিচ্ছে। সবাই তখন খুব ভয় পেয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুও ঐ বাড়িটা ছাড়তে বললেন। তারপর আমার অসুখ সারতেই আমরা এখন যে বাড়িতে আছি এখানে চলে এলাম। কিন্তু আজও বুঝিনা কেনই বা এরকম হাওয়া দিত বিশেষ করে দুপুর বেলায়? মাঝে মাঝে মনে হয় চলে যাই সেই 'বাড়িতে, গিয়ে দেখে আসি,—দমকা হাওয়ার প্রকোপ একই রকম আছে কিনা?

তোমাদের খুব অবাক লাগছে তাই তো?

রাঁচি

প্রীতম বাগচী (সভ্য, ৯)

আমি গেলাম রাঁচি
দিলাম মস্ত হাঁচি।
রাঁচিতে বড্ড মাছি
(তাই রেগে) তাড়া করলাম
নিয়ে লাঠি গাছি
(তারপর) সোজা পথটাই বাছি
চলে এলাম আমাদের বাড়ি কাঁকুড়গাছি।

দাদুর ভুঁড়ি

সোমা দে (সভ্যা, ৬)

দশে দশে কুড়ি
দাদুর বিরাট ভুঁড়ি,
ভুঁড়িটা ঠিক দেখতে গোল
তাই দাদু বাজায় ঢোল।

তীর্থের পথে

বনানী বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, ১৩)

খুব ছোট থেকেই গঙ্গানদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এর অপূর্ব পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করত। হিন্দুর পরমারাধ্য হরিদ্বারের অপূর্ব শোভার কথা আমি বড়দের কাছে অনেকবার শুনেছি। হঠাৎ সুযোগ ঘটে গেল সেই হরিদ্বারের নিসর্গদৃশ্য দেখবার। আমিও এ সুযোগ ছাড়লাম না। বেরিয়ে পড়লাম দেবাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হরিদ্বার মহাতীর্থের পথে। ট্রেনে ওঠার পর দাদা বাবা অন্যান্যদের সঙ্গে হরিদ্বার নিয়ে অনেক আলোচনা করতে লাগলেন। আমি বসলাম বাবার পাশে। আমি তাঁকে হরিদ্বার তীর্থ কেন বিখ্যাত সে কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বললেন যে, ভারতবর্ষ হল একটা ধার্মিক দেশ। এই দেশের পথে-প্রান্তরে, গিরি-গুহায়, এমনকি প্রতিটি দেবালয়ে দেবতার উপস্থিতি আমরা উপলব্ধি করি। তাই হরিদ্বার তীর্থ হল হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের কাছে স্বর্গ স্বরূপ। এই মহা তীর্থের প্রাচীন কয়েকটি নাম আছে। যেমন, কপিলা, গঙ্গোদ্বার, মায়াপুর। কথিত আছে, কপিল মুনি এখানে বসে ভগবানের কৃপা লাভ করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম কপিলা হয়েছিল। দেবী গঙ্গা এই হরিদ্বার থেকেই যাত্রা শুরু করে ভারতের বিরাট ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। তাই এর আর এক নাম গঙ্গোদ্বার। বহু ঋষি তাদের কামনার ধন হরিদর্শন লাভ করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে এর নাম রাখা হয় হরিদ্বার, সারা বছরই এখানে ঋষি সমাগম হয় ও মেলা লেগেই থাকে। এখান থেকেই কেদারনাথ, বদরীনাথের পথের যাত্রা শুরু হয়। পুরাণে কথিত আছে, মহাধার্মিক রাজা ভগীরথ সগর বংশ উদ্ধারের জন্য অনেক তপস্যা করে দেবতা পূজিত সর্বসন্তাপহারিণী দেবী গঙ্গাকে মর্তে এনেছিলেন। তাই এই গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন 'ওরে গঙ্গার জল জল নয়।' অর্থাৎ গঙ্গার জল বহু পাহাড়, পর্বত, বন ও উপবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এর সঙ্গে মিশে আছে বিভিন্ন ধাতু ও খনিজ পদার্থ ও বহু বনৌষধি।

সেইজন্যই গঙ্গাজল বিশেষ উপকারী ও অমৃততুল্য। দেরাদুন এক্সপ্রেসে দু'রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন ভোরবেলা এসে পৌঁছলাম হরিদ্বারে। হর-কি-পেয়ারী ঘাটের কাছে আমরা একটি বাড়ি ভাড়া নিলাম, এই ঘর থেকে ব্রহ্মকুণ্ড মানসিংহছত্রী দেখা যায়। পর দিন সকালে এখান থেকে দু'মাইল দূরে নীলপর্বত দেখতে গেলাম। এই তীর্থ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। অবন্তীকাপুরে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার নাম ছিল অশ্বচিত্র। তাঁর মাতা পিতা মারা যাবার পর সঙ্গদোষে তিনি চোরদের সর্দার হন। একদিন মায়াপুরে চুরি করতে এসে তাঁর মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবের বসে তিনি মহাদেবের ধ্যান করে তপস্যায় তাকে তুষ্ট করেন এবং মহাদেবের কাছ থেকে এই বর পান যে, এই পর্বত নীলকণ্ঠ তীর্থ নামে পরিচিত হবে এবং চোর সর্দার অশ্বচিত্রের নাম এই পর্বতের সঙ্গে চিরকাল জড়িত থাকবে। তার পরদিন আমরা গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত এবং পাঞ্জাবের আর্য্য প্রতিনিধি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন। এর পরের দিন আমরা দু-মাইল দূরে গঙ্গার

তীরে কনখল দেখতে গেলাম। এখানে জলের রং নীল এবং এখানেই ভাগীরথী জলের সঙ্গমস্থল। এখানে সতীর পিতা মহারাজ দক্ষপ্রজাপতির রাজধানী ছিল এখানে দক্ষরাজার একটি মন্দির আছে। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে প্রত্যেক সোমবার এখানে একটি মেলা বসে। এখানে সতীকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। দক্ষরাজ শিব-হীন যজ্ঞে পতির অপমানিতা সতী এই কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাই এর নাম হয়েছিল সতীকুণ্ড। তারপর আমরা মায়াপুর ও সপ্ত সরোবর দেখি, ধীরে ধীরে আমাদের দেখাও শেষ হল এবং কলকাতা ফেরার দিনও এগিয়ে আসতে লাগল। কিছুতেই আমার মন ফিরতে চাইছিল না। কিন্তু ফিরতেই হবে। অগত্যা দুঃখভরা মন নিয়ে আমার স্বপ্নের স্বর্গ হরিদ্বারকে পিছনে ফেলে চলে আসতে হল।

সন্ধ্যাকালে

পার্থদেব দত্ত (সভ্য, সিনিয়র)

রবি গেল সন্ধ্যা এল
  নীল আকাশের কোলে,
পশ্চিমেতে রাঙা মেঘের
  পাহাড়গুলো দোলে।
সন্ধ্যা তারা জ্বলে ওঠে
  নীল আকাশের বুকে,
চাঁদ মামা উঁকি মারে
  গাছের ডালের ফাঁকে।
মৃদু হাওয়ায় বইতে থাকে
  ফুলের মিষ্টি গন্ধ,
গানের পরে গান গেয়ে যাই
  অনন্ত তার ছন্দ।
আমি যখন চাঁদনী রাতে
  গাছের তলে বসি—
আকাশ পানে চেয়ে দেখি
  হাজার তারার হাসি।

আমরা ভারতবাসী

কৌশিক ঘোষ (সভ্য, ১১)

আমরা ভারতবাসী,
আমরা ভারতকে ভালবাসি।
আমরা দেশকে জানি,
আমরা দেশকে মানি।
দেশের জন্য তুচ্ছ করব
  নিজেদের প্রাণই।
মোরা চেষ্টা করব ঘোচাতে
  দেশের গ্লানি।
আমাদের মাতা হয়েছে স্বাধীন
নই মোরা কারও পরাধীন,
নাই কো লজ্জা, নাই কো ভয়
  নাইকো বিদ্বেষ,
মোরা মিলিত করি
  যে ধ্বনি 'আমার দেশ'।

মুক্তির রূপকথা

কণাদ মল্লিক (সভ্য, সিনিয়র)

রাত্রি নেমেছে রাজপুতানার দিগন্তপ্রসারী মরুস্থলীর বুকে। কিছুক্ষণ আগে অস্তায়মান সূর্যের লাল আভায় মরুভূমিকে এক বিশাল রক্তাক্ত রণক্ষেত্র বলে ভ্রম হচ্ছিল। স্বাধীনতা প্রেমী রাজপুত বীরদের দেশমাতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত রক্ত যেন বহু যুগের ওপার হতে আবির্ভূত হয়ে রাঙিয়ে তুলেছিল এই মরুপ্রান্তর। এখন, সেই মরুর বুকে নিকষ কালো আঁধার জমাট বাঁধছে। মাথার উপরে আকাশে তারা দেখা যায় কয়েকটা। বয়ে যাওয়া বাতাস আর বালির মধ্যে অস্ফুট 'ফিস্ ফিস্' স্বরে কত কী কথা হয়।

এক বৃদ্ধ রাজপুত ভদ্রলোকের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছি। বাড়িটা পাকা হলেও ইঁট, বালি সিমেন্টের গাঁথনি এর নয়, এ বাড়ির মেঝে, দেওয়াল, এমনকি ছাদ পর্যন্ত পাথরের তৈরি। পাথরের দেওয়ালে গর্ত করে জানলা ফোটানো হয়েছে—সেগুলোর কয়েকটাতে আবার কবাট নেই। আমার সামনের হা হা করা জানলাটা দিয়ে আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। খেয়াল হয় নি কখন বৃদ্ধ গৃহস্বামী একটা হ্যারিকেন হাতে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কথায় হঠাৎ চমক ভাঙল, "কী বাবুজী, রাতের মরুর চেহারা কেমন?" বললাম, "ভালো। বেশ নতুন রকম।" অত্যন্ত আলাপী আর সোজা সরল লোকটি, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি হবে, কিন্তু, কথা বলেন এমনি করে যেন আমার সমবয়সী। এঁর ছেলে কলকাতায় ব্যবসাপত্র চালায়। তাই আমার নিবাস কলকাতা শুনে খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নিয়েছেন আমাকে। সামনের চৌপায়াতে বসে তিনিও তাকালেন বাইরের ঘন হয়ে আসা পিচের মতো কালো অন্ধকারের দিকে। আকাশে এক টুকরো মেঘ ভেসে যায়—অন্ধকারে তার কায়া অদৃশ্য, কিন্তু তার আবরণে একেকটা তারা ঢাকা পড়ে, আবার এক একটা তারা বার হয়ে আসে তার আচ্ছাদন থেকে। বাতাসে ভেসে আসে এক অস্পষ্ট, অশ্রুত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা; কোথায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল ক'বার। বাতাসে ক্লান্ত মরুর উষ্ণ নিঃশ্বাসের গন্ধ। সহসা দেখলাম বহুদূরে কয়েকটা নীল আলোর ফুলকি দপ্ করে জ্বলে আবার মিটমিট করে জ্বলতে থাকল। মনে হল, রাতের মরুস্থলীর নির্জন, তৃষিত বুকে কেউ যেন প্রদীপ হাতে ইতস্ততঃ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবুজী, ঐ দূরে কয়েকটা আলো ঠাহর করতে পারছ?"

বললাম, "হাঁ জী, কিন্তু, কিসের আলো ওগুলো?"

বৃদ্ধ বললেন, "ও আলো ডাকুর আঁতমার আলো।"

এরপর, বৃদ্ধ শুনিয়েছিলেন ডাকুর গল্প :

অনেক অনেক বছর আগে আজকের মরুময় রাজপুতানা ছিল সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। তখনও অবশ্য এখানকার নাম রাজপুতানা হয়নি। তখন এ জায়গার তিনদিকে ছিল দুর্ভেদ্য অরণ্য আর একদিকে ছিল এক পাহাড়—আজ তা' আরাবল্লী নামে পরিচিত। এই অরণ্য পর্বত ঘেরা উর্বর অঞ্চলে বাস করত প্রাচুর্যে, সাহসে সমৃদ্ধ এক উপজাতি, কিন্তু ভাগ্যরথের চাকায় কেউ ওপরে ওঠে আর ওপরের জন পড়ে নীচে। এই নিয়মেই সুখ সমৃদ্ধ সেই জাতির ভাগ্যাকাশেও দুঃসময়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। পাহাড় অতিক্রম করে অপর এক শক্তিশালী জাতির লোকেরা আক্রমণ করে তাদের গভীর অরণ্যের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে গেল, কী গভীর সেই বন। সেখানে বড় বড় গাছের ডালপালার এমনি ঠাস বুনুনি যে সেই আচ্ছাদন ভেদ করে আকাশের একটা ছেঁড়া অংশও চোখে পড়ে না। সেই আবরণের মধ্য দিয়ে সূর্যালোকও এসে পৌঁছয় না জঙ্গলের মাটিতে আর খাল, বিল, জলাতে। সেই সমস্ত জলা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিষাক্ত বাতাস উঠে ছড়িয়ে পড়ত আশেপাশে। ভাগ্যহত, উদ্বাস্তু উপজাতিটির একটি একটি করে লোক সেই বিষের স্পর্শে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল। নারী ও শিশুদের বিলাপ আর যুবা-বৃদ্ধের অলস আক্ষেপের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবন সীমায়িত হল। তাদের সামনে ছিল দুটি পথ—শত্রুর হাতে ধরা দেওয়া অথবা জঙ্গল ভেদ করে তার অপর প্রান্তে উপনীত হওয়া। প্রথম পথের অর্থ ছিল আমৃত্যু দাসত্ব, দ্বিতীয় পথের ফলাফল ছিল পায়ে পায়ে পঙ্কিল খালবিল আর দৈত্যাকৃতি মহীরুহের দুর্ভেদ্য ভেদ করে অনিশ্চিতভাবে সামনে অগ্রসর হওয়া। পাথরের কঠিন প্রাচীরের মত বিশাল বিশাল গাছগুলো দিনের বিষণ্ণ আবছায়ার মধ্যে মানুষগুলোর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত যেন সেগুলো এই তাড়া খাওয়া মানুষের দলকে নিবিড়তর হয়ে ঘিরে ধরেছে। মুক্ত আলোবাতাসে বেড়ে ওঠা সেই মানুষগুলোকে নিষ্পেষিত করতে কালো কালো ছায়ারা যেন উদ্যত হয়ে উঠত। গাছের মাথার উপর দিয়ে হাহাকার করতে করতে দুরন্ত বাতাস যখন বয়ে যেত, তখন মনে হত, সমস্ত অরণ্য বুঝি মরণের সঙ্গীতে তান চড়িয়েছে। এই রকম জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে মুক্তি পেতে শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করার সাহস মানুষগুলোর ছিল, কিন্তু তাদের আশঙ্কা ছিল, ঐ অসমযুদ্ধে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের উপর অর্পিত ছিল পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব, কিন্তু যুদ্ধে তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হলে সেই ঐতিহ্যও চিরতরে হারিয়ে যাবে। সুতরাং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করা চলে না। এজন্য মুক্তির যথার্থ পথ ভেবে বার করতে করতেই তাদের দিন, তাদের রাত্রি, তাদের শক্তি, তাদের সাহস ক্ষয় হতে থাকল অবিশ্রান্ত গতিতে, রাতে যখন তারা আগুন জ্বালত, তখন সেই আগুনের লেলিহান শিখার ছায়া নৃত্য করত চারপাশের গাছের ডালে ডালে। মনে হত যেন নরকের অন্ধকার থেকে উঠে আসা অপদেবতার দল, বিষাক্ত পাঁকে পঙ্কিল খাল বিল জলা বিজয়ের উৎসবে মেতেছে। ক্রমে অন্ধকারের কারায় বন্দী সেই মানুষগুলোর মনে জন্ম নিল ভয়। সেই ভয়ের বিভীষিকায় তাদের শক্তি সামর্থ লোপ পেতে আরম্ভ করল। নিজেদের এই দুরবস্থার জন্য তারা ভাগ্যকে দোষারোপ

করতে লাগল। যুবকরা কাপুরুষের মতো কথা বলা শুরু করল—প্রথমে আড়ালে—আবডালে, তারপর প্রকাশ্যে। মৃত্যু তাদের কাছে এমন ভয়াবহ বোধ হল যে তাকে এড়াতে তারা মুক্ত জীবন বিসর্জন দিয়ে শত্রুর দাসত্ব করার কথা চিন্তা করতেও কুণ্ঠিত হল না, ঠিক এমনি সময় তাদের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়াল 'ডাকু'।

ডাকু তাদেরই একজন। কিন্তু নিরাশার বজ্রপেষণে অন্যান্যদের মত তার মন নিস্তেজ হয়নি, দেহ হয়নি স্থবির, তার মনের আশাপটের সবটুকু ছেয়ে যায়নি ব্যর্থতার কালিতে। সে ডাক দিল, "মাভৈঃ, ওঠো জাগো, শুধু অলস চিন্তায় লাভ কী, জাননা কি, যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে? মনে সাহস আন, এই বন পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে খোলা আকাশের নীচে আলোর সভায়। চলো যাই···।"

সকলে ডাকুর দিকে চাইল, দেখল তার চোখের দীপ্তি, অনুভব করল তার হৃদয়ের সজীবতা, মনে মনে তারা স্বীকার করে নিল তার শ্রেষ্ঠত্ব। ডাকুকে তারা বললে, "আমাদের পথ দেখাও।"

ডাকু পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। বাকীরা করে তার অনুসরণ। এ যাত্রা অতি ভয়ঙ্কর। এখানে পায়ে পায়ে ওৎ পেতে আছে কত অচেনা অজানা বিপদ আর বিষাক্ত খাল-বিল-জলা। বনের গাছগুলো যেন যাত্রীদেব সামনে দেওয়াল তুলে দাঁড়ায়—সেগুলোর শেকড় অসংখ্য সাপের মত এঁকেবেঁকে চারিদিকে বিস্তৃত। যাত্রীরা যত এগোয় জঙ্গল হয় গভীর আরও গভীর, তাদের শরীর অবসন্ন। পা চলে না। ডাকুর বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। তারা বলে যে পথ দেখাবার কোন যোগ্যতাই নেই ওর। তবুও, ডাকু এগিয়ে চলে, ভয় তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

একদিন অরণ্যের আকাশ বাতাস ঝড়ের তাণ্ডবে উত্তাল হয়ে উঠল। চতুর্দিক এমন ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল যে মনে হল ঐ অরণ্যের শত শত বছরের রাতের মিলিত আঁধার জমা হয়েছে সেই অন্ধকারে। গাছগুলোর অবিশ্রান্ত দোলে যেন কোন অশুভ সঙ্গীতের সুর; আকাশের বুকে বিদ্যুতের কশাঘাত—এরই মধ্যে যাত্রীদল পথ চলে, বজ্রবিদ্যুতের হিমশীতল নীল আলো তাদের দেহের শিরায় শিরায় ভীতির শিহরণ সঞ্চার করে। মরণ ফাঁদে বন্দী পশুর মতই তারা মুক্তির পথ সন্ধানে ক্লান্ত, আশাহত।

হঠাৎ যাত্রীদের একজন থমকে দাঁড়াল, ঝোড়ো গর্জন আর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত মাদলের শব্দের মধ্যেই তার শুষ্ক কণ্ঠ থেকে ডাকুর উপর শত ধারায় তিরস্কার বর্ষিত হল। যাত্রীদের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল তা। তাদের মতে, ডাকুই তাদের পথের অসহ্য-দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী। তারা ডাকুর মৃত্যু কামনা করল মনে প্রাণে।

ঘুরে দাঁড়াল ডাকু, হেঁকে সে বলল, "তোমরা আমাকে বলেছিলে পথ দেখাও, আমি পথ দেখিয়েছি। তোমাদের পথ দেখানোর সাহস আমার আছে বলেই এই কঠিন কাজের ভার আমি নিয়েছি; কিন্তু তোমরা? তোমরা একপাল ভেড়া। শক্তি সাহস সঞ্চয় না করেই অন্ধের মত আমার পিছন পিছন চলেছ।"

ডাকুর কথা যাত্রীদের আরও ক্ষুব্ধ করে তুলল। 'তুই মরবি, তুই মরবি'—তাদের অভিসম্পাত ছাপিয়ে আকাশের বুকে বজ্রের গুরুধ্বনি জেগে উঠল, বিদ্যুতের চমকে চমকে সীমাহীন অরণ্য অন্ধকারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ডাকু এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার ভ্রাত ভাইদের দিকে। এদেরই জন্য সে মাথায় তুলে নিয়েছে বিপদের বোঝা। তার মনে হল তারা যেন এক একটা হিংস্র শ্বাপদ। তাদের চোখে মানুষের চাহনি কই? তারা ডাকুর চারিদিকে আরও ঘন হয়ে এগিয়ে এল—চোখে তাদের জান্তব ক্রুরতা। ডাকুর বুকের মধ্যে একটা চাপা ক্রোধ ঢেউ খেলিয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সমবেদনার অশ্রুতে তার মন ভরে গেল। সে ঐ মানুষগুলোকে, ঐ অসহায় মানুষগুলোকে ভালবাসত আর তাই তাদের রক্ষা করার ইচ্ছা হোমাগ্নির মত জ্বলে উঠল তার হৃদয়ে। বক্ষপিঞ্জরের অন্তরের সেই শিখা প্রতিফলিত হল ডাকুর চোখের তারায় তারায়। এই দেখে যাত্রীরা মনে করল ডাকু বোধ হয় রেগে উঠেছে, আর সেই জন্য তার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। তারা ঠিক করল ডাকু কিছু করার আগেই তারা সকলে মিলে তাকে হত্যা করবে। ডাকু তাদের ভাব বুঝতে পারল, এতে তার মনের আগুন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অরণ্য করুণ সুরে গান গেয়েই চলল, কড় কড় শব্দে বাজ পড়তে লাগল তার সঙ্গে মুষল ধারে বৃষ্টি।

বজ্রনির্ঘোষকে ছাপিয়ে ডাকু চীৎকার করে উঠল, "তোদের জন্য কী করতে পারি আমি?"

সহসা হাঁটু গেড়ে বসল ডাকু তীক্ষ্ণ নখাঘাতে চিরে ফেলল নিজের বুক, ছিঁড়ে বার করে আনল তার শিখাময় হৃদয়, মাথার উপর তুলে ধরল সেটাকে। সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল ডাকুর হৃদয়, তীব্র আলোর বন্যায় অরণ্যের আঁধার নিমেষে সরে গেল। এ আলো মানুষের প্রতি তার ভালবাসার আলো, বিস্ময়ে যাত্রীরা যেন পাথর।

ডাকু ডাক দিল, "আমাকে অনুসরণ কর।" মাথার উপর জ্বলন্ত হৃদয় তুলে ধরে সে ছুটে চলল মুক্তির পথ দেখাতে। যেন কোন যাদু মন্ত্রে আবিষ্ট হয়ে যাত্রীরা তাকে অনুসরণ করল।

বিস্মিত বনভূমি অস্পষ্ট গুঞ্জনে মুখরিত, কিন্তু সে শব্দ শত মানুষের পদধ্বনির তলায় চাপা পড়ে মরে গেল।

হঠাৎ ডাকুর সামনের নিরন্ধ্র অরণ্য দুফাঁক হয়ে যাত্রীদের পথ করে দিল, পলকের মধ্যে তারা যেন আলোর সাগরে ডুব দিল। সূর্যের অকৃপণ আলোক ধারায় তাদের চোখ, বৃষ্টি ধোওয়া বাতাসে তাদের মন প্রাণ পরিপূর্ণ। তারা দেখল হীরের কুচির মতো শিশিরকণা লেগে আছে ঘাসে ঘাসে আর যে দিগন্তব্যাপী সবুজ প্রান্তরে তারা দাঁড়িয়ে তার বুক চিরে বয়ে চলেছে এক নদী, তার জল যেন গলান সোনার ধারা। পেছনে চেয়ে তারা দেখল, সেই মহারণ্য দাঁড়িয়ে আছে, জীবন্ত দুঃস্বপ্নের মত, তার উপর তখনও উল্লাসে নৃত্য করছে প্রবল বর্ষণ।

মুক্তির আনন্দে যাত্রীরা এমন আত্মহারা হয়ে উঠেছিল যে ডাকুর কথা সকলেই ভুলে গেল। তৃণের পলকে, উষ্ণ রক্তের শয্যায় শুয়ে অসীম সাহসী ডাকু দু'চোখ ভরে দেখল উদার প্রান্তরকে—মূর্তিমান মুক্তিকে। তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটা গভীর তৃপ্তির হাসি উঠে তার মুখে মাখিয়ে দিল এক অপার্থিব প্রশান্তি। ডাকু চোখ বুজল—সে নিদ্রা আর তার ভাঙল না, কেবল তার মৃতদেহের পাশে

ভাস্বর হয়ে রইল শিখাময় হৃদয়। দুবলা, পাতলা একটা ছোট ছেলের চোখে পড়ল সেটা। ওটা যে কি হতে পারে তা তার মাথায় এল না, তাই কি হয় দেখার জন্য সে ডাকুর জ্বলন্ত হৃদয় পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই হৃদয় শত সহস্র ফুলকি হয়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

ডাকুর মৃত্যুর পর বহু বহু যুগ কেটে গেছে, কিন্তু আজও যখন নিশুতি রাত গভীর হয়ে চেপে বসে মরুর বুকে তখন ডাকুর হৃদয়ের ভগ্নাংশে সেই ফুলকি গুলোকে দেখা যায় দূর বহু দূর থেকে।

বৃদ্ধ তার কাহিনী শেষ করলে চতুর্দিকের পরিবেশ আমার অস্বাভাবিকরকম নিস্তব্ধ বোধ হল। যে ডাকু নিজের জীবনের বিনিময়ে আর পাঁচজনের জীবনকে নিশ্চিন্ত করেছিল, কিন্তু, কোন কিছু প্রত্যাশা করে নি, সেই ডাকুর কথা শুনেই প্রকৃতি বোধহয় নির্বাক। বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন, বাইরে তখন আবছা জ্যোৎস্নায় দূর থেকে দূরে প্রসারিত মরু ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। বাতাসের সর সর শব্দের মধ্য দিয়ে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলে আর বলে……।'

[ম্যাক্সিম গোর্কির 'ইজারগিল' গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

বাণিজ্য

প্রদীপ হালদার (সভ্য, ১৩)

'কুরুবা কুরুবা কুরুবা নিহো'
শুনলে যেতে হয় বাণিজ্যে।
কিনবে কি? বেচবে কি?
নয়কো ভেজাল, নয় মেকী।
বেচবে সোনা, কিনবে দানা
আর একটা পাখির ছানা।
কেমন পাখি? হরবোলা?
না, না, শুধু লেজঝোলা।
খায় তো গোনাগুণতি দানা
তবু কেবল কাঁপায় ডানা।
পায়ে বাঁধা শিকলিটা
ঝনৎ ঝনৎ নড়ে—
চোখ দুটি যার নীল, ছুটি
রাখবে তাকে ধরে?'
এই লোকসান বাণিজ্যে
না মানে যে, খারিজ সে।

ডাঃ বি, সি, রায় জন্মশতবর্ষ উৎসব প্রতিপালন

প্রতিবারের মত ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি ডাঃ রায়ের জন্মদিন ১লা জুলাই-এ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাল, তবে এবারের আয়োজন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, কারণ, এ বছর হল ডাঃ রায়ের জন্মশত বার্ষিকী উৎসব এবং এই দিনটি হল উদ্বোধনী দিবস। সারা বছর ধরে উৎসব হবে, এদিন হল তারই সূচনা।

১লা জুলাই থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত বিধান শিশু উদ্যানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হল।

১লা জুলাই সকাল সাড়ে সাতটায় ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির সদস্য ও শিশু উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের উপস্থিতিতে ডাঃ রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই সমাবেশে ডাঃ রায় সম্বন্ধে কিছু বলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। তাঁর বক্তব্যের পর শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েরা ব্যাণ্ড সহকারে পথ পরিক্রমা করে। পথ পরিক্রমার পর কিছু সভা-সভ্যা, কমিটির কয়েকজন সদস্য ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল শিশু হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ ভাই-বোনেদের শুভেচ্ছা কার্ড, লজেন্স ও বই দিয়ে আসে।

বিকেলবেলার চারটের অনুষ্ঠানে ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। এদিনের সভায় ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী বসন্ত শাঠে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ও রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। রাষ্ট্রপতির মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানের সভ্য-সভ্যারা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ওঠে। রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মন্ত্রীমহোদয়গণ ও ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির সদস্যরা একে একে ডাঃ রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের মাল্যদান করে উদ্যানের ছোট্ট সভ্যারা। সভার প্রথমে সকলকে স্বাগত জানান ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ। বিধান শিশু উদ্যানের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন সম্পাদক অতুল্য ঘোষ। বার্ষিক হিসেব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অনিল চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশের শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নতির স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নকে সফল করার মধ্য দিয়েই হবে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।' মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'আমি ওঁর বিরোধী ছিলাম। বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে অনেকবারই ওঁর বিরুদ্ধে লড়েছি। ওনার সঙ্গে মতের অমিল হয়েছে। কিন্তু, কোন সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে দেখিনি। রাজ্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডাঃ রায়ের একটা ভূমিকা ছিল। সমাজসেবা

চিকিৎসক হিসেবে রোগীর রোগ নিরাময় করতেন।' কেন্দ্রীয় ও রাজ্যমন্ত্রীরা ডাঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। সবশেষে, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে বলেন, 'ডাঃ রায় শুধু পশ্চিমবাংলার ভাগ্যকে গড়েননি, সারা ভারতের শীর্ষ পুরুষদের মধ্যে তিনিও একজন। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিধানচন্দ্র স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অনেকদিন তাঁর অবদানকে মানুষ মনে রাখবে। তিনি ছিলেন বাংলার রূপকার। চিকিৎসক হিসেবে ডাঃ রায়
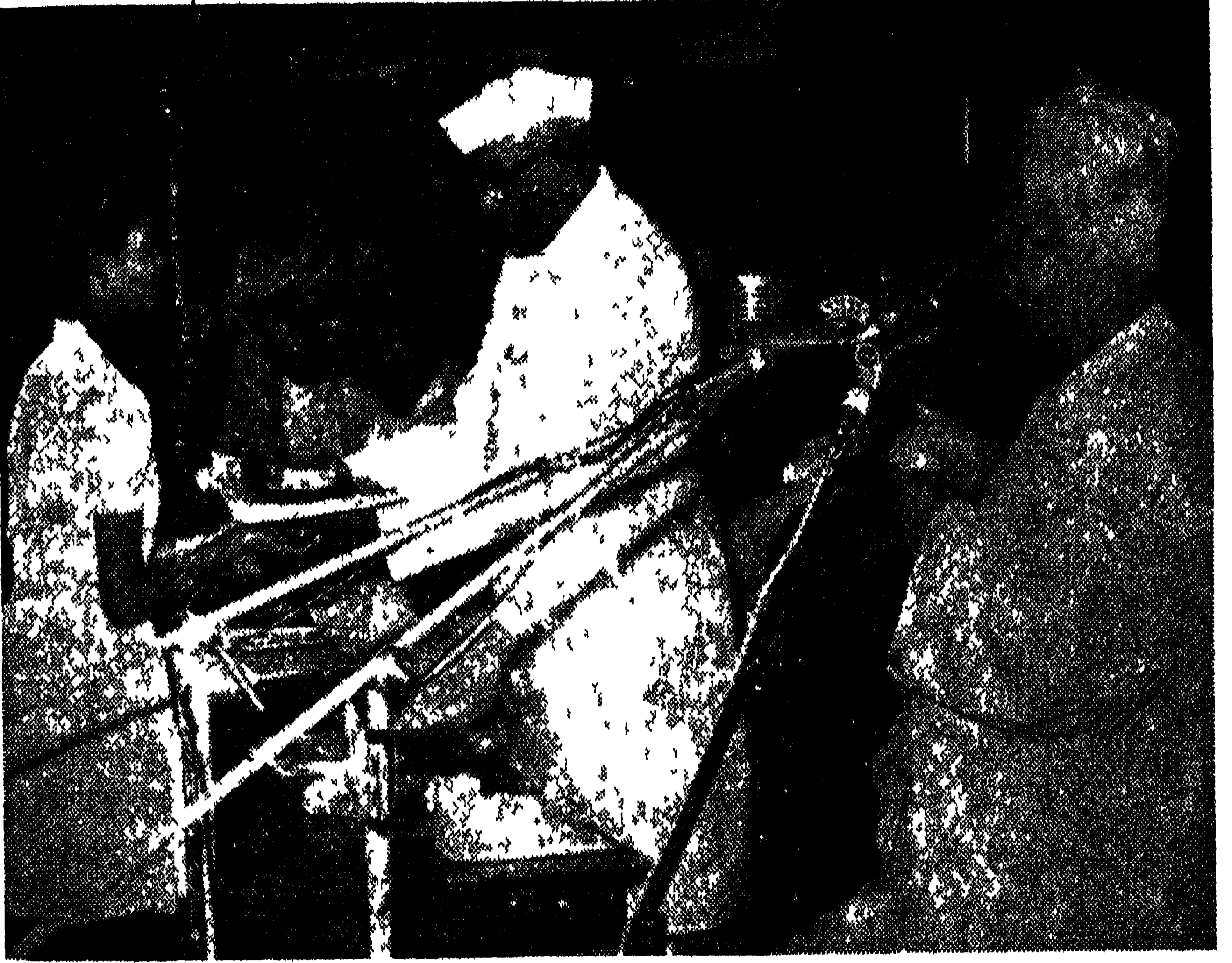
মানুষের সেবা করে গেছেন।' ভাষণের পর উদ্যানের বিভিন্ন বিভাগের বৃত্তিপ্রাপকদের রাষ্ট্রপতি পদক, বৃত্তি, উত্তরীয় ও মানপত্র দান করেন। শতবার্ষিকী কার্যক্রমের বিশেষ বৃত্তি—মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী সুঞ্জয় ঘোষ ও মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত সুচরিতা মুখোপাধ্যায়কে যে বৃত্তি দেওয়া হবে, তাতারা গ্রহণ করল রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। উদ্যানের সভ্য-সভ্যা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অংশুমান আচার্যকে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কুশলতার জন্য এক বছর মাসিক ৪০ টাকা হিসেবে বৃত্তি দান করেন রাষ্ট্রপতি। বৃত্তি প্রদানের পর সমবেত উদ্যান সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে চারটের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এরপরে, রাষ্ট্রপতি বৃত্তিপ্রাপকদের সঙ্গে জলপান করেন।

সন্ধ্যা ছ'টা তিরিশ মিনিটে বিধান কলাকেন্দ্রের সভ্য-সভ্যরা নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে বর্ষামঙ্গল মঞ্চস্থ করে। ২রা জুলাই ছিল ছোট ছোট শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। আমন্ত্রিত শিল্পীরা ও উদ্যানের সভ্য-সভ্যরা সংগীত পরিবেশন করে।

৩রা ৪ঠা ও ৫ই জুলাই বিধান কলাকেন্দ্রের সভ্য-সভ্যারা রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'অরূপরতন' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয় করে।

শুধুমাত্র পাঁচদিনেই এবার জন্মোৎসবের কার্যসূচীর শেষ নয়, জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় ৩০শে জুন, উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী বসন্ত শাঠে। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য। শ্রী শাঠে তাঁর ভাষণে বলেন যে, ডাঃ রায় শুধু বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ও প্রশাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলার রূপকার। তিনি সুদক্ষ চিকিৎসকের মত মুমূর্ষু শিল্পকে সঞ্জীবিত করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে স্ব-নির্ভর করেছেন, এবং শিক্ষাকে নতুন দিগন্তের পথে এগিয়ে নিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ ভট্টাচার্য বলেন যে, ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদক অতুল্য ঘোষ ডাঃ রায়ের বিস্ময়কর কর্মদক্ষতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, পশ্চিমবাংলার উন্নয়নে আমরা নিজেরা কতটা যোগ্য সে বিচার করতে হবে। শ্রীঘোষ বলেন যে, দেশবিভাগের পর পশ্চিমবাংলার তীব্র সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হবার পর কোষাগারে অর্থ ছিল না। সেই সংকট মুহূর্তেই তিনি পশ্চিমবাংলাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। কমিটির সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ ও সহ-সভাপতি অশোককুমার সরকার ডাঃ রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এই প্রদর্শনীতে মাটির পুতুলে ডাঃ রায়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনী, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও শিল্প ও কুটীর শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ২১ জুলাই পর্যন্ত প্রদর্শনী চলেছিল।

ডাঃ রায়ের জন্মোৎসবে বিধান শিশু উদ্যান সেজেছিল অভিনব সাজে। গাছে গাছে পাতায় পাতায় আলোর ঝিকিমিকি। লোক সমাগমে সারা উদ্যান ভরপুর। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোলাহলে সর্বদাই উদ্যান মুখরিত ছিল।

সবাই মায়ের সন্তান, সকলকে কোলে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত, তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন। —আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভারতই মহাভারত

শ্রীহর্ষ মল্লিক

সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় ভারতের স্থান খুবই ছোট। এ যেন মহাকাশের অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে পৃথিবীর স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা। অবশ্য সমগ্র সৌর জগতের তুলনায় পৃথিবী গ্রহ হয়ত তেমন একটা কিছু নয়, কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য দেশের মধ্যে ভারত তেমন কিছু না হয়েও একটা বিশেষ কিছুর অধিকারী।

আসলে ভারতকে যারা ছোট ছোট বলে প্রচার করেন তারা শুধু সেটা এ দেশের বলে ভেবেই বলেন। পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখা যাবে ভারত তেমন কিছু একটা ছোট বা হীনদেশ নয়। অনেক ব্যাপারেই সে বেশ এগিয়ে আছে।

অর্থ নৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারগুলো না হয় বাদই দেওয়া গেল। শুধু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট নিয়ে বিচার করলেও ভারত হবে জয়ী।

পৃথিবীর নবীনতম ভঙ্গিল পর্বতটি যে এদেশেরই উত্তর সীমান্ত বরাবর এ কথা তো সবারই জানা। আর সেটাই যে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা। এ তো স্কুলের ছেলেরাও বলতে পারে। পৃথিবীর আর কোন্ দেশ এ নিয়ে গর্ব করতে পারে?

পৃথিবীর যে সব অঞ্চল গঠনের দিক থেকে প্রাচীন বলে দাবী করতে পারে, ভারতের দাক্ষিণাত্য যে তার একটি এটাও তো ভাবা দরকার। শুধু তাই নয়। আরাবল্লী পর্বত যে বিশ্বের প্রাচীন পর্বত গুলির অন্যতম সেটা ভেবেও কি আমরা গর্ব করতে পারি না।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপটা য়ুরোপ বা আমেরিকায় নয়, আছে এশিয়াতেই এবং তা এই ভারতেই। ব-দ্বীপ হিসাবে সুন্দরবনের খ্যাতি পৃথিবীতে আজ সবারই জানা।

নীল, ড্যানিয়ুব, মিসিসিপি প্রভৃতি নদীও তো মোহনায় ব-দ্বীপ গঠন করেছে, কিন্তু আমাদের গঙ্গা-পদ্মার মত বড় ব-দ্বীপ তারা কেউ নয়।

ভৌগোলিক ব্যাপার বলতে গেলে নদীর কথা এসে যাবেই। অবশ্য এ দেশের কোন নদীই দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর কোন দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। কিন্তু গঙ্গা নদীর তুল্য নদী পৃথিবীতে নাকি কোথাও নেই-একথা বলেন বিশ্বের ভূ-বিজ্ঞানীরা।

কেন? সেটা কি দৈর্ঘ্য বিচারে অথবা জল প্রবাহের কথা ভেবে? কোনটাই নয়। আসলে আদর্শ নদী বলতে যা বোঝায় গঙ্গা হল ঠিক তাই। এর পার্বত্য গতি সমভূমির মোহনার গতি এত সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে গঠিত যে নদী বিষয়ক পড়াশোনার জন্য ভূ-বিজ্ঞানীদের বার বার তাই এই নদীর শরণাপন্ন

হতে হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশের নদীতেই নাকি উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো এত স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না।

আর এত বিস্তীর্ণ পলিগঠিত সমভূমি? পৃথিবীর অনেক দেশেই তা আছে—সাইবেরিয়ার সমভূমি তো বিখ্যাত। কিন্তু সমগ্র আয়তনের তুলনায় ভারতে যে পরিমাণ বিস্তীর্ণ সমভূমি আছে তা দেখে অনেক দেশই ঈর্ষা বোধ করে।

ভারত ছাড়া আর কোন্ দেশের সীমারেখা এত সুস্পষ্ট ভাবে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত? একদিকে পর্বত, একদিকে মরুভূমি, একদিকে সাগর পৃথিবীর খুব অল্প দেশই এই প্রাকৃতিক সীমা পেতে পেরেছে। সেদিক থেকে ভারত এগিয়ে আছে বৈকি।

শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যতম মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত দেশ বলে কি ভারত গর্ব করতে পারে না। পৃথিবীর কটা দেশেই বা মৌসুমী বায়ুর আনা গোনা, ভারত তারই অন্যতম প্রধান।

মহাদেশ তো পৃথিবীতে অনেকগুলি, কিন্তু উপমহাদেশ শব্দটার অর্থ যাই হোক না কেন বলতে গেলে গোটা পৃথিবীতে মাত্র একটি দেশই আছে তা হল ভারত, একমাত্র ভারতের জন্যই ঐ শব্দ তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ মহাদেশের মত বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা বাস করি—এটা কি কম গৌরবের?

প্রাকৃতিক ভূগোল যাক—না হয় অর্থনৈতিক ভূগোলের কথায় আসা যাক। এ দেশটার অর্থনৈতিক কাঠামো যে মোটেই তেমন সবল নয়, তা তো নিত্য সংবাদপত্রেই দেখছি। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন করে কোন্ দেশ? এখন অবশ্য পাটের অনেক বিকল্প বেরিয়েছে তবে ভারতীয় পাটের চাহিদা ততটা নেই। কিন্তু বিশ্বের সমগ্র চটকলের শতকরা প্রায় ৯৫ টাই এই ভারতেই—এ কথা তো আর অস্বীকার করা যাবে না।

আর অভ্র উৎপাদনে—বিহারের খ্যাতি তো সেই কবে থেকে। পৃথিবীর আর কোন দেশ এত অভ্র উৎপাদন করতে পারে নি—পারবে না।

দেশের আয়তনের তুলনায় ভারতে কয়লা আনবিক ধাতু ইত্যাদির যে সঞ্চয় আছে অন্ততঃ বিজ্ঞানীরা-যা বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই নাকি তা নেই।

অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও ভারত যথেষ্ট এগিয়ে আছে। ধর্ম যদি সংস্কৃতির অঙ্গ হয় তো বলতেই হবে যে পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাস এ দেশেই। ভারতের বাইরে আর কটা দেশেই বা হিন্দুরা বসবাস করেন। পৃথিবীতে যে কয়টি মহাকাব্য আজ পর্যন্ত রচিত হয়েছে তার মধ্যে দুটিই হল ভারতের সৃষ্টি—রামায়ণ আর মহাভারত। পৃথিবীতে যে কটি প্রাচীন মানব সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতা তা তার অন্যতম। একদা এই স্থান ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে তা হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তবু এ জন্যও ভারত গর্ব বোধ করতে পারে বৈকি!

শুধু তাই নয়, দেশের আয়তনের তুলনায় এত জনসংখ্যা পৃথিবীর কম রাষ্ট্রেই দেখা যায়। সেই সঙ্গে এ ভারতের এত ভাষা এত ধর্ম এত পোষাক বৈচিত্র্য এত খাদ্য বৈচিত্র্য ইত্যাদি সব কথারই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আসলে নিজের দেশ নিয়ে গর্ব করার মত ভারতের অনেক কিছুই আছে। কিন্তু শুধু গর্ব করলেই হয় না। দেশটাকে ভাল করে জানতে-হয়। দেশের সম্পদগুলিকে ভাল করে ব্যবহার করতে হয়। দেশের সমস্যাগুলিকে—ঠিক ভাবে খুঁজে বের করে সম্পদের প্রয়োগ করে সে সব সমস্যার সমাধান করতে হয়—তবেই না যথার্থ গর্ব করার কারণ ঘটে! প্রাকৃতিক সম্পদে এই দেশ এত সমৃদ্ধ যে পৃথিবীর বহু দেশই-তাই একে ঈর্ষা করে। ইতিহাসে তাই দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের উপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়েছে—সে কি শুধু রাজ্য জয়ের লোভে—না দেশটাকে লুণ্ঠন করার জন্য?

এসব কথা মনে রেখে দেশটাকে জানবার চেষ্টা করলে এবং অযথা অন্যের অনুকরণ না করে নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবতে শিখলে তবেই দেশ নিয়ে গর্ব করতে প্রকৃত অধিকার জন্মায়। নচেৎ ঐ গর্ব একটা কাঁচের মিনারের মতই হয়ে থাকবে।

তাই বেদব্যাস মুনির লেখা মহাভারত নয়, এই ভারতই হল আমাদের মহাভারত। এটা মহাদেশ না হলেও উপমহাদেশ ত বটেই!

আনন্দ সংবাদ

উত্থানের সভ্য শ্রীমান মানব নন্দী এ বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং দুই ক্ষেত্রেই প্রবেশাধিকার পেয়েছে। উত্থানে খেলাধুলায় বৃত্তি পেয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় জাতীয় বৃত্তিলাভ করেছে। সবচেয়ে বড়কথা, ডাঃ বিধান রায় জন্মশতবর্ষে ডাঃ রায়ের মতই দু'জায়গায় প্রবেশাধিকার পাওয়ার সুযোগ। ডাঃ রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই আশীর্বাদে জীবনে সাফল্য লাভ করুক এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

দেবী গঙ্গা ঃ বাহন মকর

প্রণবেশ চক্রবর্তী

গঙ্গা নদীকে আমরা মা বলেই জানি। তিনি আমাদের মাতৃভূমিকে পলিমাটি দিয়ে উর্বরা করেছেন, জল দিয়ে সজীব করেছেন এবং পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা করে সমৃদ্ধ করেছেন। মা যেমন সন্তানকে লালন পালন করেন, মা গঙ্গাও তেমনি আমাদের লালন পালন করেন। সেইজন্যই তিনি আমাদের মা আর সেইজন্যই গঙ্গার জল আমাদের কাছে এত পবিত্র। এই গঙ্গার ধারে ধারে কাশী থেকে দক্ষিণেশ্বর—কত তীর্থস্থান। গঙ্গা স্নান তাই তীর্থস্থানের মতই পবিত্র। সরস্বতী নদীর মতই গঙ্গাও বৈদিক যুগের সর্বজন পুজিতা নদী।

এই গেল একদিক। অন্যদিকে গঙ্গা আমাদের অন্যতম দেবী। ঋক বেদের দশম মণ্ডলের যমুনা, সরস্বতী, বিতস্তা, শতদ্রু ইত্যাদি নদীর নামের সঙ্গে গঙ্গার নামও পাওয়া যায়। দেবী গঙ্গা কী রকম দেখতে? কেমন তাঁর মূর্তি? এমন প্রশ্ন অনেকেরই মনে দেখা দিতে পারে। কারণ, গঙ্গা পুজা আমাদের সমাজে তেমন প্রচলিত নয়। দেবী গঙ্গার চার হাত, তিনটি চোখ। এক হাতে কলস ধরে আছেন, আরেক হাতে পদ্ম। এক হাত দিচ্ছে বর, অন্যহাত অভয়। তার সারা দেহে অলঙ্কার, পরনে সাদা শাড়ি। হাজার হাজার চাঁদ যতটা আলো দিতে পারে, গঙ্গা দেবীর প্রভা তার চাইতেও বেশি এবং তিনি অপরূপ সুন্দরী।

গো শব্দের অর্থ পৃথিবী। গো শব্দের দ্বিতীয়বার এক বচনে হয় গাম্। গাম্ থেকে গাং আর এই গাং কথাটা (গম্ + ড + আপ) থেকেই গঙ্গা শব্দের উৎপত্তি। গঙ্গা মানে, যিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন। গঙ্গা কোথা থেকে এসেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় পুরাণে। পৃথিবীকে উদ্ধার করতে গঙ্গা এসেছেন ব্রহ্মলোক থেকে।

রামায়ণের কাহিনী থেকে জানতে পারি, গিরিরাজ হিমালয় গঙ্গার পিতা, মাতা হচ্ছেন মেনকা। উমা ও গঙ্গা দুই বোন। আবার অন্য এক পুরাণ কাহিনীতে দেখি, বিষ্ণুর তিনজন পত্নী-লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা। একদিন সরস্বতী এবং গঙ্গার মধ্যে দারুণ ঝগড়া লেগে গেল, কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। শেষ পর্যন্ত রাগে গড়গড় করতে করতে সরস্বতী গঙ্গাকে অভিশাপ দিলেন: তুমি একটা নদী হয়ে যাও। এই অভিশাপ শুনে গঙ্গারও তখন মাথার ঠিক নেই। তিনিও পাল্টা অভিশাপ দিয়ে বললেন, শুধু আমি নই, তুমিও নদী

হবে। লক্ষ্মী দু'জনকে কত বোঝালেন, অনুনয় বিনয় করলেন—কিন্তু কেউ অভিশাপ ফিরিয়ে নেবেন না। শেষ পর্যন্ত এই অভিশাপের ফলেই পৃথিবীর লাভ হল। আমরা পেলাম গঙ্গা ও সরস্বতীর মত দুটি পবিত্র নদী। কোন কোন পুরাণে গঙ্গাকে শিবের পত্নী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার বিয়ে হয় শান্তনুর সঙ্গে এবং তারই পুত্র মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্ম। তাঁকে তাই বলা হয় ভীষ্মজননী।

গঙ্গার পৃথিবীতে আসার ব্যাপারে রামায়ণে একটা কাহিনী আছে—যে কাহিনীটা খুবই পরিচিত। এক সময় অযোধ্যার রাজা ছিলেন সগর। সগরের ছিল দুই রাণী এবং ষাট হাজার এক পুত্র। সগরের এক নাতি অংশুমান।

তিনি রাজার খুব প্রিয় ছিলেন। রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞের ঘোড়াটি নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিলেন পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে। সগরের ষাট হাজার পুত্র ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে পৃথিবী খুঁড়তে লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পাতালে প্রবেশ করে দেখেন কপিল মুনির আশ্রমে সেই ঘোড়াটি আছে। তাঁরা ভাবলেন, কপিল মুনিই ঘোড়াটি লুকিয়ে রেখেছে। তাই তারা মুনিকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে কপিলের অভিশাপে সগরের ষাট হাজার পুত্র সেখানে একেবারে ছাই হয়ে গেল। এদিকে সগরের নাতি অংশুমান এসে দেখেন এই ভয়াবহ দৃশ্য। তাঁর কাকা-জেঠা কেউ বেঁচে নেই—সব ছাই। শেষ পর্যন্ত গরুড় বললেন, যদি স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে আসতে পার, তবে সেই পবিত্র জলের ছোঁয়ায় ষাট হাজার পুত্র বেঁচে উঠতে পারেন।

এভাবে কেটে গেল ত্রিশ হাজার বছর। সগরের পর রাজা হলেন অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, আর দিলীপের পুত্র ভগীরথ। সকলেই ভাবছেন, কী করে সগরের ষাট হাজার পুত্রকে বাঁচান যায়। শেষ পর্যন্ত ভগীরথ গঙ্গাকে আনার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর তপস্যায় খুশি হয়ে ব্রহ্মা বললেন, ঠিক আছে, গঙ্গা যাবেন পৃথিবীতে, কিন্তু গঙ্গার বেগ ধারণ করবে কে? শেষে ভগীরথ তপস্যা করে মহাদেবকে রাজি করালেন তাঁর জটাজাল দিয়ে গঙ্গার ধারাকে ধারণ করতে। শিব গঙ্গাকে জটা দিয়ে জড়িয়ে ফেললেন। পরে ভগীরথের আবেদনে গঙ্গাকে ছেড়ে দিলেন বিন্দু সরোবরে। গঙ্গার একটি ধারা স্বর্গে প্রবাহিত, তার নাম মন্দাকিনী। একটি ধারা পাতালে প্রবাহিত, তার নাম ভাগবতী, আর ভগীরথ যে ধারাটি পৃথিবীতে আনলেন, তার নাম হল ভাগীরথী। জহ্নুমুনির কান থেকে গঙ্গার মুক্তি হয়েছিল বলে তার আর এক নাম জাহ্নবী। পরে গঙ্গার ধারা সাগরসঙ্গমে এসে মিলিত হয়ে ষাট হাজার সগর পুত্রকে উদ্ধার করেন। তাই প্রতি বছর সাগরসঙ্গমে গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হন লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গঙ্গা মহাশক্তিময়ী মহাদেবী। এই মহাদেবীর বাহন হচ্ছে মকর। গঙ্গার বাহন মকর কেন? দেবী দুর্গার বাহন হচ্ছে সিংহ—একথা আমরা জানি। আসলে স্থলে যেমন সিংহ, জলের তেমনি মকর। সিংহের মত মকরও মহাশক্তিধর। গঙ্গাও মহাশক্তির প্রতীক। আবার এই মকরই মুক্তিকামী মানুষের প্রতীক। জলে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে উপরে ভেসে উঠে একটু আলো চায়, একটু বাতাস চায়, একটু মুক্তি চায়। তাই সে গঙ্গার অনুগামী—যে কিনা মহাসাগরের যাত্রী। মক শব্দের অর্থ গমন করা, র কার এক মহাশক্তি। সেই মহাশক্তিকে গঙ্গা রেখেছেন পদতলে।

হাতের কাজ

শেখ ও শেখাও

উপকরণ

কিছুটা এঁটেল মাটি।

কয়েকটা খবরের কাগজ ও সাদা কাগজ

বেশ কিছুটা গঁদের আঠা (অন্য কোন আঠা হলেও চলবে),

রং বার্নিশ।

রাবারের দড়ি।

এখন আমরা শিখব ছাঁচের সাহায্যে মুখোশ তৈরি করা। এস, আগে আমরা ছাঁচটা তৈরি করে নি। প্রথমে কিছুটা এঁটেল মাটি সংগ্রহ কর। মাটিটাকে ভাল করে মেখে নাও। তারপর ঐ মাটি দিয়ে তোমার ইচ্ছামত রাক্ষস কিম্বা প্রাণীর মুখ তৈরি করে নাও (দেখ যেন চোখ, নাকগুলো বেশ উঁচু উঁচু হয়)। এবার কিছু খবরের কাগজ টুকরো টুকরো করে কেটে নাও। কি হল, কাট! হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু লম্বা হবে টুকরোগুলো। এবার একটা ছোট গামলায় কিছুটা জল নাও। কাটা কাগজ গুলোর কিছু কাগজ ঐ জলে ফেলে দাও। এবার তৈরি করব মুখোশ। মাটির ছাঁচটির উপর এবার ভেজান কাগজগুলো লাগাতে থাক যতক্ষণ না সমস্ত ছাঁচটা ঢেকে যায়। আস্তে আস্তে লাগাও তাড়াতাড়ি কোর না। আচ্ছা, এবার ঐ কাগজগুলোর উপর আস্তে আস্তে গঁদের আঠা লাগাও যেন কাগজগুলো সরে না যায়। এবার ওটাকে রোদে দিয়ে কিছুটা শুকিয়ে নাও। এবার কিছু শুকনো টুকরো কাগজে আঠা লাগিয়ে ছাঁচটার উপর আস্তে আস্তে লাগাও যেন গোটা ছাঁচটাকে পুনরায় কাগজে ঢাকা যায়। এইভাবে কাগজ গোটা ছাঁচটাতে নয় থেকে দশবার লাগাও। এবার ওটাকে রোদে দিয়ে কিছুটা শুকাও যেন কিছুটা ভিজে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে কাগজ ধরে টান দাও দেখবে মাটির ছাঁচ থেকে তোমার তৈরি কাগজের মুখোশ আলগা ভাবে উঠে এল, এইবার আবার রোদে দিয়ে মুখোশটাকে ভাল

করে শুকিয়ে নাও। তারপর মুখোশের ধারগুলো ভাল করে কাঁচির সাহায্যে কাট, দেখ, যেন কোথাও উঁচু নীচু না হয়। এবার ঐ মুখোশটির সামনের দিকে পরিষ্কার সাদা কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়ে তার উপর তোমার ইচ্ছামত রং কর। রং করা হয়ে গেল তো ? এবার ওর উপর বার্নিশ কর আর হাওয়ায় শুকোতে দাও। শুকিয়ে গেলে চোখ দুটোতে দুটো ফুটো করে দাও। আর মুখোশের কানের কাছেও দুটো ফুটো করে সেই ফুটোতে রাবার এর দড়ি বাঁধ। বেঁধেছ তো, আচ্ছা এবার ঐ মুখোশটাকে মুখে লাগাও। আর বাড়ির বড়দের ভয় দেখাও।

জন্মভূমি

সুব্রত দাস (সভ্য, ১৩)

জীবন মোদের ধন্য মাগো
জন্মেছি এই দেশে,
জন্মেছি এই বাংলাতে মা
বাঙালী জাতির বেশে।
ধর্মেতে মা হিন্দু মোরা
জাতিরই গৌরব,
বাংলা মোদের জন্মভূমি
বাংলা মোদের সব।
বাংলা মোদের জীবন মরণ
বাংলা মোদের প্রাণ,
বাংলা মোদের জননী আর
মোরা তার সন্তান।
বাংলা মোদের পুণ্যভূমি
বাংলা মোদের জ্ঞান—
সর্বদা তাই বসে মোরা
করছি তারই ধ্যান।
এই সঙ্গে এই কথাটা
বলতে ভালবাসি,
বাঙালী হলেও
আমরা ভারতবাসী।

এ্যালবাম

কয়েকটি বিচিত্র ওভার বাউণ্ডারী

দিলীপ দত্ত

ক্রিকেটে ওভার বাউণ্ডারী মার দর্শকদের আনন্দ দেয়। ব্যাটসম্যান যখন সটপীচ বলকে হুক করে স্কোয়ার লেগের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠান বা ওভারপীচ বলকে ড্রাইভ করে মিড অফ. বা মিড অন দিয়ে ওভার বাউণ্ডারী মারেন তখন দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়েন।

এই লেখায় এমন কয়েকটি ওভার বাউণ্ডারী মারের কথা বলব যা খুব কমই দেখা যায়।

ইংলণ্ডের গিলবার্ট জেসপ ১৮৯৭ সালে ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ৪১ মিনিটে ১০১ রান করেছিলেন। সেই ইনিংসে জেসপ ফাস্ট বোলার এফ, ডাবলিউ মিলিগ্যানের একটি বল ড্রাইভ করলেন। বলটি ব্যাটের কোনায় লেগে স্লিপের মাথার ওপর দিয়ে বাউণ্ডারী সীমানা পেরিয়ে গেল। ঠিক এই ধরনের ছক্কা মেরে-ছিলেন ই আর, উইলসন। ১৯১৩ সালে এসেক্সের বিরুদ্ধে খেলায় ফাস্ট বোলার ব্যাকেনহ্যামকে ড্রাইভ করতে গিয়ে ব্যাটের একপাশে লাগিয়েছিলেন, এবং বলটি সোজা স্লিপের মাথার ওপর দিয়ে ওভার বাউণ্ডারী হয়েছিল।

বি, জি, ডাবলিউ এ্যাটকিনসন লর্ডস মাঠে এমন একটি ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন যা সচরাচর দেখা যায় না। এ্যালফ গোভার একটি সট পীচ বল দিলেন, বলটি মাথার উচ্চতা ছাড়িয়ে গেল। এ্যাটকিনসন টেনিসের মাথার ওপর থেকে ভলি মারের মত ব্যাট চালালেন। বলটি বোলারের মাথার ওপর দিয়ে সোজা প্যাভিলিয়নের মধ্যে পড়ল।

ফুল পীচ বলকে চার মারা সোজা, কিন্তু ছয় মারা শক্ত। ১৯৩৬-৩৭ সালে অষ্ট্রেলিয়া সফরের সময় ইংলণ্ডের উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান লেসলী এমস্ ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে নিয়ে একটি স্লো বোলারকে লং অনের ওপর দিয়ে ছক্কা মেরেছিলেন।

ইংলণ্ডের শেফার্ড, ডি, বি, কারের একটি ইয়র্কার পেছিয়ে খেলতে গিয়ে এত জোর ব্যাট চালিয়ে ছিলেন যে বলটি সোজাসুজি মাঠ পেরিয়ে চলে যায়।

কয়েকটি ছক্কা ব্যাটসম্যানদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। কাউন্টি ক্রিকেট খেলায় প্রথম খেলতে এসে প্রথম বলটিই ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে খেলায় এম, সি সির কার্থবাটসন প্রথম বলটি মিড অনে ছয় হাঁকিয়েছিলেন। প্রথম বলে ছয় মার সাধারণত দেখা যায়না। ১৯৫২ সালে এসেক্সের ডড্‌স দুবার এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। টেস্ট ক্রিকেটে অষ্ট্রেলিয়ার কিমমিলার, প্রথম বলে ছয় মেরে ইনিংস শুরু করেছিলেন।

খেলা শেষ হবার সময় ওভার বাউণ্ডারী কি কম রোমাঞ্চকর, আর যদি সেই মার থেকে খেলায়

জিত হয় তাহলে ত কথাই নেই। ১৯৫১ সালে সমর সেটের বিরুদ্ধে খেলায় ছুটি বল বাকী আছে। ব্যাট করছেন উরসেষ্টার সায়ারের ওয়াট। জয়লাভের জন্য তখন আরও ছ'রানের প্রয়োজন। প্রথম বলটি তিনি সজোরে ব্যাট চালালেন, কিন্তু ব্যাটে বলে হোল না। কিন্তু শেষ বলটিতে কোন ভুলচুক হয়নি। স্কোয়ার লেগের ওপর দিয়ে ওভার বাউণ্ডারী এবং ম্যাচ জিত।

দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৩৭-৩৮ সালের ইষ্টার্ন প্রভিন্সের বিরুদ্ধে ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্সের জয় আরও চমকপ্রদ। ৪৫ মিনিটে ১১৭ রান করতে হবে এমন অবস্থায় ব্যাট করতে এসে যখন শেষ ওভার (৮ বলে ওভার) পৌছলেন তখনও ম্যাচ জিততে হলে ২৭ রানের দরকার। প্রথম বলে একটি রান হল। এবার ব্যাট করবেন দলের অধিনায়ক পি. জি. ভ্যানডার বিল। পরপর ছটি বল মারলেন ৪, ৪, ৬, ৬, ৪, ২, ।

এত গেল ম্যাচ জিতের কথা, বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে ম্যাচ বাঁচিয়েছিলেন গ্যামরগানের ড্যাক মারকার। খেলা শেষ হতে তখনও আধঘণ্টা বাকী। শেষ ব্যাটসম্যান ব্যাট করছেন। গ্যামরগান তখন মাত্র দশ রানে এগিয়ে। তখনই আউট হলে বাকী সময়টুকুতে ১১ রান করা কিছুই অসুবিধে নেই। মারকার স্থির করলেন মেরে যদি রান বাড়িয়ে নেওয়া যায় তবেই ম্যাচ বাঁচানো যেতে পারে। প্রথম বলটিতে রান পেলেন না। তারপর পর পর সাতটি বল ৬, ৭, ২, ৬, ৬, ৬, ১। গ্যামরগান ৪০ রানে এগিয়ে গেল। বাকী সময় টুকুতে আর খেলার মীমাংসা হবেনা দেখে উরসেষ্টার দলের অধিনায়ক খেলা শেষ ঘোষণা করলেন।

তোমরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত, আজ যে উন্নত সমাজে বাস করছ, তাও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। যে সব বিজ্ঞানীর কথা জান—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধাসিধে। অথচ, কত বড় বিজ্ঞানী!

রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন যেটা একমাত্র তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম করেন সেই প্রতিষ্ঠান আজ দেশখ্যাত—'বেঙ্গল কেমিকেল'।

১৮৬১-র ২রা আগস্ট তাঁর জন্মদিন। তাঁকে জীবনে কখনও ভুল না।

খেলার খোশ-খবর

শ্রীকলমচি

এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতির জন্য পূর্ব-জার্মানী থেকে প্রশিক্ষক আসছে

আগামী বছরে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য এশীয় ক্রীড়ার প্রস্তুতি পর্যায়ে ভারতীয় দলকে তালিম দেওয়ার জন্য পূর্ব-জার্মানী থেকে চারজন প্রশিক্ষক আসছেন। ইতিমধ্যে জুলাই মাসে জিমনাস্টিকস ও সন্তরণের দুজন প্রশিক্ষক এখানে এসে গেছেন। অবিলম্বে একজন ফুটবল ও একজন ভলিবল প্রশিক্ষকও আসছেন।

সম্প্রতি ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রীরামমূর্তির নেতৃত্বে পাঁচসদস্যবিশিষ্ট এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পূর্ব জার্মানী সফরে যান। সেখানে তাঁরা বিশিষ্ট জার্মান ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন এবং সেই সমস্ত কেন্দ্রে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তালিম দেওয়ার পদ্ধতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশ্ব দাবার খেতাবী লড়াই আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বরে হচ্ছে

সম্প্রতি স্থির হয়েছে যে, বিশ্বখেতাবী দাবা প্রতিযোগিতা আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বরে পুনঃ নির্দ্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এই বহুবিতর্কিত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সোভিয়েত দেশের আনাতল করপভ ও ভিক্টর করশনয়। বিশ্ব দাবা ফেডারেশনের (FIDE) সভাপতি, আইসল্যাণ্ডের ফ্রিদিক ওলাফসন খেলাটি আরও একমাস পরে ১৯শে অক্টোবর করতে চেয়েছিলেন কারণ, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ করশনয়ের পরিবারকে রুশ দেশ থেকে চলে যেতে দিতে অরাজী। উল্লেখযোগ্য যে, করশনয়ের পুত্র ইগর সেনাদলেতে যোগ না দেওয়াতে রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে।

সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ওলাফসনের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানায় ও বিশ্ব দাবা ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতিকে ১৯শে সেপ্টেম্বরেই ইটালীর শৈলনিবাস মেরানো শহরেই খেলা অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জানায়।

বিস্ময় বালক দাবাড়ু দিব্যেন্দু আর্জেন্টিনা গেল

পশ্চিমবঙ্গের কিশোর দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া করডোবাতে অনুষ্ঠিতব্য কমবয়সীদের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আর্জেন্টিনা অভিমুখে রওনা দিয়েছে। ষোল বছরের কমবয়সীদের জন্য ঐ প্রতিযোগিতা। দিব্যেন্দুর সঙ্গে ওর প্রশিক্ষক শ্রীকুমার মল্লিকও গেছেন।

রাজধানীতে বিশ্বের সেরা টেনিস তারকারা আসছে?

আগামী ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে বিশ্বের সেরা টেনিস খেলোয়াড় জন ম্যাকেনরো, বিয়রণ বর্গ এবং আইভান লেণ্ডল প্রদর্শনী টেনিস খেলায় যোগ দিতে পারে। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি এসোসিয়েশনের তরফে বিজয় অমৃতরাজকে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

ভারতীয় বাস্কেট বল দল বিদেশ সফরে যাবে

চোদ্দজন সদস্যবিশিষ্ট ভারতীয় বাস্কেটবল দল আগামী ডিসেম্বরে তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশ সফরে যাচ্ছে। এই সফরসূচীতে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া এবং সোভিয়েত দেশ সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ আছে।

ধাঁধা

এক ভদ্রমহিলা একটি কাপড়ের দোকানে কাপড় কিনতে গেছেন। কাপড়টি পছন্দ হতেই দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন দাম কত। দোকানদারটি প্রত্যুত্তরে জানাল, তার যা নাম তাই। লোকটির নাম নেত্র চন্দ্র বসু।

কাপড়টির দাম কত বল তো?

শান্তনু দাস (সভ্য, ৭)

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

		১ বি	জ	লী
২ স	মা	ধা	ন	
৩ ভ	য়া	ন	ক	
	৪ অ	চ	ল	
	৫ চ	ন্দ্র	পু	রা
	৬ অ	রা	জ	ক
৭ অ	হা	য়		

এ সংখ্যায় যারা এঁকেছে

সুশান্ত দত্ত (সভ্য, সিনিয়র), সুব্রত কুণ্ডু (সভ্য, সিনিয়র), শুক্লা সরকার (সভ্য, ১২,), সঞ্জীব কুণ্ডু (সভ্য. ১৪), প্রদীপ ভট্টাচার্য (সভ্য, সিনিয়র)।

আগামী সংখ্যা থেকে 'খেয়ালখুশী' তোমাদের সামনে নতুন স্বাদের গল্প, কবিতা, ধাঁধা, প্রবন্ধ পরিবেশন করছে। এ ছাড়া থাকছে তোমাদের জন্য ধারাবাহিক রোমাঞ্চকর আন্দামান অভিযানের কাহিনী।

নতুন বিভাগও একটি থাকছে হাতের কাজের। হাতের কাজ শেখ এবং শেখাও।

তোমরাও তোমাদের মনের মত লেখা তোমাদের বন্ধুদের জন্য পাঠাও।

Regn. No. WB/EC-179 August 1981 Re. 1·00

নিয়মাবলী

১. জুলাই মাস থেকে "খেয়াল খুশীর" বছর শুরু। বছরের যে কোন মাস থেকে খেয়াল খুশীব গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে খেয়াল খুশী প্রকাশিত হয়।

২. প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা এবং বছরে ১২ টাকা। সডাক টাকা ১৩·২৫।

৩. খেয়াল খুশীর চাঁদা মানিঅর্ডারে পাঠানো যায়।

৪. গ্রাহক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

৫. ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েরাই লেখা, ছবি, ধাঁধার উত্তর প্রভৃতি সম্পাদিকার নামে খেয়াল খুশীতে পাঠাতে পারবে।

৬. গ্রাহক চাঁদা ইত্যাদি পাঠাতে হবে খেয়াল খুশীর ম্যানেজারের নামে।

৭. অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। যারা লেখা পাঠাতে চাও তারা লেখার একটি নকল রাখবে। লেখা পাঠাবার সময় কাগজের দু'পিঠে লিখবে না। যারা আঁকা পাঠাতে চাও, তারা পেন্সিল স্কেচের উপর "চাইনিজ ইঙ্ক" বুলিয়ে দেবে।

৮. কোন কিছু জানতে চাইলে খেয়াল খুশীর কার্যালয়ে এসে দেখা করতে অথবা চিঠিও লিখতে পারো। চিঠির উত্তর পেতে হলে জোড়া পোষ্টকার্ড অথবা ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

৯. পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশকপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে।

"খেয়াল খুশী কার্যালয়"
১, বিধান শিশু সরণী
কলিকাতা—৭০০০৫৪
ফোন: ৩৫-৮০৮৬

কার্যাধ্যক্ষ

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে শ্রীদুলাল ভৌমিক কর্তৃক ১, বিধান শিশু সরণী কলিকাতা-৭০০০৫৪ হইতে প্রকাশিত ও গ্রাফিকো, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ১৯৮১
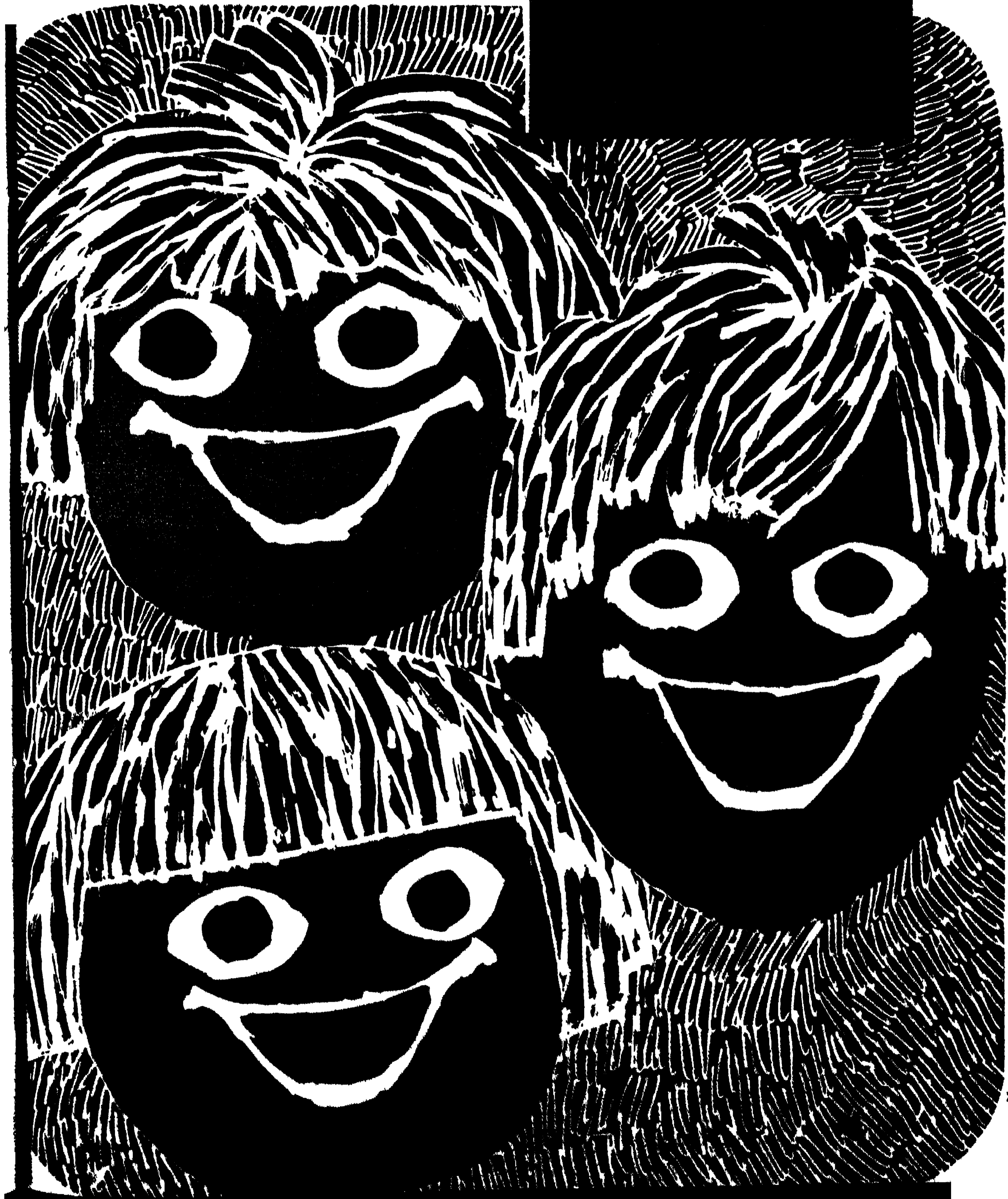
॥ বিজ্ঞাপনের হার ॥

মুদ্রিত জায়গার মাপ

পূর্ণ পৃষ্ঠা :—

১৪·৫ সি. এম × ২০ সি. এম

৬০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (হরাইজেণ্টাল)

৯·৫ সি. এম × ১৪·৫ সি. এম

৩০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা [ভারটিক্যাল]

৭ সি. এম × ২০ সি. এম

৩০০·০০ টাকা

¼ পৃষ্ঠা :

৭ সি. এম × ৯·৫ সি. এম

১৭৫·০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৬৮৩ (১৬) টি-বি-সি/২এ—৬টি/৭৯, ২৪. ১২. ৮০.

৪র্থ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ॥ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৮
ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা ॥ দাম: এক টাকা
প্রধান উপদেষ্টা: গৌরকিশোর ঘোষ ॥ সম্পাদিকা: ইন্দিরা রায়।

আমাদের কথা □ ২

গল্প □ এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ॥ অশোক কুমার সেনগুপ্ত ৬ অলৌকিক না ভৌতিক ॥ রিঙ্কু বসু ১২ রোমন্থন ॥ পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ বোম্বেটে সর্দার ডেসমণ্ডের পতন ॥ অচ্যুত পাল ২৩ প্রায়শ্চিত্ত ॥ নীলাঞ্জনা দাস ২৫ জন্মদিনে ॥ সুদীপ কুমার চক্রবর্তী ৩৪ মায়ের মুখ ॥ সুচন্দ্রনাথ দাস ৩৯

প্রবন্ধ □ চরিত্র-বিচিত্রা ॥ মন্মথনাথ ঘোষ ৩ উদ্যানে একদিন ॥ সুস্মিতা দে ১০ ১লা জুলাই, ১৯৮১ ॥ সুধীর মাধব বসু ১১ পৃথিবীর জল সরবরাহ ব্যবস্থা ॥ শ্রীহর্ষ মল্লিক ১৪ আন্দামান অভিযানের ডায়েরী থেকে ॥ পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ১৭ সেফটি গ্লাস ॥ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ এসেছে শরৎ ॥ সমিত্র পণ্ডিত ২২ ভারতের চিত্রকলা ॥ অহিভূষণ মালিক ২৯ ভাবাশিক্ষার আসর ॥ অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য ৩২ বিধান মেলা ॥ স্বপন ঘোষ ৩৭ ঠাকুর দেবতার বাহন ॥ প্রণবেশ চক্রবর্তী ৪৩ আমার ডায়েরী ॥ অর্পিতা মজুমদার ৪৫

কবিতা □ নাচ-গান ॥ সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত ৫ ঝালর ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় ৫ কার্শিয়াঙ ॥ ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় ১৩ গ্রামের মাঠ ॥ দেবজ্যোতি বসু ১৩ বিয়ের ভোজ ॥ বিশ্বরঞ্জন দাস ॥ ১৬ অজানা ॥ সহদেব সাহা ১৬ চাঁপা ॥ কাকলি কুণ্ডু ১৯ দাদু ও আমরা ॥ ঝুমকা ভাদুড়ী ১৯ গল্প বলা ॥ গৌতম শিকদার ২২ বিয়ে বাড়ি ॥ বুলা পাল ২৪ খাবার ॥ রাজকুমার রায় ৩১ আমার পাখি ॥ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ৪৬

উদ্যানের খবর □ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ৪৭

খেলাধূলা □ ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম জয় ॥ দিলীপ দত্ত ৫৩ খেলার খোশ-খবর ॥ শ্রীকলমচি ৫৩

হাতের কাজ □ তৈরি কর মজার টেলিফোন ৫৫

ধাঁধা □ ৫৬

প্রচ্ছদ □ পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের কথা

সাধারণত ১৫ই আগস্টে যে কার্যসূচী পালন করা হয়, সে সব তো শিশু উদ্যানে পালন করা হয়। তাছাড়াও আরও কিছু যা উদ্যানে পালন করা হয়, তা আমাদের সকলেরই ভাল লাগে। এবারে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শিশু উদ্যানের দুজন সভ্য-সভ্যাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ সময়ে যদি উদ্যানের অন্য ছেলেমেয়েদের চেহারা দেখতে তাহলে খুব ভাল লাগত। যারা আস নি, তাদেরও খুব ভাল লাগত। স্বাধীনতা দিবসে এরকম পাওয়ার একটা তাৎপর্য আছে। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েরা ভাল কাজ করবে, লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাবে, এটাই তো সকলে আশা করে, সেজন্য সবাই খুশি। সাড়ে দশটায় আবার এই কাগজের প্রধান উপদেষ্টা ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের সভাপতিত্বে সুন্দর একটি অনুষ্ঠান হ'ল। এই শিশু উদ্যানের সদস্য শ্রীমান মানব নন্দী জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দুটোতেই প্রবেশাধিকার পেয়েছে—সেজন্যই এই অনুষ্ঠান। এই বছরটা তো ডাঃ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী বছর। এই বছরে ডাঃ রায়ের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে শিশু উদ্যান—সেখানকার একটি সভ্য ডাঃ রায়ের মতই ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারীতে প্রবেশাধিকার পাওয়ায় সকলের উৎসাহ উপচে পড়ছে, চতুর্দিকেই খুশির মেজাজ। বড়রা আরও খুশি, কারণ মানব স্বাধীন ভারতের ছেলের মর্যাদার উপযুক্ত হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চন্দন পরিয়ে দিচ্ছিল, গলায় মালা দিচ্ছিল, শুভেচ্ছা—মানপত্র পড়ছিল, সেটা সত্যিই একটা চমৎকার দৃশ্য। স্বাধীনতা দিবসের অংগীভূত হয়ে তাৎপর্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল ছেলেমেয়েরা বলাবলি করছিল, মানবদাদা দেখ হয়ত একদিন বিধানচন্দ্রের মত হবে। এ যে কত বড় আশা তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

বিকেল পাঁচটায় উচ্চ মাধ্যমিকে যে প্রথম হয়েছে তাকে বৃত্তি দেওয়া হল মাসিক ৭৫ টাকা, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, তার জন্য অভিনন্দন পত্র পাঠ করল ছেলেমেয়েরা তাতে ছিল তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং অনুরোধ যেন এখন থেকে নিয়মিত সে উদ্যানে আসে। এর পরের অনুষ্ঠানও খুব খুশির মেজাজে হল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশজনকে রাজ্যপালের পদক ও সার্টিফিকেট দিয়ে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

স্বাধীনতা দিবস তো উৎসব করারই দিন। আবার সে উৎসব যদি দেশের ছেলেমেয়েদের কৃতিত্বকে উপলক্ষ্য করে হয়, তাহলে উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, স্বাধীনতা দিবসেরও মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।

চরিত্র-বিচিত্রা (১১)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সুমথনাথ ঘোষ

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন একজন ভারত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। রসায়নশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইংরেজ রাজত্বে, ইংরেজী লেখা পড়ার মাধ্যমে বিদ্যার্জন করলেও তিনি মনে প্রাণে ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন। এই ইংরেজ জাতটা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলেই বেঁধে রাখেনি, ভারতবর্ষের মানুষগুলোকে একটা দাস জাতিতে পরিণত করেছিল। তারা প্রভুত্ব করতে এসেছে আর এরা তাদের দাসত্ব করবে, এই মনোভাব, এই শিক্ষা তাদের মধ্যে এমনভাবে ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে দলে দলে ছেলেরা লেখাপড়া শিখে এই ইংরেজের কাছে ছুটত চাকরি করতে। চাকরগিরি বা দাসত্ব ছাড়া অন্য জীবিকার কথা চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছিল, আর প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া তাদের অন্য কোন চোখে দেখত না ইংরেজরা। তাই সামান্য ভুলত্রুটির বা সময়মত অফিসে হাজিরা দিতে না পারলে ড্যাম সোয়াইন, রাস্কেল্ বলে এইসব কর্মচারীদের গালাগালি দিতেও তাদের মুখে আটকাত না। তবুও মান সম্ভ্রমের মাথা খেয়ে, সব হীনতা স্বীকার করে সামান্য টাকার লোভে, দিবারাত্র মুখ বুজিয়ে তাদের হুকুম তামিল করে যেত।

বিশেষ করে বাঙালীর ছেলেদের এই দাস মনোবৃত্তি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিত। তিনি ছিলেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। মনে প্রাণে ভালবাসেন দেশকে, যা কিছু দেশী সব ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। ছোট্ট খাট্টো রোগা এই মানুষটি। সব সময় একটি খাটো খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী গায়ে দিতেন। সামান্য আহার, সামান্য শয্যা, অতি সাদাসিদে দরিদ্র মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি যে দরিদ্র ভারতবাসীর একজন—একথা কখনও ভুলতেন না। এদিক থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মানসিকতার অদ্ভুত মিল ছিল। ইংরেজের পোশাক-আশাক দূরে থাক কোন বিলিতি খাদ্য পর্যন্ত ছুঁতেন না। তিনি চা পর্যন্ত খেতেন না, ওটা ইংরেজদের প্রিয় পানীয় বলে।

তাঁর দেশপ্রীতি কি রকম উগ্র ছিল, তার দু একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি।

অধ্যাপক সি. ভি. রমন তখন সবে বিলেত থেকে এফ. আর. এস হয়ে ফিরেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হলে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র তাঁর ছাত্রকর্মীদের হুকুম দিলেন খাবারের ব্যবস্থা হবে কেবল মুড়ি আর বাতাসা।

যখন তখন তাঁর মুখে এই কথাটা শোনা যেত, "বাঙালীর ছেলেরা বাপের পয়সা খরচ করে হাণ্টলী পামারের বিস্কুট খেতে খুব মজবুত, অথচ তার নিজের দেশের জিনিস মুড়ি বাতাসা বা চিঁড়ে বা অল্প খরচায় হয় এবং খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর তার দিকে ফিরেও তাকায় না। দাসত্ব করে করে বাঙালীর মনোবৃত্তি আজ এমন অবস্থায় এসেছে যে বিলেত থেকে যদি টিনে করে মুড়ি চিঁড়ে এদেশে আসে তাহলে দু'পয়সার জিনিস অনায়াসে তারা দু'টাকায় কিনে খাবে।"

তাঁর কথা যে একদিন অক্ষরে অক্ষরে কতখানি সত্য তার প্রমাণ আজও তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ। তখন দেশ ছিল পরাধীন। ইংরেজ রাজা হলেও ছিল আসলে বনিকের জাত, তাই আমাদের দেশে কোন জিনিস তৈরি করতে না দিয়ে নিজেরা সব কিছু এদেশে আমদানী করে এখানের পয়সা সব লুটে নিয়ে যেত।

কিন্তু সেই পরাধীন ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে। চৌত্রিশ বছর হয়ে গেল, স্বাধীন ভারতে এখন কত কলকারখানার উন্নতি হয়েছে। কত ভাল ভাল সব সৌখীন জিনিস বিশেষ করে জামা-কাপড় নিত্য নূতন তৈরি হচ্ছে। এমন কি এখান থেকে বিদেশে সেই সব মাল লক্ষ লক্ষ টাকায় রপ্তানী হচ্ছে। তবু এখনও আমাদের দেশ থেকে সেই দাস মনোভাব যায়নি। ইম্‌পোর্টেড্ গুড্‌স্ যা আমাদের এখানে আনা নিষিদ্ধ—সেইসব জিনিস কালোবাজার থেকে তিন চার গুণ বেশি দাম দিয়ে কিনে ব্যবহার করে নিজেদের রুচি ও কালচারের বড়াই করি। বিশেষ করে সৌখীন প্রসাধন দ্রব্যের সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে ও বিদেশী প্যাণ্ট, গেঞ্জি, জামা পরে বিদেশীদের অনুকরণ করতে লজ্জা পাই না। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি হিপিদের অনুকরণ করে তাদের মত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বুক ফুলিয়ে সগর্বে এখানের শিক্ষিত যুবকেরা অনেকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। সেদিন এই দাস মনোবৃত্তির ওপর বার বার প্রফুল্ল চন্দ্র আঘাত করেছিলেন। তিনি চাইতেন, এ দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে তাদের অর্জিত জ্ঞানবুদ্ধি এই দেশের কাজেই নিয়োগ করে দেশের সম্পদ শ্রী বৃদ্ধি করুক।

শুধু মুখে বক্তৃতা দিয়ে তিনি কথার ফানুস ওড়ান নি। নিজে হাতে করে একদিন এই 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্য চার পাঁচজন বন্ধু মিলে সামান্য অর্থ দিয়ে ছোট একটা কারখানা তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কেমন করে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হয়। তাঁর জীবিত-কালেই এই 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' সারা ভারতে একটা গৌরবময় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। কত শত মানুষের মুখের অন্ন সেদিন থেকে আজও যোগাচ্ছে। বাঙালী বিশেষ করে প্রফুল্লচন্দ্রের কেবল এ একটা শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়, সারা বাঙালী জাতির গৌরবস্তম্ভ।

প্রফুল্লচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এ দেশের যুবকরা যদি দাসত্ব ভুলে, দেশের কাজে মনোনিবেশ করে, তাহলে এ দেশের মাটিতে সোনা ফলতে পারে। ভারতবর্ষ আবার সারা পৃথিবীর মধ্যে গৌরবের আসন দাবী করতে পারে।

একবার আচার্যদেব হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি থেকে আমন্ত্রিত হন। তিনি যখন সেখানে বক্তৃতা করছিলেন তখন তাঁর সামনে বসেছিল একটি অল্পবয়স্ক ইংরেজ রসায়নের অধ্যাপক। প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রাচীন যুগের হিন্দুদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে সরল ভাষায় মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন এই তরুণ ইংরেজটির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র এই উদ্ধত যুবকটির মুখভঙ্গী লক্ষ্য করে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাই একটু পরে তিনি পকেট থেকে একখণ্ড মকরধ্বজ বার করে বললেন, দু'হাজার বছর আগে এই ওষুধটি ভারত-বর্ষের বৈজ্ঞানিকরা মাটির তৈরি সামান্য কয়েকটা যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত করেছিলেন। এই

ওষুধটি চিকিৎসাশাস্ত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। তখনকার দিনে যেমন বহুরোগে এর প্রচলন ছিল এখনও তেমনি আছে। এখন এই ওষুধটি অবশ্য অনেক বড় বড় ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে। তবু সবচেয়ে বড় কথা গুণের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, আগের চেয়ে এখন এটা এমন কিছু বেশি উৎকৃষ্ট হয়নি। হিন্দুরা যখন এই পদার্থটি প্রস্তুত করছিলেন তখন আমার এই ইংরেজ বন্ধুটির পূর্বপুরুষেরা বনে জঙ্গলে পশু পক্ষী শিকার করে বুনো ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত।' শেষের কথাটি বলার সময় প্রফুল্লচন্দ্র সেই ইংরেজ যুবকটির দিকে আঙুল দেখান। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেঁট করে ছুটে সেখান থেকে বাইরে যান সেই প্রফেসরটি। অপমানে তাঁর কান মাথা যেন জ্বলতে থাকে।

নাচ-নাচ

সুনীল কান্তি সেনগুপ্ত

মুখে নাই বলাবলি
নাম তবু কথাকলি।

* *

পা দুটোকে ঠক্ ঠক্
কাঁপালেই কত্থক।

* *

নাচ হবে ওড়িশি ?
ওরে বাবা। মরিছি

* *

ভারত নাট্যম্ ?
এই বারে কাট্যম্।

ঝালর

রথীন্দ্র নাথ রায়

জলের বুকে উপুর,
থাকে হলুদ দুপুর
কাঁচা সোনার রঙ।

পরজাপতির পাখায়
রামধনু কে আঁকায়
রকম সকম ঢঙ।।

জোছনা রাতে ঝালর
তুললে এত আলোর
বন্যা না, না ঢল ?

চন্দ্র কিরণ মালা
মস্ত সোনার থালা
রাঙা-সাগর জল।।।।

এলিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড

লুইস ক্যারল

অশোককুমার সেনগুপ্ত

ছয়

শুয়োরের বাচ্চা ও গোলমরিচের গুঁড়ো

দু এক মিনিট সে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি করা যায় ভাবতে লাগল। হঠাৎ দেখে বনের ভিতর থেকে এক উর্দি পরা বেয়ারা দৌড়ে আসছে। (উর্দি পরা বলেই এলিসের মনে হল সে বেয়ারা, মুখের দিকে তাকালে দেখা যাবে আসলে সে মাছ।) বেয়ারাটা এসে দরজায় জোরে জোরে টোকা দিতে লাগল। আরেকটা উর্দিপরা বেয়ারা দরজা খুলল। এটা ব্যাঙ। এলিস দেখল দুজনের মাথাতেই পাউডার মাখান ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ব্যাপারটা কি জানার জন্য এলিসের খুব কৌতূহল হল। সে হামাগুড়ি দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে শুনতে লাগল ওরা কি বলে।

মাছ বেয়ারার বগলে এক বিরাট খাম, প্রায় তারই সমান। সেটা ব্যাঙ-বেয়ারাকে বাড়িয়ে দিয়ে সে রাশ ভারি চালে বলল, 'জমিদার গিন্নির নিমন্ত্রণ—রাণীর কাছ থেকে—ক্রোকে খেলার।' শব্দগুলো একটু উল্টেপাল্টে একই চালে ব্যাঙ বেয়ারা বলল, 'রাণীর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ—জমিদার গিন্নির—ক্রোকে খেলার।'

তারপর যেই দুজনে দুজনকে কুর্নিশ করতে গিয়েছে অমনি দুজনের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এক সঙ্গে জড়িয়ে জট পাকিয়ে একাকার।

তাই দেখে এলিস হেসে বাঁচে না। পাছে তারা তার হাসি শুনে ফেলে তাই সে বনের মধ্যে আরেকটু সরে গেল। একটু পরে আবার উঁকি দিয়ে দেখে মাছ-বেয়ারা চলে গিয়েছে আর ব্যাঙ-বেয়ারা দরজার কাছে মাটিতে বসে পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এলিস ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল।

ব্যাঙ-বেয়ারা বলল, 'টোকা দিয়ে লাভ নেই। দুটো কারণে। এক, আমার দরজা খুলে দেওয়ার কথা, কিন্তু আমি দরজার বাইরে অর্থাৎ আমরা দুজনে দরজার একই দিকে। আর দুই, ভিতরে যারা আছে তারা এত চেঁচামেচি করছে যে তোমার টোকা শুনতেই পাবে না।' ভিতরে সত্যিই যেন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হচ্ছিল—লাগাতার চেঁচামেচি আর হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হাঁচা হাঁচি আর থেকে থেকেই ঝন ঝন ঝন, যেন কোন প্লেট বা কেটলি ভেঙে চৌচির হল।

এলিস বলল, 'তাহলে আমি কি করে ভিতরে যাব?'

ব্যাঙ-বেয়ারা তার কথায় কর্ণপাত না করে বলে চলল, 'আমরা দুজনে যদি দরজার দুপাশে থাকতাম তাহলে তোমার টোকা দেওয়ার মানে হত। যেমন ধর, তুমি যদি ভিতরে থাকতে আর টোকা দিতে তো আমি বাইরে থেকে দরজা খুলে দিতাম আর আমি যদি ভিতরে থাকতাম আর তুমি বাইরে থেকে টোকা দিতে তো আমি ভিতর থেকে খুলে দিতাম। কিন্তু এখন তো আমরা দুজনেই একই দিকে।' ব্যাঙ-বেয়ারা কথা বলছিল আকাশের দিকে চেয়ে, যেন এলিস তার সামনে নেই। এলিসের মনে হল এটা খুবই অভদ্রতা। কিন্তু সে ভাবল হয়ত বেচারার আর কোন উপায়ও নেই, চোখ দুটো তো মাথার একেবারে চুড়োতে, আকাশে ছাড়া তাকাবে কোথায়? কিন্তু কথায় জবাব দেয় না কেন? সে আবার চেঁচিয়ে বলল, 'আমি ভিতরে যাব কি করে?'

'ব্যাঙ বেয়ারা বলে চলল, 'আজ সারাদিন আমাকে এখানেই বসে থাকতে হবে। হয়ত কাল দরজা খুলবে—'

এই সময়ে ধাঁ করে দরজা খুলে গেল আর সাঁ করে একটা বড় প্লেট ব্যাঙ-বেয়ারার একেবারে মাথা ঘেঁষে নাকটাকে একটু খানি ছুঁয়ে চলে গেল আর একটা গাছের গায়ে লেগে ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ল।

নির্বিকার ব্যাঙ-বেয়ারা বলে গেল, 'কিংবা হয়ত পরশু।' যেন ইতিমধ্যে কিছুই ঘটে নি। এলিস, আরও জোরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি ভিতরে যাব কি করে?'

ব্যাঙ-বেয়ারা বলল, 'ভিতরে তোমার আদৌ যাওয়া উচিত কিনা সবার আগে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার।'

এটা জরুরী প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে ব্যাঙের খবরদারি এলিসের পছন্দ হল না। সে বিড় বিড় করে বলল, 'পুঁচকে পুঁচকে জীবজন্তুগুলো মুখে মুখে কি তর্কই না করে। পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়।'

এই সুযোগে ব্যাঙ-বেয়ারা একটু ঢঙ পালটে তার কথাটা আরেকবার বলে নিল, 'এখানেই বসে থাকতে হবে, হয়ত কাল পর্যন্ত, কিংবা পরশু, কিংবা দিনের পর দিন।'

এলিস বলল, 'কিন্তু আমি কি করব?'

'তোমার যা ইচ্ছে,' বলে ব্যাঙ শীষ দিতে লাগল।

এলিস মরীয়া হয়ে উঠেছে। এ ব্যাটার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই, ব্যাটার মাথায় শুধু গোবর, এই বলে সে নিজেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল।

প্রথমেই একটা বড় রান্না ঘর, আগাগোড়া ধোঁয়ায় ভরতি। জমিদার গিন্নি একটা তেপায়া টুলের উপরে বসে আছেন, কোলে একটা বাচ্চা আর রাঁধুনী ঠাকরুণ উনুনের উপরে ঝুঁকে পড়ে খুন্তি দিয়ে এক মস্ত কড়াই ভরতি ঝোল নেড়ে যাচ্ছে।

হাঁচতে হাঁচতে এলিসের দম বেরিয়ে যাচ্ছে। সে কোন রকমে বলল, 'উঃ, ঝোলের মধ্যে ঠেসে গোল মরিচের গুঁড়ো দিয়েছে।'

গোলমরিচের ঠেলায় ঘরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়াই মুস্কিল। জমিদার গিন্নিও মাঝে মাঝে হাঁচ-

ছিলেন। আর বাচ্চাটা তো হেঁচেই চলেছে আর সেই সঙ্গে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। ঘরে দুজন কেবল হাঁচি জয় করেছে মনে হল—একজন রাঁধুনী আর আরেকজন হল বিরাট এক বেড়াল। বেড়ালটা উনুনের পাশে বসে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে হাসছিল।

আগ বাড়িয়ে কথা বলাটা কি শিষ্টাচারসম্মত হবে? হোক না হোক, এলিস একটু ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলল, 'আপনার বেড়ালটা অমন হাসে কেন?'

জমিদারগিন্নি বললেন, 'ওটা খানদানি বেড়াল, তাই। এই শুয়োর!'

শেষের কথাটা জমিদার গিন্নি এমন জোরে চেঁচিয়ে বললেন যে এলিস চমকে উঠল। তারপরই অবশ্য সে বুঝতে পারল যে ওটা বাচ্চাটাকে বলা হয়েছে, তাকে নয়। তখন সে সাহস করে আবার বলল, 'খানদানি বেড়ালরা যে সব সময়ে হাসে তা জানতাম না। আসলে কোন বেড়ালই যে হাসতে পারে তাই আমার জানা ছিল না।'

জমিদারগিন্নি বললেন, 'সব বেড়ালই হাসতে পারে আর বেশির ভাগই হেসে থাকে।'

জমিদারগিন্নি যে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এতে এলিস বেশ খুশি। সে খুব নম্রভাবে বলল, 'কোন বেড়ালকে আমি এর আগে কোনদিন হাসতে দেখি নি।'

জমিদারগিন্নি বললেন, 'তুমি আর কতটুকুই বা দেখেছ আর জানই বা কি?' এ মন্তব্যটা এলিসের ভাল লাগল না। সে কথাবার্তার মোড়টা অন্য কোন বিষয়ে ঘুরিয়ে দেবে ভাবল। কি বিষয়ে কথা বলবে ভাবছে এমন সময়ে উনুন থেকে ঝোলের কড়াইটা নামিয়ে রেখে রাঁধুনী তার হাতের নাগালে যা কিছু ছিল এক এক করে ছুঁড়ে মারতে লাগল জমিদারগিন্নি আর বাচ্চাটার দিকে—প্রথমে খুন্তিটা, তারপর উনুনের শিক, প্লেট, সসপ্যান, চামচ যা পেল তাই। জমিদারগিন্নির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, কিছু কিছু জিনিস তাঁর গায়ে এসে লাগলেও। আর বাচ্চাটা তো আগে থেকেই এমন চেঁচাচ্ছিল যে ওগুলো গায়ে লাগলে তার ব্যথা লাগছে কিনা বোঝার উপায় ছিল না।

এলিস ভয়ে হকচকিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। চেঁচিয়ে বলল, 'থাম, থাম, কি করছ? এই রে বাচ্চার নাকটা গেল!' বিরাট এক সসপ্যান বাচ্চার নাক ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। নাকটাকে প্রায় নিয়েই গিয়েছিল আর কি।

জমিদারগিন্নি ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় বললেন, 'যে যা করছে তা যদি ভেবেচিন্তেই করত তা হলে তো এই দুনিয়ার চলার গতিই অনেক বেড়ে যেত।'

এলিস এইবারে তার ভূগোলের বিদ্যে জাহির করার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। বলল 'তাতে বড় একটা সুবিধে হত না। দিন আর রাতের কি দশা হত ভেবে দেখুন। পৃথিবী তার আহ্নিক গতিতে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষর চারিধারে—'

জমিদারগিন্নি বললেন, 'ওর মাথাটা কেটে নাও তো, আমাকে অক্ষর জ্ঞান শেখাচ্ছে।'

এলিস ঘাবড়ে গিয়ে রাঁধুনীকে ঘুরে দেখল। হুকুম তামিল করার তার কোন লক্ষণ নেই। সে ওদের কথাই শুনছিল না, ঝোল নাড়তেই ব্যস্ত। তাই দেখে আশ্বস্ত হয়ে এলিস আবার বলল, 'চব্বিশ ঘণ্টায় একবার—নাকি বারো?—মানে—'

জমিদারগিন্নি তাকে থামিয়ে দিলেন। রাখ ওসব কথা, বিরক্ত কর না। সংখ্যাতত্ত্বে আমার রুচি নেই। সংখ্যার হিসেব শুনলেই আমার মাথা ঘোরে।' এই বলে তিনি বাচ্চাকে কোলের উপরে দুলিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে লাগলেন আর প্রত্যেক লাইনের শেষে তাকে কি একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন:

ধমকে দিও কাঁদলে খোকা
হাঁচলে মেরো চাঁটি
খোকা আমার নয়কো বোকা
কাঁদলেই সব মাটি।

—কোরাস—

(জমিদারগিন্নি, রাঁধুনী ও বাচ্চা একসঙ্গে)

ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া

অন্তরায় পৌঁছে গান গাইতে গাইতে বাচ্চাকে তিনি এমন জোরে জোরে উপরে ছুঁড়ে দিতে আর লুফতে লাগলেন আর সে চেঁচিয়ে এমন বাড়ি মাথায় করল যে গানের কথাগুলি উদ্ধার করতে এলিসকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল:

মারবে ঘুষি কাঁদলে ছেলে
কিংবা যদি হাঁচে
গোল মরিচের গুঁড়ো পেলে
দু হাত তুলে নাচে।

—কোরাস—

ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া

'ওকে একটু ধরবে নাকি? এই নাও,' বলে জমিদারগিন্নি বাচ্চাটাকে এলিসের কোলে ছুঁড়ে দিলেন। 'আমাকে আবার রাণীর সঙ্গে ক্রোকে খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিতে হবে।' এই বলে তিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাঁধুনী তাঁর দিকে একটা তাওয়া ছুঁড়ে মারল। তিনি একটুর জন্যে বেঁচে গেলেন।

[ক্রমশঃ]

উদ্যানে একদিন

সুস্মিতা দে (সভ্যা, ৯)

সেদিন ছিল রবিবার। বাবা ঠিক করলেন, আমাদের নিয়ে তিনি শিশু উদ্যানে বেড়াতে যাবেন। আমার আনন্দের সীমা রইল না। সকাল থেকে বাবাকে তাড়া দিতে লাগলাম কখন সেই শিশু উদ্যানে আমাদের যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত সেই সময়টা এসে উপস্থিত হল। বিকেলবেলা বাবা, মা, আমি ও ভাই গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি লেক টাউন ছেড়ে ভি. আই. পি. রোডের দিকে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের গাড়িটা ভি. আই. পি রোডের ওপর এসে গেল। গাড়িটা শিশু উদ্যানের দিকে এগিয়ে যেতে গাড়ি থেকেই যেটা চোখে পড়ল, সেটা একটা মর্মর মূর্তি। সাদা লম্বা মূর্তিটি একটি গোল বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাবা ঐ মূর্তিটিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ মূর্তিটি হচ্ছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের। তিনি আরও বললেন যে, আমরা যে উদ্যানটিতে বেড়াতে যাচ্ছি, সেই উদ্যানটি নাকি শিশুদের জন্য, তাঁর স্মৃতিরক্ষা কমিটির উপহার। তাই উদ্যানটির নাম বিধান শিশু উদ্যান। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের গাড়িটি সামনের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা লোহার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ডান দিকে চোখে পড়ল বিরাট মাঠ। বাবা বললেন, এই মাঠে বিভিন্ন ধরনের খেলা হয়। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি গোল চৌবাচ্চা—তার মধ্যে বিভিন্ন মাছ। সুন্দর মাছগুলো দেখে আমার ভাই চেঁচিয়ে উঠল। মাঠের আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম, এখানে এসে দেখলাম শিশুদের জন্য কত খেলার আয়োজন। চারদিকে শিশুদের কোলাহলে মুখর। তারা আনন্দে কেউ দোলনায় চড়ছে, কেউ বা স্লিপে, আবার অনেকে ঢেঁকিতে। একটা সুন্দর জিনিস পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। সেটি হচ্ছে দড়ির সিঁড়ি। সিঁড়িটি নীচ থেকে মাটির ঢিবির ওপর উঠে গেছে। আমি ও আমার ভাই দড়ি ধরে কিছুটা উঠলাম। খুব মজা লেগেছিল। এখানে কত রকমের গাছ। কত রকমারী ফুলের গাছ। এক জায়গায় দেখলাম ছোটছোট গাছ দিয়ে কী সুন্দর একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র করা হয়েছে। এখানে এসে চোখে পড়ল, একটি বড় পুকুর উদ্যানকে ঘিরে বয়ে চলেছে। পুকুরের ওপর একটি নৌকাকে ভাসতে দেখলাম। সত্যিই সব কিছু মিলে কী সুন্দর এই উদ্যান। চারিদিকে ফুল আর ফুল কোন জায়গায় শুধু গোলাপ কোন জায়গায় শুধু ডালিয়া। বিভোর হয়ে যখন আমি উদ্যানের সব কিছু দেখছি, তখন হঠাৎ একটা ঘণ্টা বাজানোর আওয়াজ কানে পৌঁছল। দেখলাম, সবাই খেলা ছেড়ে সামনের দিকে যাচ্ছে। বাবাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি বললেন, চল, সময় হয়ে গেছে। এবার আমাদের চলে যেতে হবে। তাই আস্তে আস্তে আমরা ভিড় ঠেলে বাইরে চলে এলাম। আইসক্রীম কিনে আমরা গাড়িতে চড়ে বসলাম। আমার কিন্তু বাড়ি ফেরার দিকে মন ছিল না। গাড়ি ছেড়ে দিল। পিছনের জানলা দিয়ে উদ্যানটির দিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল, বাবা যে বলেছিলেন উদ্যানটি তাঁর স্মৃতি রক্ষা কমিটির উপহার। সত্যিই, উপহারটি তাঁর যোগ্য হয়েছে। তাঁর ওপর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল।

১লা জুলাই, ১৯৮১

সুধীরমাধব বসু

১৮ বছর আগের ১লা জুলাই এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। ১লা জুলাই আগে বহু-বার এসেছে, সকলের কাছে কত আনন্দের ছিল দিনটি। কিন্তু ১৯৬২ সালের সেই দিনটিতে ভোরেব আলো হতে না হতেই মনের মধ্যে সংশয় ছিল কিভাবে কাটবে সমস্ত দিন। ছুটে গেলাম, আগের দিনের ব্যবস্থা সকলে মেনে নিয়েছেন। অনেকেই আছেন উদ্বেগ ও চিন্তা নিয়ে। এক জায়গায় কেউ বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারছেন না, কখন কি হয় তারই অধীর প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি?

শিশু উদ্যানে এসে ভাবছি, আজকের দিনটি কত তফাত সেই দিনের থেকে। চারদিকে উৎসাহ উদ্দীপনা আর কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা। স্রোতের মত লোক আসছে, আবাল বৃদ্ধ, বনিতা সকলের মনেই আজ খুশির আমেজ, ছোট ছেলেমেয়েরা ভাবছে আজকের দিনটি তাদেরই জন্য। তাদের নিয়ে ছয় বছরে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, আজ এই বিরাট মঞ্চে তারাই প্রধান। ১৮ বছর আগের ঘটনা এরা কেউ দেখেনি। সেদিন এই একই সময়ে যে মানুষের স্রোত দেখেছিলাম তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। তারা সেদিন ছুটে এসেছিল একজনকে দেখতে যাকে আর কোন দিনও দেখা যাবে না। আজও তারা এসেছে সেই একজনকে তাঁদের অন্তরের ভক্তি ভালবাসা জানাতে। তাই ভাবছিলাম এই দুটো দিনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মন প্রাণ দিয়ে সকলে চেষ্টা করছে তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল করে ধরে রাখতে। শিশু উদ্যানের কার্য পরিষদকে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। চার-দিক দেখে মনে মনে ভাবলাম ১৮ বছর আগের এই দিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কজন আজ এখানে আছেন—দেখলাম খুবই কম, সেদিনও তাঁরা যেমন ছিলেন, আজও সেই রকম, তবে এক জনের সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। সেদিন তিনি খুব ভোরে এসে প্রায় পাহারা দিচ্ছিলেন বলা চলে, যাতে অনেকে উপরে উঠতে না পারে। সেদিনই তাঁকে আবার অন্য মূর্তিতে দেখলুম। সকালে ছিলেন মুহ্যমান, আর বিকেলে যখন রাজ্যপাল, পদ্মজা নাইডু, প্রফুল্ল সেন, কালীপদ মুখার্জী এরা সকলেই শোকে এমনই অভিভূত, প্রায় সব কাজ বন্ধ হয়, তখন এই লোককেই দেখেছিলুম অবিচলিত নিষ্ঠায় এসে সব ব্যবস্থা তদারক করছিলেন, তাঁর ১৮ বছরের চিন্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল দেখতে পাওয়া গেল। ১৯৭০ থেকে নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে এনে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তার তুলনা বিরল। ডাঃ রায় ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসতেন—তারা মানুষ হয়ে উঠুক সেই চেষ্টাই করে যেতেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে গড়ে উঠেছে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের স্মৃতি সৌধ মন্দির, বাস্তবে পরিণত হয়েছে তাঁর স্বপ্ন। তিনি যা ভেবেছিলেন কিন্তু জীবদ্দশায় করে উঠতে পারেন নি, সেই সূত্র ধরে এগিয়ে গিয়ে আজ তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবে এসে উপলব্ধি করছি যেন জীবন্ত কর্মবীরকে ঘিরে রয়েছে সেই শিশুবৃন্দ, যারা বাংলা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

অলৌকিক না ভৌতিক ?

রিঙ্কু বসু (সভ্যা, সিনিয়র)

ছোটবেলা থেকেই আমার ভূত দেখার সখ। একবার হঠাৎ ভূত দেখার একটা সুযোগ এসে গেল ; কলেজের কাজল বলে একটা ছেলে ওদের গ্রামে একটা ভূতুড়ে বাড়ির খবর দিল। অনেক কষ্টে মা বাবার মত করিয়ে আমি কাজলের সঙ্গে ওদের গ্রামে গেলাম. এখানে বলে রাখা ভাল আমি কিন্তু আমার মা বাবাকে ভূতের বাড়িতে যাবার কথাটা বলি নি তাহলে যে মত পেতাম না তা বলাই বাহুল্য। ওর মা বাবা গ্রামেই থাকেন, আমাদের দেখে খুব খুশি কিন্তু যেই শুনলেন আমি সেই ভূতুড়ে বাড়িতে যাবার জন্য এসেছি তখন কেউই মত দিলেন না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল, জীবনে প্রথম একটা ভূত দেখার সুযোগ এসেও হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। জানলা দিয়ে গ্রামের দৃশ্যপট দেখছিলাম, বেশ ভালো লাগছিল, হঠাৎ মনে হল আমার চোখদুটো যেন গ্রামের শেষপ্রান্তে একটা বিরাট ভাঙ্গাচোরা বাড়ির কাছে যেতে চাইছে গা টা শিউরে উঠতে জানলা ছেড়ে কাজলের কাছে গেলাম। কাজলের সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে জানলাম ঐটাই সেই ভূতুড়ে বাড়ি। যাই হোক, গ্রামে কাজলের সঙ্গে বিকেলে বেড়ালাম, গাছে ওঠা, সাঁতার কাটা সব কিছুতেই খুব মজা লাগছিল, মন খারাপটা এক নিমেষেই দূর হয়ে গেল। রাত্তিরে মাসিমার হাতের গরম গরম মাছের ঝোল ও ভাত খেয়ে আমি আর কাজল ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। দিনটা খুবই ছুড়োছুড়ি করে গেছে তাই কাজলের সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালই নেই। রাত্রিবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে আমি জল খেতে উঠলাম। তারপর কি যে হোল জানি না। মনে হয়, আমি যেন দরজা খুলে হাঁটতে লাগলাম, কিছুক্ষণ পরে দেখি আমি একটা বিরাট রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি অতি পরিচিতের মত। যারা আমাকে দেখছে তারা সবাই আমাকে সেলাম করছে। শেষে আমি একটা দরজা খুলে একটা ঘরে ঢুকলাম। ঘরটা একটা বিরাট হলঘর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে আজকে সেখানে উৎসব হবে। হলঘরটা উৎসবের সাজে সেজে যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছে। একটা চাকর ঝাড়বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল মুহূর্তে আলোর ছটায় রাত্রের হলঘরটা যেন দিনের আলো হয়ে উঠল। এরপর একজন লোক ঢুকল সেই হলঘরে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে—জমিদার মশাই নিশ্চয়। তারপরই, আমি চমকে উঠলাম। একি ? এ কে ? যেন হুবহু আমি দাঁড়িয়ে আছি। জমিদার মশাই আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নাচ। ' নাচছে বিখ্যাত বাঈজী তারাবাঈ। ভাবছ, জানলাম কি করে ? সেটা তো আমিও বলতে পারব না, তবে এসব আমার ভীষণ চেনা, এই রাজবাড়ির প্রতিটি অলিগলি আমার চেনা। হঠাৎ নীচ থেকে শোনা গেল একটা 'হৈ হৈ মার মার' চিৎকার। ক্রমশঃ আওয়াজটা এগিয়ে আসছে তারপর দেখা গেল গ্রামের সমস্ত কৃষক প্রজা লাঠি, সড়কি নিয়ে হলঘরে ঢুকতে চাইছে। জমিদারের দারোয়ান, পাইক, বরকন্দাজ আপ্রাণ চেষ্টা করছে আটকানোর কিন্তু ওরা যেন মরিয়া। ওদের মনে 'হয় এসপার নয় ওসপার' এইরকম একটা ভাব। দারোয়ানেরা

পারল না ওদের রুখতে। ওরা হৈ হৈ করে জমিদারকে আক্রমণ করল। হলের মধ্যেই শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। হঠাৎ আমি একটা আঘাতে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর কি হয়েছে আমি কিছুই জানি না। চোখ খুলে দেখি আমার মা বাবা সবাই উপস্থিত। ধীরে ধীরে আমার সব মনে পড়ল। আমি ভেবেই পেলাম না মা বাবা কি করে এখানে এলেন। তারপর শুনি সকালে কাজল আমাকে দেখতে না পেয়ে লোকজন নিয়ে খুঁজতে বেরোয়। তারপর আমাকে দেখে অজ্ঞান অবস্থায় রাজবাড়ির সিঁড়িতে পড়ে আছি। ওরা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছিল ব্যাপারটা, আমি ওদের পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কাজলের বাবা সেখানকার ছেলে উনি সব কথা শুনে বললেন অনেকদিন আগে ওই গ্রামে রতন রায় নামে এক জমিদার ছিলেন। তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। যদি কোন প্রজা তার কথার অবাধ্য হত তাহলে রাজবাড়ির নীচে চোরা কুঠরিতে তাকে না খেতে দিয়ে মারা হত। গাঁয়ের মোড়লের ছেলে খেতাব লেখাপড়া শিখেছে কলকাতা গিয়ে। সে গাঁয়ে এসে সব প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুলল। একদিন ওরা ঠিক করল যখন নাচ ঘরে নাচ হবে তখন জমিদার হালকা মেজাজে থাকবে সেই সময় তাকে সবাই আক্রমণ করবে। সবই ঠিক হয়েছিল কিন্তু খণ্ডযুদ্ধে যারা গিয়েছিল তারা কেউই প্রাণ নিয়ে ফেরেনি। তবে প্রতিশোধ তুলেছিল রতন জমিদারকে মেরে। আস্তে আস্তে রাজবাড়ি ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। আজ এত বছর পরে আমি কেন সেই সব দৃশ্য দেখলাম জানি না। আমিই কি ওই জমিদার ছিলাম? না সবই আমার মনের ভুল। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়েছে, অনেক ভুতের বাড়িতে গেছি রাত্রি কাটাতে, কিন্তু সেই রাত্রের ঘটনা আমি আজও ভুলতে পারি নি। মনে প্রশ্ন জাগে আমি সত্যিই কি সেদিন ভুত দেখেছিলাম? সেদিনের ঘটনাটা ভৌতিক না অলৌকিক?

কার্শিয়াঙ

ইন্দ্রানী চট্টোপাধ্যায় (সভ্যা, ১২)

গার্ড সাহেব দিল নিশান
ছাড়ল গাড়ি ইস্টিশান।
চাকায় চাকায় টিটাং টাঙ্
থামল শেষে কার্শিয়াঙ্।
কার্শিয়াঙে সবুজ পাহাড়
তার পেছনে পাতার বাহার
সেখানে চাঁদ মামার বাড়ি
কু ঝিক্ ঝিক্ করে গাড়ি।

গ্রামের মাঠ

দেবজ্যোতি বসু (বয়স, ৭)

গ্রামে অনেক মাঠ আছে
বাগান আছে তারই কাছে।
ফুল ফোটে গাছে গাছে
গাছের ডালে পাখি নাচে।
সেই ফুলেতে মধু হয়—
মৌমাছিরা তাই খায়।

পৃথিবীর জল সরবরাহ ব্যবস্থা

শ্রীহর্ষ মল্লিক

পৃথিবীর সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের চার-ভাগের তিন ভাগই তো জল দিয়ে ঢাকা। অবশ্য এ জলেরও আবার রকমফের আছে। রকমফের বললে হয়ত সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপানের' সেই নাকের জল, চোখের জল, ডাবের জল ইত্যাদি হাজার গণ্ডা জলের তালিকা মনে আসতে পারে।

কিন্তু গোড়াতেই বলি, এখানে সে সব কিছু বলা হচ্ছে না।

পৃথিবীর সমগ্র জলভাগের প্রধান উৎসই হল মহাসাগরের জল অর্থাৎ লোনা জল। প্রায় ৯৭ শতাংশ জল হল এই ধরনের। তাহলে রইল বাকী ৩ শতাংশ—তার মধ্যে ২ শতাংশ আসে বরফ ঢাকা অঞ্চল থেকে। রইল বাকী ১ শতাংশ সেটার যোগান দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ছোট নদী, হ্রদ, মাটির নিচের স্তরের জল—যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে ভৌম জল বা Ground Water.

শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, ভূ-পৃষ্ঠের উপরের আবহাওয়ায় বা বায়ুমণ্ডলেও আছে সামান্য জলীয় অংশ তারাও ঐ ১ শতাংশর কিছু ভাগ বইন করছে।

পৃথিবীর জলভাগ বলতে অসংখ্য সাগর মহাসাগর রয়েছে। তবে সবচেয়ে নামী হল চারটি মহাসাগর—অর্থাৎ আটলান্টিক, ভারত, প্রশান্ত আর কুমেরু। এরা পৃথিবীর প্রায় ১২৯৪০৮ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান দখল করে আছে।

বলা বাহুল্য যে, এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল প্রশান্ত মহাসাগর আর সবচেয়ে ছোট হল কুমেরু মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগরের ১২ ভাগের এক ভাগও নয়। তবে আয়তনের ক্ষুদ্রতার জন্যই কুমেরু মহাসাগরকে অনেকে মহাসাগর আখ্যা দিতে চান না—ঠিক যেমন অবস্থা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কেউ বলেন পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ আবার কেউ বলে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। এখানে আছে পৃথিবীর ৩১৭ মিলিয়ন কিউবিক মাইল লবণাক্ত জল। মহাসাগরগুলিতে এত জল এল কি করে? ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলা যাক।

এইসব মহাসাগর ছাড়া পৃথিবীতে আছে আরও সংখ্যাতীত সাগর—তাদের মধ্যে আয়তনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল, ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ চীন সাগর, বেরিং সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, পূর্ব চীন সাগর, পীত সাগর। নামী উপসাগরের মধ্যে মেক্সিকো ও হাডসন-এর নাম করতেই হয়।

এ ছাড়া আছে অজস্র বড়-ছোট নদী আর হ্রদ—এদের কথা তো সব ভূগোল বইয়েই বিস্তর লেখা আছে।

বরফ-ঘটিত জল সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কুমেরু অঞ্চলের সঞ্চিত পুরু বরফ-স্তর থেকে, তার পরেই হল গ্রীনল্যাণ্ডের বরফ স্তূপ থেকে।

এই সব বিভিন্ন ধরনের জল প্রতিনিয়তই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেশামেশি করছে। রোদের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে আবার মেঘ হচ্ছে—বৃষ্টি হয়ে নেমে আসছে নিচে। আবার কখনও কখনও হিম হয়েও ঝরে পড়ে। এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আবার বাষ্প হয়ে ফিরে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে—আবার নেমে আসছে আবার বাষ্প হচ্ছে এইভাবেই চলছে অনন্তকাল ধরে ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। দেশটি প্রতি বছর প্রায় তিরিশ ইঞ্চি জল পায়—অবশ্য নানা ভাবে। এর সমগ্র পরিমাণ হল প্রায় ১৪৩০ কিউবিক মাইল। এর প্রায় ১০০০ কিউবিক মাইল জল আবার বাষ্পীভবন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় উপরে উঠে যায় বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে মিশতে। তার থেকে আবার প্রায় ৪০০ কিউবিক মাইল পরিমিত জল নিচে নেমে আসে প্রতি বৎসর—ছড়িয়ে পড়ে দেশের সাগর, উপসাগর, নদী ও সমুদ্রে।

এই একই কাণ্ড করছে নদীগুলোও। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী হল দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০ মাইল। এর অববাহিকা অঞ্চলের পরিমাণ হল ২.৩ মিলিয়ন বর্গ মাইল। এই নদী প্রতি বৎসর ১৩০০ কিউবিক মাইল নিয়ে এসে ফেলছে মোহানার সমুদ্রে।

আফ্রিকার কঙ্গো নদীরও নাম আছে এ ব্যাপারে—দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭০০ মাইল বলে কেউ কেউ ওকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বলে। এ নদী প্রতি বৎসর আটলান্টিক মহাসাগরে ৩৪০ কিউবিক মাইল জল নিয়ে এসে ফেলছে।

পৃথিবীর নাম করা ৬৬টি নদী—তার মধ্যে নীল, মিসিসিপি, ইয়াংসি, আমুর, হোয়াং হো, লেনা, ম্যাকেঞ্জি মেকং, নাইজার, ইলিসি, মারে-ডার্লিং, ভোলগা, সিন্ধু প্রভৃতি সব নদীই আছে—এর সম্মিলিত ভাবে প্রতি বৎসর ৫৭২০ কিউবিক মাইল জল এনে ফেলছে পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরে।

আর যদি এই হিসাবের সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় খ্যাত অখ্যাত ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর প্রবাহের কথা যোগ করা হয় তবে বিভিন্ন সাগরে বার্ষিক জল নিকাশের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯২০০ কিউবিক মিটার।

এরপর আসছে হ্রদের কথা। পৃথিবীর সব দেশেই যে বড় বড় হ্রদ আছে এমন নয়। মাত্র তিনটি মহাদেশে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলি আছে আবার উত্তর আমেরিকাতেই পৃথিবীর বড় বড় হ্রদগুলির মধ্যে আয়তন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের সুপিরিয়র, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া, রাশিয়ার আয়াল বৈকাল, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের হিউরন ইরি অন্টারিও, যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান, মধ্য আফ্রিকার নিয়াকা ও টাঙ্গাইনিকা কাগর্নার গ্রেটবিয়ার গ্রেট স্লেভ, উইনিপেগ, আলাবাস্কা রেনডিয়ার প্রভৃতি।

ক্যাস্পিয়ান সাগরকে কেউ কেউ হ্রদ বলেন—সেই আয়তন ঘটিত সমস্যা। যে কারণে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ও কুমেরু মহাসাগরকে নিয়ে সমস্যা, সেই কারণেই ক্যাস্পিয়ান কখনও হ্রদ, কখনও সাগর। যা হোক, হ্রদরূপে মেনে নিলে এটি হবে সর্ববৃহৎ হ্রদ—সুপিরিয়র হ্রদের প্রায় ছয় গুণ বড়।

এই সব হ্রদ সম্মিলিত ভাবে ৩০ হাজার কিউবিক মাইল সরবরাহ করছে মহাসাগরগুলিকে—সবই মিঠে জল, নোনা নয়। এর ৭৫ শতাংশ জলের যোগানদার হল আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার মাত্র পাঁচটি হ্রদ।

ভৌম জলের পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। দেখতে শুকনো হলেও, মাটির মধ্যেকার যে রস আছে সারা পৃথিবীর মাটির মধ্যে তারা সম্মিলিত ভাবে যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীতে সরবরাহ করছে ৬০০০ কিউবিক মাইল জল।

ভূপৃষ্ঠের আধ মাইল নিচেই আছে অনেক জলপ্রবাহ। এরা যা জল সংগ্রহ করে রেখেছে তা নাকি ভূপৃষ্ঠের উপরের জলের ৩০ গুণ বেশি। সমুদ্রের জলের তালিকায় এটাও যোগ করতে হবে। আর বরফের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ইউরোপের আল্পস, এশিয়ার হিমালয় ও উত্তর আমেরিকার কাস্কেড পর্বতের সঞ্চিত বরফ প্রায় ৫০ হাজার কিউবিক মাইল সরবরাহ করে।

সুতরাং মহাসাগরগুলি যে এত জল পায় কোথা থেকে সেটা এখন নিশ্চয়ই আর কোন সমস্যা নয়। চারিদিক থেকে এত জল বলেই না এরাই সমগ্র পৃথিবীর চার ভাগের তিনভাগই ঢেকে রেখেছে।

বিয়ের ভোজ

বিশ্বরঞ্জন দাস (বয়স, ৯)

বিশু কাকুর টিয়ার সাথে
আমাদের ওই চন্দনার
বিয়ে হবে আজ দুপুরে
দেখতে সে তো মন্দ না।
বর যাত্রী অমল বিলে
বর কর্তা বিশ্বজিৎ—
বেনারসী গরদ মিলে
হয় না কারো হার জিৎ।
হাঁড়ি ভাঙা মাছ হয়েছে
ইটের কুচি মাংস
পাতার লুচি, বালির পোলাও
শুনে তুমি হাসছ?
স্বাদ পাই না খেতে বসে
শুধুই বলি আর না—
ভরে না পেট, বাড়ে খিদে
খুঁজি মায়ের হাতের রান্না।

অজানা

সহদেব সাহা (সভ্য, সিনিয়র)

আঁকাবাঁকা পথে
অজানার সাথে
চিরদিন ছুটে চলা
আমার ললাটে।

দুর্গম গিরিপথে
হারিয়ে যাওয়া
তারই সাথে
দেখেছি অজানার ছবি
কত রঙিন পটে।

কত অশান্ত পারাবার
হয়েছি আজ পার
অজানাকে জয় করেছি
নেই কোন ভয় আর।
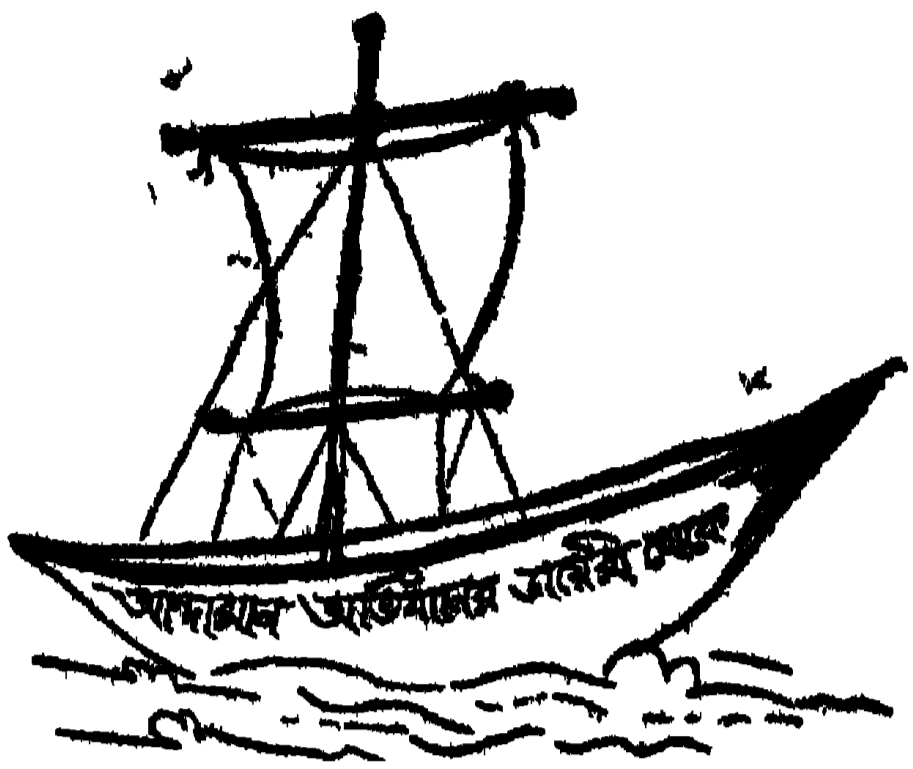
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

সকাল থেকে একটা চাপা ব্যস্ততা। সময় যেন কাটতে চায় না। এক সময় হাজির হলাম মেরিন হাউসের গেটে। দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ভদ্রলোক। আমায় ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন। তখন আর আমার ভেতরে ততটা ব্যস্ততা অনুভব করলাম না। আমার ডাক পড়ল প্রথম দশ জনের পরে। দরজা দিয়ে বিরাট হ'ল ঘরটায় ঢুকে এত লোককে দেখব আশা করিনি। ওঁদের ভীড়ে একটা চেয়ার আমায় দেওয়া হল বসবার জন্য। মনের তলায় শান দিচ্ছি আমার বিদ্যের সমস্ত বিষয় বস্তুকে। এই বড় সভায় দেখলাম মিহিরবাবুর আর লেক রোয়িং ক্লাবের কৈলুদা (ব্যারিষ্টার এস. এন. সেন) ছাড়া আর সমস্ত মুখ অচেনা। মিহির বাবু একে একে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনেক কথার ফাঁকে এক সময় আমার সবচেয়ে অসতর্ক প্রশ্নটা এল। আমার যাওয়া সম্পর্কে বাড়ির লোকের কি ধারণা। একেবারেই তৈরি ছিলাম না, বেমালুম বানিয়ে বলতে হ'ল যে, বাড়িতে কিছুই মনে করবে না। এঁদের ভাবলেশহীন মুখ দেখে বুঝছিলাম না এ'দের মনের প্রতিক্রিয়া। তাই এক সময় আমার আর একটা বড় দিককে (ওয়ার্ক ফিজিওলজির গবেষণার দিক) নিজে থেকেই সুযোগ করে তুলে ধরলাম। আমার কথা আগ্রহ ভরে শুনতে লাগলেন ডাঃ অঞ্জলি সেন, আর্মি সাইকোলজিস্ট।

লম্বা ইন্টারভিউ-র পর ছাড়া মিলল এক সময়, মনটা বড় ক্লান্ত, কিছুই ভাবতে চায় না, তারপর একসময় ফিরে এসেছি দৈনন্দিন কাজের ভেতর। এলোমেলো ভাবে দিন কাটে। আবার এক্সপ্লোরার ক্লাবের ছাপ মারা খামে চিঠি পেলাম। জীবনে দুটো অলটারনেটিভ ঃ আছে—হাঁ অথবা না—দার্শনিক হয়ে উঠি, খাম খুলতে খুলতে, কি এসে যায় যদি না-ই নিল আমাকে। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম ঠাওর হ'ল। আমার ডাক এসেছে মেডিকেল বোর্ডের কাছে যাবার জন্য।

আবার সেই বোর্ড। হাজির হলাম এবার কলকাতার আর্মি হসপিটালে। এক্সপ্লোরার ক্লাবের সেক্রেটারী অশোক দাশগুপ্ত সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভেতরে। এর পরে ডাক পড়ল ফাইনাল সিলেকসনের জন্যে। আবার সেই মেরিন হাউস, আবার সেই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা।

এতদিন ধরে আমার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী জেনে এসেছি সাইগল বলে একটি ছেলেকে, মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করে, পাঞ্জাবী ছেলে, যেমনি চালাক তেমনি চৌখশ। আর দেখি নি আজও লেঃ ডিউককে, যার ন্যাভাল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট দেখেই তাকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে (রূপকথার রাজপুত্রের মত)। এখন ইণ্ডিয়ান নেভি তাকে ছাড়তে চাইছে না। আর তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যেই এক্সপ্লোরার ক্লাবের সকলের ঘাম ছুটছে।

এলাম মেরিন হাউসে। প্রথম দিনের উচ্ছ্বাস

আর নেই, মনে মনে তৈরি হয়ে এসেছি, সাইগলকে আমার থেকে অনেক যোগ্য ভেবে। ডিউককে এই প্রথম দেখলাম এবং আগে না দেখেই চিনলাম। যেমনটি শুনেছি ও ঠিক তেমনটি।

ফাইনাল সিলেকসনের কাজ শেষ হবার ফাইনাল ঘণ্টা যখন বাজল, তখন আমার কানের ভেতর হাজার হাজার ঘণ্টা বাজছে একসঙ্গে। এতদিন যা ছিল স্বপ্ন, আজ তা কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে বাস্তবে নেমে এল। ডিউক বিদায় নিল কয়েক দিনের ভেতর দেখা হবে আশ্বাস দিয়ে। আমি বাড়ির পথ ধরলাম। শীতের কলকাতা, কুয়াশা আর ধোঁয়া চোখ জ্বালা করে। অনেক কিছু ভাবতে চাইছি কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়।
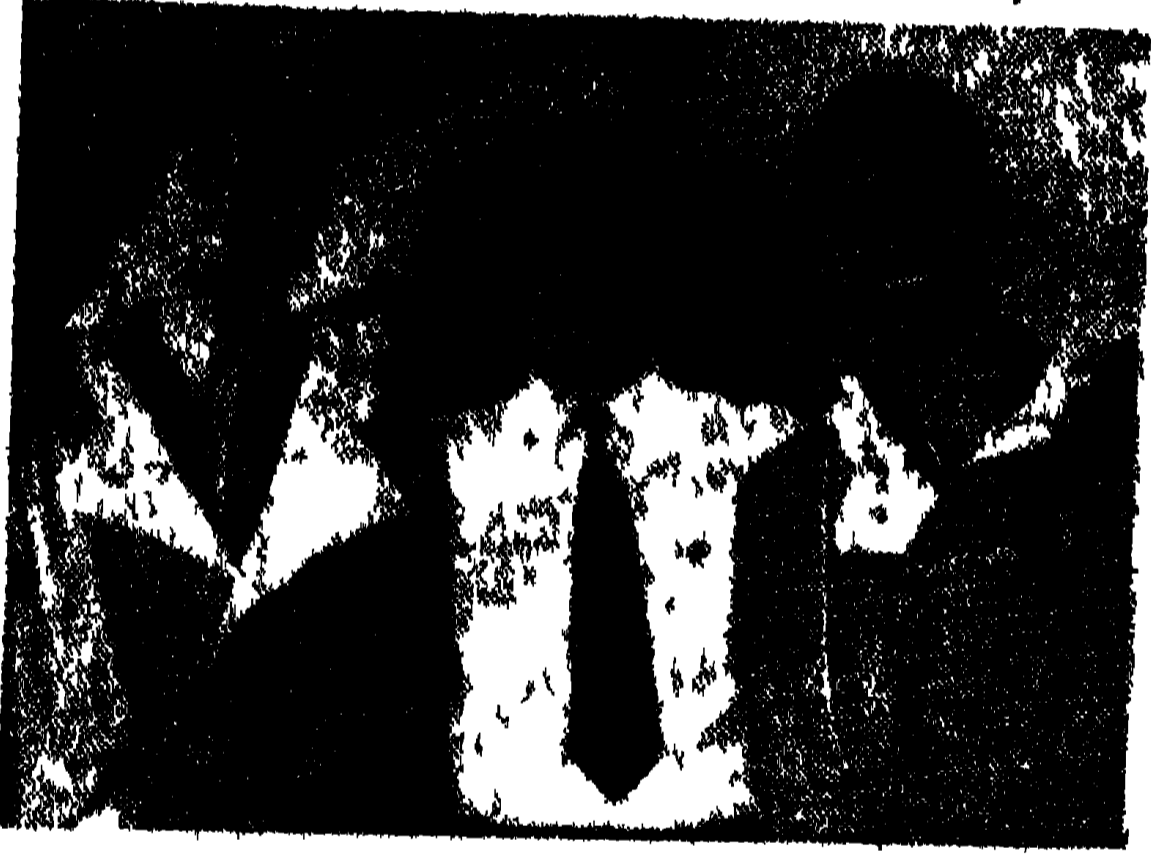
আমাদের সদানন্দ রোডের তিনতলা বাড়িটার সম্বন্ধে আমার আজীবন যা অভিজ্ঞতা, আজ তা কিছুই কাজে লাগল না। সমুদ্রের ঝড় তখনও দেখিনি, পারিবারিক সাইক্লোন দু'একটা আমার ওপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আজকের ঝড়ের কোন তুলনা হয় না। এ রেডিও-র শত্রুতা। আজ সন্ধ্যের কোন্ এক সময় অল ইণ্ডিয়া রেডিও আমার এই সর্বনাশ করেছে। বাড়িতে আমাকে কেউ একটা কথা বলার মত সুযোগ দিল না, শুধু চেঁচামেচি আর হৈ-চৈ করে সময়টা কেটে গেল। সময় তার পর কাটতে লাগল ঠিকই, কিন্তু আমার চেতনাকে সত্যি সত্যি টুকরো টুকরো করে কেটে কেটে। সে দিনগুলোর মত রক্তাক্ত দিন আমার জীবনের ইতিহাসে বিরল। একে একে প্রতিটা মানুষ আমার বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠল। শুধু তিনজন ছাড়া,— আমার বোন খুকু, ভাই বাবু আর দিলীপদা (আমার জেঠতুতো ভাই)। আমাকে বাড়ির চার দেওয়ালের ভেতর খোঁজ পেলেই চেনা আর অচেনা প্রতিটা মানুষ আমাকে অযাচিত আর অমূল্য উপদেশ দান করত আমার বিবেক ফিরিয়ে আনতে, কেউ বা সন্দেহ করল আমি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছি বলে।

ভুগছিলাম অসুস্থতায় নয়, অস্বস্তিতে, সে এক বিষম দ্বন্দ্ব। নিজের কাছেই ব্যাপারটা গুলিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। আমার ভেতর তখন গোঁ চেপে বসেছে, আমি কেন যাব না, এতে কি অপরাধ। লাভ-লোকসানের হিসেব ছোট থেকেই আমার মাথায় ঢোকে না। আসল কথাটা যখন পরিষ্কার হ'ল, তখন ব্যাপারটা নিয়ে না ভেবে পারলাম না। এমনতর ব্যাপারে না ফেরার আশঙ্কা আছে, আর সেই জন্যেই মা, বাবা অসম্ভব চিন্তিত। তবু অন্য কেউ হলে কথা হত, আমার সম্বন্ধে আর ভাবার কিছু নেই, একেবারে নির্ঘাত……। যে ছেলে রাতে শুতে গেলে দরজা লাগাতে ভুলে যায়, সন্ধ্যে আটটা থেকে ঢোলে, সে কিনা নৌকা চড়ে কালাপানি পার হবে। অসম্ভব। মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন সকলেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, অসম্ভব। শুধু খুকু রয়ে গেল ওদের বাইরে। এতদিন চেঁচামেচি আর বকাবকি হচ্ছিল, এক সময় এ সবের শেষে মাকে প্রথম কাঁদতে দেখলাম।

ব্যাপারটা একেবারে নতুন আমার কাছে, হঠাৎ কেন যেন ভীষণ অপরাধী ঠেকল নিজেকে। বাবা চুপ করলেন বটে, তবে বুঝলাম যে কী ভীষণ চিন্তিত। এইবার মনে হতে লাগল কি দরকার এ অশান্তি করে। ছেড়ে দি এ সব, শুধু আমারই জন্যে এত কাণ্ড ভাবতেও পারছি না,—সব হিসেব হারিয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

বড়দিন এসে গেল, বাবারা বের হল ঘুরতে। আমি রয়ে গেলাম কলকাতায়। এমন সময় একদিন দেখা করতে গেলাম ডাঃ মৈত্রের সঙ্গে। অনেক চড়াই উতরাই পেরোন মানুষ। এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে গেলাম তাঁর কাছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনলেন। তারপর নিঝুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে বললেন, "ইডিওলজি আর সেন্টিমেণ্ট চিরকাল বিরোধ ক'রে, শুধু একটা কথাই বলতে পারি সেন্টিমেন্টের লজিক নেই।"

আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি। এত সোজা ব্যাপারটা আগে বুঝিনি বলে লজ্জা পেলাম। কিন্তু আর একটা উপসর্গ এসে হাজির হল আমার মনে। এখন বাড়িতে কেউ নেই, অন্তত রুটিন মাফিক বকুনি নেই, তবুও মনের রাজত্বে আর একটা নতুন চিন্তা এসে হাজির হল, যখন বুঝলাম সেন্টিমেন্টকে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ব্যাপারটা খুব সাধারণ ভাবেই একদিন এল আমার রাত জাগা মনে, সত্যিই তো আমি যদি আর কোনদিন না ফিরি। মনে হ'ল ভবিষ্যৎ বলে আমার কিছু নেই। একমাস বাদে কি হবে আমি তা কিছুই জানি না। কেমন যেন একটা ছটফটে ভাব আমার ভেতর। শুধু শুধু কি দরকার এমনি করে অনিশ্চয়তাকে ডেকে আনার? (চলবে)

চাঁপা

কাকলি কুণ্ডু (সভ্যা, ৭)

চাঁপা গাছে চাঁপা ফুল
দেখতে এল বুলবুল।
মিষ্টি সুরে ধরল গান—
জুড়িয়ে গেল চাঁপার প্রাণ।
সোনার বরণ অঙ্গটি,
ভুরভুরে তার গন্ধটি।
খবর পেয়ে ছোট্ট মেয়ে
আসছে ধেয়ে পথ বেয়ে।

দাদু ও আমরা

ঝুমকা ভাদুড়ী (সভ্যা, সিনিয়র)

দাদুর আছে অনেক নাতি-নাতনী
তাদের নিয়ে দাদুর বড় খাটনি।

তাদের তরে গড়েছেন এক উদ্যান
সেই বাগানই হয়েছে তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

সেখানেতে আমরা সবাই খেলি—
দোলনা চেপে খুশির ডানা মেলি।

রোমন্থন

পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, ১২)

মেজদির কাছে বাংলার একটা ব্যাখ্যা বুঝতে গিয়েছিলাম শনিবার সকালবেলায়। আমার মেজদি মাধ্যমিকে বাংলায় লেটার পেয়ে পাশ করেছে। তাই, আমি পড়াশোনায় দিদিদের সাহায্য নিই। আমি খাতা বই নিয়ে মেজদির পড়ার ঘরে ঢুকলাম। মেজদিকে আমি প্রায়ই বিরক্ত করি পড়া নিয়ে। মেজদির পড়ার সময়ে অন্য কথা বলাও আমার অভ্যাস। যা হোক্, ধমক হজম করে পড়ার দিকে মন দিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' নামে কবিতার একটা ব্যাখ্যা বোঝবার জন্যই মেজদির কাছে আমার যাওয়া। কবিতাটি বোঝাতে গিয়ে কবিগুরু যে বাচ্চা ছেলেটির কথা বলেছেন, সেখানটা বলতে গিয়ে আমার ও মেজদির চোখে জল এসে গেল। হঠাৎ, দুজনেরই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল।

একবছর আগে আমাদের গরমের ছুটি পড়ায় আমরা তিন বোন, মা ও বাবা একবার নেপাল গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা একটা গেস্ট হাউস পেয়েছিলাম। ভাগ্য ভাল ছিল বলে আমরা দোতলায় দুটো ঘর পেয়ে গেলাম। গেস্ট হাউসের পেছনে খানিকটা জঙ্গল ছিল। পেছনের বারান্দায় গেলে জঙ্গল দেখা যায়। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে কাটল সেই রাত্রিটা। পরদিন সকালবেলায় তিন বোনে বেড়াতে বেরোলাম। জঙ্গলের দিকটার কাছে গিয়ে একটা কান্নার স্বর শুনতে পেলাম। কান্নার স্বর যেদিকটা থেকে আসছিল, সেদিকে যাত্রা করলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে খুব কাঁদছে এবং তার সামনে এক মহিলা তাকে শাসাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে ভদ্রমহিলা কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন, তারপরেই আমাদের তাঁদের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করলেন। ভদ্রমহিলাকে কান্নার কারণ জানতে চাইলে হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু কান্না থামার পর বাচ্চাটিকে আমাদের গেস্ট হাউসে নিয়ে এলাম। বাচ্চা মেয়েটির বয়স বছর পাঁচেক। মেয়েটি অনাথ। বছর তিনেক আগে সে মা, বাবাকে হারিয়েছে। মেয়েটির নাম রুমি। কিছুক্ষণ পরে তাকে ওর বাড়ি দিয়ে এলাম। যতদিন ওখানে ছিলাম, মেয়েটির সঙ্গে খেলা করতাম। একদিন বাবা এসে বললেন পরের দিনই আমরা চলে যাব। যাবার দিন মা সব গোছগাছ করছেন। এমন সময় আমাদের বাড়ির কাছে চেঁচামেচি শুনে বাবা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন। কী ঘটল দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে এলাম।

যা দেখলাম তা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম সবাই! দেখি সেই রুমি মেয়েটি, মুখটা নীল হয়ে গেছে। ওখানকার লোকেরা মেয়েটিকে জলে ভাসতে দেখেছে। বাবা তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ি গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন বাড়িতে কেউ নেই।

সেদিন সবাই মনমরা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এলাম। সেদিন খাওয়া হল না। মেয়েটি হিন্দু বলে তাকে দাহ করা হল। তারপরের দিন আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। ঐ রুমির মৃত্যুতে যে কে দায়ী তা এখনও বার করতে পারিনি সময় পেলে আমি ভাবি যে একটা অনাথ মেয়েকে কেমন করে কষ্ট দিতে পারে। সেদিন আর আমার পড়া বোঝা হয়নি।

সেফটি গ্লাস

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্য, সিনিয়র)

এবার তোমাদের এক তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানীর আকস্মিক আবিষ্কারের গল্প শোনাব। সালটা ছিল ১৯০৩। তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী বেনিডিকটাস তাঁর গবেষণাগারে বসে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে একান্ত মনে গবেষণা করছিলেন। বিজ্ঞান সেবী তরুণ অধ্যাপক তাঁর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। একমাত্র চিন্তা নতুন কিছু আবিষ্কার, নতুন কিছু উদ্ভাবন—যা মানব সভ্যতার আরও কল্যাণ সাধন কববে। তারই একনিষ্ঠ গবেষণায় তিনি ডুবে ছিলেন।

একটা কাঁচের ফ্লাস্কে অ্যাসিটোন এবং সেলুলয়েড দ্রবনের মিশ্রণ নিয়ে একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলেন। প্রক্রিয়ার সব ফলাফলই তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছেন এমন সময়ে মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল এক মারাত্মক ঘটনা। হঠাৎ অসাবধানতার ফলে হাত থেকে পড়ে গেল মিশ্রণ সমেত কাঁচের ফ্লাস্কটি মেঝেতে। আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল ফ্লাস্কটি। অ্যাসিটোন ও সেলুলয়েডের মিশ্রণগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এই অসাবধানতার ফলে তার যে ক্ষতি হল তার তিনি একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। রাগ, দুঃখ উত্তেজনায় নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। রীতিমত কাঁপছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য অভাবনীয় ঘটনা লক্ষ্য করে ভুলে গেলেন তাঁর ক্ষতির কথা।

সাধারণত, কাঁচ ভেঙে গেলে কাঁচের টুকরোগুলো চারিদিকে ছিটকে যায়, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বেনিডিকটাস এ কী দেখছেন! ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো চারদিকে ছিটকে না গিয়ে পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে আছে। স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম এখানে হল কী করে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ আছে।

না, আর তিনি দেরি করলেন না, রহস্য উদ্ঘাটনে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। প্রথমে. খুব সাবধানে তিনি ভাঙা ফ্লাস্কটিকে মেঝে থেকে তুললেন। তারপর গভীরভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, বিভিন্ন পরীক্ষা করলেন, অনেক পরীক্ষার পর তিনি বুঝতে পারলেন ফ্লাস্কের ভিতরের দিকে কাঁচের গায়ে সেলুলয়েডের একটা পাতলা আস্তরণে কাঁচের টুকরোগুলো জড়িয়ে যাওয়ায় ছিটকে যেতে পারেনি, গায়ে গায়ে লেগেছিল।

এরপর দিনের পব দিন চলে গেল, এই ঘটনার কথা তিনি প্রায় ভুলেই গেলেন। কিন্তু একদিন খবরের কাগজের এক দুর্ঘটনার খবর তাঁর চোখে পড়ল। দুর্ঘটনার কারণ হল, একটি গাড়ির সঙ্গে আর একটি গাড়ির সংঘর্ষ এবং সেই গাড়ির কাঁচ ভেঙে ছিট্‌কে যাওয়ায় বেশ কিছু লোক আহত।

এই খবর চোখে পড়তেই পুরনো দিনের ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। শুরু করলেন আবার পরীক্ষা—যে করেই হোক এমন কাঁচ তৈরি করতে হবে যা ফেটে গেলেও ছিটকে পড়বে না। একে অন্যের গায়ে লেগে থাকবে। অক্লান্ত পরিশ্রমের মূল্য হিসেবে তিনি আবিষ্কার করলেন এমন কাঁচ যা ভেঙে গেলেও ছিটকে যায় না। কিন্তু আবিষ্কার তো হল, এর নাম দিলেন, সেফটি গ্লাস (Safety glass) বা নিরাপদ কাঁচ।

(শেষাংশ ২৪ পাতায়)

এসেছে শরৎ

সন্দিত পণ্ডিত (সভ্য, ৮)

শরৎ এসেছে.........শুনতে পাচ্ছি তার পায়ের শব্দ.........শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশ সোনালী রদ্দুরের ঝলমল আভা, মধুময় সূর্যকিরণ, মৌমাছি আর পাখির গুঞ্জন, প্রকৃতির সবুজ রূপ মনে এক প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করে। শরতে নানা ফুলের গন্ধ চারিদিকে মাতিয়ে তোলে। তাইতো কবিগুরু বলেছেন :—

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি.........
শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি...।

শরৎকালে পিত্রালয়ে আসেন আনন্দময়ী মা দুর্গা। সানাই, ঢাকঢোল বাজিয়ে, আগমনী গান গেয়ে আহ্বান করা হয় মা দুর্গাকে। নতুন বসনভূষণে ছেলেমেয়েরা মেতে ওঠে মহা উল্লাসে। পাড়া জেগে ওঠে শরতের উৎসবে। বেরোয় নানান ধরনের পত্র পত্রিকা হাসি আর মজার খোরাক—পড়ে যায় কাড়াকাড়ি। যাত্রা, থিয়েটার, নাচ-গান, সার্কাস... আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। বাড়িতে জমে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের ভীড়। শুরু হয় হৈ হুল্লোড় আর ভুরিভোজনের পালা। মনে হয় যেন দিন কয়েকের জন্যে বাঁধাধরা জীবন থেকে অনেক-দূর চলে এসেছি। তাই শরৎ এত ভালো লাগে...... তাই শরৎ আমার প্রিয় ঋতু ॥

গল্প বলা

গৌতম শিকদার (সভ্য, ১৪)

এস বস আজ গল্প বলি
"কিন্তু কী করে যে শুরু করি
রাজার গল্প না রানীর গল্প
মনে আসছে সব কিছুই অল্প অল্প
রাজা রানী দুজনেই গেছেন বেড়াতে
তাঁদের কথা বলতে গেলে
হবে রং চড়াতে।
আজকে তো হয়ে এল সন্ধ্যে
চারিদিকে ভয় ভয় ভূতের গন্ধে।
তোমরা তবে বাড়ি চলে যাও,
বাড়ি গিয়ে দুধ ভাত খাও।

অচ্যুত পাল, (সভ্য, সিনিয়র)

দুই বন্ধু—ডেসমণ্ড ও জেমসবণ্ড। শিকলাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতির কি নিয়ম! সে শিকলে একদিন মরচে ধরে গেল। কেননা, ডেসমণ্ড পরবর্তী-কালে হয়ে উঠেছিল পাশবিক ও লোভী। তাই সে সৎপন্থী জেমসবণ্ডের ব্যবসা বানিজ্য ছেড়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করল। পর্যায়ক্রমে সে হল বোম্বেটে সর্দার বা জলদস্যু সর্দার ডেসমণ্ড। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীর গ্রেটেস্ট ওয়েলদীম্যানের আসন অধিকার করা।

উত্তর পশ্চিম কোণে একটা জাহাজ ভেসে উঠেছে। বাণিজ্যিক জাহাজ। দস্যুসর্দার ডেসমণ্ডের দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না। এগিয়ে চলল ডেসমণ্ডের জাহাজ দ্রুতবেগে, আটলান্টিক মহাসাগরকে উন্মাদ নৃত্যে নাচিয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে হারে-রে-রে রে—পিলে চমকানো হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়েছে সেই বাণিজ্যিক জাহাজে দুর্ধর্ষ বোম্বেটেরা। তরবারির সে কী ঝংকার। দুম দাম আকাশ বিদীর্ণ করা শব্দে জাহাজ দুলে উঠছে। এইভাবে চলল কিছুক্ষণ। ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিকে অসাড় দেহ। লাল হয়ে উঠল শিমুল কাঠের ডেক। শেষ হল পৈশাচিক লুণ্ঠন খেলা। বাণিজ্যিক জাহাজের সকলে বন্দী হল। এবার শুরু হল বোম্বেটে সর্দার ডেসমণ্ডের হাসিঠাট্টার পালা। সেই সময় হঠাৎ তার চোখ পড়ল এক বন্দীর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠল তার অকৃত্রিম অট্টহাসি—হা—হা—হা—হা। কিন্তু তার বিবেক তাকে দংশন করল। এ যে তার বন্ধু স্বয়ং জেমসবণ্ড। সে কি না বন্ধু জেমসবণ্ডের অর্থেই পৃথিবীর গ্রেটেস্ট ওয়েলদীম্যান হতে চলেছে। তার হাত দুটো মুঠো হয়ে উঠল। এক পৈশাচিক হিংসা তার মুখে ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে তার হাত স্পর্শ করল কোমরের ঝুলন্ত তরবারির হাতল। সে যেন কিছু একটার সমাধান করতে চলেছে।

এতক্ষণ ধরে জেমসবণ্ড সবই লক্ষ্য করছিল। সে ডেসমণ্ডের অস্থিরতাকে সংযত করবার জন্য এক পন্থা বার করল। সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল বন্ধু ডেসমণ্ডের মৃত্যু হলে তাকে যেতে হবে সোজা হাঙ্গরের পেটে—নতুবা বোম্বেটে দলে নাম লেখাতে হবে। তাছাড়া, রক্তপিপাসু বোম্বেটেদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে কখনই তার হীরেগুলো হাতছাড়া করতে পারবে না। তাই সে ছলনার হাসি হেসে বলল—হে বন্ধু ডেসমণ্ড, তোমার বীরত্বে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত এবং আমি এতে বড়ই খুশি তাই তোমার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ এই সকল হীরে তোমার জন্যই এনেছিলাম। কিন্তু আমি খুব দুঃখিত, কেন না তোমার মত দুর্লভ বন্ধুর হাতে তুলে দেবার আগেই আমরা আক্রান্ত হলাম তোমারই আক্রমণে। কিন্তু, পরম বন্ধুকে দেখতে পেয়ে আমার হৃদয়টা আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছে। জেমসবণ্ড তার কৃত্রিম হাসির রেখাকে আরও প্রকট করে তুলল, ঢেকে ফেলল তার বাণিজ্যিক ক্ষতি।

প্রশংসায় দ্বিগুণ ফুলে উঠল ডেসমণ্ড। অট্টহাস্য করে বলে উঠল—তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে

পারছ ডেসমণ্ডের স্বপ্ন বাস্তবে প্রতিফলিত হতে চলেছে কিনা?

মুক্তি পেল জেমসবণ্ড। তার জাহাজ ফিরে চলল আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর পশ্চিম দিকে………।

ওদিকে ডেসমণ্ড জানে না—বন্ধু জেমসবণ্ড তার কপালে এক মাকড়সার জাল বুনে দিয়ে গেছে। বোম্বেটেরা মদের বোতল শেষ করে বোম্বেটে সর্দার ডেসমণ্ডের কাছে হীরের ভাগ চাইল, বলল—হীরের ভাগ মেলাও সর্দার।

—হীরে? কোন হীরে? ডেসমণ্ড যেন আকাশ থেকে পড়ল। ডেসমণ্ড আবার বলল, কানে তুলো দিয়েছ নাকি। শোন নি বন্ধু জেমসবণ্ডের কথা? এ হীরে কেবল ডেসমণ্ডের বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ—এ হীরে কেবল আমারই প্রাপ্য।

এবারে বোম্বেটেরা একেবারে অগ্নিশর্মা। রাগ তাদের চরমে পৌছল। শুরু হল তর্কাতর্কি—ওটা আমাদের লুঠ করা হীরে।

কিন্তু, বোম্বেটে সর্দার ডেসমণ্ড অসহায়। তার পক্ষে আজ আর কেউ নেই। তবুও পৃথিবীর গ্রেটেস্ট ওয়েলদী ম্যানের আশাবাদী ডেসমণ্ড কখনই সেই হীরের ভাণ্ডার ছাড়তে রাজি হল না। এদিকে হীরে লোভী বোম্বেটেরা ভুলে গেল তাদের সর্দারকে। মূহুর্তের মধ্যে ঘটে গেল এক নাটকীয় ঘটনা। তারা ডেসমণ্ডকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলল, ছুঁড়ে ফেলে দিল হাঙ্গরভর্তি সাগরের বুকে। বুরবুর করে বেরিয়ে এল গুটি কয়েক জল-পটকা।

(২১ পাতার শেষাংশ)

বর্তমানে আমরা যে ল্যামিনেটেড গ্লাস ব্যবহার করি তা সেই তরুণ বিজ্ঞানীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেই তৈরি করা হয়। এই কাঁচ আজকাল বুলেট নিরোধক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

এই নিরাপদ কাঁচ আবিষ্কার করে এডোয়ার্ড বেনিডিকটাস মানুষের যে কত উপকার করে গেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যদিও তিনি আজ নেই, তথাপি সেফটি গ্লাসের মাধ্যমে যুগে যুগে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

বিয়ে বাড়ি

বুলা পাল (সভ্যা, ১২)

বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ি
তারই গন্ধে ছড়াছড়ি।
এদিকে হয় লুচি মিষ্টি
ওদিকে পড়ে শুধুই বৃষ্টি।
কেউ বা যায়, কেউ বা আসে,
কেউ বা খায়, কেউ বা হাসে
বর-বউ এক সঙ্গে হল জুটি
সবাই হল, হেসেই কুটিকুটি।
এবার সবাই চলে যায়
আমিও তবে নিই বিদায়।

প্রায়শ্চিত্ত

নীলাঞ্জনা দাস (সভ্যা, ১২)

রূপা বাবুদের পুকুরপাড় থেকে দুটো শাক তুলে নিয়ে আয় না মা।

আমি পারব না। জান আমাদের কুমু লুকিয়ে শাক আনতে গিয়ে কাল কেমন মার খেয়েছে দারোয়ানের হাতে। তুমি কি আমারও তাই দেখতে চাও?

এবার বাবুরা বলেই দিয়েছে, একবার হয়েছে, আর একবার হলে তাকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

কিন্তু তোর ছোট ভাইটার কথা একবার ভেবে দেখ মা, বেচারার সারাদিনে একটি দানাও পেটে পড়েনি। মণ্ডলদের বাড়ি থেকে দুটি ক্ষুদ যোগাড় করেছি। কিন্তু কি দিয়ে দেব? একবার যা মা। আর কোন দিন বলব না।

তুমি তো রোজই একথা বল। কিন্তু ভেবে দেখ আমি এতবড় মেয়ে ধরা পড়লে মিঠুরা মণ্ডলরা সব তাকিয়ে হাস'ব। আমার বুঝি তখন লজ্জা করবে না?

তোদের জ্বালায় কী আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব? উঃ ভগবান!

ছোট নিরঞ্জনা নদীটি শান্ত মেয়েটির মতো বয়ে চলেছে। এরই তীরে একটি গ্রাম। মাঝে মাঝে পাহাড়। রূপারা এই গ্রামেরই বাসিন্দা। এখানে কেউই খুব অবস্থাপন্ন নয়। আবার খুব গরীবও নয়। শুধু মাত্র জমিদারই খুব অবস্থাপন্ন। রূপারা বহু পুরুষ ধরে এগ্রামে বাস করছে। ওর বাবা পঙ্গু, বিছানায় পড়ে। মা ভদ্রঘরের মেয়ে কী করবে? লোকের বাড়ি ধান ভেঙেই দিন চলে। রূপা বড় মেয়ে, বারোতে পড়ল। ছোট ছেলে হারু তিন বছরের হল। এত রূপ গরীবের ঘরে সাধারণতঃ দেখা যায় না। ওর মা রুক্মিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, তাও যদি পেট ভরে খেতে দিতে পারতাম। জমিদারের বাড়ির পেছনে একটি বহু কালের পুরনো বাগান আছে। বাগানের ভিতর আছে বহু কালের পুরনো একটি মজা দীঘি, দীঘির পাড়ে সারি বাঁধা কলমী, সুশনি, হিঙচে প্রভৃতি শাকের মেলা। দীঘির ছাতা পরা জলেও এখন রুই কাতলা পোনা তারপর ছোট খাটো মাছ যেমন, চিংড়ী পুঁটি মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে দেখা যায়। স্থানীয় গরীব মানুষেরা, যাদের পেট ভরে এক বেলাও ভাত জোটেনা তারা শাকের জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে এখানে আসে। তারা ভাবে জমিদাররা বড়লোক মানুষ। তারা রাজভোগ খায়। শাক তো তাদের কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস, আমরা সেগুলি নিই না কেন। কিন্তু জমিদার সেখানেও আজকাল দারোয়ান রাখছে। তাদের মজা পুকুরের মাছ অনেক সময় নিরাপদ স্থান পেয়ে ঐ কলমী, সুশনি, প্রভৃতি লতার মধ্যে এসে আটকে থাকে। আর ঐ শাক তুলতে এসে তার সঙ্গে মাছও চুরি করে পালায়, ইতি মধ্যে কয়েকজন শাক চুরি করতে এসে মোক্ষম মার খেয়ে প্রায়

আধমরা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। সেইজন্য রূপাকে বারবার বলা সত্ত্বেও সে যেতে রাজী হচ্ছিল না। তার ওপর ওরা গরীব। লোকেরা ওদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে যদি অপমান করে বসে। রুক্মিনী অপেক্ষা করছেন। কখন রূপা আসবে। তারপর তিনি রাঁধবেন। তারপর ক্ষুধার্ত স্বামী-পুত্রের ক্ষুধার নিবৃত্তি করবেন।

হঠাৎ বাইরে খুব হট্টগোল শুনতে পেলেন। কেন যেন এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল। বাইরে ছুটে গেলেন। দেখলেন, অনেক লোকের ভিড়। একজন লোককে জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে? তিনি বললেন, জমিদারের পেয়াদা একটি মেয়েকে খুব মেরেছে। মেয়েটার মাথা ফেটে গেছে। কী নাম বেশ মেয়েটার রূ……পা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। রূপা রূপা। বাবুদের শাক চুরি করেছে। ধরা পড়ে গেছে। মেয়েছেলে। কী কেলেঙ্কারী বাবা! ছ্যা। বলে টাক নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন। রুক্মিনীর চোখে জল নেই। শান্ত পদক্ষেপে গিয়ে মেয়েকে তুলে বাড়ি নিয়ে এলেন। মুখে কোন কথা বললেন না। শুধু রূপাকে নিয়ে আসার সময়, জমিদার ভূষণ চৌধুরীর দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। এদিকে রূপার বাবা বাড়ির সামনে হট্টগোল শুনে, তার ওপর একজন পরোপকারী প্রতিবেশীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে উত্তেজিত হয়ে সব ভুলে খাট থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেছেন নিরেট মেঝেতে। পড়ে মাথা ফেটে গেছে। রূপার ছোট ভাই হারু ঘুম থেকে উঠে খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে পুকুরপাড়ে বসেছিল অসাবধানতঃ কখন পা পিছলে পড়ে গেছে। চিৎকার শুনে একজন পাড়ার ছেলে জল থেকে তুলে তার বাড়ি নিয়ে গেছে জ্বরের ঘোরে অচৈতন্যপ্রায় বালক হাতড়ে হাতড়ে মা-দিদিকে খুঁজছে।

রুক্মিনী স্বামী-কন্যার যথাসাধ্য সেবা করলেন, কিন্তু তাদের বাঁচান গেল না। একে অনাহার, তার ওপর গুরুতর আঘাত। রাতদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে রূপার বাবা শান্তিধামে চলে গেলেন। রূপা তার পরদিন ভোর বেলা মারা গেল। এত শোকেও রুক্মিনী একটুও ভেঙ্গে পড়লেন না। তখন একমাত্র অবলম্বন ছোট ছেলে হারু।

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। হারু এখন সাত বছরের ছেলে। দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে সে। তার মতো ভাল ছেলে মেলা ভার। কোন শিশুসুলভ চাপল্য নেই ওর মধ্যে। রুক্মিনী সব সময় চোখে চোখে রাখেন ওকে। গ্রামের সাধারণ পাঠশালায় পড়ে। ভাল ছেলে বলে পণ্ডিত দয়া করে বিনা বেতনেই পড়ান। হারু খুব বাচ্চা বয়স থেকেই চিন্তামগ্নভাবে বসে থাকত, বয়সের সঙ্গে সেটা আরও বাড়তে থাকল। যখন সন্ধ্যায় অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে যেত, ও তখন ভূষণ বাবুদের পুকুরপাড়ে চুপচাপ বসে থাকত। ও মায়ের মুখে দিদির কথা, দিদির প্রতি জমিদারদের অত্যাচারের কথা শুনেছিল। তাতে ওর মনে জমিদার বাড়ির প্রতি একটা চাপা আক্রোশ জন্মে নিয়েছিল, ও ফাঁক খুঁজত সুযোগের। কিন্তু হারু ভূষণবাবুকে একদম সহ্য করতে পারেনা। ওকে দেখলে ওর ভেতরটা জ্বলন্ত আগুনের মত জ্বলে উঠে। কিন্তু হঠাৎ রাগের মাথায় কিছু করাটাও ঠিক নয়। তাই নিজেকে সে সংযত করার চেষ্টা করে।

একদিন হারু বেশ তাড়াতাড়ি বাগানে এল। কেউ কোথাও নেই। একা একা পুকুরপাড়ে

বসে নিজের দুঃখের কথা ভাবছে। কী করে সে তার দুঃখিনী মার দুঃখ ঘোচাবে সেই ভাবনাই তাকে অস্থির করে তুলেছে। এমন সময়ে একটা গোঙানীর আওয়াজে হারুর টনক হল। খেয়াল করে দেখল, আওয়াজটা জমিদারের ঘরের কাছ থেকেই আসছে। পায়ে পায়ে ঘরের জানলার কাছে এসে দাঁড়াল, হ্যাঁ, আওয়াজটা তো ঘর থেকেই আসছে। হঠাৎ উঁকি মেরে দেখে ভূষণবাবু বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। দেখেই ও সব কথা ভুলে দরজা ঠেলে ঘরে গিয়েই মাথায় মুখে জল দিল ভূষণবাবুর। হাতের কাছে কাগজ পেয়ে তাই দিয়ে মাথায় জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর জল চাইতে সে মুখে জল দিল। জল খেয়ে কিছুটা সুস্থবোধ করে যখন ভূষণবাবু চোখ মেললেন, হারুকে বুঝতে না পেরে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? হারু ওর পরিচয় দিল, আর ডাক্তার ডাকবে কিনা জিজ্ঞেস করল। উনি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন।

হারু যেই চলে আসবে ভাবছে তখনই ভূষণবাবু ওর হাত দুটো ধরে বললেন, ওরে হারু, আমি তোদের ওপর কত না অত্যাচার করেছি। কিন্তু, তুই আজ আমার এত উপকার করলি যা ভোলবার নয়। সত্যি রে আমি অত্যন্ত পাপী। অনেক পাপ করেছি। আর তোদের প্রতি অবিচার করব না। এবার থেকে তুই তোর মা আমার বাড়ির সব কাজ দেখাশোনা করবি। একথা শুনে হারু ছুটে চলল ওর মার কাছে। মনে মনে নিজের জয়ের আনন্দে খুশি হল, তখন সন্ধ্যে ছাড়িয়ে রাত্রি নেমেছে চারিধারে।

মজার কথা

ছুচ ফোটান ব্যাপারটা নেহাতই রাগের বশেই লোকে করে। কিন্তু, কি আশ্চর্যের ব্যাপার এই ছুচ ফোটানোর ব্যাপারটা এখন সকলের কাছে খুবই সমাদর লাভ করেছে, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই ব্যাপারটা এখন বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। চীনদেশে এই পদ্ধতির প্রচলন হয়। সবচেয়ে মজার কি ব্যাপার জান—চীন দেশে উচ্চারণেও আকুপাংচার করেছে। সেই চিকিৎসার ফলে পিকিং আর পিকিং নেই, হয়েছে বেজিং। চীনকে অবশ্য এখনও চায়নাই বলা হচ্ছে। তার খুব শিগ্‌গীরই নাম পালটে 'ঝোংগুও' হয়ে যাবে। উচ্চারণ রীতির এই পরিবর্তনের নাম 'পিনয়িন'। ইংরাজী নববর্ষের প্রথম থেকে চীন এই নতুন পদ্ধতি চালু করেছে, সারা পৃথিবীতে এখন এই নতুন পদ্ধতি 'পিনয়িন' নিয়ম অনুসারে উচ্চারণ আর বানানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

জন্মদিনের উপহার
আনন্দ তার বোন শীলাকে নিয়ে মেলায় এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে এক বেদে কুকুর ছানা বিক্রি করছে।
-ইস, কি মিষ্টি আমি একটা কিনবো।
-মাত্র ১০০ টাকা।

ওরা ভেঙ্গে পড়লো।
-আমাদের যে মাত্র ৫ টাকা আছে চলো শীলা- কাঁদেনা। দেখো, এবারে তোমার জন্মদিনে আমি তোমায় একটা কুকুরছানা দেবই দেবো।

ঐ দিনই আনন্দ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো
-বাবা, শীলার জন্মদিনে উপহারের জন্যে আমি কিছু জমাতে চাই। কি করে জমাই বলো তো।
-খুব সোজা। রোজ একটু করে জমাও। আমি ইউকোব্যাঙ্কে তোমার নামে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলে দেবো।

-ইউকোব্যাঙ্ক। আমি যা জমাবো, তা কি ওরা নেবে? সে তো খুবই কম।
-নিশ্চয়ই নেবে। নিয়মিত জমিয়ে যাও, বছরের শেষে দেখবে অনেক জমেছে।

United Commercial Bank
সেদিন থেকেই আনন্দ জমাতে শুরু করল।

শীলার জন্মদিনের ঠিক আগে আনন্দ তার পাশবই বাবাকে দেখায়।
-বাবা, ব্যাঙ্কে আমার ১৫০ টাকা জমেছে। এইবারে নিশ্চয়ই শীলাকে কুকুরছানা কিনে দিতে পারবো।
-চমৎকার!

জন্মদিনের সকাল
-আনন্দকে ধন্যবাদ দাও। তোমাকে এই কুকুরছানা কিনে দেবার জন্যে সে তার হাত খরচ থেকে এ টাকা জমিয়েছে।

-শীলার আজ ভারী আনন্দ, কিন্তু সেটা তো ইউকোব্যাঙ্কের জন্যেই

ভৌ! ভৌ!

চালুক্য

অহিভূষণ মালিক

এক রাজা যায়, আর এক রাজা আসে, এ তো চিরকালের নিয়ম। বকাটকদের সরিয়ে দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করলেন চালুক্যরাজ। ইতিহাসের ছাত্ররা পুলকেশী প্রথম, তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মন আর নাতি দ্বিতীয় পুলকেশীর কথা নিশ্চয় মন দিয়ে পড়েছে। পরীক্ষায় এদের কথা প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। কী বীর বিক্রমই না ছিল এই রাজাদের। চালুক্য বংশেরও দাপট আর রবরবা বকাটকদের মত দু'শ বছর ধরে চলে। কীর্তিবর্মনের অনুজ মঙ্গলিসা যেমন ছিলেন লড়াই যুদ্ধে বীর, তেমনই আবার সুকুমার শিল্প জ্ঞানী গুণী। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে ব্যক্তির রণসজ্জায় অত ঝোঁক তাঁর আরটের প্রতি অনুরাগ কেমন করে হল। কীর্তিবর্মনের পর মঙ্গলিসা সিংহাসনে বসলেন এবং তাঁর রাজ দায়িত্ব গুলির মধ্যে দেশের শিল্প সম্ভার সমৃদ্ধতর করে তোলা ছিল অন্যতম।

চালুক্যরা ছিলেন ধর্মে হিন্দু। চালুক্যদের প্রয়াসে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য দাক্ষিণাত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। দিকে দিকে হিন্দু মন্দির গড়ে উঠল। হিন্দু আরটে সাজগোজ করে হিন্দুরা বহুকাল কোন ঠাসা হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আবার। শিল্পীদের রচনা থেকে জাতক আর অবদান কাহিনী বিদায় নিল; অঙ্কনে, কাঠখোদাইয়ে পাথর খোদাইয়ে যেদিকেই ফেরা যায় দেখা যায় হিন্দু দেবদেবীরা সগৌরবে নতুন করে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ত্রি বিক্রম, নরসিংহ, বিরাট, ভোগীভোগনাসী বরাহ প্রভৃতি রূপে বিষ্ণুদেব উপস্থাপিত হলেন বৈষ্ণব গুহায়! মহীশূরের তহশীল ও শহর, আগে বলা হত বাতাপি বর্তমানে বাদামি ৫৭৮ অব্দে, রাজা মঙ্গলিসার রাজধানী ছিল। একপাশে হ্রদ, হ্রদের ধারে পাহাড় তাঁর মধ্যে গুহার সারি—বাদামি গুহা। ৪ নং গুহাটিকে বৈষ্ণব গুহা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাদামি গুহায়, অজন্তার বৌদ্ধ শিল্পীদের মত হিন্দু শিল্পীরাও প্রাচীরের গায়ে ছবি এঁকে অলঙ্করণ করেছিলেন। সম্ভবত দেখাবার উদ্দেশ্য ছিল যে হিন্দুরাও কিছু কম যেতেন না ছবি আঁকায় আর মূর্তিগড়ায়। বাদামিগুহার কথা কেন জানি না, শিক্ষিতদের মধ্যেও বহুলোক শোনেননি। শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ বাদামি গুহার সন্ধান পান প্রথম। শিল্প বিশেষজ্ঞা এই ইংরাজ মহিলাটির নাম পাঠকদের মধ্যে নিশ্চয় অনেকে জানে। বাদামি গুহায় অজন্তার পরে আঁকা হলেও ম্যুরালগুলির অবস্থা অজন্তার ছবি থেকেও শোচনীয়। বহুকাল অগ্রাহ্য হয়ে অযত্নে পড়ে থাকার ফলে ছবির রঙ চটে গিয়ে জায়গায় জায়গায় খসে পড়ে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

আঁকার ধরণ ধারণ থেকে ব্যক্ত হয়, শিল্পীরা বৌদ্ধ না হলেও অজন্তার বৌদ্ধ আরটেরই অনুসরণ করেছিলেন প্রথা প্রকরণ আর ব্যাকরণে। রাজা মহারাজা আর দেবদেবীরা আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন চালুক্য পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট বাদামি ম্যুরালে। ফরাসী শব্দ ম্যুর মানে দেয়াল, অর্থাৎ দেয়ালে যা ছবি আঁকা হবে তাই-ই ম্যুরাল পেইনটিং।

আমাদের ভাষায় একে বলা হয় ভিত্তিচিত্র। বর্তমানে ম্যুরাল শব্দটাই বেশি সড় গড় হয়ে গেছে শিল্পী আর শিল্প রসিক মহলে। তাই লিখতে বসলে ম্যারাল কথাটাই কলমের ডগায় এসে পড়ে বার বার।

আড়াআড়ি ভাবে লম্বা একটি মস্ত বাদামি ছবিতে বোঝা যায় কোনও রাজ প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য আঁকা হয়েছে। নীলবর্ণ এক পুরুষ, তাঁর এক পা সিংহাসনে, অন্য পা নিচে পাদানির ওপর, মাথায় মুকুট। মুখাবয়ব একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ছবির টুকরো টুকরো অংশ থেকে বোঝা যায় জোর কদমে নৃত্যগীত চলেছে। সভায় হয়েছে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম। এক পাশের বারান্দা থেকে কিছু দর্শক সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন নিচের দিকে। রমনীর দল হাতে চামর নিয়ে দণ্ডায়মানা। সম্ভবত তারা সেবাদাসী। অর্কেস্ট্রা বাজছে, বাঁশী আর মৃদঙ্গ অবশ্যই আছে বাজনার মধ্যে। নাচছেন এক পুরুষ আর এক নারী। পুরুষটির নৃত্য ভঙ্গিমা ভরত নাট্যমের 'চতুর'। নারীটির ঢং পৃষ্ঠস্বস্তিকা। খুব সম্ভবত দৃশ্যটি বোঝাচ্ছে ইন্দ্রের রাজসভা। নর্তক স্বয়ং ভরত কিংবা তণ্ডু। নর্তকী হতে পারে উর্বশী। গল্পে আছে উর্বশী ইন্দ্রের দরবারে নাচতে নাচতে একবার মারাত্মক এক গলদ করে ফেলেছিলেন, এ ছবি হয়ত সেই কাহিনীর চিত্ররূপ। দ্বিতীয় ছবি এক রাজপুরুষ রাজলীলা ঢঙে বসে আছেন মেঝেতে সিংহাসনে দক্ষিণ পাশের কয়েকটি অভিজাত ব্যক্তি উপবিষ্ট। রাজপুরুষটির বাঁ দিকে এক সুন্দরী, নিশ্চয় রাণী। তিনি পা এগিয়ে বসে আছেন, তাঁকে আলতা পরান হচ্ছে। রাণীর সখী কিংবা দাসী বৃন্দা নানাভাবে তাঁর পরিচর্যায় ব্যস্ত। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পিছনে সারভাবে দাঁড়িয়ে, চামর দোলাচ্ছেন কতিপয় স্ত্রীলোক। এ ছবির মূল চরিত্র স্টেলা ক্রামরিশের মতে কীর্তিবর্মন। চালুক্য মঙ্গলিসার আমলের এই পেইন্টিং-এ ইন্দ্রের অত কাছে কীর্তিবর্মনকে স্থান দেবার কারণ মঙ্গলিসার অগ্রজের প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা, তাঁর কাছে কীর্তিবর্মন ইন্দ্রেরই সমান।

যারা দক্ষিণ ভারত বেড়িয়ে এসেছে তারা নিশ্চয় মহাবলিপুরম না দেখে ফেরেনি। মহাবলিপুরমের শিবমন্দির বাদামির অনেক পরে তৈরি হয়। বেশ বোঝা যায় মহাবলিপুরমের বহু পাথর খোদাই বাদামি গুহার ছবি অনুসরণ করেই রচিত হয়েছিল। বাদামির বরাহ আর মহাবলিপুরমের বরাহ রচনা কৌশল যেন একই। মঙ্গলিসা যেভাবে কীর্তিবর্মনের বিরাটত্ব প্রকাশ করেছেন অগ্রজকে ইন্দ্রের পাশে স্থান দিয়ে মহাবলিপুরমে রাজা নরসিংহবর্মন পিতামহ এবং সিংহবিষ্ণু এবং মহেন্দ্র বর্মনকে বরাহদেবের কাছাকাছি রেখে বুঝিয়েছেন তাঁরাও ছিলেন দেবতা বিশেষ। বাদামিতে জুড়োড়া বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীকে দেখা যায় উড্ডীন অবস্থায়। বিদ্যাধরের গায়ের বর্ণ কৃষ্ণ, বিদ্যাধরীর গৌর। বিদ্যাধরীর এক

হাতে বীণা, বিদ্যাধরী ধরে আছেন বিদ্যাধরের অন্য হাত।

চালুক্যদের সময় থেকেই তারা দক্ষিণ ভারতে জনসাধারণের মধ্যেও আরটের কদর এবং আদর বাড়তে থাকে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের বাড়ি ঘর নানান নকসায় ছবি এবং ভাস্কর্যে ভরে ওঠে সে এক যুগ বটে। রূপবিদ্যায় কার কত জ্ঞান আর শিল্পের কে কত বড় ভক্ত তা দেখাবার জন্য যেন প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল। ঈশ্বরভক্তিও বেড়ে ওঠে সে সময় খুব বেশি। মন্দিরে মন্দির শুধু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেই নয়, নানা ঘটনা, নানা বন্দনা, নানা রীতি, নানা নীতি ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে আব পাথর কেটে দেবপূজারীরা, শিল্পীরা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, আমরা হিন্দু। হিন্দু-আরটের নিদর্শন দক্ষিণ ভারতে যত পাওয়া যায় তা হিন্দুস্থানের আর অন্য কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ। অনেক বৌদ্ধ মন্দির কব্জা করে হিন্দু দেবতা-মন্দিরে রূপান্তর করা হয়েছিল ভারতের নানা জায়গায় বটে, খ্রিস্ত হাজার বছরেব বেশি প্রাচীন সব মন্দিরই প্রায় দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণ ভারতে। সেকালের প্রথাপ্রকরণ, শৈলী আর রূপ দক্ষিণ ভারতীয় বহু শিল্পী ইচ্ছাকৃত ভাবে আজও ত্যাগ করেন নি। সেকালের ব্যাকরণ মেনে, ক্রিয়া কৌশল মেনে মূর্তিগড়া নিয়মিত হয়ে চলেছে, স্কুলও আছে একটি প্রথাগত নিয়মে। ভাস্কর্য শেখাবার পুনরাবৃত্তি হলেও ক্লাসিকাল আরটের ট্রাডিশান বেঁচে আছে শুধু দক্ষিণ ভারতেই।

খাবার

রাজ কুমার রায় (বয়স, ১৪)

চারিদিকে তাকিয়ে দেখি মানুষের হাহাকার,
সকলের মুখে একই কথা 'একটু খাবার, একটু খাবার
কিন্তু কে দেবে কাকে খাবার ?
চারিদিকে সব খাবার নিমেষে হচ্ছে সাবাড়।
রাস্তায় বেরিয়েই দেখি দুর্গত মানুষের ভিড়
পথ চলছে তারা করে নতশির।
ছেঁড়া জামা কাপড় তাদের দেহে
খাবার পড়েনি পেটে।
সারা দিনমান খেটে রাতে ফেরে বাড়ি
বাড়ি ? হ্যাঁ ফুটপাথ তাদের বাড়ি।
বস্তা আর ছেঁড়া ন্যাকড়া চাপা দিয়ে
দেহটাকে শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে বাঁচিয়ে
ওদের লড়তে হয় জীবনের শীত গ্রীষ্মের সাথে।
ওরা তবু হেরে যায়, জন্তু-মানুষ ওদের খাবার কেড়ে খায়।
হে কাল্পনিক ঈশ্বর, তুমি কাল্পনিকই
তবে বল কবে থামবে এ বিশাল আর্তনাদ ?
মিটবে মানুষের খাবারের সাধ ॥

ভাষাশিক্ষার আসর

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

দাদুমণি গিয়ে দেখে তিন্নি মলিনমুখে চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে টেবিলের উপর বাংলা ইংরেজী অভিধান খোলা। তার পাশে বাংলা ও ইংরেজী ব্যাকরণের বই। একধারে টেবিলের সামনে ছোট চেয়ারে তোড়া বসে আছে। তার সামনে বাবাইয়ের মোটা ইংরেজী অভিধান খোলা। অভিধানটির ধারে একটি ঠাকুরমার ঝুলি ও সহজপাঠ প্রথম ভাগ। তিন্নি বলল, 'দাদুমণি। এই দেখ, পদ পরিচয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া লিখেছে। বিশেষ্য Noun, বিশেষণ Adjective, সর্বনাম Pronoun, ক্রিয়া Verb, তা হলে, অব্যয় কি? অভিধানে তো কিছু দেখছি না। অব্যয়ের মানে লিখেছে, Indeclinable word, Preposition, interjection অথবা conjunction, মানে কি দাঁড়াল বুঝিয়ে দাও। 'দাদুমণি!' তোড়া হেসে উঠল, 'তিন্নির বইতে কনজানটিস লিখেছে। কনজানটিস তো আমার চোখে হয়েছিল। দিয়ার বইটা খুব বাজে, তাই না?'

ইংরেজীতে Parts of speech অর্থাৎ পদের সংখ্যা আট, বাংলায় পাঁচ। তা হলে, বাকি তিনটির কি হল? ইংরেজীর Adverb বাংলায় বিশেষণের মধ্যে ঢুকে গেছে, আর preposition, Interjection ও Conjunction-এ তিনটির বদলে পাচ্ছি অব্যয়কে। আটটির হিসেব মিলল; কিন্তু কোথায় যেন গোল থেকেই গেল। আসল কথা, বাংলার অব্যয় খুবই গোলমেলে ব্যাপার। ইংরেজীতে যাকে বলে Preposition, বাংলায় সে রকম পদ নেই। আছে যা, তা হল Post-position অর্থাৎ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে অব্যয় শব্দ বসে। সব অব্যয় নয়, কিছু সংখ্যক অব্যয়। এ ধরণের অব্যয়কে বলে অনুসর্গ। 'বিনা' অনুসর্গটিকে Preposition-এর মত ব্যবহার করা যায়। যেমন: বিনা মেঘে বজ্রপাত, বিনা হুকুমে কেউ ঘরে ঢুকবে না ইত্যাদি। যখন লিখি, অর্থ বিনা জীবন বৃথা, তখন বিনা আর Pre-position রইল না, হল Post-position. আরবী থেকে নেওয়া অব্যয় বেগরকেও Preposition-এর মত ব্যবহার করা যায়। বেগর শব্দের অর্থ বিনা বা ব্যতীত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতি কুমারের মতে বিনা ও বেগর ছাড়া ইংরেজী Preposition এর অনুরূপ কোনও পদ বাংলা ভাষায় নেই। বিনা পরিশ্রমে কেউ পরীক্ষায় প্রথম হতে পারে না, বাক্যটির পরিশ্রম শব্দটিতে এ বিভক্তি হয়েছে বিনা অনুসর্গর যোগে। The book M on the table, এই ইংরেজী বাক্যটিতে table এর পদান্বয় (Pasing) করতে গিয়ে আমরা বলি table শব্দটি on Preposition এর কর্ম। বাংলায় পরিশ্রমে শব্দটিকে বিনা অনুসর্গের কর্ম বলব না ; কারণ মূল ক্রিয়ার সঙ্গে এর ব্যাকরণগত কোনও সম্পর্ক নেই।

তিন্নি বলল, 'দাদুমণি ; অতশত বুঝি না। তুমি খুব সোজা করে বুঝিয়ে দাও না অব্যয় কাকে বলে।' শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন অনেক শব্দের মূল চেহারা পালটে যায়। যেমন বনে থাকে বাঘ। গায়ে চাকা চাকা দাগ। বাক্য দুটির মধ্যে 'বনে' এবং 'গাঁয়ে' পদ দুটি আছে। এ দুইয়ের মূল শব্দ যথাক্রমে বন এবং গা। শব্দযুগল পরিবর্তিত হয়ে বাক্যের মধ্যে হয়েছে বনে এবং

গায়ে। যে শব্দের এ রকম কোনও পরিবর্তন হয় না তাকে বলে অব্যয়। ব্যাকরণে অব্যয় শব্দের রূপান্তর হয় না। কাজেই উপরের বন এবং গা শব্দ দুটি অব্যয় নয়। বালক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে হয় বালিকা, আবার বহুবচনে হয় বালকেরা। সুতরাং বালক অব্যয় শব্দ নয়; কারণ এটির রূপান্তর ঘটে। তবে, সুতরাং শব্দটি অব্যয়, কারণ বাক্যের মধ্যে কিংবা অন্যত্র সুতরাং এর কোনও রূপান্তর ঘটেনা। সুতরাং শব্দের অর্থ অতএব, কাজেই বা অগত্যা। অব্যয় শব্দের অর্থের বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু চেহারার পালটাই নেই।

সংস্কৃত যারা পড়েছে, তারা জানতেন শব্দ রূপের পাহাড় ডিঙ্গান কত কঠিন। সংস্কৃতের শিক্ষক তাই সবাইকে উপদেশ দেন অব্যয়-শব্দগুলো মুখস্ত করতে। অব্যয় শব্দের রূপান্তর নেই। তাই বিভিন্ন বিভক্তিতে শব্দটি কি দাঁড়াবে, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। অব্যয়কে মনে হবে খুব সোজা। এ বিষয়ে দাদুমণির মত জিজ্ঞাসা করলে দাদুমণি সবাইকে শোনাবে, 'একটি মেয়ে আছে জানি পল্লীটি তার দখলে/সবাই তারি পূজো জোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে/আমি কিন্তু বলি তোমায় কথায় যদি মন দেহ/ খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে আছে আমার সন্দেহ।' দাদুমণির পরামর্শ, অব্যয় খুব লক্ষ্মী নয়; কাজেই প্রথম থেকেই অব্যয়ের পঠন-পাঠনে সময় ব্যয় করা ভাল। অব্যয়ের শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি ব্যাপার শেখার আগে ভাল করে অব্যয় শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

প্রথমেই বাংলা ভাষায় গৃহীত সংস্কৃত অব্যয়গুলো চিনে রাখা দরকার। যেমন: অকস্মাৎ, অতীব, অথবা, অদ্য, অধুনা, অন্যত্র, অন্যথা, অপিচ, অবশ্য, ইতস্তত, ইদানীং, একদা, একত্র, কদাচিৎ কদাপি, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, ঠিক, নানা, পুনঃ, পৃথক, প্রায়শ, যথা, যদি, স্বয়ং, বৃথা, পুনঃ পুনঃ, ইতি, ঈষৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত 'এবং' অব্যয়ের অর্থ এইরূপে ; কিন্তু বাংলা ভাষায় গৃহীত এবং শব্দ ইংরেজী and শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় গৃহীত 'পুন পুনঃ' শব্দের কোমল রূপ। পুরাতন ভৃত্য কবিতায় কেষ্টা তার প্রভুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে 'যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরানিরে দেখিতে পাইবে পুনঃ।'

এছাড়া নীচের অব্যয়গুলির সঙ্গে ভাল করে পরিচয় থাকা দরকার :— আর, ও, না, ই, কি, আবার, অপর, আর, তো, নাই, নই বা, যাই, তাই, এদিকে, ওদিকে, অ্যাঁ, তাই না'ক? আহামরি, বেশ, ধন্য ধন্য, যেহেতু। তা'হলে, যেন, বেড়ে, সাবাস, হায় হায়, মরি, মরি, বেশ বেশ, দুত্তোর হাঁগো, হ্যাঁগা আহা, নয় তো ইত্যাদি।

সবশেষে, অনুসর্গ-গুলিকেও মনে রাখা দরকার। অনুসর্গ-গুলিকে কেউ কেউ বলেন পরসর্গ : আবার,কেউ কেউ বলেন কর্ম প্রবচনীয়। এসব ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা মিলে একটা নাম রাখলেই ছাত্রদের সুবিধে। নীচের শব্দগুলি অনুসর্গ স্থানীয় অব্যয় :—অপেক্ষা, জন্য, ছাড়া, দ্বারা, দিয়ে, বিনা, সঙ্গে, মতো, হইতে, থেকে, চেয়ে, কারণে, কর্তৃক, বই, নইলে, বলে, বলিয়া, লাগি, পাশে ভিতর, ভিতরে, মধ্যে, মাঝে, তরে, পিছে ইত্যাদি।

জন্মদিনে

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

এখন বিকেল। সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশটা এখনও রাঙিয়ে রয়েছে লাল আলোয়। রিনি একলা ছাদে বসে আছে। হাতে এক রঙীন ছবিই বই। পাতায় পাতায় রঙবেরঙের মন-ভোলান ছবি। রিনি অন্যমনস্ক হয়ে বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে।

ম্লান আলোকরশ্মির কয়েকটা রেখা রিনির মুখের ওপর লুকোচুরি খেলছে। চিক্‌চিক্‌ করছে মুখখানা! দু'চোখের কোণায় শিশির বিন্দুর মত জমে উঠেছে কয়েক ফোঁটা জল। রিনি কাঁদছে।

কি হয়েছে রিনির? কেউ কি বকেছে? কে? মামণি না বাপী? না কি ভাই আড়ি করে দিয়েছে? তবে কাঁদছে কেন রিনি?

মিনির মনেও এই প্রশ্নগুলো ঝোড়ো হাওয়ার মত দাপাদাপি করছে। ছাদের রেলিঙের ওপর বসে মিনি দুঃখ দুঃখ চোখে রিনির দিকে চেয়ে আছে। কিছুই বুঝতে পারছে না বেচারা।

'ম্যাঁউ ম্যাঁউ।' ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় মিনি এবার মুখ খুলল।

'ওমা, তুই কখন এলি রে মিনি!' চোখ মুছতে মুছতে রিনি বল্‌ল, 'আমি তো তোকে এতক্ষণ দেখতেই পাইনি। কোথায় ছিলি তুই?'

এক ফোঁটা জল রিনির গাল বেয়ে টপ্‌ করে ঝরে পড়ল ছবির বইটার ওপর।

মিনি কথার উত্তর দিল না। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ছাদের রেলিং থেকে নেমে সোজা রিনির কোলের ওপর এসে বসল।

মিনির চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি। মনে প্রশ্নের ঝড় বইছে। ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে রিনিকে দেখছে বিকেলের হাওয়ায় গায়ের লোমগুলো উড়ছে।

মিনিকে দেখতে ভারী সুন্দর! সাদা ধপ ধবে লোমে সারা গা ঢাকা। দু'চোখের মাঝখানে কালো লোমের একটা তিলক। লেজের আগায় খানিকটা কালো।

মিনিকে বাপী নিয়ে এসেছিল সৌমেন কাকুর বাড়ি থেকে, ইঁদুরের বংশ ধ্বংস করার জন্য। মিনি করেছেও তাই। ইঁদুরগুলোকে জ্যান্ত ধরে ধরে গিলেছে।

ভাগ্যিস বাপী তখন মিনির মত এত ভাল বেড়াল পেয়েছিল—তাই রক্ষে। না হলে কি যে হত—!

মিনি ছোট ছোট চোখকরে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে চোখের পাতা নাড়ছে পিট্‌পিট্‌ করে।

'খুব ভাবুক হয়ে গেছিস্‌ তো!' মিনির ফোলা গালে একটা ছোট্ট চর দিয়ে রিনি বল্‌ল, 'তোর ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে—যেন কবি!'

মিনি মুখ চাটছে।'

'চোর কোথাকার!' ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে রিনি বলল, আজও মাছ চুরি করে খেয়েছিস্?'

মিনি ঘাড় নাড়ল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দু'একটা তারা ফুটেছে আকাশের গায়ে, বহুড়ের দল উড়ে চলেছে পাকা ফলের সন্ধানে। ছোট ছোট নাম-না-জানা ক'টা পাখি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে।

'বেশ করেছিস্। চুরি করতে না জানলে তোকেও আমার মত উপোস থাকতে হত। একটু চুপ করে থেকে রিনি বলল, 'জানিস্ মিনি, মামণি আমাকে ভালোবাসে না বলে, আমার জন্মদিনও করে না। মামণি বলে কিনা, মেয়েদের জন্মদিন করতে নেই। দোষ হয়। আমি তো আর ছোট নই। আমি সব বুঝি। মামণি এখন সব থেকে ভালোবাসে বাপ্পাকে। আজ মামণি ভীষণ ব্যস্ত। বাপ্পার জন্মদিন তো—তাই। বাড়িতে কত লোক এসেছে, দেখছিস্ না? সব্বাই তো বাপ্পাকে নিয়েই হৈ হৈ করছে। কেউ কি আমাকে ডাকছে বল্?'

মিনি প্যাটপ্যাট করে ল্যাজ নেড়ে উঠল।

'বাপী অফিস থেকে আসার সময় বাপ্পার জন্য কী দারুণ দারুণ জামা নিয়ে আসে জানিস্? আমার জন্য কিচ্ছু আনে না রে। আমার কী দুঃখ বল্ তো?'

মিনি রিনির পাশটায় এসে বসল। বেশ আয়েস করে বসেছে মিনি। পা দু'টো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘাড়টা নাড়ছে।

বাপ্পাও আমার সাথে কথা বলছে না। আজ একবারও আমার কাছে আসেনি। আমায় দিদি বলে ডাকেনি। আড়ি করে দিয়েছে। আমি কিন্তু ওকে একটুও বকিনি।'

রিনির গলা ধরে এল। চোখের কোণায় ভেসে উঠল টলমলে জলবিন্দু।

মিনি এখন চুপচাপ। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। হাওয়ায় চোখের পাতা বুজে আসছে।

'তুই আমার সাথে আড়ি করবি না তো মিনি?' সাদা লোমে হাত বুলিয়ে রিনি বলল, 'তুইও যদি আমার সাথে আড়ি করে দিস্, তাহলে দেখিস্, আমি ঠিক এ'বাড়ি থেকে চলে যাব। আর কোন দিন আসব না।'

'সত্যি—!' মামণি রিনির পিছনে দাঁড়িয়ে। রিনি লক্ষ্য করেনি। মিনিও না। লক্ষ্য করলে মিনি ঠিক সাবধান করে দিত। রিনির মনের কথাটা এভাবে ফাঁস হত না।

'আমি বিকেল থেকে খুঁজে মরছি,' মামণি মিচকি হেসে বলল, 'আর তুমি এখানে বসে চোরটার সাথে গল্প করছ?'

মামণি রিনিকে কোলে নিল। ভীষণ লজ্জা পেয়েছে রিনি। চোখমুখ লজ্জায় লাল।

মিনি কিন্তু একটুও লজ্জা পায়নি। ভয় পেয়েছে। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ল্যাজ খাড়া করে মামণিকে দেখছে।

'আমাকে মামণি ?' রিনি মামণির কাপড়ে চোখ মুছছে। গলাটা ধরে আসছে কান্নায়।

'হ্যাঁ, তোমাকেই।'

'কেন, আমাকে বুঝি তুমি ভালোবাস ?'

মামণি হেসে উঠল।

'সব থেকে বেশি ভালোবাসি।' রিনির দু'গালে চুমু খেয়ে মামণি বলল, 'না দেখে থাকতেই পারি না।'

'বাপ্পা কিন্তু আমাকে একটুও ভালোবাসে না। আমার সাথে আড়ি করে দিয়েছে জান ?'

'বোকা মেয়ে আমার! বাপ্পাই তো তোমার জন্য কেঁদে আকুল।' রিনির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মামণি বলল, 'বাপীকে নিয়ে পার্কে গেছে তোমাকে খুঁজতে।'

'বাপ্পা ?' মামণির মুখ দু'হাতে চেপে ধরে রিনি বলল, 'বাপ্পা আমাকে খুঁজতে গেছে ? বাপীকে নিয়ে পার্কে ?'

'হ্যাঁ—।'

মিনি ভীষণ হিংসুটে। এতক্ষণ রিনির সাথে কী পিরিত-ই না করেছিল! এখন মামণি আদর করছে দেখে হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে। একলাফে মামণির কাঁধে উঠে পড়েছে। মুখে মুখ ঘষে আদর করছে। একটুও ভয় নেই।

হঠাৎ একঝলক সাদা আলোয় রিনির চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বাপী ফটোটা তুলে নিয়েছে।

'ওয়াণ্ডারফুল্! ওয়াণ্ডারফুল্! চোখের ওপর থেকে ক্যামেরা নামিয়ে নিতে নিতে বাপী বল্‌ছে, 'ছবিটা দারুণ হবে দেখো।' মামণি হাসছে।

বাপ্পা দৌড়ে এসে মামণিকে জড়িয়ে ধরেছে। রিনির পা ধরেও ঝুলতে শুরু করে দিয়েছে।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি লে দিদি তুই ?' বাপ্পা আধো আধো গলায় বল্‌ছে, 'আমি তোকে কত খুঁজলাম। পাল্‌কে গেলাম। কোথাও তোকে পেলাম্ না। ছাদে বসে তুই মিনির সাথে গল্‌পো কল্‌ছিলি ?'

মামণি রিনিকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। বাপ্পা দিদিকে কোলে নেবার চেষ্টা করল। 'বাব্বা তুই ভীষণ ভালি তো!' দিদিকে কোলে নিতে না পেরে বাপ্পা বল্‌ল, 'অত মোটা কেন লে তুই ?'

বাপ্পার কথায় সবাই হেসে উঠল। মিনিও হাসল ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে।

'এ্যাই মাছ চোর, আমার সোনামণিকে মাছ-চুরি শেখাচ্ছিলি কেন বল্ ?' মিনিকে চ্যাংদোলা করে মামণি বলল, 'আর শেখাবি ?'

মিনি চোখবন্ধ করে দোল খেতে খেতে বলল, 'ম্যাঁউ—ম্যাঁউ—'।

বিধান মেলা

স্বপন ঘোষ (সভ্য, সিনিয়র)

নবীন বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১লা জুলাই ৮৮১ সালে পাটনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র রায় ও মাতার নাম অঘোর কামিনী দেবী। তিনি তাঁর সাড়ে তের বৎসরের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে পশ্চিমবঙ্গে অনেক শিল্পের গোড়াপত্তন করে গেছেন। বস্তুতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সকল কাজের পেছনে আছে তাঁর সুপরিকল্পিত চিন্তার প্রকাশ।

বিধান রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন ১লা জুলাই। এই বছরের ১লা জুলাই হল তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী বছর। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী হিসাবে বিধান শিশু উদ্যানে এক বিরাট প্রদর্শনী বিধান মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীবসন্ত শাঠে এই মেলার উদ্বোধন করেন। জনসাধারণের জন্য এই মেলা ২রা জুলাই থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত খোলা ছিল। আমাদের এই মেলা প্রতি শনি ও রবিবার বেলা ১টা থেকে রাত্রি ৮-৩০ পর্যন্ত ও অন্যান্য দিন বেলা ৫টা থেকে রাত্রি ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকত। জনসাধারণের জন্য ৫০ পয়সা ও ছাত্র ছাত্রীদের ২৫ পয়সা টিকিটের হার ছিল।

আমাদের এই বিধান মেলা ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ছিল রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্যাভিলিয়ন। আমাদের এই মেলার আর এক অনন্য আকর্ষণ ছিল পুস্তক প্রদর্শনী। পুস্তক বিক্রেতারা যে কেবল বিশেষ সুলভ মূল্যে দর্শক সাধারণকে পুস্তক বিক্রি করেছেন তা নয়, অনেক পুস্তক বিক্রেতারা আবার গ্রাহকও করে নিয়েছেন। সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য ছিল নানান রকম মনমাতানো গানের রেকর্ড। এই মেলায় বৃক্ষপ্রেমীরা বঞ্চিত হন নি। বন বিভাগ বিনা মূল্যে বিভিন্ন ধরনের গাছ দর্শকদের দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্যাভিলিয়নে চলন্ত মডেলে কিভাবে রেলের চাকা ইত্যাদি প্রস্তুত হয় তা দেখানো হয়। এছাড়া ছিল স্বয়ংক্রিয় দূরভাষ যন্ত্র (টেলিফোন) কিভাবে কাজ করে, সোলার সিস্টেম, পর্যটন, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পূর্ত ও সড়ক বিভাগ, দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড, দুর্গাপুর ষ্টিল, মৎস্য ও সেচ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, সুলেখা ও টি-বোর্ড।

হালদার চুলায় সোলার সিস্টেমে সূর্যরশ্মির সাহায্যে জল গরম করে কিভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায় তা দেখান হয়। পর্যটনে ছিল পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানের মন মাতানো ছবি, পূর্ত ও সড়ক বিভাগে মডেলের সাহায্যে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য কি কি পরিকল্পনা আছে তা দেখান হয়। পশ্চিমবঙ্গ বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প বিভাগে ছিল কিভাবে বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া যায় সেই বিষয়ে চার্ট ও নানা বই।

যে চা আমরা সাধারণতঃ বাজারে পাই না সেই বিশেষ রপ্তানী যোগ্য চা 'টি বোর্ড' বিশেষ স্বল্পমূল্যে দর্শক সাধারণের কাছে বিক্রয় করেন। সুলেখা কোম্পানীও বিশেষ রিবেটে দর্শক সাধারণের নিকট পেন, কালি, আঠা, ফিনাইল ইত্যাদি বিক্রয় করে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্টলে ছিল দুধ, ঘি, মধু, এলাচ, মাংস, ডিম ইত্যাদি। এছাড়া আরও স্টল ছিল, যেমন—ষ্টীলের বাসন, জ্যাম জেলি, আচার মুখরোচক হজমি, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, চামড়ার ব্যাগ, জুতো ইত্যাদি এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন হোমিওপ্যাথ মহেশ ভট্টাচার্য।

আমাদের মেলার মূল আকর্ষণ ছিল দ্বিতীয়াংশে। এই অংশে ছিল চারটি প্যাভিলিয়ন। তাঁর একটাতে দেখান হয় মাটির মডেলের সাহায্যে বিধানচন্দ্রের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এই প্যাভিলিয়নে আরও একটি আকর্ষণীয় জিনিস ছিল, একটি কাঁচের শো-কেসে বিধান রায়ের ব্যবহৃত জিনিস পত্র। এটি দর্শক সাধারণের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় প্যাভিলিয়নে দেখান হয় বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েদের হাতের তৈরি নানা জিনিসও আঁকা ছবি। তৃতীয় প্যাভিলিয়নে দেখান হয় মাটির মডেলের সাহায্যে তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং চতুর্থ ও শেষ প্যাভিলিয়নে দেখান হয় মানুষের শরীরের নানা রোগ ও তার প্রতিকারের উপায়। এছাড়া ছোট বড় সবাইকে আনন্দ দেবার জন্য আমাদের এই মেলায় উপস্থিত ছিল দুটি কথা বলা পুতুল। সর্পবন্ধু মিলন কুমার তার বিষধর সাপ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আমাদের এই বিধান মেলায়। আর্ট কলেজের জনৈক ছাত্র অল্প জায়গায় চাল, ডাল প্রভৃতি দ্রব্যে তাঁর আঁকার প্রতিভা দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। মুখরোচক নানা খাবারও ছিল আমাদের এই মেলায়। এইসবে সুসজ্জিত ও আলোয় ঝলমল হয়ে ডাঃ রায়ের জন্মশতবর্ষটি যেন আমাদের সামনে রোজই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠত।

২১শে জুলাই-এ এই বিধান মেলা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু জন্মশতবার্ষিকীর যে অনুষ্ঠান রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করে গেছেন তার অনেক কাজ এখনও অনেক বাকী। সেগুলো যাতে সুসম্পন্ন হয় বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েদের সে বিষয়ে পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বিধান শিশু উদ্যানের সভ্য-সভ্যা। চেষ্টার দ্বারা, সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে জীবনে বড় হওয়া যায় এই যে দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন, তাঁর সেই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যদি আমরা তাঁর মত বড় হতে পারি তবে সেটাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠতম সম্মান প্রদর্শন এবং তাই হবে নিষ্ঠা সহকারে জন্মশত বার্ষিকী পালন করা।

মায়ের মুখ

সুচন্দ্র-নাথ দাস

মনসাপোতা মৌজার উপর দিয়ে মৌসুমী বাতাস এখন লেফ্‌ট-রাইট করতে করতে হেঁটে চলেছে। চল্লিশ বছরের বুড়ো অশ্বত্থ গাছের শাখা প্রশাখা আলতা মাখানো পাতায় ভরে গেছে।

এই রকম দিনকাল তোপার খুব ভাল লাগে। বাদল নেই, বৃষ্টি নেই, শ্যামল বনানীতে কেবলই সৃষ্টির উল্লাস।

তোপাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা বাব্‌লা বন আর তাল সারির ভেতর দিয়ে ছুটে গেছে, সে রাস্তাটা ইরিগেসন ক্যানাল ব্রীজের কাছে বিশ্রাম নেবার জন্য একটু থেমেছে, তারপর একটা বাঁক নিয়ে নদীর বাঁধে গিয়ে মিশেছে।

ইরিগেসনের ক্যানাল ব্রীজের কাছে একটা অশোক গাছ আছে। লাল-হলুদ ফুল ফুটেছে। পাতার আড়ালে বসে' পাখিরা গান করে। তোপা ইরিগেসন ক্যানাল ব্রীজে ব'সে তাদের গান শোনে।

ক্ষেতে যখন জলের প্রয়োজন হয় তখন চাষীরা ইরিগেসন ক্যানাল ব্রীজের কবাট খুলতে যায়। তারপর বাকী সময় জনমানব শূন্য। সেই নির্জনতা তোপার খুব ভাল লাগে।

অর্গলহীন খোলা ইরিগেসন ক্যানাল ব্রীজের জলস্রোত ঝর্ ঝর্ শব্দ তোলে। যেন দ্রুত লয়ের রাগিনীতে পিয়ানো বাজে। সে রাগিনীব ছন্দ মাত্রা বজায় রেখে তোপা নতুন নতুন কথার পিঠে কথা বসায়, গলার সমস্ত অর্গল খুলে গান ধরে। মেহেদীর বন, ফণী মনসার ঝোপ-ঝাড় তার সে গানের নীরব শ্রোতা।

ইরিগেসনের ক্যানাল ব্রীজের কাছে যেতে যেতে মাঝপথে তোপা থমকে দাঁড়াল। পাশে একটা ঝাকড়া বকুল গাছ। পাতার আড়ালে কোথায় কি রকম পাখি বসে আছে—তোপা দেখতে পাচ্ছে না। পাখিটা যেন 'তোপা—তোপা—তোপা—' বলে ডাকছে। তাই তোপার কৌতূহলী মনটা পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তোপার জন্মের সাত মাস পরেই তাব মা মারা গেছে। সে মায়ের মুখ কোনদিন দেখে নি। মায়ের মুখ কেমন ছিল—তা বলতে পারবে না। এই মুহূর্তে তার মনে হল—যদি তাব মা থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই পাখিটার মত তার নাম ধরে ডাকত, তোপা—তোপা—তোপা—।

পাখিটার পিছনে ছুটতে তোপার ব্যাকুল মনটা, সবুজ প্রাণটা অনেক অনেক বন—পাহাড়ের রাজ্য ঘুরে এল। বিহ্বলতা মুছে যেতে বুঝতে পারল—মনসাপোতার মেঠো পথের উপর সে দাঁড়িয়ে।

দিদি হয়ত তাকে ডাকছে—এই ভেবে তোপা পিছনে ফেলে আসা বাড়িটার দিকে তাকাল। দৃষ্টিটা বাড়ির কাছ পর্যন্ত ছুটে যেতে পারল না, সম্মুখের একজন অপরিচিতের মুখের উপর স্থির হয়ে গেল।

তোপার সমবয়সী একটা ছেলে কখন যে তাব পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—তা সে সে বুঝতে পারে নি। অপরিচিত মুখ। মনসাপোতা মৌজার পথে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। তবু মনসাপোতা মৌজার মানচিত্রের উপর দিয়ে কাল্পনিক দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে চাইল।

ছেলেটা বলল, আমাকে তুমি চিনতে পারবে না ভাই।

—তোমার বাড়ি কি এ গাঁয়ে নয়?

না। আমি শহর থেকে এসেছি।

শহর থেকে? সে তো অনেক দূর!

হ্যাঁ।

সেখানে পিচঢালা রাস্তা আছে। রাস্তার পাশে সারি সারি পাকা বাড়ি। পথে পথে জনস্রোত। গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম-বাস।

তুমি কখনও শহরে গিয়েছ না-কি?

না আমি তো এখনও ছোট। কি করে যাব? বড় হলে নিশ্চয়ই যাব ইস্টিশানে রেলগাড়ি আসবে ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দ হবে। আমি টিকিট ঘরে গিয়ে টিকিট কিনব। তারপর রেলগাড়িতে চড়ব। তুমি নৌকোতে চড়েছ?

হ্যাঁ। এ গাঁয়ে আসবার সময় নৌকোতে করে এসেছি।

কাদের বাড়িতে এসেছ?

হরপ্রসাদ দত্তর বাড়িতে। তিনি আমার কাকা হন।

আগে কই তুমি তোমার কাকার বাড়িতে আস নি!

হ্যাঁ, এসেছিলাম। খুব ছোটবেলায় আমার মায়ের সঙ্গে একবার এসেছিলাম। তুমি হয়ত দেখ নি।

আমি খুব ছোট ছিলাম তখন, তাই দেখি নি।

তোমার নাম কি?

তোপা। এই গাঁয়ে থাকি। ঐ দূরে একটা টালির বাড়ি দেখা যাচ্ছে—ওটা আমাদের।

আমার নাম কমল।

আচ্ছা কমল! তুমি ইরিগেসনের ক্যানাল ব্রীজ দেখেছ?

না।

তাহলে চল তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

মুহূর্তের আলাপে দুই ভিন্ন পরিবেশের, দু'টো অপরিচিত মন সখ্যতার এক অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে গেল। দুজনের বুকের পলিতে কে যেন অদৃশ্য হাতে একই অনুভবের বীজ বপন করে দিল। দুজনের কেউ তা বুঝতে পারল না। দুজনের শুধু মনে হল—তারা একে অপরের বন্ধু।

ইরিগেসন ক্যানাল ব্রীজের কাছে আসতেই কমলের জুতো পরা পা দুটো অনেকখানি ধুলোতে ভরে গেছে। তোপার খালি পা। ধুলো কাদা লাগলেও সে কখনও চিন্তা করে না। কমল মাটির উপর পা ঠুকে ঠুকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল।

তোপা বলল, অমন করলে ধুলো মুছবে না।

এস—

মনসাপোতার মাঠে মাঠে এখন উন্নত ফলনশীল ধানের চাষ। তাই ইরিগেসনের ক্যানাল ব্রীজের অর্গল বন্ধ করে নদীর জল ক্যানালে ভরে রাখা হয়েছে।

ব্রীজের পাশে জল-ছুঁই-ছুঁই শান্ বাঁধানো বেদী। তোপা কমলের হাত ধরে সেই বেদীব উপব নিয়ে এসে দাঁড় করাল। কমল পা থেকে জুতো খুলতে তোপা নিজের হাতে অঞ্জলি ভরা জল তুলে কমলের পা ধুইয়ে দিল। কমলের কোন বাধা শুনল না।

তোপা কলকলিয়ে বলল, আমার দিদি এইভাবে আমার পা ধুইয়ে দেয়। আমি 'না' বললেও শোনে না।

কমল বলল, তোমার দিদি আছে? তাহলে তো তোমার খেলার সাথী আছে।

তোমার দিদি নেই?

বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। দিদি নেই, মা নেই।

কি আশ্চর্য! আমারও তো মা নেই!

তোমারও মা নেই?

কমলের কথায় নিঃশব্দ সম্মতি জানাতে তোপা অধর-ওষ্ঠ বিস্তারিত করে একটু ম্লান হাসি হাসল।

কমল বলল, আমার মা আমাকে খুব ভালবাসতেন।

তুমি তোমার মা-.ক দেখেছ?

দেখব না কেন? মাত্র ছ'মাস আগে মারা গেছেন।

তোমার মাকে তোমার মনে পড়ে?

না।

একটুও মনে পড়ে না? মায়ের মুখ এই রকম ছিল। মায়ের চোখ এই রকম ছিল।

না।

মা এইভাবে ডাকতেন। মা এইভাবে আদর করতেন। এইভাবে—

না—আমার কিছু মনে পড়ে না। আমি তো মা-কে কোনদিন চোখে দেখি নি। তাই জানি নে, আমার মায়ের মুখ কেমন ছিল।

ছবিতেও তোমার মায়ের মুখ দেখনি?

না।

আমার মায়ের ছবি দেখবে?

মায়ের ছবি কাকে বলে তোপা জানে না, তাই বিস্মিত হল, সে বলল, তোমার মায়ের ছবি আছে?

হ্যাঁ। বাড়িতে খুব বড় ফটো বাঁধানো আছে। প্রতিদিন ফুলের মালা দিই, ধূপ জ্বালি। আমার সঙ্গে সব সময় মায়ের একখানা ছোট ফটো থাকে।

কমল প্যান্টের পকেট থেকে মায়ের ফটো বের করল। তোপা কমলের মায়ের ফটোর দিকে ঝুঁকে পড়ে দু'চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ধরল। দেখে দেখেও তার সাধ মিটল না।

কমল বলল, ফটোটা তুমি হাতে নিয়ে দেখ।

কমল তোপার মনের কথা বুঝে নিয়েছে। তাই তোপা কমলের মুখের দিকে তাকাল, অধর-ওষ্ঠ বিস্ফারিত করল, ফুটে উঠল স্মিত হাসি।

তোপা সত্যিই একবার ফটোখানা ছুঁয়ে দেখতে চায়। ফটো স্পর্শ করলে কি রকম লাগে অনুভব করতে চায়।

কমল বলল, ফটোখানা নাও।

নেব! বলেই তোপা কমলের হাত থেকে ফটোখানা নিজের হাতে নিল।

ফটোখানা হাতে নিতেই তোপার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আনন্দ অনুভূতির তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ল।

বাঃ! কী সুন্দর!

কমল নিঃশব্দে একটু হাসল।

তোপা জিজ্ঞেস করল, মায়ের মুখ এত সুন্দর হয়?

হ্যাঁ।

তোপার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন—আমার মায়ের মুখ কি এই ছিল? আমার মায়ের চোখ কি এইরকম ছিল? আমার মায়ের ঠোঁটে কি এইরকম হাসি লেগে থাকত। আমার মা কি এইরকম সিঁদুর পরত?

কমলকে কিছু বলল না তোপা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মায়ের ফটোখানা ফেরৎ দিল।

কমলকে বিদায় জানিয়ে তোপা যখন বাড়ির দিকে পা বাড়াল তখন মনসাপোতা মৌজার বুকে অন্ধকারের ওড়নাখানা পৎ পৎ করে উড়ছে। (পরের সংখ্যায় সমাপ্য)

পবন দেবতা ঃ বাহন হরিণ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

যাঁর নাম পবন, তাঁরই আরেক নাম বায়ু। আবার তাঁকেই পুরাণে বলা হয়েছে মরুদগন। আমরা সহজ বাংলায় বলি বাতাস। এই বায়ুই হচ্ছে আমাদের প্রাণশক্তির প্রধান উৎস। বায়ু আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। বিশ্বভুবন বেঁচে আছে। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস সেই বায়ু থেকে জন্মায়। তাই বেদে বায়ুকে বলা হয়েছে আমাদের পিতা, মাতা এবং সখা। ঋকবেদে বলা হয়েছে, বায়ুর ঘরে অমৃত সঞ্চিত আছে, সেই অমৃতেই জীবগণ উজ্জীবিত হয়।

পুরাণে বলা হয়েছে, বায়ুর পত্নীর নাম বায়বী। বায়বীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে বায়ুর বিয়ে নিয়ে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল। রাজা কুশনাভ বলে সেকালে একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। এই রাজার ছিল একশটি কন্যা। বায়ু কুশনাভের একশটি মেয়েকে একসঙ্গে বিয়ে করতে চান। কিন্তু মেয়েরা বললেন, বাবা অনুমতি দিলে তবেই তারা বায়ুকে বিয়ে করবেন, নইলে নয়। এদিকে রাজা কুশনাভও রাজি নন এই বিয়েতে। এতে বায়ু দেবতা ভীষণ চটে গেলেন। তিনি তাঁর শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে নিলেন—বায়ু হলেন প্রবল বায়ু। অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড ঝড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজা কুশনাভের রাজ্যের উপর। ঝড়ের দাপটে সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, আর রাজার একশজন কন্যার পিঠে কুঁজ হয়ে গেল—কন্যারা গেলেন বেঁকে। সেই থেকে কুশনাভের রাজধানীর নাম হল কান্যকুব্জ।

পুরাণের এই কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবের এক ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জানা যায়, রাজা কুশনাভের রাজ্যে একবার ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিবার্তার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঘূর্ণিঝড়ে রাজ্যের যেমন দারুণ ক্ষতি হয়েছিল, তেমনি আহত হয়েছিলেন রাজকন্যারাও। এই ঘটনাকে পুরাণে এক রূপক কাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বায়ু দেবতার আরেক নাম পবন সেকথা আগেই বলেছি। পুরাণে বলা হয়েছে, পবনদেব বাস করেন গন্ধবতী নামে এক রাজপুরীতে। আমরা পবনের আরেকজন পত্নীর নাম পাই। তাঁর নাম অঞ্জনা। অঞ্জনারই পুত্র হচ্ছেন মহাবীর হনুমান—যিনি রামভক্ত হনুমানরূপেও পরিচিত। পঞ্চপাণ্ডবের একজন হচ্ছেন বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, যিনি পবনদেবের মানসপুত্ররূপেও পরিচিত। পবন যেহেতু শক্তি ও বলের দেবতা—তাই তার এই দুজন পুত্র ছিলেন মহাশক্তিধর।

বায়ু দেবতার আরেক নাম মরুদগন। বায়ু পুরাণ নামে একটি পৌরাণিক গ্রন্থ আছে, তাতেই মরুদগনের কথা বলা হয়েছে। বায়ু দেবতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। বায়ু স্বাধীন, হাল্কা, ঠাণ্ডা, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, জীবদেহে চেতনা সঞ্চারকারী এবং জলকণিকা বহনকারী। এই সাতটি গুণের অধিকারী হচ্ছেন বায়ু দেবতা। এই দেবতার স্বভাব চঞ্চল এবং বৃষ্টিপাতের সহায়ক। বাহন অর্থে বা ধাতু থেকে বাত বা বায়ু শব্দের জন্ম। এই দেবতা সব সময় প্রবাহিত হচ্ছেন এবং এবং যা কিছু খারাপ, সে সব কিছু দূরে সরিয়ে যায়।

বায়ুর বাহন হচ্ছে মৃগ বা হরিণ। পুরাণের এই মত। অবশ্য বেদে বায়ুর বাহন হিসেবে অশ্ব বা ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, বায়ুর বাহন কী এই প্রশ্নের উত্তরে পুরাণ এবং বেদ আলাদা মত পোষণ করে। বেদ আগে, পুরাণ পরে রচিত হয়। তাই বেদের মতটাই আগে বলি। ঋকবেদে বলা হয়েছে, বায়ুর সোনার রথ, সেই রথ টানে একশ ঘোড়া। বেদে আবার বলা হয়েছে, মরুদগনের বাহন চিত্রহরিণ, শক্তি ও গতির কথা বিবেচনা করলে অশ্বকেই বায়ুর বাহন হিসেবে সঙ্গত মনে হয় ঠিকই, কিন্তু বায়ুর সামগ্রিক গুণাবলী বিচার করলে হরিণকেই বায়ুর যোগ্য বাহন বলে মনে হবে।

একবার দেবতাদের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় বায়ু জয়ী হয়। তাঁর এই ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে হরিণের ক্ষিপ্রগতির তুলনা করা চলে। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, হরিণের গতি ঘোড়ার তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। হাল্কা শরীর হরিণের, ঠিক বায়ুরই মত। তাই বায়ুবেগেই হরিণ ছুটতে পারে। এছাড়া আমরা জানি, বায়ু গন্ধ বহন করে। হরিণও গন্ধ বহন করে। মৃগনাভির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য। তাই হরিণই বায়ুর উপযুক্ত বাহন।

আরেকটা কথাও উল্লেখযোগ্য। বায়ুর স্বভাব যেমন চঞ্চল, হরিণের স্বভাবও ঠিক তেমনি চঞ্চল। কারুর চঞ্চল স্বভাবের কথা বলতে গেলেই আমরা তাকে হরিণের সঙ্গে তুলনা করি। আমাদের গানে বনহরিণীর চকিতচপল স্বভাবের অসংখ্য উপমা পাওয়া যায়। হরিণের চোখ এবং স্বভাব চঞ্চল এবং সেদিক থেকে বায়ুর সঙ্গে তার উপমাই সব থেকে বেশি। সেদিক থেকে বায়ুর বাহন হিসেবে হরিণই সার্থক এবং সুপ্রযুক্ত।

আমার ডায়েরি

অর্পিতা মজুমদার (সভ্যা, ১২)

নতুন করে আমার একটা ডায়েরি হয়েছে। তাতে আমি অনেক কিছু লিখেছি। পড়বে নাকি? আচ্ছা এই নাও ডায়েরি, পড়।

৬,১,৮১—আমি আমাদের বাড়ির সবাইকে ভালবাসি, কিন্তু গতকাল থেকে একটা কারণে মাকে আর ভালবাসি না। কারণটা হল যে—গতকাল সকাল বেলায় মা ব্রাশ খোঁজবার জন্য আমাদের দুই ভাই বোনকেই ডাকে কিন্তু আমরা কেউই উঠিনি। তখন মা নিজেই এসে ব্রাশ নিয়ে যায়। যাওয়ার আগে আমি ঘুমোচ্ছি দেখে আমার কানটা খুব জোরে মুলে দেয়। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘুম জড়ানো গলায় বললাম—আমি কি করলাম? মা বলল তোদেরকে যে, তখন থেকে ডাকছি। কানে যায় না? খালি ঘুম। সকালে উঠেই আর বকাবকি ভাল লাগেনা। তারপর মুখ ধুয়ে এসে টেবিলে খেতে বসেছি, তখনও আমার ভাই তুতুম আমাকে দেখে ফ্যাচ্, ফ্যাচ্ করে হাসছে। আর বলছে এ মা এত বড় মেয়ে মা'র হাতে মার খায়। কিছু আর বললাম না। মা ডিম, পাঁউরুটি দিয়ে গেল। প্রথমেই তুতুম বলল, এই তিতির ভাখ আমার ডিমটা কত বড়। তোরটা পুঁচকে। চোখ রাঙ্গিয়ে বললাম—তুতুম তর্ক রাখ। আমারটাই বড়। এমনি করতে করতে ঝগড়া। ঝগড়ার পর হাতাহাতি। হাতাহাতির পর সমাপ্তির রেখা টেনে দিল মা। রান্নাঘরে বেগুন ভাজছিল। তুতুমকে এক খুন্তির বাড়ি মারল। আমার বিনুনীটা ধরে টেনে দিল, আর বলল—সব সময় ঝগড়া না? বড় বোন হয়ে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না? বলে চলে গেল। প্রতিজ্ঞা করলাম যে মা'র সাথে আর বেশি কথা বলব না।

গতকালের প্রতিজ্ঞা আমি পালন করবই। আজ রাগের চোটে স্কুল থেকে এসে সুমিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ির দিকে হাঁটছিলাম। ড্রেনের পাশে ইটের ওপর পা টা আচমকা পরে যাওয়াতে পা টা মুচকে গেল। কোন রকমে টলতে টলতে বাড়ির কাছে এলাম। রেলিং ধরে কোন রকমে ওপরে উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। মা—মাগো আর পারছি না। মা তাড়াতাড়ি এসে হাত ধরে নিয়ে বলল, তিতির কি হয়েছে? তখন আমার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। মুখে কিছু না বলে আঙ্গুল দিয়ে পায়ের গোড়ালিটা দেখিয়ে দিলাম। তারপর আর কিছু জানিনা। ডাক্তারকাকু যখন এল তখন বুঝলাম ঘরে কেউ এসেছে, কারোর কোন কথা আমি বুঝতে পারছিলাম না। শুধু কে যেন বলল জখমটা খুব বাজে জায়গায় হয়েছে। অন্তত এক মাস শুয়ে থাকতে হবে। রাত্রিতে যখন খুব ব্যথা উঠত, তখন যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠতাম। মা তখন চুমু খেয়ে বলত, তিতির ওরকম করিস না মা। চোখের জল মুছে দিয়ে বলত, চোখের জল ফেললে শরীর খারাপ হয়। তুতুমটা কী পাজী ছিল, কত শান্ত হয়ে গেছে। সকাল বেলায় ডিমের কুসুমটা এনে বলত এই তিতির এটা খেয়ে নে। আমার ভাল লাগেনা

খেতে। দুপুর বেলায় স্কুল থেকে হজমি এনে বলত, বল না তিতির করে ভাল হবি? বলেই কেঁদে ফেলত।

৭,২,৮১—অনেকদিন পর ডায়েরি লিখছি। পা টাও ভাল হয়ে গেছে। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মা আর তুতুমের সাথে কথা বলব না সেটা ব্োধহয় গুলিয়ে খেয়ে ফেলেছি। তুতুম আবার পাগলামী শুরু করে দিয়েছে। মার স্নেহে, তুতুমের ভালবাসায় আমি সব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছি।

বন্ধুরা এবার ডায়েরিটা বন্ধ করি কেমন?

আমার পাখি

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (সভ্যা, সিনিয়র

আমার একটি পাখি ছিল
খেতে চাইতো দুধ ছোলা
গাইতো শুধুই হরে কৃষ্ণ
দেখতে ছিল কালো
মনটা বড়ই ভালো।
বকুনিতে চুপ না করে
শুধুই বলে হরে।

করে দেখ ভারি মজা

দু'টি পাত্র নাও, তাদের একটিতে ফেরিক ক্লোরাইড আর অপরটিতে পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট নিয়ে তাদের জলীয় সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি কর। এবার তোমার হাতের তালুতে ভাল করে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণটি লাগাও, আর একটা ছুরি পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট দ্রবণে ডোবাও। এবার যদি তুমি ছোরাটা হাতের তালুতে লাগাও, দেখবে হাতটা কিরকম রক্তের মত লাল হয়ে গেল। এইভাবে অনেক রকম মজা করতে পার।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসটি যথাযথভাবে পালন করা হল বিধান শিশু উদ্যানে। সকাল সাড়ে সাতটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সমবেত ছেলেমেয়েদের সামনে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এসময়ের অনুষ্ঠানের বিশেষ একটা দিক ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের পুরস্কার প্রদান। ওদের পুরস্কার দেওয়ার পর উদ্যানের ছেলেমেয়েরা ব্যাণ্ড সহকারে পথ পরিক্রমায় বের হয়।

এইদিন সকাল সাড়ে দশটায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এই অনুষ্ঠানে ছিল উদ্যানের কৃতি ছাত্র শ্রীমান মানব নন্দীর সম্বর্দ্ধনা। মানব উদ্যানে খেলাধুলায় বৃত্তি পেয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এমন কি ডাঃ বিধানচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে সে জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। তার এই কৃতিত্বের
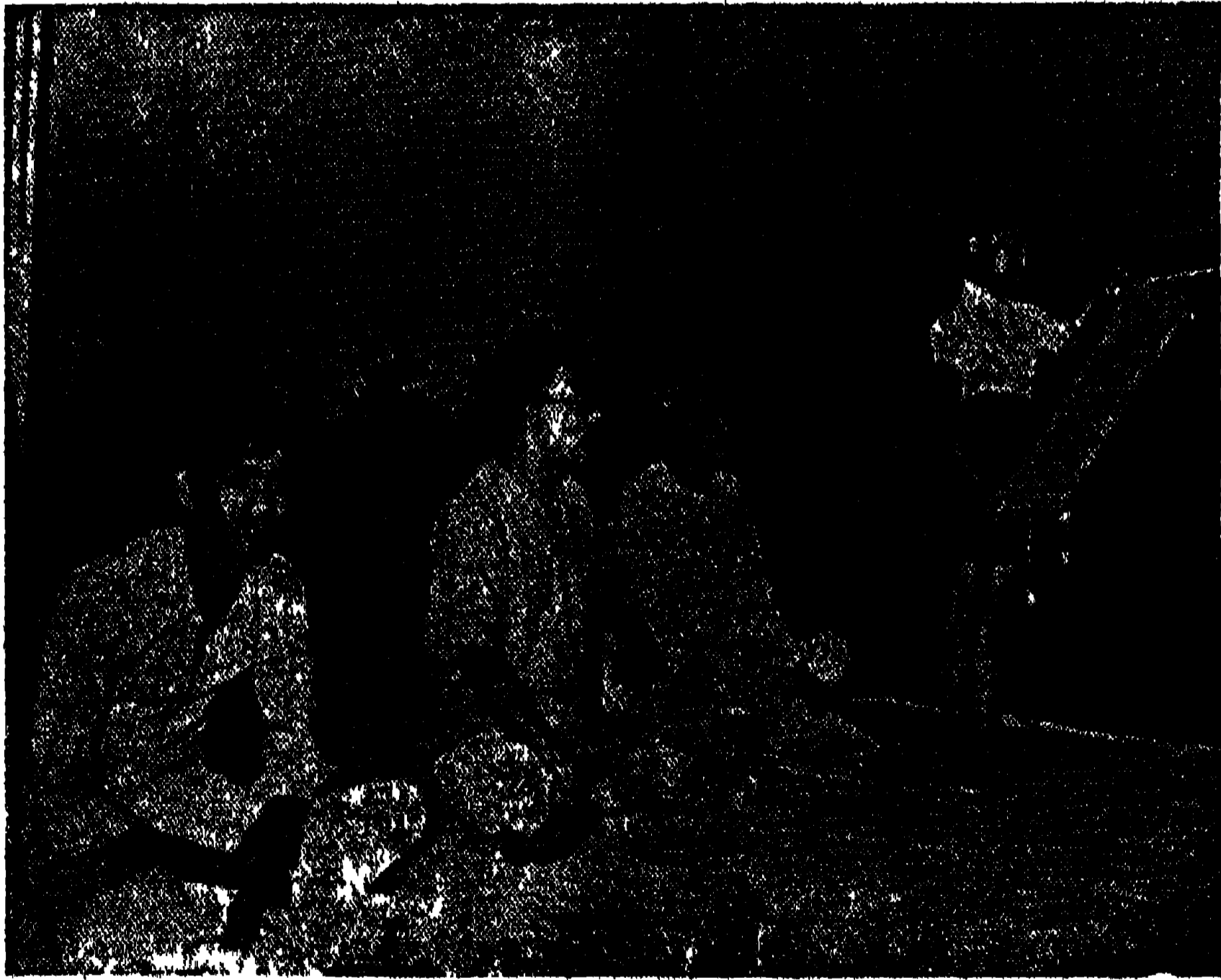
উদ্যানের সভ্য শ্রীমানব নন্দীর সম্বর্দ্ধনা সভায় মানপত্র পাঠ করছে উদ্যানের সভ্যা কুমারী নীলাঞ্জনা গুহ

জন্য বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েরা ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি তাকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী গৌরকিশোর ঘোষ। উদ্যানের ছেলেমেয়েদের সংগীত পরিবেশনের

মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে যে মানপত্র দেওয়া হয় তা পাঠ করে কুমারী নীলাঞ্জনা গুহ এবং কমিটির পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করেন শ্রী গৌরকিশোর ঘোষ। উদ্যানের পক্ষ থেকে তাকে আরও নানা জিনিস উপহার দেওয়া হয়। সভাপতি মানবের প্রশংসা করেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানবের মত জীবনে সার্থক হতে বলেন এবং মানবকে ভবিষ্যৎ জীবনে অধিকতর সার্থক হয়ে ওঠার আশীর্বাদ করেন। মানব উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রণাম ও ছোটদের তার প্রীতি ভালবাসা জানায়। উদ্যান সংগীতের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিধান শিশু উদ্যানে প্রতি বছরেই স্বাধীনতা দিবসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তা হল—মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজন ছাত্রকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন। এবারে ডাঃ বিধানচন্দ্রের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী শ্রীমান অভিজিৎ চৌধুরীকে এই দিনে শতবার্ষিকী বৃত্তি মাসিক ৭৫ টাকা করে এক বছরের জন্য দেওয়া হল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক ও প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রী অপরেশ

৬১ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীমান অভিজিৎ চৌধুরীকে মাল্যদান করছে উদ্যানের সভ্যা কুমারী রূপা মুখোপাধ্যায়

ভট্টাচার্য। সভার প্রথমে এদিনে এ ধরনের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরে উদ্যানের সভ্য শ্রীমান মানব নন্দী। প্রস্তাবনার পর উদ্বোধন সংগীত পরিবেশিত হয়। শ্রীমান অভিজিৎ, সভাপতি ও প্রধান বক্তাকে মঞ্চে আহ্বান করে মালা, চন্দন পরানো হয়। তারপর অভিজিৎকে বৃত্তি, সার্টিফিকেট ও পদক প্রদান করেন সভাপতি শ্রী জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। বক্তা অপরেশবাবু তার বক্তব্যে কৃতি ছাত্রদের প্রতি আশীর্বাদ রাখেন।

উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রকে সম্বর্দ্ধনা জানানোর পর মাধ্যমিকে কৃতি দশজনকে (যদিও প্রথম স্থানাধিকারী অসুস্থতাবশত উপস্থিত থাকতে পারেনি) মঞ্চে আহ্বান করা হয়। ওদের সবাইকে মালা ও চন্দন পরানো হয়। বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েদের ও ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হয়, মানপত্র পাঠ করে শ্রীমান অপ্রতিম মহলানবীশ ও সভাপতি জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। মানপত্র ছাড়া কমিটির পক্ষ থেকে বই দেওয়া হয় এবং রাজ্যপাল প্রদত্ত পদক ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এরপর প্রতিটি ছাত্র তাদের বক্তব্য রাখে। সভাপতি কৃতি ছাত্রদের প্রশংসা করেন

কৃতি ছাত্র সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সভাপতি ও কৃতিছাত্রগণ

এবং স্বাধীনতা দিবসে তাদের এই ধরনের সম্বর্দ্ধনা দেওয়া অত্যন্ত আনন্দের ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এ কথাও উল্লেখ করেন। সকলকে তাঁর আশীর্বাদ জানান।

সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানের পর বিধান কলাকেন্দ্রের সভ্য-সভ্যরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে।

আনন্দ-সংবাদ
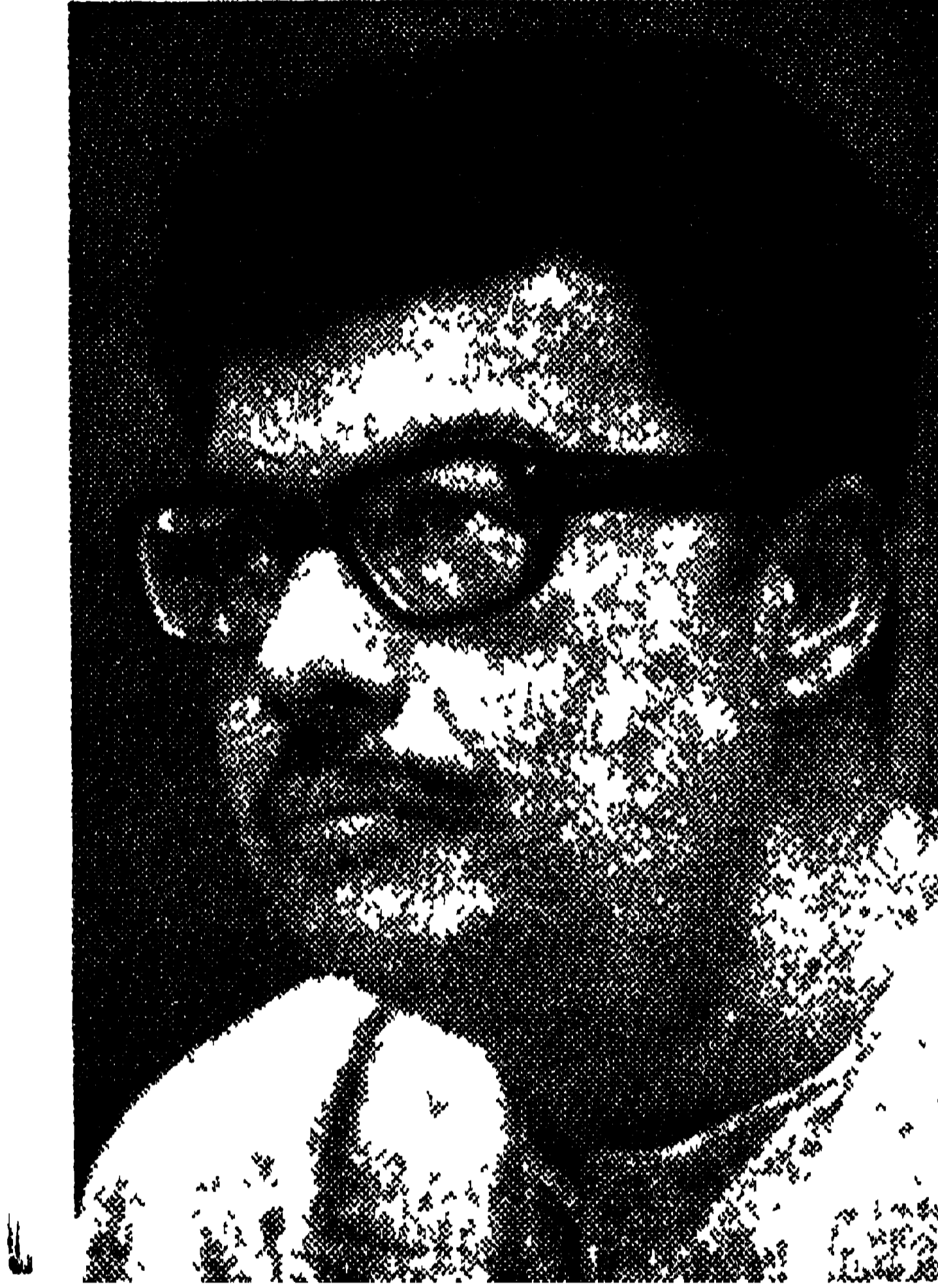
'খেয়াল-খুশী' পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা ও ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য শ্রী গৌরকিশোর ঘোষ সম্প্রতি র‍্যামন-ম্যাগসেসে পুরস্কার অর্জন করেছেন। আগামী ৩১শে আগস্ট ম্যানিলায় আয়োজিত উৎসবে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন। এটা আমাদের খুবই আনন্দের ও গর্বের কথা। তিনি আমাদের মধ্যে আরও দীর্ঘকাল থেকে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করুন—এই আমাদের একমাত্র কামনা।

ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম জয়

দিলীপ দত্ত

ভারতীয় ক্রিকেটদল প্রথম ইংলণ্ড সফর করেন ১৯৩২ সালে, কিন্তু ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের মাটিতে ৩৯ বছরের একটি টেস্টেও জিততে পারে নি। এই ঐতিহাসিক জয় সম্ভব হয় ১৯৭১ সালে ওভাল টেষ্টে।

সিরিজের প্রথম দুটি টেষ্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর তৃতীয় টেষ্ট শুরু হল।

প্রথম দুটি টেষ্টের মত এ টেষ্টেও টসে পরাজিত হলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকর। ইংলণ্ড দল প্রথম ব্যাট করতে নামল। সোলকারের প্রথম ওভারে ড্রাইভ করতে গিয়ে লাকহার্ষ্ট গাভাস্কারের হাতে ক্যাচ আউট। তারপর এডরিচ ও জেমসনের জুটিতে রান হল ১০৬। জেমসন হলেন রান আউট। মধ্যবর্তী ব্যাটসম্যানরা অল্প রানে আউট হওয়ায় একসময় ইংলণ্ড দলের রান হল ৫ উইকেটে ১৪৩। কিন্তু রিচার্ড হাটন ও উইকেট রক্ষক এ্যালান নট দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করলেন। নট ৯০ এবং হাটন ৮১। ৩৫৫ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল।

বৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় দিন খেলা হল না। তৃতীয় দিন একটু দেরিতে খেলা শুরু হল। কিন্তু মাত্র ২১ রানে ভারতের প্রথম উইকেট জুটি আউট হয়ে গেলেন। অশোক মানকড়কে বোল্ড করলেন প্রাইস আর গাভাস্কার বোল্ড হোলেন জন স্নো-এর বলে। ওয়াদেকর ও দিলীপ সরদেশাই ধীরে সুস্থে ব্যাট করতে লাগলেন। সরদেশাই ৫৪ রান করলেন আর ওয়াদেকর ৪৮। সোলকার ৪৪ ও ও এঞ্জিনিয়ার ৫৯ রান। বিশ্বনাথ কিন্তু আউট হলেন শূন্য রানে। দিনের শেষ বলে ইঞ্জিনিয়ার আউট হলেন। তৃতীয় দিনে ভেঙ্কটরাঘবন ও আবিদ আলির জুটিতে হল ৫৮ রান। কিন্তু তারপর ২৮৪ রানে শেষ হল ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস। ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ৭১ রান কম। ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ ৭০ রানে ৫ উইকেট দখল করলেন।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াদেকর সোলকার ও আবিদ আলিকে দু ওভার বল করতে দিয়ে নিয়ে এলেন স্পিনার চন্দ্রশেখর ও ভেঙ্কটরাঘবনকে। মারকুটে ওপনার জেমসন প্রথম ইনিংসে ভারতীয় স্পিনারদের চমৎকার আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ভেঙ্কটরাঘবনকে একটি টেষ্ট ড্রাইভ করার পর হল অঘটন। লাকহার্ষ্ট ড্রাইভ করলেন চন্দ্রশেখরকে। চন্দ্রশেখর হাত বাড়িয়ে বল থামাতে গেলেন বলটি তার হাতে লেগে লাগল উইকেটে। জেমসন তখন ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাই তিনি হলেন রান আউট। এডরিচ এলেন এবং চন্দ্রশেখরের পঞ্চম বলে বোল্ড। মধ্যাহ্ন ভোজের এক মিনিট আগে ব্যাট করতে নামলেন ফ্লেচার। প্রথম বলটি একটি লাফিয়ে ওঠা

গুগলি। ফ্লেচার সন্ত্রস্ত হয়ে খেললেন, ব্যাটে লেগে ক্যাচ উঠল, সর্ট লেগ থেকে সোলকার ঝাঁপিয়ে পড়ে চমৎকারভাবে ক্যাচটি নিলেন। ডি অলিভিরা চন্দ্রশেখরের বলে স্বচ্ছন্দভাবে খেলতে পারছিলেন না। স্লিপে একটি ক্যাচও দিলেন, কিন্তু ধরতে পারলেন না সরদেশাই। তার আঙুলে আঘাত লাগায় তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন ; ফিল্ড করতে এলেন দ্বাদশ খেলোয়ার জয়ন্তীলাল। এই জয়ন্তীলালই ভেঙ্কট রাঘবনের বলে ডি অলিভিয়েরাকে মিড অনে ক্যাচ ধরলেন। ইংলণ্ড ৪ উইকেটে ৪৯। এ্যালান নট এলেন। সেই সিরিজে নট প্রতি ইনিংসেই ভাল রান পেয়েছেন, এবং এই টেষ্টে প্রথম ইনিংসে ৯০ রান করেছিলেন। ইংলণ্ডের অনেক ভরসা নটের ওপর। চন্দ্রশেখরের ৬টি বল খেলার পর নট ভেঙ্কট-রাঘবনের সম্মুখীন হলেন। ভেঙ্কটের একটি অফব্রেক বল নট খেললেন। বলটি মাটি থেকে সামান্য একটু উঠেছিল, সোলকার দেহ শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় ব্যাটের ডগা থেকে ক্যাচটি নিলেন। নট আউট হওয়ায় ভারতীয়রা কিছু স্বস্তি পেল। ইলিংওয়ার্থ একটু পরেই আউট হলেন কট এণ্ড বোল্ড চন্দ্রশেখর। ইংলণ্ডের ৬৫ রান, পড়েছে ৬টি।

এতক্ষণ একদিকে লাকহার্ষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে দুই স্পিনারের সঙ্গে মোকাবিলা করছিলেন, শেষে ধৈর্য হারালেন, চন্দ্রশেখরের একটা অফ-স্ট্যাম্পের বাইরের বল জোরে মারতে গিয়ে স্লিপ কাট দিলেন। তার ব্যক্তিগত রান ৩২। ইংলণ্ড ৬ উইকেটে ৭২। বাকী ব্যাটসম্যানেরা বেশিক্ষণ টিঁকতে পারলেন না। ১০১ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘটল। চন্দ্রশেখর ৩৮ রানে ৬টি উইকেট পেলেন, ভেঙ্কট ৪৪ রানে ২ ও বেদী ১ রানে ১টি।

১৭৩ রান করতে পারলে জয়ী হবে এই অবস্থায় ব্যাট করতে এলেন গাভাস্কার ও অশোক মানকড়। গাভাস্কার ভারতের অন্যতম ভরসা। এর আগের সিরিজেই গাভাস্কার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৪টি টেষ্টে ৭৭৪ রান করেছিলেন, কিন্তু স্নো দ্বিতীয় ওভারে লেগষ্টাম্পের বাইরের একটা বল গাভাস্কার প্যাড দিয়ে খেললেন। জন স্নো আবেদন করলেন এবং আম্পায়ার তাকে আউট দিলেন। টেষ্টে গাভাস্কার এই প্রথম শূন্য রান। ওয়াদেকর ও মানকড় রান নিয়ে গেলেন ৩৭। তারপর মানকড় আউট হলেন, তিনি ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ব্যাট করে ১১ রান করেছিলেন। রান কম হলেও ইনিংসকে দাঁড় করাতে মানকড়ের দৃঢ়তা কম কার্যকরী নয়।

(ক্রমশ)

খেলার খোশ-খবর

শ্রীকলমচি

খেলাধুলায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি পাল্টাচ্ছে ?

ভাগ্যিস এশীয় ক্রীড়া ১৯৮২ সালে এ দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে, তাই আমাদের দেশের ক্রীড়া কর্মকর্তাদের অনেকের টনক কিছুটা নড়েছে বলে মনে হচ্ছে। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তো এশীয় ক্রীড়ার ফুটবল দল গড়তে খুব যাচাই বাছাই আর লম্বা লম্বা মেয়াদী শিক্ষণ শিবির ও ভ্রমণসূচী প্রস্তুত করেছে। সেকেন্দ্রাবাদে সম্প্রতি সমাপ্ত তৃতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের পর আবার ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত চতুর্থ শিবির। ১৯৮২'র ফেব্রুয়ারী মাসে পঞ্চম শিবির। পয়লা মে থেকে ষষ্ঠ শিবির। জুলাই মাসে আবার শিবির। এরপর আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত চূড়ান্ত ও শেষ প্রশিক্ষণ অধ্যায়। ২০শে নভেম্বর থেকে এশীয় ক্রীড়া আরম্ভ।

প্রশিক্ষণের বিরতির মধ্যে চলবে অনেক প্রদর্শনী ও প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলা। ৩১শে আগস্ট ১৯৮১ থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা। ৯ই নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ককে কিংস কাপ প্রতিযোগিতা। ডিসেম্বরে দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া সফর করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারী মার্চে আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতার সম্ভবনা আছে। মধ্য ও দূরপ্রাচ্যে এশিয়ার আধ ডজন দলকে আমন্ত্রণ জানাবার প্রস্তাব আছে। মে-জুন মাসে ইংলণ্ডের মিডল সেক্স ওয়াণ্ডারার্স ফুটবল ক্লাবের আসার সম্ভাবনা আছে। আগস্টের শুরুতেই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি সহ ইংলণ্ড ভ্রমণ ও সাতটি প্রীতি খেলায় যোগদান করার কথা আছে।

উপরোক্ত কর্মসূচী যদি সঠিকভাবে পালিত হয় এবং অতীতের তিক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তবে খেলোয়াড় ও দেশ উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবার প্রাকালে ভারতীয় দলের মুখ্য প্রশিক্ষক শ্রী প্রদীপ কুমার ব্যানার্জীর (পি. কে.) সরস উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :—"আমাদের স্বভাবই বীজ রোপন করেই বিরাট গাছ চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ফল। অনুরোধ করব, একটু ধৈর্য ধরুন। বীজ তো সবে পোঁতা হল। চেষ্টা করব ফল ফলাতে।

এক মাইল দৌড়ের বিশ্ব নজীর দখলে রাখার জন্য টানা হেঁচড়ার বে-নজীর নজীর

বৃটেনের দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান এ্যাথলীট সেবাষ্টিয়ান কো আর ষ্টিভ ওভেটের মধ্যে এক মাইল দৌড়ের নতুন বিশ্ব নজীর স্থাপনের যে রেষারেষির দৌড় স্বরু হয়েছে, এর বোধ হয় আর

দৃষ্টান্ত নেই। গত ১৯শে আগষ্ট জুরিখে সেবাষ্টিয়ান কো ৩ মিনিট ৪৮'৫৩ সেকেণ্ডেদৌড়ে ষ্টিভ ওভেটের পূর্ব বিশ্ব নজীরটি চুরমার করে। ২৭শে আগস্ট ষ্টিভ ওভেট বদলা নিল ৩ মিনিট ৪৮'৪০ সেকেণ্ডে এক মাইল দূরত্বটি দৌড়ে। পশ্চিম জার্মানীর কোবলেঞ্জে এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এ্যাথেটিকসে উন্নত অন্যান্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। তাতেই এই নজীর সৃষ্ট হয়। এদিকে ষ্টিভ ওভেট ব্রাসেলসে ২৮শে আগস্ট "গোল্ডেন মাইল" দৌড় প্রতিযোগিতায় সেবাষ্টিয়ান কো-র সদ্যার্জিত খেতাব ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নামছে। সে ৩ মিনিট ৪৭'৫ সেকেণ্ড দৌড়বে বলেছে।

এই নজীর তছনছের খেলায় অন্য দেশের এ্যাথলীটরাও মজা পেয়েছে ও মদত দিচ্ছে। কোবেলেঞ্জের দৌড় ওভেটের সঙ্গে তৃতীয় স্থানাধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টম বায়ার্স বলেছে যে, ব্রাসেলসে নিজে বিশ্ব নজীর করার জন্য মন না দিয়ে কো-কে সাহায্য করার জন্য এমনভাবে দৌড়ব যাতে ওভেটের রেকর্ড সে ভাঙ্গতে পারে।

২৯শে আগস্ট তারিখে আটচল্লিশ ঘণ্টা মেয়াদ অতিক্রান্ত হতে না হতে সেবাষ্টিয়ান কো, ষ্টিভ ওভেটের গড়া বিশ্ব নজীর ' মিনিট ৪৮'৪০ সেকেণ্ডের থেকে ১ মিনিট '০৭ সেকেণ্ড কম সময়ে দৌড়ে (৫ মি. ৪৭'৩৩ সেকেণ্ডে) বিশ্ব খেতাব ছিনিয়ে নিল। বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইভো ভ্যান ডেম স্মারক প্রতিযোগিতার "গোল্ডেন মাইল" বিষয়ে মাইল-দৌড় বিশারদ কো এই সম্মান অর্জন করে। হেসেল স্টেডিয়ামে কো সীমানা রেখা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে স্কোর বোর্ডে "বিশ্ব রেকর্ড" লেখাটি জ্বলজ্বল করতে থাকে—পঞ্চাশ হাজার দর্শকের অভিনন্দনের সঙ্গে।

গলফ খেলায় প্রশিক্ষণ নিতে তিন উদীয়মান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছে

দিল্লীর অমিত লুথরা ও কলকাতার ব্র্যাগুন ভিস্যুজা এবং বাপ্পি রণধাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গলফ খেলার প্রশিক্ষণ নিতে যাবে। এই তিন উদীয়মান খেলোয়াড় ক্যালিফোর্ণিয়ার টম এ্যাডিসের কাছে প্রশিক্ষণ নেবে। ভারতীয় গলফ ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক গলফ এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হয়েছে।

সুরজিৎ সিং হকি অধিনায়ক হচ্ছে ?

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ইউরোপ সফরকারী এবং এই বছরের শেষে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় হকি দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম আগামী ২রা আগস্ট ঘোষণা করা হবে। অলিম্পিক ফুলব্যাক, পাঞ্জাব দলের সুরজিৎ সিং খুব সম্ভবত ভারতের দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হবে'
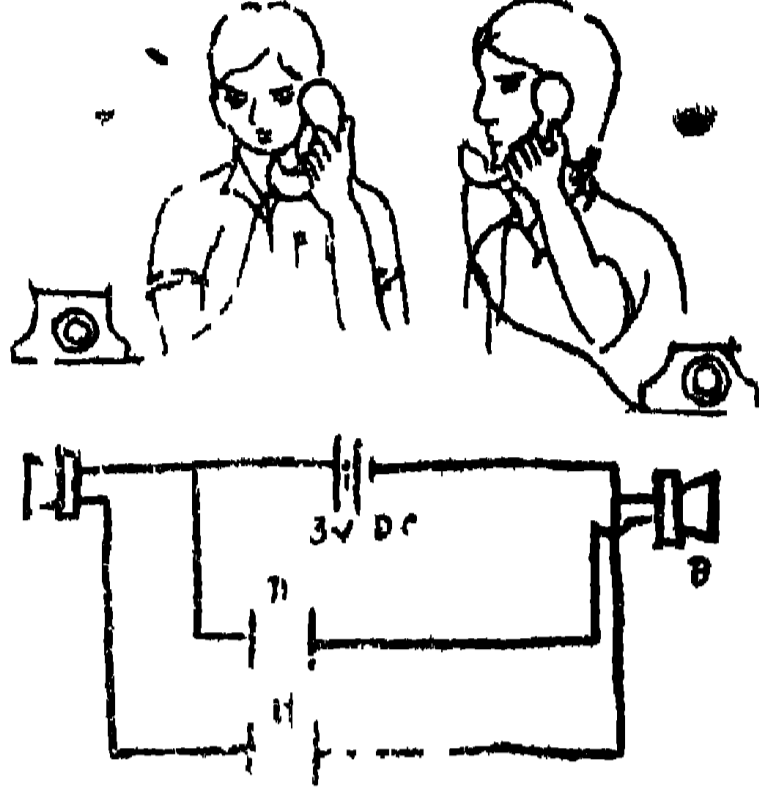
তৈরি কর মজার টেলিফোন

এবার আমরা তৈবি করব মজার টেলিফোন। এই টেলিফোন তৈরি করবার আগে আমরা জেনে নিই, টেলিফোন কি ? টেলিফোন হল এমন এক ধরনের যন্ত্র যার সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের মানুষেরা পরস্পর পরস্পবেব সঙ্গে যোগাযোগ বা কথোপকথন করতে পারে। এই ধরনের যন্ত্রকে বলা হয় টেলি-ফোন। এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা আমেরিকার গ্রাহাম বেল। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন ১৮৭৬ সালে।

এখন আমবা যে মজার টেলিফোন তৈবি করব সেটা তৈরি করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হবে দুটো লাউড স্পীকার। (85·2 Loud speaker), দুটো 1·5 ভোল্টের ব্যাটারী, দুটো ছোট (3 ইঞ্চি) মাপের কাঠ পেন্সিল, চারটে ব্লেড, কিছু তার এবং 3 ইঞ্চি চওড়া ও উচ্চতা এবং 4ইঞ্চি লম্বা একটু মোটা কাগজের বাক্স দুটো।

এখন কি করে তৈবি করবে তাইতো ? আচ্ছা কি ভাবে তৈরি করা যায় তা বলার আগে আমাদের মজার টেলিফোন-এর বর্তনী-টা দেখে নাও।

উপরের ঐ বর্তনীর মত করে আমাদের মজার টেলিফোন তৈরি করতে হবে। বর্তনীর 'A' ও 'B' হল মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোন দুটি কিভাবে তৈরি করবে বলছি। প্রথমে সংগ্রহ করা কাঠ পেন্সিলের শীষ বার করে নাও। এবার সংগ্রহ করা বাক্স দুটিতে ব্লেড এমন ভাবে কেটে বসিয়ে দাও যেন বাক্সের এক পিঠে দুটি ব্লেড এক সমকোণে বসে যায় অর্থাৎ খাড়াভাবে। এবার ব্লেড দুটির গায়ে তার এমন ভাবে বাঁধ যেন তার আলগা না হয়ে যায়। এবার বাক্স ও ব্লেডের সংযোগস্থল আঠা দিয়ে ভাল করে আটকে দাও। ঠিক এই ভাবেই আর একটা তৈরি কর। এবার আর একটা। তৈরি হয়ে গেলেই বর্তনী দেখে সমগ্র যন্ত্রটি তৈরি করে নাও। তৈরি হয়ে গেলে তোমার কোন এক বন্ধুকে ডাক এবং তার কাছে A এবং A 1 (A স্পীকার এবং A 1-মাইক্রোফোন) রাখ। আর তোমার কাছে B এবং B 1 মাইক্রোফোনের সামনে তোমার বন্ধুর নাম ধরে ডাক, দেখ, তোমার বন্ধু তার স্পীকারে (A) তোমার কথা শুনতে পাবে। আর যদি সেও তার মাইক্রোফোনে (A 1)-কথা বলে তুমিও তোমার স্পীকারে (B) তে তোমার বন্ধুর কথা শুনতে পাবে। কি ? খুব মজার জিনিস নয় কি।

ধাঁধা

সন্দীপন চৌধুরী (সভ্য, ৯)

উপরের ছকের যে কোন একটি কাঠি সরিয়ে অংকটির সমাধান কর।

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

৩১৮ টাকা

গত সংখ্যায় দেওয়া তোমাদের ছোট্ট বন্ধুর ধাঁধার উত্তর তোমরা সকলেই দিতে পেরেছ। এজন্য সকলকেই ধন্যবাদ। সকলের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না। উত্তর দেখে মিলিয়ে নাও।

এ সংখ্যায় যাঁরা এঁকেছে

অচ্যুৎ পাল (সভ্য, সিনিয়র), প্রদীপ ভট্টাচার্য (সভ্য, সিনিয়র)।

পূজো এসে গেল। চারিদিকে খুশির মেজাজ। তোমাদের খুশী ও আনন্দ বাড়াতে 'খেয়ালখুশী'ও সেজেগুজে আসছে তোমাদের সামনে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, লেখকরা তোমাদের মনের মত ছড়া, গল্প, কবিতায় সাজিয়ে দিয়েছেন 'খেয়ালখুশী'কে।

তার সঙ্গে ছোট্ট বন্ধুদের বিচিত্র ধরণের লেখাতো আছেই।

Regn. No. WB/EC-179 SEPTEMBER 1981 Re. 1·00

নিয়মাবলী

১. জুলাই মাস থেকে "খেয়াল খুশীর" বছর শুরু। বছরের যে কোন মাস থেকে খেয়াল খুশীর গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে খেয়াল খুশী প্রকাশিত হয়।

২. প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা এবং বছরে ১২ টাকা। সডাক টাকা ১৩·২৫।

৩. খেয়াল খুশীর চাঁদা মানিঅর্ডারে পাঠানো যায়।

৪. গ্রাহক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

৫. ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েরাই লেখা, ছবি, ধাঁধার উত্তর প্রভৃতি সম্পাদিকার নামে খেয়াল খুশীতে পাঠাতে পারবে।

৬. গ্রাহক চাঁদা ইত্যাদি পাঠাতে হবে খেয়াল খুশীর ম্যানেজারের নামে।

৭. অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। যারা লেখা পাঠাতে চাও তারা লেখার একটি নকল রাখবে। লেখা পাঠাবার সময় কাগজের দু'পিঠে লিখবে না। যারা আঁকা পাঠাতে চাও, তারা পেন্সিল স্কেচের উপর "চাইনিজ ইঙ্ক" বুলিয়ে দেবে।

৮. কোন কিছু জানতে চাইলে খেয়াল খুশীর কার্যালয়ে এসে দেখা করতে অথবা চিঠিও লিখতে পারো। চিঠির উত্তর পেতে হলে জোড়া পোষ্টকার্ড অথবা ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

৯. পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশকপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে।

"খেয়াল খুশী কার্যালয়"
১, বিধান শিশু সরণী
কলিকাতা—৭০০০৫৪
ফোন : ৩৫-৮০৮৬

কার্যাধ্যক্ষ

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে শ্রীদুলাল ভৌমিক কর্তৃক ১, বিধান শিশু সরণী কলিকাতা-৭০০০৫৪ হইতে প্রকাশিত ও গ্রাফিকো, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৮১

রূপদান — জীবন পাল

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৬৮৩ (১৬) টি-বি-সি/২এ—৬টি ৭৯, ২৪. ১২. ৮০.

৪র্থ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ১লা অক্টোবর ১৯৮১ ॥ আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮৮
ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা ॥ দাম : এক টাকা
প্রধান উপদেষ্টা : গৌরকিশোর ঘোষ ॥ সম্পাদিকা : ইন্দিরা রায়।

আমাদের কথা □ ২

গল্প □ শাস্ত্র ও শস্ত্র ॥ প্রমথনাথ বিশী ৫ দাদুর দুপুর ॥ শান্তিকুমার মিত্র ৬ একটা স্বপ্নে দেখা গল্প ॥ অরিন্দম ঘোষ ১০ তেপান্তরের পেত্নী ॥ সুদীপ দাস ১৫ বিরলে ॥ কণাদ মল্লিক ২১ এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ॥ অশোককুমার সেনগুপ্ত ২৪ মিনুতার গল্প ॥ চিত্তরঞ্জন রায় ২৮ মায়ের মুখ ॥ সুচন্দ্রনাথ দাস ৩০ মাছেদের দেবতা ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৩৭

প্রবন্ধ □ চরিত্র-বিচিত্রা ॥ সুমথনাথ ঘোষ ৩ আমার দেখা পালামৌ ॥ সুচিস্মিতা গুপ্ত ১২ আন্দামান অভিযানের ডায়েরী থেকে ॥ পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ১৭ প্রকৃতির দুই আশ্চর্য রূপ ॥ শৈলেন ঘোষ ১৯ কুরুক্ষেত্র ॥ সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায় ৩৪ দুর্গা পূজার একটু কথা ॥ চয়ন সমাদ্দার ৪২ মহাত্মা গান্ধী স্মরণে ॥ রুমা রায় ৪৩ বাপুজী ॥ চন্দ্রনাথ রায় ৪৫ তবু যেতে হবে ॥ সিন্ধবাদ ৪৭

কবিতা □ যে বিবি সেই কমলিনী ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ৪ স্বপন বুড়োর ছড়া ॥ স্বপন বুড়ো ৫ ইকড়ির ভাই ছিল ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী ৮ বাস বাস খেলা ॥ রঞ্জন ভাদুড়ী ৯ যাত্রাভঙ্গ ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৯ ছুটি ॥ সৌমেন মুখোপাধ্যায় ১৪ চার ভাই ॥ কৃষ্ণা দে ১৮ পূজো ॥ মধুমিতা মণ্ডল ২০ বিশ্ব-প্রতিবন্ধী-বর্ষের শপথ ॥ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ২৭ বোধন তলায় ॥ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ২৭ দুর্গোৎসব ॥ অর্চনা চক্রবর্তী ৪১ সিপাহী বিদ্রোহ ॥ আবীর দত্ত চৌধুরী ৪১ কালীপূজো ॥ অর্পিতা মজুমদার ৪৪ লিমেরিক ॥ সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত ॥ ৪৪ পূজো আসছে ॥ বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪

উদ্যানের খবর □ ডাঃ বি, সি, জন্মশতবর্ষ কার্যসূচী ৫৩

খেলাধূলা □ ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম জয় ॥ দিলীপ দত্ত ৫১ খেলার খোশ খবর ॥ শ্রীকলমচি ৫২

হাতের কাজ □ ডিমের তৈরি ফুলগাছ ৫৫

ধাঁধা □ ৫৬

প্রচ্ছদ □ পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের কথা

শরৎকাল এসে গেছে। সকালের রোদ্দুরটায় একটু সোনালী আভা আর গাছগুলো কী রকম নতুন সাজে সেজেছে। শীতের পর যখন নতুন গাছে নতুন পাতা বেরোয়, তখন তার একটা শোভা, মানে বসন্ত কালে, কিন্তু এখনকার শোভা অন্যরকম। এ যেন চান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজেরা যেন কোন উৎসবের জন্য তৈরি হচ্ছে। পাতাগুলোসমেত সমস্ত গাছগুলো ধুয়ে যায়, কোথাও কোন ধুলো-বালি নেই। নিজেরা তো সেজেইছে, তারা আমন্ত্রণও পাঠাচ্ছে চতুর্দিকে। আর মাঠগুলো? যা সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়, শুকনো, রুক্ষ, তার যা শোভা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একেবারে সবুজে সবুজ। আবার সেখানে ধানের শীষ বেরিয়েছে, সে নিজের আনন্দে হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাশফুল মাথা উঁচু করে আছে বটে, তবে গর্বোদ্ধত নয়, সকলেই যেন উৎসবের সাজে সেজেছে। আকাশও নীলিমায় নীল—মাঝে মাঝে কতরকম মেঘ। খানিকটা দেখলে মনে হয় পেঁজা তুলো, খানিকটা কালো, আবার সন্ধ্যের কিছু আগে দেখা যাবে লালচে আভা। মেঘগুলো ছুটোছুটি করছে, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ, আর নীচে দিগন্তপ্রসারী সবুজ। এ সব মিশে যে উৎসবের আমন্ত্রণ—তাতে সকলেরই আহ্বান।

এইসব দেখেই মনে পড়ে যায় যে পুজো এসে গেছে। সেজন্যই নাম—শারদোৎসব। অনেকে অনেক রকম করে পুজোর জায়গা সাজায়, কিন্তু, প্রকৃতি যেভাবে সেজে ওঠে, মানুষ তার কাছে পৌঁছতে পারে না। ধর্মানুষ্ঠানকে অবলম্বন করে উৎসব তো অনেক হয়। ঈদ, খ্রীষ্টমাস, বুদ্ধজয়ন্তী আরও সব আছে। তেমনি দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে শারদোৎসব করা হয়। মহালয়ার দিন থেকে উৎসব শুরু হয়, চাঁদ যেমন বাড়তে থাকে, উৎসবের আমেজও তেমনি বাড়তে থাকে, বিজয়ার পর একটু কমলেও গড়িয়ে গড়িয়ে ঠিক লক্ষ্মীপুজো অবধি চলে। এই উৎসবে তোমরা কী করবে? প্রকৃতি যেমন সেজেছেন, তোমরা নিজেরাও তেমনি সংকল্প কর—নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। নিজেদের পড়ার জায়গা, বইপত্র পরিষ্কার রাখবে, শরীরও পরিষ্কার রাখবে, তবেই উৎসবের সঙ্গে সাজা হবে। শুধুমাত্র রঙচঙে জামাকাপড় পড়লেই কী চলবে! গোটা বাড়িটাও যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে আরম্ভ কর, এখন তো ছুটি। বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে পরিষ্কার করা হয়, আর দুর্গাপুজা তো সার্বজনীন—সবাইকার। সবাই গিয়ে তো অঞ্জলি দেবে, সেজন্য সকলের বাড়িই পরিষ্কার রাখা দরকার। এমন সময় কর, যখন ছুটি শেষ হলে বাড়ির সব লোক বলবে, ভাগ্যিস ওরা করেছিল পরিষ্কার। এইভাবেই তো বাড়িতে পুজোর আয়োজন করা হয়। তোমরা ওই যে বলবে বিদ্যা দাও, ধন দাও, যশ দাও আর হিংসা জয় কর। এই যে পুষ্পাঞ্জলি দেবে, তার জন্য তো প্রস্তুত হতে হবে। তার মানে ভাল করে লেখাপড়া করতে হবে। সবচেয়ে বড় ধন মানুষের কাছে মন, যেন সব মানুষকে সমান ভাবে দেখতে পারা যায়, আর যশ হল খ্যাতি প্রতিপত্তি। আর ভাল কাজ করলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়। তারপরেরটা সবচেয়ে ভালো—যেন, দ্বেষ, হিংসা ত্যাগ করতে পারি, জয় করতে পারি। শুধুমাত্র অঞ্জলি দিলেই হবে না, মনে মনে ঠিক করতে হবে। এটাই হোক্ তোমাদের সংকল্প।

চরিত্র-বিচিত্রা (১২)

জনসেবা ও গান্ধীজী

সুমথনাথ ঘোষ

গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজনীতি ও নিজের পেশা ওকালতির মধ্যে ডুবে আছেন তখনই তাঁর মনে এক অদ্ভুত চিন্তা জাগে। কেবল বক্তৃতা দিয়ে দল গঠন করে, মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে কারাবরণ করা যদিও জনসেবা, যা রাজ-নীতির নামান্তর তবু যথার্থ জনসেবা বলতে কায়িক শ্রম দিয়ে নিজে হাতে মানুষের জন্যে কিছু সেবা কর্ম না করলে তাতে পূর্ণতালাভ হয় না বলে তাঁর বিশ্বাস। যেমন বিজ্ঞানের বই শুধু পড়লে চলে না, আবার ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের হাতে প্রমাণ প্রয়োগ করতে না পারলে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, এও অনেকটা সেইরকম। জনসেবা অনেকেই করে, তবে দূর থেকে। আসল জনসেবায় উত্তীর্ণ হতে হলে তেমনি হাতে কলমে কিছু পরীক্ষা দেওয়া উচিত, তা যেমন ভাবেই হোক।

এমনি একটা অনুপ্রেরণা তখন গান্ধীজী অন্তরে উপলব্ধি করেন। তাঁর মনে হ'তো জীবনটাকে সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন বাহুল্য বর্জিত করা উচিত প্রত্যেক মানুষের, বিশেষতঃ ভারতবাসীর। তিনি যে দরিদ্র ভারতবাসীর একজন প্রতিনিধি একথাটা তাঁর মনের মধ্যে থেকে কখনও যেত না।

এমন সময় একদিন এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখিরী তাঁর বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে এল। তাকে তখন কেবল ভিক্ষা দিয়ে তাড়াতে গান্ধীজীর মন চাইল না। কুষ্ঠ ঘা তার সর্বাঙ্গে দগদগ করছে। তিনি তাকে আগে পেট ভরে খেতে দিলেন, তারপরে একটা পৃথক ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে তার ঘা ধুইয়ে পরিষ্কার করে ওষুধপত্র খাওয়াতে লাগলেন।

কিন্তু এভাবে এত কঠিন রোগের চিকিৎসা বাড়িতে রেখে বেশিদিন করা চলে না, তাই তিনি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। এতেও তিনি মনে ঠিক শান্তি পেলেন না। তখন গান্ধীজী ডাঃ বৃলের সেই হাসপাতালে নার্সের কাজ নিলেন। প্রতিদিন বিনা পারিশ্রমিকে দু'ঘণ্টা করে যথারীতি সেই হাসপাতালের রোগীদের সেবা করে বাড়ি ফিরে এসে আবার কোর্টে বেরুতেন, নিজের কাজকর্মে ডুবে থাকতেন।

এভাবে মানুষের সেবা করতে পেয়ে ক্রমশঃ দুঃখ-দুর্দশার প্রতি তাঁর সমবেদনা বেড়ে চলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

গান্ধীজীর মনে এসময় থেকে অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তিনি সব বিষয়ে সংযম পালন করতে থাকেন। সংসারের অনাবশ্যক খরচ কমিয়ে যতটুকু ঠিক জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ যা না হ'লে চলে না, তাই অভ্যাস করেন। এমন কী নিজের জামাকাপড়, স্যুটের কলার পর্যন্ত ধোপার বাড়ি না দিয়ে বাড়িতে সাবান কেচে পরতেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী সব রকমে তাঁকে সাহায্য করতেন। যেমন স্বামী তেমনি তাঁর উপযুক্ত স্ত্রী ছিলেন তিনি।

গান্ধীজীর জীবনের এই পরম মুহূর্তে ইংরেজদের সঙ্গে বুয়োরদের যুদ্ধ বাধল। যদিও গান্ধীজীর মনে সহানুভূতি ছিল বুয়োরদের প্রতি, তবুও বৃটিশপ্রজা হিসেবে তাদের এই বিপদকালে বৃটিশরাজ্য রক্ষা করাই তাঁর ধর্ম। এই মনে করে তিনি তখন যুদ্ধে আহতদের শুশ্রূষা করার জন্য একটি সেবা

দলগঠন করে যোগদান করলেন। এগারোশো সেবক ও তাদের দলনায়ক হিসাবে চুয়াল্লিশজনকে নিয়ে গান্ধীজী যেদিন 'বেডক্রশের' কাজ করতে গেলেন, সেদিন সত্যই ভাবতবাসী সম্বন্ধে ইংরেজদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। তারা এতদিন ভাবত ভারতবাসীরা স্বার্থপর, ভীতু, কোনরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জীবন বিপন্ন করতে চায় না। গান্ধীজী ভারতীয়দের এই অপবাদ সেদিন চিরকালের মত ঘুচিয়েছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রেব বিপদজনক এলাকাব ভেতর থেকেও তিনি আহতদের বহন কবে আনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং সগৌরবে তা পালনও করেছিলেন। কুড়ি পঁচিশ মাইল পর্যন্ত আহতদের বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছিল কখনও কখনও।

এইভাবে ছ' সপ্তাহ ধরে গান্ধীজী তাঁর দল নিয়ে অক্লান্তভাবে সেদিন যে সেবাকার্য চালিয়েছিলেন, তার জন্য চাবদিক থেকে প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি হয় গান্ধীজীব ওপর।

প্রকৃত জনসেবা কাকে বলে এমনি করে নিজের জীবন দিয়ে তিনি বিশ্বমানবের চোখের সামনে একদিন যে আদর্শ তুলে ধবেছিলেন, আজও সেখানে তিনি একক, অনন্যসাধারণ মানুষ হয়েও মহামানব।

যে বিবি সেই কমলিনী

(দু'টি ছড়া দৌহিত্রীকে নিয়ে)

সন্তোষ কুমার ঘোষ

১. নাম হলই বা চটকদাব চক্রবর্তী কমলিনী
হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমি যে! একটুও নন সরল ইনি
এই ভাব্ তো মর্জিমাফিক ওর সঙ্গে এই আড়ি
রঙের দেমাক! মানছি বাপু, তা অবিশ্যি ফেয়ার-ই।
চোখ দুটিও আকাশ থেকে উপড়ে আনা নীলোৎপল
কিন্তু নাকটা? ফ্ল্যাট হাই-ওয়ে—ডিমাপুর টু ইমফল!

২. মিস বিবি ঠোঁট ঠেকিয়েই বুক বেঁকিয়ে
বলে ওঠে "কী বিচ্ছিরি! খাবার কিএ?"
কাচুমাচু ছোটেন তিনি, যিনি হলেন Mrs.
ধুয়ে মুছে রাখেন "বৌল্", তাকে তোলেন ডিশেজ।
বাবা, যিনি থিসিস লিখে হলেন বলে Dr.
বলেন "ওটা স্রেফ চাইল্ড'স্ প্র্যাংক, নয়কো কোনো ফাক্টর।"

শাস্ত্র ও শস্ত্র

প্রমথনাথ বিশী

কোন গ্রামে একটি লোকের সুন্দর ফলের বাগান ছিল। তাতে ঋতু ভেদে নানা রকম উপাদেয় ফল ধরে থাকত। দুঃখের বিষয় বাগানটা ছিল ঠিক একেবারে পথের ধারে। পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই সেইসব ফল দেখে লুব্ধ হলেও কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না। সবাই জানত যে বাগানের মালিক এক বদরাগী দুর্দান্ত পণ্ডিত। কিছুকাল পরে সেই গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল ছাত্ররা সেই পথ দিয়ে যাতায়াত সুরু করল ফলের বাহার দেখে তারা লোভ সংবরণ করতে পারল না। বাগানে ঢুকে পড়ে কেউ বা গাছে উঠল, কেউ বা নীচ থেকে কুড়োতে লাগল। এমন সময় এক প্রবীণ ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল ছাত্রদের সতর্ক করে দিয়ে বলল, শীগগির পালাও। বুড়ো দেখতে পাবলে লাঠি হাতে তাড়া করে আসবে। বলা বাহুল্য ছাত্ররা সে কথায় কর্ণপাত করল না। কিছুক্ষণ পরেই তাদের দেখতে পেয়ে পণ্ডিত সেখানে এসে উপস্থিত হল। তবে তার হাতে লাঠির বদলে ছিল লাঠির চেয়েও মোটা একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ।

ছাত্রদের ফল পাড়তে বা ফল কুড়োতে নিষেধ করল না সে, কেবল তাদের উদ্দেশ্যে সন্ধি-সমাস বহুল দুবোধ্য শব্দ সমন্বিত বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক প্রয়োগ করতে লাগল। ছাত্ররা প্রথমে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করল, তারপর ফল পাড়া, ফল কুড়ানো বন্ধ করল এবং সন্ধি-সমাস কণ্টকিত শ্লোকের আঘাত সহ্য করতে না পেরে সংগৃহীত ফল মূল ফেলে দিয়ে সকলে সবেগে প্রাচীর টপকিয়ে পলায়ন করল। তারপরে তারা আর কখনই সেই পণ্ডিতের বাগানে প্রবেশ করেনি।

যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পমাণ হয় যে শস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্র অধিকতর ফলপ্রদ।

স্বপন বুড়োর ছড়া

স্বপন বুড়ো

হাসি আর খুশী দিয়ে ভরা মুখগুলি
রোজ ভোরে ডাকে মোরে কচি হাত তুলি।

তাহাদের কলরব ভাসে বাতাসে—
তাহাদের মিঠে গান জাগে আকাশে!

তারা হাসে, তারা গায়, তারা নাচে গো -
ওদের না পেলে মোর প্রাণ বাঁচে গো?

ধরাধরি করে হাত সবাসরি আয়
সবাকার কাছে এরা ভালোবাসা চায়।

যত কিছু খুনসুটি তাদের সাথে--
সকাল-বিকাল তারা খেলায় মাতে।

ফুল তুলে গান গেয়ে মিটি মিটি চায়—
আনন্দ বয়ে আনে মোদের ধরায়।

হাসি আর খুশী দিয়ে ভরা সব মন
স্বপন বুড়োর জাগে প্রীতির প্লাবন॥

দাদুর দুপুর

শান্তিকুমার মিত্র

'দাদু, তুমি কাঁদছ?'

'হুঁ, বাবু সোনা, মা যে বকল'।

'মা তো বোনটিকে আনতে স্কুলে গেছে, মা আবার কখন তোমার ঘরে এল?'

'দূর পাগল, তোর মা বকবে কেন? আমিই বকে দেব না? আমার মাকে, আমার মা খুব ধমক দিল।'

নাতি বণ্টু খুব মজা পেয়ে যায় দাদুর কথা শুনে। এই দুপুরে আর বেরোবে না। মা ফিরে তাকে দেখতে না পেলে প্রচণ্ড রেগে যাবে। বিকেল হোক, পরিমল আসবে, তখন মাঠে যাওয়া যাবে, তা দাদু এখন ঘোরে আছে, দাদুকে উস্কে দিয়ে গল্প বের করা যাক।

বণ্টু দাদুর গা ঘেঁসে বসে, আচ্ছা দাদু, তুমি মাঝে মাঝে বুঁদ হয়ে কী ভাব বল তো? এই যে বললে তোমাকে তোমার মা বকল, 'তোমার মা তো কবে মারা গেছে।'

'তা তো গেছে। বাবু সোনা, এই হল তোমার জগতের সঙ্গে আমার জগতের তফাৎ। তোমার জগৎ বর্তমান, ভবিষ্যতকে নিয়ে, আমার জগৎ অতীতে। মাঝে মাঝে যেন সব স্পষ্ট দেখতে পাই। কখনও ভাল লাগে কখনও কান্না আসে, সব মানুষেরই একটা স্মৃতির জগৎ থাকে। তুমি বড় হও, তখন তোমারও সে জগৎ হবে। তা ছাড়া কী জান বাবু সোনা, বুড়ো হাড়ে এ জগৎটা বড় নির্মম লাগে। সব বুঝতেও পারি না। তাই ক্ষণে ক্ষণে আমার পুরোন জগতে পালিয়ে যাই। চুপি চুপি একটা কথা বলি, তখন মানুষের মনে অগাধ ভালবাসা ছিল। দাদু একনাগাড়ে বলে থামেন। আবার যেন ঘোর লাগে তাঁর।

বণ্টুর সেই মজা করার মনোভাবটা যাদুমন্ত্রে যেন কেটে গেছে। একটা অদম্য কৌতূহল তাকে ঠেলা দিতে থাকে। বণ্টু দাদুর হাঁটু ধরে নাড়া দেয়, ও দাদু, তোমার মা কেন বকল বললে না তো?

দাদু সজাগ হয়ে ওঠেন, শুনবি বাবুসোনা, কী কাণ্ড ঘটেছে? তা হলে শোন, এই এমনি দুপুর। তুই-ই বল, ছুটির দুপুরে ঘরে থাকতে মন চায়? তুইও তো হরদম পালাস। তা তোরা আর কোথা যাবি? বড় জোর ট্রামে ট্রামে ঘুরবি, না হয় পার্কে গাছতলায় বসে গল্প করবি। যাক, আমার কথা বলি। মফঃস্বল শহরে তো থাকতাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা দোতলা ভাড়া বাড়ি। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল দে বাবুদের বাগান। আম, জাম, কাঁঠাল গাছে মেশামেশি গলাগলি। ওদের বাড়ির পচা, ফটিক ছিল আমার সহপাঠী। বেশ বড়সড় পুকুরও ছিল। এখন? দূর পাগলা, সে সব কী আছে? তখন তোর মায়ের সবে বিয়ে হয়েছে। শ্রীরামপুর কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেই পুরোন পাড়াটা খুঁজতে গিয়েছিলাম। সে সব কোথায় কী! আমাদের সে বাড়িটার জায়গায় নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি। সে বাগানের চিহ্নমাত্র নেই। সেখানেও দোতালা, তেতালা সব বাড়ি। সবুজ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাক্,

সেদিনটার কথা বলি। গরমের ছুটি। মা রোজই একটু গড়িয়ে নিত। আর আমিও সেই ফাঁকে বাড়ি থেকে পালাতাম। আমাদের একটা ইশারা ছিল। পচা জাম গাছে উঠে কোকিল ডাক ডাকত। দুপুরে কোকিল তেমন ডাকে না, অত সব খেয়াল ছিল না। নীচের সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেতাম। তখন অত ভয় ছিল না, যে কেউ বাড়িতে ঢুকে চুরি করে নিয়ে যাবে। তা সেদিনও একই ব্যাপার ঘটেছিল। আমরা তিনজনে পেট ভরে জাম খেলাম। তারপর ফটিকই মতলব দিল, অ্যাডভেঞ্চারে যাবি? কোথায়? কোথায়? না গঙ্গার ধারে একটা ভাঙা সাহেব কুঠি রয়েছে। সেখানে একটা কাঁচা মিঠে আম গাছ আছে। পচা একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল, নদাইদা বলেছে ও বাড়িতে বড় বড় সাপ আছে। ফটিক সে কথা উড়িয়ে দিল। তারপর তিন কিশোর আমরা অ্যাডভেঞ্চারে রওনা হলাম। গাছের ডাল ভেঙে লাঠি করা হল। বুনো গাছগাছড়ায় কুঠির উঠোন দেখা যায় না, দেওয়াল ফুঁড়ে নিম গাছ, অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে। ছাদে ওঠবার সিঁড়ি ভাঙা। যদি সাপ থাকে, হাট হাট করতে করতে ছাদে উঠলাম, ছাদের সিঁড়ির ছোট্ট ঘরটা তখনও অটুট। ছাদে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখলাম অনেকক্ষণ। ঘেমে সেই চিলতে ঘরে এসে দাঁড়ালাম। একদিকে ডাঁই করা কাগজপত্র বই! ফটিক বলল, দাঁড়া একটা আবিষ্কার করি, ও সেই স্তূপ ঘেঁটে একটা ফাটা কাঁচের বাঁধান ছবি বার করল। একটি মেম মেয়ের ছবি। একেবারে ঠিক জীবন্ত। আমি বললাম, দেখছিস ফটকে, মেয়েটা আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। পচা একটু কাঠগোঁয়ার। ও কিন্তু কেমন ভয় পেয়ে গেল, বলল, রেখে দে, রেখে দে, সাহেবের মেয়ে হবে হয়ত, সাহেব ঠিক গোড় থেকে দেখছে, উঠে আসবে। কী দরকার বাপু! ছবিটা দেখে আমার মনটা কেমন ভালোলাগায় ভরে গেল। তা ফটিক পেয়েছে, আমি আর চাই কী করে? ফটিক পচাকে ধমকে উঠল, যত সব গাঁজাখুরি কথা। বমু, তুই বরং ছবিটা তোর কাছে রাখ, আমি গিয়ে গিয়ে দেখব। আমাদের বাড়ি নিয়ে পচা আবার মা দিদিমার কাছে কাহিনি গাইবে। আমি তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম।

সেদিন বাড়ি ঢুকতে গিয়ে পড়বি তো পড় মায়ের সামনে। চোরার মুখেই নিচে বল। তখন জল এসে গেছে। কমলাদি বোধ হয় কাজ করতে আসেনি। মা নিশ্চয়ই জল পড়ে যাচ্ছিল বলে কল বন্ধ করতে এসেছিল। যতই লুকোবার চেষ্টা করি, মা খপ করে ছবিটা কেড়ে নেয়। সাহেব কুঠি থেকে একটা ময়লা খবরের কাগজ জড়িয়ে নিয়েছিলাম। মা কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমায় নিয়ে পড়ল, এই হচ্ছে দুপুরে। কোনও গুণেরই শেষ নেই দেখছি। চুরি করতেও শিখেছ। তা কোথা থেকে ছবি চুরি করা হল? এ ছবি ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। যতই বলি চুরি করিনি, সাহেব কুঠিতে জঞ্জালের মধ্যে পড়েছিল, মা ততই রেগে ওঠে, মা রাগলে যা কাণ্ড করে, কী বলব? মা যখন বকাবকি, সঙ্গে সঙ্গে কিল চাপড় মারতে শুরু করেছিল, তুই তখন ঢুকলি।

বল্টু বিহ্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার কৌতূহল বাধা মানে না। জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা দাদু, সে ছবি তুমি আবার সাহেব কুঠিতে রেখে এসেছিলে? দাদুর ফোকলা মুখ হাসিতে ভরে ওঠে, দূর পাগলা! মা এরকমই। সন্ধ্যেয় যা কুলপি বরফ তৈরি করে খাওয়াল—ওঃ বাবু সোনা, তোমরা আবার আইসক্রিমের

ভক্ত, আমাদের সময় কুলপি বরফ ছিল পুরস্কার, তা মা তো ফেরিওয়ালার কুলপি খেতে দিত না, নিজেই তৈরি করত, টিনের ছাঁচ ছিল, সেই সঙ্গে ছবিটা ফেরত দিল, দেবকন্যার মত, ভাল করে রেখে দিস্।

দাদু মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

রন্টুর মনে ঔৎসুক্য তখন মেটেনি, দাদু ছবিটা আছে?

আছে বৈকি বাবু সোনা, দাদু রহস্যহাসি হাসে। কোথায় কোথায়, রণ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ে এই মনের ভেতর রে বাবু সোনা। দুপুর দুপুর তুই যখন পালাস, পায় দুপুর আমি ছবিটা খুলে বসি, বড় ভালো লাগেরে, ভালো লাগেরে।'

ইকড়ির ভাই ছিল

পূর্ণেন্দু পত্রী

ইকড়ির ভাই ছিল
তার নাম মিকড়ি
কালিয়া পোলাও নয়
ভালোবাসে চিংড়ি।
মিকড়ির ভাই ছিল
তার নাম মাকড়া
চিকেনে অরুচি তার
খায় শুধু কাঁকড়া,
মাকড়ার বোন ছিল
তার নাম মাকড়ি
শাড়ি বা ম্যাক্সি নয়
ভালোবাসে পাগড়ি।
মাকড়ির ছেলে ছিল
তার নাম মুড়কি
গাড়ি নয় ঘোড়া নয়
কেনে শুধু সুরকি।
মুড়কির ছোট বোন
তার নাম ঝুমকি
হাসে না সে কাঁদে না সে
শুধু দেয় হুমকি।
ইকড়ির—মিকড়ির
মাসি ছিল ইড়মি
কেউ যদি ছড়া কাটে
তক্ষুনি ভির্মি।
ইকড়ির মিকড়ির
পিসি ছিল মিড়িকি
নাচ—গান শুনলেই
মেজাজটা তিরিখি।

বাস বাস খেলা

রঞ্জন ভাদুড়ী

বাস ছুটেছে খুব জোরে
টিকিট কেটে নাও সবাই,
পৌঁছে দেবে দোরগোড়ে —
এমন সুযোগ আর কী চাই ?

*

এ-বাস যাবে সবখানে—
চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ—
কোথায় তোমার মন টানে
জাদুঘর না জাহাজঘাট ?
বিধান শিশু উদ্যানে ?
ফেরার পথে পরেশনাথ ?

*

ড্রাইভারকে দিই সাবাস—
বাচ্চারা সব চোখ ঢাকো,
ঝড়ের বেগে ছুটছে বাস—
ভিতর দিকে হাত রাখো।

*

এ-বাস যাবে সবখানে,
টিকিট কেটে নাও সবাই—
যেথায় তোমার মন টানে
নামিয়ে দেব সেথায় ভাই।

যাত্রাভঙ্গ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এক-এক জনের এক-এক রকম
বায়না।
রাম যেতে চায় দিল্লি, শ্যাম তা
চায়না।

বোম্বে যেতে যত্নর ইচ্ছে
মধুর ইচ্ছে মদ্রদেশে
ঘুরবার।

যে যাই বলছে, শিলং কিংবা
আগ্রা,
অন্যজনে অমনি দিচ্ছে
বাগড়া।

নবীন বলে, ঝগড়াঝাটির
শাস্তি
এই যে, তোদের কোথাও যাত্রা
নাস্তি।

একটা স্বপ্নে দেখা গল্প

অরিন্দম ঘোষ সভ্য, ১৪।

এক রাজ্য ছিল
সাত সাগরের পারে
তেপান্তরের ধারে
নাম তার অচিনপুর
সেথায়,
ভালুক হলেন মন্ত্রী
আর ব্যাঘ্র সেনাপতি
তারি মাঝে রাজ্য চালান
সিংহ মহামতি।
সেখানে মানুষের প্রবেশ নাস্তি,
(তারা) ঢুকলেই পাবে কঠিন শাস্তি।

যাই হোক কোনরকমে প্রহরী কুকুর দুটোকে মাংসের টুকরো ঘুষ দিয়ে ভেতরে ঢুকে শেয়াল পণ্ডিতের পুঁথি থেকে গল্পটা 'খেয়াল খুশীর' জন্য চুরি করে এনেছি।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। পশুরাজ্যে হাহাকার। কোনো জায়গায় এক ফোঁটা জলের দেখা মিলছে না। রাজ্যের নদী নালা, পুকুর সব শুকিয়ে গেছে। একমাত্র নদী হচ্ছে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ওপাশে। সেইখান থেকে তো আর জল এনে খাওয়া যায় না।

যাই হোক এই অবস্থায় একদিন শিয়াল পণ্ডিত পাঠশালা চালাচ্ছেন। তখন হঠাৎ একটা মৌমাছি কোথা থেকে উড়ে এসে বলল, 'শেয়াল পণ্ডিতকে রাজা মশাই-এর তলব।' শুনেই শিয়াল পণ্ডিত তাড়াতাড়ি পাঠশালার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। 'ছুটি, ছুটি, আজ ছুটি। আসল কথা কি জান— শেয়াল পণ্ডিত দুটো পেল্লায় জালা ভর্তি জল পাঠশালার এক কোণে লুকিয়ে রেখেছিল আর তার থেকে একটু একটু করে খাচ্ছিল। রাজার কাছে গিয়ে সে দেখে, সিংহমশাই-এর গোঁফ ঝুলে পড়েছে। ভালুক মশাই আর ব্যাঘ্র মশাই বসে ঝিমোচ্ছেন। পাহারাদার নেকড়েগুলো গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তাকে দেখে সিংহের ঝোলা গোঁফ সোজা হয়ে গেল। অন্যরাও আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। শেয়ালকে তাড়াতাড়ি বললেন, ওহে পণ্ডিত,

জলের অভাবে
প্রাণধারণ দুষ্কর,
উপায় একটা কিছু
করহ সত্বর।
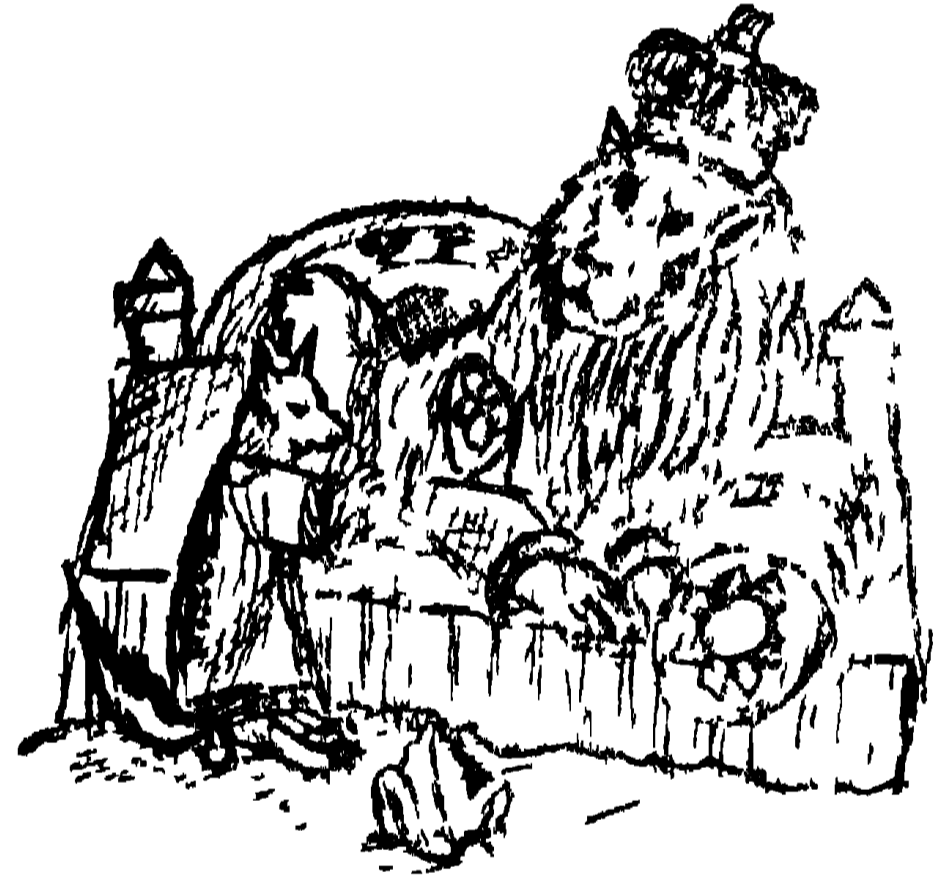
শেয়াল আভূমি নত হয়ে একটা কুর্নিস করে বললে,

সেবক থাকিতে তব
দ্বারে দাঁড়াইয়া,
কেনই বা ক্লেশ পান
মিথ্যা ভাবিয়া।
সঙ্গে পেয়ে বন্ধুবর
ভেক মহাশয়,
অচিরেই কার্যোদ্ধার
হইবে নিশ্চয়।

তখন শেয়াল ব্যাঙকে নিয়ে চলল সেই তেপান্তরের ওপারের সেই নদীর দিকে। দেশের পশুরা ত্রিকূট পাহাড়ী মহাজ্ঞানী কচ্ছপের কাছে গেল শেয়ালের অভিযানের ফল কি হবে জানতে। অনেক ডাকাডাকির পর একটু ঘাড় বাড়িয়ে কচ্ছপ বললে,

জল জল করে কেন কর কলরব,
ঈশ্বরের নাম লহ, শান্তি পাবে সব।

বলেই আবার ধ্যানমগ্ন হল, পশুরা সব বলাবলি করতে করতে গেল—একদিন ওই বুড়োটাকে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দেব।

ওদিকে শেয়াল নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছে সে চুপিচুপি ব্যাঙকে বলল, তুই চুপ করে এইখানে মড়ার মত শুয়ে থাক। একদম নড়বি না।

নদীকে সে বললে—

'নদী দিদি, নদী দিদি মনটা তোমার বড্ড ভাল,
এমন মিষ্টি জল আর, কোথায় আমরা পাব বল।'

নদী বলল —বেশ, বেশ, বাছা তোমরা কোথা থেকে আসছ।

শেয়াল বলল, –

তেপান্তরের ওপারেতে সে দেশ সুদূর,
পশুদের রাজ্য সেথা, নাম অচিনপুর।

নদী বলল—বাবা, কি জন্যে এদেশে এসেছ? কি চাই তোমাদের আমার কাছে?

শেয়াল বলল,—

অল্পই প্রার্থনা মোর বেশি কিছু নহে,
এক অঞ্জলি জল দাও ভেক মহাশয়ে।
তা না হলে জলের অভাবে ও মারা যাবে।

নদী বললে, 'তথাস্তু'।

যেই না বলা শেয়াল অমনি ব্যাঙের পা ধরে নিয়ে যেতে থাকল, নদী পড়ল বিপদে। ব্যাঙকে জল দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তো আর জল না দিয়ে পারে না। তাই সেও তাড়াতাড়ি ব্যাঙকে ধরবার জন্য শিয়ালের পিছু নিল। এই বুঝি ধরল, না অমনি শেয়াল সরিয়ে নিল ব্যাঙকে। আবার নদী ছুটল পিছনে। এবার বুঝি ধরে ফেলে আর কি, না। আবার শিয়াল সরিয়ে নিল ব্যাঙকে। এরকম করে তারা এসে পড়ল অচিন-পুরের সীমানায়। নদী বয়ে চলতে লাগল। আস্তে আস্তে ভরে উঠতে লাগল খাল। একটা একটা করে পুকুর ভরে উঠল। শুকিয়ে যাওয়া নদীটাও জলে টইটুম্বুর হয়ে গেল, তখন আর কি।

পশুরাজ্যে কলরব, আনন্দ অপার,
চতুর্দিকে শৃগালের জয়জয়কার।

সাতদিন সাতরাত চলল উৎসব,
জল পেয়ে শান্ত হয়ে তুষ্ট হল সব।

শুচিস্মিতা গুপ্ত (সপ্তম, সিনিয়র)

বাদল বাউল নিল ছুটি আর সেই সঙ্গে ছুটি পেলুম আমরাও। আশ্বিনের আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা। পূজোর আগমনী শুনতে পাচ্ছি।

এমনি এক মঙ্গলবার ভোরে পৌঁছলুম রাঁচীতে। স্টেশন থেকে রওনা হলুম নাগরা টোলির পথে তখনও শহরের ঘুম ভাঙ্গিনি। ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়ায় ঘুম ঘুম চোখে রাঁচীর সঙ্গে পরিচয় হল।

তার পরদিন থেকেই শুরু হল আমাদের রাচী পরিক্রমা। প্রথমেই গেলুম মোরাবাদী পাহাড় তার ওপরে বিশ্বকবির দাদার বাড়ি। পাহাড়ের চূড়োয় সুন্দর একটি বাধানো বেদী— তারই ওপর বসে বিশ্বকবি অনেক গান ও কবিতা লিখেছেন। চারিদিকেই এক মনোরম পরিবেশ, কাছে দূরে, ছোট বড় নানান পাহাড়—রাঁচী হিল, কাঁকে ড্যাম সবই দেখতে পেলুম। অদূরেই প্যারেড গ্রাউণ্ড—'দসের'তে রাবন বধ অনুষ্ঠান হয় সেখানে। সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলুম রাচী-হিল। সেখানে আছে একটি শিব মন্দির। মোরাবাদী পাহাড়ে দেখেছি অসংখ্য বড় বড় পাথর। রাঁচী হিলে কিন্তু তেমন বড় পাথর নেই, গাছের সংখ্যাই বেশি, পাহাড় থেকে নেমে এসেই রাতু রোড। এখানেই রাঁচীর বাস ষ্ট্যাণ্ড ও আকাশবাণী ভবন। এসব দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম টুরিষ্ট অফিসের খোঁজে, বিদেশ বিভুঁইয়ে পথ চলতে পথ নির্দেশক হ'ল টুরিষ্ট অফিস। সেখানে গিয়েই ছকে বেঁধে নিলুম আমাদের পালামৌ ভ্রমণসূচী।

নেতারহাটের রিজার্ভেশান হল—দুদিন পরেই যাওয়া। মাঝখানে তাই দেখে নিলাম কাঁকে ড্যাম, পাগলা-গারদ, আনন্দময়ীমার আশ্রম, রাঁচী-মেডিকেল কলেজ, কাঁকে ড্যাম যাওয়ার পথটা কি সুন্দর। পাগলা-গারদে পাগলারা যে ছাড়া থাকে, আদৌ জানা ছিল না, ভেতরে ঢুকে তাই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকলুম। সেই সুযোগে একটা পাগল এসে আমার পিঠে দিল এক ঘা, কি বিপদ! প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারলে রক্ষে পাই তখন। মেডিকেল কলেজ যাওয়ার রাস্তাটিও ভোলা যায় না, এত সুন্দর। তবে আদিবাসীদের দাক্ষিণ্যে কলেজটি আর পরিচ্ছন্ন নেই।

এর পরেই চলে গেলুম নেতারহাট। ডিজেলের অভাবে বাস ছাড়তে বেলা প্রায় **২টো** বেজে

গেল। 'সানরাইজ' ও 'সানসেট' দেখতেই সকলে নেতারহাট যায়, কিন্তু দেরিতে বাস ছাড়ার দরুণ পৌঁছে সান্‌সেট দেখতে পাব কিনা—এই সংশয় সকলের মন ছেয়েছিল। রাতু রোড ধরে রাতু রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভেঙে ভেঙে যাওয়া। পথের দু পাশে বড় বড় গাছের সারি এক-টানা চলে গেছে, পথে কোথাও হাট বসেছে, আদিবাসীরা সওদা করতে এসেছে। মনে পড়ল সঞ্জীব চন্দ্রের 'পালামৌতে' পড়েছি "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। কুরা অবধি পৌঁছে রাস্তা দুভাগে এগিয়েছে, একটি সোজা খাড়া উঠে গেছে নেতারহাট পাহাড়ে, অন্যটি গেছে ডালটন্‌গঞ্জের দিকে। পাহাড়ের পর পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট বেশ কয়েকটি নদী ও ঝোরা, শালবনের ছড়াছড়ি—এই সব নিয়েই পালামৌ। আমাদের বাস প্রচণ্ড গতিতে খাড়া উঠেছে। গাছের ফাঁকে সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। পাহাড়ের ঢাল দেখে ভয় হয়, তেমনি পটু ড্রাইভার। নেতারহাট পৌঁছেই বাস ছুটল সূর্য অস্ত দেখার নির্দিষ্ট জায়গা—ম্যাগ্‌নেলিয়া পয়েন্টে। অল্পক্ষণের জন্য দেখতে পেলুম সেই অপরূপ দৃশ্য, ফেরার পথে দেখলুম, মাঠ ভর্তি হলদে ফুল, ঠিক যেন সরষে। গাইড বলল, সারগুজাক্ষেত, অদূর ভবিষ্যতে কাছেই হবে নেতারহাট এয়ার পোর্ট। ফুটবল খেলা হচ্ছে দেখতে পেলুম, খেলছিল স্কুলের ছেলেরা। নেতারহাট স্কুল বিহারের একটি সেরা প্রতিষ্ঠান। পরদিন সূর্য ওঠা দেখে বেরিয়ে পড়লুম সেই স্কুলটির উদ্দেশে। শালবনের মধ্যে দিয়ে পথ। স্কুলের সামনের রাস্তা জুড়ে পাইনের সারি। স্কুলের সাজান সুন্দর বাগানে থানা ফুল ফুটে আছে, সেই স্কুলের একটি প্রাক্তন ছাত্রীর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ আলাপ জমে উঠেছিল। তাদের বাড়িতে পরম আদর-যত্ন ও আতিথেয়তা পেয়ে মনটা ভরে গেল, তার কাছেই শুনলাম, 'নেতার' মানে হ'ল বাঁশ তবে এখন বাঁশের তুলনায় শাল গাছই বেশি। এখানে জন-মনিষ্যি খুবই কম। যারা আছেন, অন্ধকার নেমে এলে তাঁরাও ভালুকের ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোন না। আমরাও তাই দিনের আলো থাকতে থাকতেই ঘরে ফিরতুম। নেতারহাটে দোকানপাট একেবারেই নেই, হাট বসে সপ্তাহে মাত্র একটি দিন। চারিদিকে পথের দুধারে ঝাউ ও শালবন, পেয়ারা বাগান, হলুদ রঙের ঘৃত কুমারী ফুলের অজস্র গাছ, নেতারহাট স্কুল, কিছু কিছু বসতি এবং কয়েকটি হোটেল এই নিয়েই নেতারহাট টুরিষ্ট বাংলো থেকে চোখে পড়ত পাহাড়ী নদী কোয়েল বয়ে চলেছে। কোয়েলকে দূর থেকেই দেখেছি, কাছে যেতে পারিনি। পূজোর প্রথম দিনটি নেতারহাটেই কেটেছে। নির্জন পরিবেশে মায়ের মূর্তি, মাদলের সুরে ঢাকের বাদ্যি মনে এক স্বতন্ত্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল।

নেতারহাটে বনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরই বেতলার জঙ্গল দেখতে যাওয়ার ইচ্ছেটা হল প্রবল। তাই পূজোর বাকী কটা দিন রাঁচীতে কাটিয়ে ডালটনগঞ্জ হয়ে আমরা চলে গেলুম বেতলা। জঙ্গলে ঢোকার আগেই দেখে এলাম একটা দুর্গ ও tree house গাছের উপরে ছিমছাম সাজানো গোছানো একটি বাড়ি। সেদিন ছিল লক্ষ্মী পূর্ণিমা। চাঁদের ও সার্চ লাইটের আলোয় দেখলুম অসংখ্য হরিণ হায়না বুনো মোষ, খরগোস। নিজেদের একান্ত আপন পরিবেশে আনন্দে বিরাজ করছে। কিন্তু আমাদের এমনই মন্দভাগ্য যে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও বেত্‌লার বিখ্যাত হাতীর দেখা আমরা পাইনি, যদিও অনেক উপড়ে ফেলা গাছ দেখে তাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলুম। ডালটনগঞ্জ

থেকে ভোর রাত্তিরে রওনা হয়ে রাঁচী ফিরে সেদিনই চলে গেলুম জোনা ও হুড্রু ফলস দেখতে। জোনার বর্তমান নাম গৌতমধারা। বড় বড় পাথরের ধাপ চলে গেছে জল প্রপাতের দিকে। হুড্রুর জলধারা থেকে এখন তৈরি হয় জলবিদ্যুৎশক্তি। তাই হুড্রু নাকি তার আগের সৌন্দর্য অনেক হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের ভ্রমণসূচীর শেষে ছিল রাজরুপ্পা ও হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক। হাজারীবাগ রোড ধরে রামগড় হয়ে গেলুম রাজরুপ্পা। এ সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। দুধারে বড় বড় গাছের সারি ছায়ায় ঢেকে রেখেছে যাওয়ার পথটি। রামগড় পেরিয়ে উঁচু নিচু পাহাড় বেয়ে বাস্ চলল। পথে রাজরুপ্পা কয়লা খনিটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। রাজরুপ্পায় আছে ছিন্নমস্তার মন্দির। মন্দিরের সেবাইত বাঙালী, শুনলুম, আমাদের কালীঘাটের পুরোহিতদের বংশধর তিনি। সামনেই বয়ে চলেছে দামোদর নদ। পাথর ভেঙে তারই উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এসে মিশেছে পাহাড়ী নদী ভেরা। নদী দুটির সঙ্গম বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে চলেছে নদীর খরস্রোত। মনোরম সে দৃশ্য। এরপর আমাদের হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক যাওয়ার পালা। একে একে ছাড়িয়ে এলাম হাজারীবাগ অঞ্চলের ছোট শহর কুজু, মাণ্ডু। পেরিয়ে এলাম পাহাড়ী নদী বাঁকা। পাহাড়ের চুড়োয় তখন অস্তগামী সূর্য। ন্যাশনাল পার্ক পৌঁছতে বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেল। গাড়িতে স্পট লাইট লাগিয়ে আমরা ঢুকলাম জঙ্গলে। প্রথমেই চোখে পড়ল বনের পরিবেশে একটি সম্বর পরিবার। দু'একটি হরিণ ও খরগোস দেখতে পেলুম। এছাড়া তেমন কিছু আর দেখতে পাইনি। হাজারীবাগ ঘুরে সেদিন রাঁচী ফিরেছি অনেক রাতে। পরে রাঁচী থেকে একদিন গেলাম রাঁচীর ধুরুয়ার হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং এলাকা দেখতে। কাছেই জগন্নাথপুর পাহাড়, পুরীর মন্দিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছে পাহাড়ের ওপর মন্দির। সেখানে দাঁড়িয়ে রাঁচীকে আবার দুচোখ ভরে দেখলুম। সুবর্ণরেখাকে বয়ে যেতে দেখেছি দূর থেকেই।

একটি একটি করে আমাদের রাঁচীর দিনগুলো ফুরিয়ে এল। প্রকৃতিকে এত কাছ থেকে এমন প্রাণ ভরে আর কখনও দেখিনি। তাই মনের পটে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার দেখা পালামৌ।

ছুটি

সৌমেন মুখোপাধ্যায় (সভ্য, ১০

ছুটি, ছুটি, ছুটি
আসছে পুজোর ছুটি।
আমোদ আর আহ্লাদেতে
সবাই মোরা জুটি।
আসছে কাকা আসছে মামা—
নিয়ে সাথে নতুন জামা।
যেমন খুশি দিচ্ছে এনে
নিচ্ছি আমি খুশি মনে।

তেপান্তরের পেত্নী

সুদীপ্ত দাস (সভ্য, ১৪)

আমাদের পাড়ায় একজন ভদ্রলোক এসেছেন। শুনলাম এককালে তিনি নাকি একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন। একদিন আমরা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি তো সাংবাদিক, বিভিন্ন জায়গায় খবর জোগার করাই তো আপনার কাজ। ভূতের খবর জানা থাকলে আমাদের বলুন। শুনে উনি হেসে বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের আজ একটা সত্যি ভূতের কথাই বলব। কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আচ্ছা তোমরা কেউ ক্ষিতিশগঞ্জের নাম শুনেছ? আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। শিবু বলল, "আচ্ছা সুন্দরবনের কাছাকাছি কোন জায়গা, কি?" উনি বললেন, "ঠিকই বলেছ তুমি। ঐখানেই ঘটনাটা ঘটেছিল। এবার আমি ঘটনার অবতারণা করছি।" আমরা সবাই নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলাম।

তিনি বলতে শুরু করলেন,—"অনেক অনেক দিন আগে এই ক্ষিতিশগঞ্জে এত লোকের বাস ছিল না। তখন আমি এই তোমাদের মতই ছিলাম। কয়েক ঘর নিয়ে সেখানে একটা ছোট খাট গ্রাম গড়ে উঠেছিল। চারদিক ছিল ঘোর জঙ্গলে ঘেরা। রাতে কুকুর, শেয়ালের ডাকে ঘুমানো দায় হত। মাঝে মাঝে আবার বাঘের ডাকও শুনতে পাওয়া যেত। কাজেই সন্ধ্যে হতে না হতেই সবার দরজা জানলা বন্ধ হয়ে যেত।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। আমরা বললাম "তারপর?" উনি একবার কেশে নিয়ে বলতে শুরু করলেন—আমাদেরই এক প্রতিবেশী ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি করতেন। কলকাতারই এক মেসে থাকতেন তিনি। প্রতি শনিবার বাড়ি আসতেন আর সোমবার চলে যেতেন। ভদ্রলোক ছিলেন খুবই সাহসী।

এক শনিবার রাতে একটা ইলিশ মাছ কিনে বাড়ি আসছিলেন। বাড়ি আসার পর যথারীতি বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে মাছটা দিয়ে বললেন, "মাছটা রান্না করে পাড়াপড়শীদেরও দিও।"

এই বলে তিনি বাথরুমে চলে গেলেন। ওদিকে ওঁনার স্ত্রী যেই না মাছটা ভাজতে বসেছেন, অমনি এক ঝটকায় ছিটকিনি সমেত জানলার কপাটটা খুলে গেল। আর জানলার ভেতর একটা কঙ্কালসার হাত ঢুকে পড়ল। তাই দেখে উনি প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেও পরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে তুই? কেন এসেছিস।" তৎক্ষণাৎ বাইরে থেকে একটা নাকি সুরে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমি তেপান্তরের পেত্নী। হিঁ—হিঁ—হিঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ। সেই ওখাঁন থেঁকে ইঁলিশ মাঁছের গঁন্ধ পেঁয়ে ছুঁটে এঁসেছি। আঁমায় এঁকটু ইঁলিশ মাছ ভাঁজা দে না।" ভদ্রমহিলার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল প্রখর। উনি তাড়াতাড়ি লোহার খুন্তিটাকে উনুনের গন্‌গনে আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন; আর বললেন, "কিরে তুই ইলিশ মাছ ভাজা খাবি বল-ছিলি না?" বাইরে থেকে উত্তর এল, "হ্যাঁ"। তখন ভদ্রমহিলা উনুনের মধ্যে রাখা লাল, গরম খুন্তিটা হাতে ভিজা গামছা জড়িয়ে উনুন থেকে বার করে আনলেন। তারপর বললেন, "হাতটা শিগ্-গিরি বাড়া। মাছ ভাজা নে।" যেই না একথা বলা অমনি সেই লিক্‌লিকে হাতটা আবার জানলার ভেতরে গলে এল। আর উনি তক্ষুনি ঐ লোহার খুন্তিটা লিক্‌লিকে হাতের মধ্যে ঠেসে ধরে বললেন,

,'নে খা; ইলিশ মাছ ভাজা খাবি বলছিলি না? আর খাবি? যাবি কিনা বল। ওদিকে পেত্নী

তো আগুনেব ছ্যাঁকা খেয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, "ছেঁড়ে দেঁ; আঁমায় ছেড়ে দেঁ আঁমি চঁলে যাঁচ্ছি, এক্ষুঁনি চঁলে যাঁচ্ছি। আঁর কোঁন দিন আঁসব না।" এই বলে ভদ্রলোক থামলেন।

আমরা বললাম "তারপর কি হল"? উনি হেসে বললেন, "তারপর?—তারপর তেপান্তরের পেত্নী তেপান্তরেই ফিবে গেল। আব আমরা সেই ইলিশটার ভালই সদব্যবহার করলাম।"

মহাত্মাজি এমন একজন খৃষ্ট সাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের অধিকারকে বাধামুক্ত করা।

—রবীন্দ্রনাথ
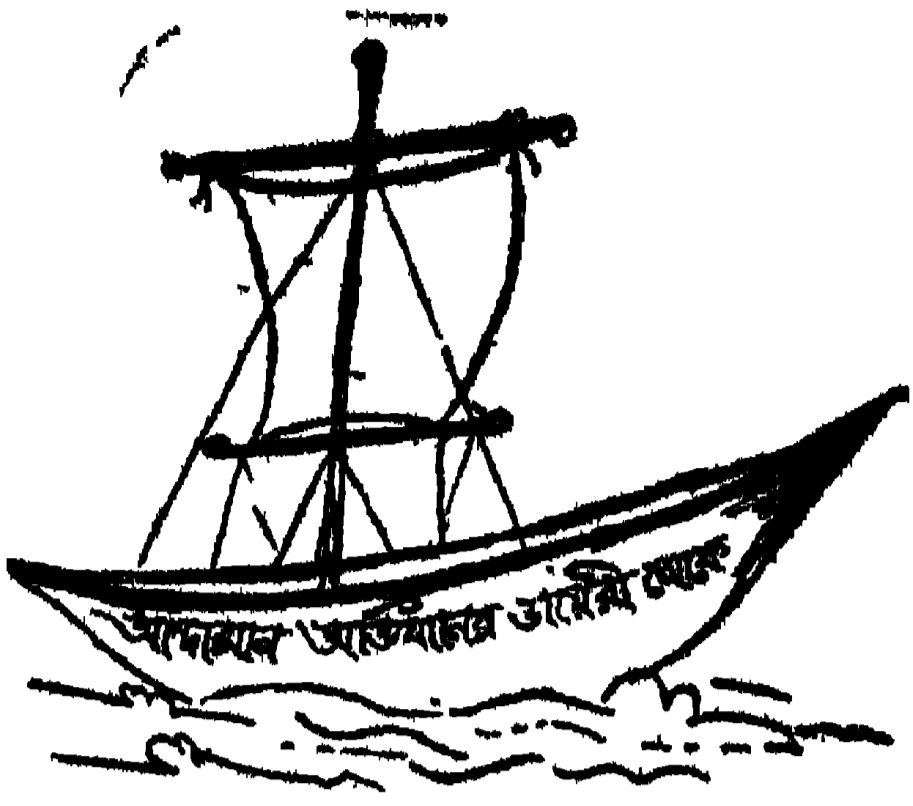
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

আবার মানসিক দ্বন্দ্ব। লড়াই শুরু হ'ল আমার ভেতর। প্রথমে সামান্য, তারপর চলল বেড়ে। এই আশে পাশের প্রতিটি মানুষ ভাবতে পারে না তাদের এই ভবিষ্যতের কথা। আর আমি একমাস পরের কথাও যে ভাবতে পারছি না। অবস্থা এক সময় এমন চরমে উঠল যখন বুঝতে পারলাম যে, না যাওয়ার ভার তো আমার উপর নয়। এ ক্ষেত্রে আমি যে আমার ভাবনার মালিক নই। এই চাওয়া আর না চাওয়ার লড়াই শেষ হল একদিন, যেদিন ডিউক কোচিন থেকে ছুটি নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

আংরের তৈরিও চলতে লাগল। কেমন নৌকা হবে এই ব্যাপারে অনেক গবেষণার পর ঠিক হল আমাদের মতন আর একটা যে দাঁড়টানা অভিযান হয়েছে এর আগে (আমেরিকা থেকে ইংলণ্ড অবধি।) তাদের মত নৌকা নেওয়া হবে। চিঠি লেখা হল ক্যাপ্টেন রিজওয়েকে বিলেতে। (আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে, আটলান্টিক দাঁড়টানা নৌকায় পার হওয়া দুজন অভিযাত্রীর অন্যতম)। তিনি চিঠির উত্তর পাঠালেন নৌকার নক্সা সহ কয়েকদিনের ভেতর।

অতি সাধাসিধে নৌকা। ২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া আর সাড়ে চার ফুট উঁচু। আর নৌকার দুদিকে দুটো কাঠের হাওয়া ভরা বাক্স। এই রকম নৌকা নাকি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের জেলেরা ব্যবহার করে। উত্তাল সমুদ্রের পক্ষে খুবই উপযোগী। গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ এগিয়ে এলেন নৌকা তৈরি করে দিতে। শুরু হল নৌকা তৈরি। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমাদের উৎসাহকে ছাপিয়ে ওয়ার্কশপের কর্মীরা তৈরি করলেন নৌকা। নৌকার আগায় একটা ছোট মাস্তুল লাগানো হল আর তারপর একটা ছোট্ট রাডার রিফ্লেক্টর পিছনে লাগান হল। রাডার এবং কম্পাস, তারপর একটা লাইফ লাইন লাগিয়ে মারাঠী নৌ অধ্যক্ষের নাম অনুসারে লেখা হল "আংরে"। প্রথমে গঙ্গায় শুরু হল আংরে নিয়ে নানা কসরৎ। সত্যি সত্যি অদ্ভুত সুন্দর তৈরি হল আংরে। কত উল্টে পাল্টে আছড়ে জলে ফেলে যে চলল আমাদের পরীক্ষা তার ঠিক নেই। কিন্তু আংরে আংরেই, যেমনি শক্ত, তেমনি হাল্কা। খাবার দাবার নেবার ব্যবস্থা হল টিনের প্যাকেটে আর তা মজুত করা হল নৌকার ভেতরে নাইলনের জাল দিয়ে বেঁধে। আর খাবার জল নেওয়ার ব্যবস্থা রইল নৌকার পাটাতনের তলায়। প্লাস্টিকের বোয়েমে নানা রকমের দাঁড়কে পরীক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত দেখা গেল স্প্রিং বোট রোয়িং এর জন্য যে দাঁড় ব্যবহার হয় যা কলকাতায় ঢাকুরিয়া লেকে চলে, সেই দাঁড়ই ভাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবের কাছ থেকে দাঁড় পাওয়া গেল, আমার পুরনো ক্লাব, দেখেশুনে বেছে নেওয়া হল চারটে ভাল দাঁড়, আর তার সঙ্গে রইল একস্ট্রা চারটে অর্ডিনারি দাঁড়।

কি কি নেওয়া হবে নৌকায় তা নিয়ে অনেক

খাক্‌বিতগুার পর তৈরি হল একটা ছোট ফর্দ, দুটো ট্রান্সমিটার, তার সঙ্গে চারটে বেলুন, দুটো রেডিও, দুটো কম্পাস, একটা সেক্‌সসেন্ট দুটো স্লিপিং ব্যাগ, চারটে পরখা জ্যাকেট, চার জোড়া স্নো গগলস্‌, দু জোড়া গ্লাবস্‌। ৫৫ দিনের খাবার (মাংস, শুকনো ভাত, বিস্কুট, চকলেট, জমা দুধ, কফি, হরলিক্‌স, বোর্নভিটা, টিনে করা রসগোল্লা, লজেন্স, ৬০ গ্যালন জল)। দিক নির্ণয়ের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় বই, খাতা, চার্ট, প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ আর এক বোতল ব্রাণ্ডি।

এবার শুরু হল আমার সত্যিকারের প্রস্তুতি পর্ব। আমাদের দুজনের থাকার জায়গা ঠিক হল মেরিন ক্লাব-এর তিন তলার একটা ছোট ঘরে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হল অঢেল। শরীরের ওজনকে যে বাড়াতে হবে। মেরিন ক্লাব খিদিরপুরের ডক ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে। এ এক আলাদা দুনিয়া। নানা দেশের নানা জাতের লোক এখানে এসে ভীড় করে। ছন্নছাড়া নাবিকের দল এরা, আমি এদের ভেতর স্থান পেলাম।

ভোর হতে না হতে ঘুম থেকে ওঠা, তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে দৌড়ান অন্তত সাত আট মাইল। দৌড়ের পর ফিরে এসে পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেওয়া, তারপর বেরিয়ে পড়া। সকালের দিকে মিটিং বসত কখনও কখনও পোর্ট কমিশনের অফিসে, কখনও আই, এন এস হুগলীর অফিসে। দুপুরবেলা আবার ফিরে যাওয়া, আবার পেট ফাটানো লাঞ্চ। তারপর গার্ডেনরীচ-এর রাস্তা ধরা যেখানে আংরেকে নিয়ে গঙ্গায় নামিয়ে কসরত করা। বিকেল গড়িয়ে গেলে কলকাতার রাস্তা ধরা-তারপর প্রয়োজনীয় লোকদের সঙ্গে দেখা করা।

(চলবে)

চার ভাই

কৃষ্ণা দে (সভ্যা, জিনিয়র)

হাবু, বাবু, সদাই, গদাই,
মাত্র তারা চারটি ভাই,
হাবুর খুব মাথা মোটা
বাবুর আবার পেটটা মোটা
সদাই ভীষণ দেখতে মোটা
গদাই আবার মোটা সোটা
তার ঠাকুরমা চিবোয় পানের বোঁটা।

প্রকৃতির দুই আশ্চর্য রূপ

ঝড়

শৈলেন ঘোষ

খবরের কাগজের আবহাওয়ার কলমে মাঝে মাঝেই আমরা দেখি, "কলকাতা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। আসছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।" আর তারপর সত্যিই যখন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়, তখন কী ভয়ানক কাণ্ডই না ঘটে। ঝড়ের শক্তির কাছে আমরা তখন নেহাতই জুজু। তোমরা শুনলে বোধহয় চমকে যাবে, সামুদ্রিক ঝড়ের এমন শক্তি অসংখ্য আণবিক বোমার বিস্ফোরণও তার কাছে কিছু নয়। এক মিনিটে এই ঝড়ে এমন বিদ্যুৎ শক্তির উৎপন্ন হয় যে, একে বেঁধে রাখতে পারলে আমেরিকার মত বিরাট দেশে পঞ্চাশ বছর বিদ্যুৎ শক্তির কোনো অভাবই হবে না।

কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়কে তো আর পোষ মানানো যায় না। তার দুরন্ত শক্তি ইতস্ততঃ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মৃত্যু ও সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করে আবার শান্ত হয়ে যায়। ১৯৭০ সালে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে এই ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড়ের আঘাতে পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যান। ১৯০০ সালে আমেরিকার টেক্সাস-এর কাছে গ্যাল্‌ভেসটন নামক জায়গায় এই সামুদ্রিক ঝড়ের জলোচ্ছ্বাসে ছ'হাজার মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে জাপানেও একটি মস্ত ফেরি বোট এই ঝড়ের কবলে পড়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে এক হাজার লোকের সমাধি হয়।

সমুদ্রে এই ঝড়ের সৃষ্টি যখন হয়, তখন জলের তাপমাত্রা খুবই বেশি থাকে। এই তাপের ফলে তপ্ত বাতাস ওপরে উঠতে থাকে। যতই বাতাস ওপরে উঠতে থাকে, আশপাশের বাতাস তখন তীব্র বেগে ছুটে এসে সেই জায়গাটা দখল করে। নিমেষে সেই বাতাসও গরম হয়ে ওপরে ওঠে। আর এটা এত দ্রুতগতিতে ঘটে চলে যে, তার ফলে দমকা হাওয়ার সৃষ্টি, আর তারই জন্য ঝড়। মনে করা হয়, এই বাতাস প্রায় ৫০,০০০ ফিট পর্যন্ত ওপরে উঠে সৃষ্টি করে ঝোড়ো মেঘের। এই ঝড় ৪০০ মাইল জায়গা জুড়ে ঘণ্টায় প্রায় ২০০ মাইল বেগে ছুটে চলে। সমুদ্রের বুকের ওপর এই ঝড় ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও ডাঙ্গায় এসে গাছপালা, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা খেতে খেতে শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু তার আগে ক্ষতি যা করার, সে তো করেই চলেছে!

সামুদ্রিক ঝড়কে যদি বলি দৈত্য, তবে তার মাসতুতো ভাই ঘূর্ণী ঝড় ছোটখাটো একটি দত্যি ছানা। স্বল্প জায়গায় তার আনাগোনা, তবু কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়ের চেয়ে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেক বেশি। এই ঝড়ের বাতাসের এমন শক্তি যে, তার ধাক্কায় বড় বড় বাড়ি, ঘর নিমেষে তাসের ঘরের মতো লুটিয়ে পড়ে। বড় বড় গাছ উপড়ে যায়। চলন্ত রেলগাড়ি লাইন থেকে ছিটকে যায়, যেখানে সামুদ্রিক ঝড় ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে ছোটে, সেখানে ঘূর্ণী ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ৫০০ মাইল।

হিমবাহ

তোমরা শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবে, পৃথিবীতে যত পরিস্রুত জল আছে, তার চার ভাগের তিন ভাগই বরফ। হিমবাহ। আর এই সব বরফ

ছড়িয়ে আছে দুই মেরুর দুই প্রান্তে, পাহাড় পর্বতের গায়ে মাথায় কোথাও কোথাও এইসব বরফের চাঁই দু মাইলের মত চওড়া। বলা হয়, এই সব বরফে এত জল জমে আছে যে ভূমধ্যসাগরের মতো ছটা বড় সমুদ্র এই জলে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এই বরফ গলে গলে পৃথিবীতে এখন যতগুলি সমুদ্র আছে তার সব কটি আরও দুশো ফুট করে জলে ভরে যেতে পাবে। এমন কি কলকাতা, টোকিও, লণ্ডন, প্যাবিস, নিউইয়র্ক নিমেষে এই বরফ গলা জলে ডুবে যেতে পারে।

অবশ্য এখন মনুষ্য সমাজ ভাবতে শুরু করেছে, এই হিমবাহকে কিভাবে মানুষের কল্যাণ কাজে লাগানো যায়। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন, তাদের দেশে পাহাড়ের উপর এমন ১০'০০০ হাজার বরফের চাঁইকে গলিয়ে মধ্য এশিয়ার খরা আক্রান্ত জায়গাগুলিকে কৃষি-কাজের উপযোগী করার জন্য।

এই হিমবাহ সাধারণতঃ দিনে এক ইঞ্চিমত হাঁটতে পারে। অবশ্য দু একটি ব্যতিক্রমও আছে। ১৯৬৬ সালে স্টিলি পর্বতের একটি হিমবাহকে দেখা গেছে ঘণ্টায় দু ফুট বেগে সে ওপর থেকে নেমে আসছে। প্রায় ২৫,০০০ হাজার বছর আগে, শেষ তুষার যুগে দেখা গেছে। এই তুষার মাটির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। উত্তর ইউরোপ, কানাডাব প্রায় সবটা এই তুষারের ভারে চাপা পরে ছিল। এমনকি, অস্ট্রেলিয়াবও কিছু অংশ কঠিন তুষারেব কবলে ঢাকা ছিল।

পূজো

মধুমিতা মণ্ডল (সভ্য, সিনিয়র)

পূজো! পূজো! পূজো!
চাবদিকেতে রব উঠেছে
এবার সবে সাজো॥
মা আসছে বাপের বাড়ি
তাই যে সবার হুড়োহুড়ি।
নতুন জামা নতুন জুতো
হবে সবার মনের মতো॥
সব কাজ যে ভুলে মোরা
থাকব পাঁচটি দিন,
আনন্দে তাই মন মেতেছে
নাচছে তা—ধিন্—ধিন্॥
পূজোর মজা সবচেয়ে মজা
মোদের কাছে ভাই,
ভাবতে ভালো থাকতে ভালো
মিলেমিশে তাই॥

বিরলে

রিচার্ড ই. বায়ার্ড

অনুবাদকঃ কনাদ মল্লিক

(প্রভু, সিনিয়র)

(১ম পর্ব)

[যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ জন্ম গ্রহণ করেন সুখ-শান্তি-নিরাপত্তার অচলায়তন যাঁদের ঘরে বেঁধে রাখতে পারে না। অরণ্যের শ্যামলিমা, মরুর নির্জনতা, হিমাদ্রির ধ্যান গাম্ভীর্য, সাগরের সঙ্গীত তাঁদের আহ্বান করে অচিন পথের পথিক হতে। আজ যাঁকে নিয়ে এই কাহিনী, তিনিও এইরকম এক ঘর পালানো অভিযাত্রী-রিচার্ড ই. বায়ার্ড (১৮৮৮-১৯৫৭)। বস্তুতপক্ষে, কুমেরু প্রদেশ বা দক্ষিণমেরু মহাদেশের সঙ্গে বায়ার্ডের নাম অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। কলম্বাসের স্বপ্নভূমি আমেরিকার সন্তান বায়ার্ড প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনিই প্রথম উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের উপর দিয়ে বিমান চালনা করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

বর্তমান কাহিনীতে আমরা রিচার্ড বায়ার্ডকে দেখব কুমেরু প্রদেশের হিমনির্জনতায় দক্ষিণমেরু বিন্দুর দশ ডিগ্রি দূরত্বে এক ক্ষুদ্র ভূগর্ভস্থ আবহাওয়া কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ১৯৩৪ সালের সুদীর্ঘ পাঁচটি মাস এই ঘরটিই ছিল তাঁর আশ্রয়। বায়ার্ড তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন 'Alone' শীর্ষক গ্রন্থে। তাঁর ভাবনা এবং তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তাঁরই স্বকীয় প্রকাশভঙ্গী ব্যতীত পাঠকের সামনে উপস্থিত করা অসাধ্য। সেই কারণে, বায়ার্ডের বর্ণনার আঙ্গিকেই তাঁর রচনাকে প্রকাশ করার যথাসাধ্য প্রয়াস করলাম অনুবাদের মধ্য দিয়ে ; কেবলমাত্র ভাষানুবাদই নয়, ভাবানুবাদ।

নিজেকে চিনতে হলে আমাদের আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখতে হয়। বায়ার্ডের জীবন সেই দর্পণ। চিরসংগ্রামী, দুরন্ত বায়ার্ডের মধ্যেই যদি আমরা নিজেদের আবিষ্কার করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত আছে তাঁর প্রাণেরই স্ফুলিঙ্গ, তাহলেই তাঁর কাহিনী পড়া আমাদের সার্থক হবে ; ধন্য হবে পৃথিবীর মাটিতে রিচার্ড ই, বায়ার্ডের মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব।]

১৯৩৫ সাল। কুমেরু প্রদেশের গাঢ় রাতে মৃত্যুর নির্জনতা। এ সময়ে, 'রস তুষার প্রাচীরে' (Ross Ice Barrier). মাটির নীচে। 'বোলিং অ্যাড্‌ভান্‌স আবহাওয়া কেন্দ্রে' (Bolling Advance Weather Base) আমি ছিলাম একা। দক্ষিণ মেরুবিন্দু ও আমাদের মূল কেন্দ্র লিটল্ আমেরিকার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এই কেন্দ্র। এটিই পৃথিবীর দক্ষিণতম প্রান্তের প্রথম আবহাওয়া কেন্দ্র।

প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রটিতে আমাদের দু'জন আবহাওয়াবিদ আর একজন বেতার পরিচালক—এই তিনজনের থাকবার কথা, কিন্তু, তখন কে জানত শেষ পর্যন্ত-পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে একা আমাকেই বোলিং অ্যাড্‌ভানসে থেকে তিনজনের কাজ চালাতে হবে !

'বোলিং অ্যাডভান্‌স কেন্দ্রের' পরিকল্পনা

আমারই। ১৯২৮-৩০ সালে দক্ষিণ মেরুতে অভিযানে এসে আমার মনে হয়েছিল যে ৪৫ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত সমগ্র কুমেরু মহাদেশই আবহাওয়া বিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিধির বাইরে। এই মহাদেশের মূল ভূখণ্ডে কখনই আবহাওয়া কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় নি। এখানকার শীত ঋতুর প্রকৃতি নিরূপণের জন্য। কেবলমাত্র এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কখন কখন। আমার ধারণা হল কুমেরুর গভীরতর প্রদেশে স্থাপিত বোলিং অ্যাড্‌ভান্স কেন্দ্রে এবং মূল কেন্দ্র লিটল আমেরিকাতে একই সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করা হলে এগুলির সাহায্যে দক্ষিণ গোলার্ধের জলবায়ু সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।'

এক যুগের বেশি সময় ধরে একটার পর একটা করে বিভিন্ন অভিযানে আমি অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু, উদ্দেশ্যহীন চাঞ্চল্যের মধ্যে তৃপ্তি পেয়েছি কোথায়? তাই, এখন নীরব শান্তির সন্ধানে ফিরছি। আমার মনে হল বোলিং অ্যাড্‌ভান্সকে কেন্দ্র করে যা ঘটবে তা আমার পক্ষে এক মস্ত সুযোগ। দক্ষিণ মেরুর বিজন তুষারভূমিতে পাব আমার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি। আমার ইচ্ছেমতো দীর্ঘ সাত সাতটি মাস আমি থাকব সেই জায়গায় যেখানে এই আমি ছাড়া আর কারও বাধ্য হতে হবে না আমাকে, যেখানে আমার প্রয়োজনই একমাত্র প্রয়োজন, আমার চিন্তাই এক মাত্র চিন্তা, আমার ইচ্ছাই যেখানে অবিসংবাদিত আইন।

আশার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও আছে। প্রধানতঃ সেটা মনোবিকারের শিকার হওয়ার ভয়। আমি জানি, মেরুদেশের চিররাত্রিতে লোকালয় থেকে বহুদূরে সম্পূর্ণ একা থাকার কী দুঃসহ যন্ত্রণা! নিঃসঙ্গ অবস্থায় হিম্‌ শৈত্যের বা কোনরকম দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে এদের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য বহু সম্বল অভিযাত্রীর থাকে, কিন্তু শ্বাসরোধী, অতল আঁধারের মুখোমুখি দাঁড়াতে অভিযাত্রীর পাশে স্বয়ং সে ছাড়া আর কেউ থাকে না।

যাই হোক, ভেবে দেখলাম যত বিপদই থাক তার কোনটাই খুব গুরুতর নয়—অন্ততঃ আমার পক্ষে, কারণ, একটা বিরাট মেরু অভিযানের নেতা আমি আমার হাতে রয়েছে দুটো জাহাজ, চারটে এরোপ্লেন আর আমার রয়েছেন একশ' সহযোগী, আমার অনুমান যে কত ভুল, তা' পরে বোলিং অ্যাডভান্সে থাকবার সময় আমি সম্যক উপলব্ধি করেছিলাম। সেই কাহিনীই বলতে চলেছি, এই ঘটনার কথা শুনলেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে মানুষ মৃত্যুর স্পর্শের মধ্যে এসেও কী ভাবে বেঁচে থাকতে পারে, কী ভাবে বেঁচে থাকতে চায়।

১৯৩৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী 'জ্যাকব রুপার্ট' (Jacob Ruppert) জাহাজে চড়ে আমরা প্রবেশ করলাম হোয়েল উপসাগরে, এখানেই প্রথম আমরা দক্ষিণ মহাদেশের বরফের ভয়ানক অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মনে কোন সন্দেহই রইল না যে, বরফের এই দুরবস্থা আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার উপরই প্রভূত প্রভাব রাখবে। আমাদের জাহাজ অতি সন্তর্পণে হিমশৈলের ভিড় ঠেলে লিট্‌ল আমেরিকার তীরভূমির দিকে এগিয়ে চলল। সামনে অসংখ্য উঁচু-নীচু বরফের ঢেউ-এর সারি—সেগুলোর কোন কোনটার চুড়ো আকাশের নীলিমা স্পর্শ করতে চায়। দেখে মনে হল, ঝড়ক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরকে কে যেন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমাদের পথ বন্ধ, এরোপ্লেন ও স্কী-তে

চড়ে গোটা অঞ্চলটা দেখে এল ছুটো দল। শেষে, অতিকষ্টে পথ একটা বার করা গেল, সেটাকে পথ না বলে বিপথ বলাই ঠিক, কারণ, মাইল সাতেক লম্বা সেই রাস্তায় ওৎ পেতে ছিল অসংখ্য বিপদ। সেই পথের নাম দেওয়া হল 'Misery trail' অর্থাৎ 'তুঃখের রাস্তা'।

এরপর পুরো তু'মাস ধরে দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যখন জাহাজ থেকে সমস্ত রসদ 'তুঃখের রাস্তা' দিয়ে এনে লিট্‌ল আমেরিকাতে তুললাম, তখন আমাদের সব শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। মালপত্র বইবার জন্য এতাবৎ যে চারটে ট্রাক্টরের ওপর আমরা নির্ভর করে এসেছি, সেগুলো Misery trail এ অবিরাম পরিশ্রম করতে করতে এমন কাহিল হয়ে পড়ল যে সেগুলোকে মেরামত না করে। 'বস প্রাচারে' পাঠানো একেবারেই অসম্ভব। ওদিকে বসন্তকালের অভিযানের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করতে করতে ক্যাপ্টেন ইনেস-টেলর বেরিয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে আমাদের কুকুর বাহিনীর বাছা বাছা কুকুরগুলোকে নিয়ে গেছেন। সুতরাং লিটল আমেরিকা থেকে বোলিং অ্যাড্‌ভান্স কেন্দ্রে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার উপায় রইল না। একাজে এরো-প্লেন ব্যবহার করার চেষ্টা একবার করেছিলাম, কিন্তু তাতে একটা প্লেন তুর্ঘটনা হল। এই তুর্ঘটনায় কোন প্রাণহানি না ঘটলেও এরোপ্লেনে মালবহন করার চেষ্টা থেকে বিরত হলাম, এই সময়ে হিসেব করে দেখা গেল মেরুর নিশ্ছিদ্র আঁধারের হিমরাত্রি নামবে মাস তুই-এর মধ্যেই।

সমস্ত অবস্থা থেকে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ম্যাড্ পর্বতমালার পাদদেশে বোলিং অ্যাড্‌ভান্স কেন্দ্র তৈরি করা কোনমতেই সম্ভব হবে না।—আরও কাছাকাছি কোথাও জায়গা দেখা দরকার। এই সমস্ত বড়ো বড়ো বিপদের মাথায় গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আরও কিছু প্রতিকূলতা দেখা দিল। প্রধান বেতার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জন ইয়ং ডায়ার একটা উঁচু পোল থেকে পড়ে গুরুতর আঘাত পেলেন, সহ-কারী পাইলট মিঃ র‍্যাসনের অস্ত্রোপচার হল গলার অসুখের জন্য, ফটোগ্রাফার মিথ পেলটারের অ্যাপে-ণ্ডিসাইটিস অপারেশনের সময় তুর্ঘটনাক্রমে ডাক্তার-বাবু একটা আলো উল্টে ফেলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন, সেই আগুনে আমাদের ওষুধপত্রের ভাঁড়ারের ভীষণ ক্ষতি হল।

এই ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটাই মারাত্মক রূপ নিতে পারত। সেই কারণে, এদের সম্মুখীন হতে আমরা সকলে প্রতি মুহূর্তেই যে কোন রকম অপ্রত্যাশিত তুর্ঘটনার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম।

জানুয়ারী মাসে এখানে আসার সময়েই লক্ষ্য করেছিলাম যে হোয়েল উপসাগরের বরফ অবিশ্বাস্য-রকম দ্রুত গতিতে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের আশা ছিল ফেব্রুয়ারী নাগাদ বরফ আবার জমাট বাঁধতে আরম্ভ করবে, কিন্তু বরফ ভাঙ্গার গতি ক্রমেই বেড়ে চলল, এখন, লিটল আমেরিকার চারপাশে বড় বড় ফাটল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। দিনকে দিন ফাটলগুলো চওড়াও হচ্ছে। রাতে শুয়ে শুয়ে অনুভব করতে পারি কয়েকশ' ফুট পুরু বরফ মেঝের নীচে সাগরের জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে সুতরাং আমাদের সব থেকে গুরুতর আশঙ্কা হল এই যে লিটল আমেরিকা কুমেরু মহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে ভেসে যেতে চলেছে।

[ক্রমশঃ]

এলিস ইন্‌ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড
লুইস ক্যারল

শুয়োরের বাচ্চা ও গোলমরিচের গুঁড়ো

অনুবাদক : অশোককুমার সেনগুপ্ত

(শেষাংশ)

বাচ্চাটা দেখতে কিম্ভুত। অনেকটা সমুদ্রের শুঁড়ওয়ালা মাছের মত। এমন হাত পা ছুঁড়ছে যে ধরে রাখাই দায়। কয়লার ইঞ্জিনের মত ভোঁস ভোঁস করছে। কিছুতেই একভাবে থাকছে না। একবার কুকুরকুণ্ডলী তো একবার ঢেঁকি-অবতার। সামলে রাখতে এলিসের ঘাম ছুটে গেল।

খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বাচ্চাটার ছটফটানি বন্ধ করার একটা কায়দা বের করে ফেলল এলিস। যেই সে কুণ্ডলী হয়েছে অমনি এলিস তার ডান কান আর বাঁ পা একসঙ্গে চেপে ধরল যাতে আর সে সোজা হতে না পারে। তারপর সে বাচ্চাটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ভাবল একে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—এখানে রেখে গেলে ওরা আর একে আস্ত রাখবে না, দু এক দিনের মধ্যেই খতম করে দেবে। নিজেকেই বলল, 'না, না, রেখে যাওয়াই মানে খুন করা।' বাচ্চাটা একথা শুনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, যেন এলিসের কথার জবাব দিচ্ছে (বাইরে এসে ওর হাঁচি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল)। এলিস বলল, 'ছি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোর না, মানুষ কি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।'

কে শোনে কার কথা? বাচ্চা আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। ব্যাপার কি এলিস খুব চিন্তিত হয়ে বাচ্চার মুখের দিকে তাকাল। নাকটা উপর দিকে ওঠান আর লম্বা, অনেকটা শুয়োরের নাকের মত, আর চোখ দুটো ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। এলিসের কেমন যেন খটকা লাগল, ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ হল না। আবার ভাবল, না, না, হয়ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বলে এ রকম দেখাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলে তো চোখে জল থাকবে? সে আরেকবার বাচ্চার চোখের দিকে তাকাল।

কই, জলটল তো নেই। এলিস খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'দেখ বাছা, তোমার ভাবগতিক ভাল মনে হচ্ছে না। যদি শুয়োর হয়ে যাবে ঠিক করে থাক তো আমি আর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না। মনে রেখ।' বাচ্চাটা আবার সেইরকম ফুঁপিয়ে উঠল (না কি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল? কে জানে), এলিস কোন কথা না বলে এগিয়ে চলল।

এলিস ভাবছিল, 'এটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কি করব?' এমন সময়ে আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ। এবার বেশ জোরে, স্পষ্ট। এলিস চমকে উঠল। তার বেশ আতঙ্ক হল। বাচ্চার মুখের দিকে চাইল। না, এবার আর কোন ভুল নেই। মুখটা অবিকল শুয়োরের। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? অসম্ভব, একে নিয়ে সে কী করবে?

এলিস কোল থেকে বাচ্চাটাকে নামিয়ে দিল আর সে গুটি গুটি বনের মধ্যে চলে গেল। এলিস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে মনে মনে বলল, 'মানুষ হলে ও বড় হয়ে ভীষণ কুচ্ছিৎ হত। তার চেয়ে এই ভাল হয়েছে, কি সুন্দর শুয়োরের বাচ্চা। এলিস ভাবতে লাগল তার চেনা পরিচিত ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এমন অনেক আছে, যাদের শুয়োর হলে বেশ মানাত। আপন মনে বলল, 'মানুষকে কি করে শুয়োর করতে হয় তা যদি জানা থাকত—' এলিস হঠাৎ চমকে উঠল। সেই খানদানি বেড়াল একটু দূরে একটা গাছের ডালে বসে আছে।

এলিসকে দেখে বেড়াল একগাল অমায়িক হাসি হাসল। বেশ নিরীহ গোছের বেড়াল, কিন্তু লম্বা লম্বা নখ আর চকচক করছে দাঁত—তাই এলিস ভাবল একটু সম্ভ্রম করে কথা বলাই ভালো।

কি বলে ডাকবে? এলিস একটু ভয়ে ভয়েই বলল—কে জানে সম্বোধনটা পছন্দ করবে কিনা—'ওগো খানদানি বেড়াল।' বেড়াল আরো গাল ভরে হাসল। যাক বাবা, রাগে নি, খুশিই হয়েছে। এলিস ভরসা পেল। বলল, 'আমাকে কোনদিকে যেতে হবে বলতে পার?'

বেড়াল বলল, 'সেটা নির্ভর করছে তুমি কোথায় যেতে চাও তার উপরে।'

এলিস বলল, 'কোথাও একটা গেলেই হল।'

বেড়াল বলল, 'তা হলে যে কোন একদিকে হাঁটলেই হল।'

এলিস ব্যাখ্যা করল, 'মানে কোন একটা জায়গায় পৌঁছতে চাই।'

বেড়াল বলল, 'তা পৌঁছবে বই কি। যদি অনেকটা হাঁটতে পার তা হলেই কোথাও না কোথাও পৌঁছে যাবে।'

এলিস দেখল কথাটা ঠিক। তখন সে অন্য প্রশ্ন করল, 'এখানে আশেপাশে কি ধরনের লোক থাকে?'

বেড়াল তার ডান পা উঁচু করে দেখিয়ে বলল, 'ওই দিকে এক টুপিওয়ালা।' আবার বাঁ পা দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই দিকে এক বসন্ত শশক।'* যার কাছে ইচ্ছে যেতে পার, দুজনেই পাগল।

এলিস বলল, পাগলের কাছে যাব কেন?'

'উপায় নেই। এখানে সবাই পাগল। আমি পাগল, তুমি-ও পাগল।'

'কে বলল আমি পাগল?'

'নিশ্চয়ই পাগল। নইলে তুমি এখানে আসবে কেন?'

বাঃ, কি প্রমাণের ছিরি! কিন্তু এলিস কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি যে পাগল তা জানলে কি করে?'

বেড়াল বলল, 'খুব সোজা। ধর, কুকুর! কুকুর পাগল নয়—এটা তো মান?'

'তা মানি বই কি।'

---

* ইংরেজীতে বলে' 'mad as a March hare'—মার্চ মাসে অর্থাৎ বসন্ত সমাগমে শশকেরা বড়ই চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে, তাই March hare বা বসন্ত শশককে ভাবা হয়।

'তা হলেই দেখ, কুকুর রাগলে ভৌ ভৌ করে আর আহ্লাদে লেজ নাড়ে—আর আমি ঠিক তার উলটো। আমি আহ্লাদে ভৌ ভৌ করি আব রাগলে লেজ নাড়ি। অতএব আমি পাগল।'

'কিন্তু তুমি তো ভৌ ভৌ কর না, মিউ মিউ কর।'

'কুকুরও ডাকে, আমিও ডাকি—তা আমাদের ডাককে তুমি যে নামেই ডাক। যাক, রাণীর ক্রোকে খেলায় তুমিও যাচ্ছ নাকি?'

'যেতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আমার তো নেমন্তন্ন নেই।'

'সেখানে আবার দেখা হবে' বলে বেড়াল হঠাৎ অদৃশ্য।

বেড়ালের এ রকম হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় এলিস খুব একটা অবাক হল না, আজ তো সারা-দিনই কত আজব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বেড়ালটা যেখানে বসেছিল এলিস সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার আগেই হঠাৎ আবাব সে উদয় হল। বলল, 'হ্যাঁ, ভাল কথা। বাচ্চাটার কি হল? জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

বেড়ালের অন্তর্ধানের মত তার এই পুনবাবির্ভাবেও এলিস অবাক হল না। সে বেশ সহজভাবেই বলল, 'সে শুয়োরের ছানা হয়ে গিয়েছে।'

আমি আগেই ভেবেছিলাম যে তাই হবে, বলে বেড়াল আবার অদৃশ্য।

হয়তো সে আবার দেখা দেবে এই আশায় এলিস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। একটু পবেই যেদিকে বসন্ত শশক থাকে এলিস সে দিকে হাঁটতে শুরু করল। আপন মনেই বলল, 'টুপিওয়ালা তো অনেক দেখেছি, বসন্ত শশক দেখিনি। তার কাছেই যাই, নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আর এখন তো গ্রীষ্ম সে নিশ্চয়ই এখন বদ্ধ পাগল হবে না—অন্ততঃ বসন্তে যতটা হয় ততটা তো হবে না।'

এই সময়ে আবাব একটা গাছেব ডালে খানদানি বেড়ালের আবির্ভাব। বেড়াল বলল, 'বাচ্চাটা কিসের ছানা হয়ে গিয়েছে বললে, ছুধেব?'

'না, শুয়োবের, আর শোন, ও রকম হঠাৎ হঠাৎ আসা যাওয়া কর না, দেখলে মাথা ঘুরে যায়।'

বেড়াল বলল, 'আচ্ছা', আর এবারে সে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে লাগল, লেজের ডগা থেকে শুরু করে একটু একটু করে। ক্রমে সবটা অদৃশ্য হয়ে শুধু হাসিটুকু হাওয়ায় ভেসে রইল। তারপর সেটাও মিলিয়ে গেল।

এইবারে এলিস অবাক হল। ভাবল, 'হাসি ছাড়া বেড়াল অনেক দেখেছি, কিন্তু বেড়াল ছাড়া বেড়ালের হাসি এই প্রথম। এমন আজগুবি জিনিস সারা জীবনেও আর দেখি নি।'

একটু এগিয়েই এলিস দেখল সামনে বসন্ত শশকের বাড়ি। হ্যাঁ, তারই হবে, কারণ চিমনিগুলো খরগোশের কানের মত আর চালটা খরগোশের লোমে ছাওয়া। বাড়িটা খুবই বড়। এলিস ভাবল আরেকটু বড় না হয়ে অত বড় বাড়িতে ঢোকা ঠিক হবে না। সে বাঁ হাতের ব্যাঙের ছাতার টুকরো থেকে একটুখানি খেয়ে নিজেকে দু ফুট মত করে নিল। তারপরেও সে ভয়ে ভয়ে এগোল। ভাবতে লাগল, 'কি জানি, বদ্ধ পাগলই যদি হয়। টুপিওয়ালার কাছে গেলেই হত।'

বিশ্ব-প্রতিবন্ধী-বর্ষের শপথ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

পঙ্গু যারা, ভাগ্যহারা—প্রতিবন্ধী শিশু
সহজ-সরল, সবুজ-অবুঝ ভবিষ্যতের যীশু।
জ্বালব প্রেমের আলো আশা সেই শিশুদের মুখে
ঢালব স্নেহ ভালোবাসা সেই যিশুদের বুকে !!

অন্ধ-অনাথ, অসহায় যারা ভাবছ দিন ও রাতে
ভয় পেও না, আমরা সদাই থাকব সাথে-সাথে !
দুঃখ কিসের ? বিঘ্ন-বিপদ করতে হবেই জয়
শপথ নিলাম, থাকব সাথেই আর কি তোদের ভয় !!

শক্তি দেব, সাহস দেব, দেব মনের বল
দুঃখ নেব, কষ্ট নেব, মোছরে চোখের জল !!
বুক ফুলিয়ে জোর কদমে চল্ এগিয়ে চল্
তোদের চোখে মুখেই নামুক হাসি-খুশীর ঢল !!

'বিশ্ব-প্রতিবন্ধী-বর্ষ' এলো রে তাই আজ
সাজরে সবাই নতুন সাজে, সাজরে সবাই সাজ।
দূর করবই দুঃখ তোদের, ভাঙব তোদের লাজ
শপথ নিলাম, এটাই মোদের হবে প্রধান কাজ !!

পঙ্গু-খঞ্জ-অন্ধ বলে তো ভাবনা কিছুই নাই
তোরা আমাদের বন্ধু সবাই, দাদা-দিদি, বোন ভাই
সুস্থ সবল সমাজের সাথে সন্ধি তোদের চাই
মোদের মনের মন্দির মাঝে থাকবে তোদের ঠাঁই !!

বোধন তলায়

কালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত

"ঐ শোনো মা বাদ্যি বাজে বোধন তলায় আজ
ঐ দ্যাখো মা প'রেছে সব কত রকম সাজ।
চৌধুরীদের চারটি ছেলে রেশ্‌মী জামা গায়
জরির টুপি নতুন জুতো মশ্‌মশিয়ে যায়।
আমায় তুমি দাও পরিয়ে অমনি রাঙা সাজ
মখমলেতে শ্‌লমা দেওয়া ঝক্‌মকে ঐ তাজ।"

"দীনদুখিনী মা যে তোমার চরকা কেটে খায়
কোথায় পাবো জরির টুপি চুমকি দেওয়া তায়।
দুধের মত ধপধপে এই শুদ্ধ খাদি পরে
হাস্যি মুখে এসো গে বাপ্ ঠাকুর নমো করে।
মা দুর্গাকে জানিয়ে এসো তোমার মনের কথা
মা যেন দূর করেন তোমার দুঃখিনী মা'র ব্যথা।

যখন তুমি বড় হবে থাকবে দুধে ভাতে
বস্ত্র দেবে, অন্ন দেবে, ক্ষুধাতুরের পাতে,
এখনকার এই দিন যাপনের দুখের কথাগুলি
মনে রেখো, যেয়োনা বাপ্ তখন যেন ভুলি।
দেখতে হলে বাবুর মতো রঙীন জামা গায়
দেখতে রাঙা শিমুল ফুলে কে বল না চায় ?

দুখীর চোখের জল মুছাতে দুখীর ঘরে যেয়ো
তাদের সুখে সুখী, দুখে দুঃখী হ'তে চেয়ো।
আজকে তুমি কষ্ট কর কালকে হবে সুখী,
তোমায় দেখে মানুষ হবে আজকে যারা দুখী।"

মিন্‌তার গল্প

চিত্তরঞ্জন রায়

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মিন্‌তার গলার আওয়াজ পাই। জানলা গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—উমা পিসি লে, ও উমা পিসি।

উমা তখন অঘোরে ঘুমোয় কোন সাড়া শব্দ নেই। মিনতা তবু ডেকে চলে—ও উমা পিসি উমা পিসিলে। আমি আবো?

আমাদের পাশের বাড়িতে মিনতারা থাকে। ওর বাবার দুধের ব্যবসা। কাজেই ভোব হলেই, ওর বাবা খাটালে চলে যায় দুধ দুইতে আর মা বিচুলি মাখে ঘোল দিয়ে। সেই ফাঁকে ওদের একমাত্র মেয়ে মিন্‌তা ঘর থেকে পালিয়ে আসে আমাদের বাড়ি। উমার সঙ্গে ওর খুব ভাব। মিন্‌তা এক মুহূর্তও উমাকে চোখের আড়ালে করতে চায় না।

খানিকক্ষণ মিহি গলায় ডাকাডাকির পর উমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দরজা খুলে দেয়। হাসিমুখে প্লাষ্টিকের ছোট্ট লাল চটি পায়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর উমার কাছে বসে বলে—তু চা পিবি না?

উমা হেসে বলে—চা পিবো, তুইও পিবি।

মিন্‌তা দুধের চেয়ে চায়েব ভক্ত বেশি। দুধ নিয়ে ওর মা কত সাধে, কিন্তু মিনতা কিছুতেই খাবে না। জোরজাব করলে কান্না জুড়ে দেয় চিৎকার করে। এব জন্য কত মার খায় মিন্‌তা ওর মায়ের হাতে। তবু ও দুধ খাবে না। দুধে ওর অরুচি। শেষ অব্দি উমার কাছে ছুটে এসে নালিশ জানায়—উমা পিসি মাই ভালো না। হামরাকে খালি মালে! ছোট্ট মিন্‌তা। বয়স এখন ছয় পুরো হয় নি। কিন্তু মুখে যেন অনববত কথার ফুলঝুরি ফোটে।

দিন কয়েক হল, উমা একটা ছোট্ট শালিক ছানা পুষেছে, দু বেলা বাচ্চাটাকে ছাতু মেখে খাইয়ে দিতে হয়। উমাকে দেখলেই শালিকটার খাঁচার ভেতর চিঁ চিঁ করে হাঁ করে, লাফালাফি শুরু করে। মিন্‌তা খাঁচার পাশে বসে একভাবে শালিকটা দিকে চেয়ে থাকে। খাঁচার দরজা খুলে দিলেই শালিকটা লাফাতে লাফাতে বাইরে কলতলায় বাসন মাজার জায়গায় বার কয়েক ঘুরে ফিরে উমার পেছন ঘুরতে থাকে। তার পর এক সময় উমা পাখিটাকে ধরে খাঁচার মধ্যে আবার পুরে দেয়। মিন্‌তা অবাক হয়ে উমাকে জিজ্ঞেস করে—এটা কি ওদের ঘল? চিডিয়ারা কি করে নিদ যায়? মিনতা তার ছ'বছরের ছোট্ট জীবনে পাখিদের কখনো ঘুমোতে দেখেনি। তাই বোধ হয় অবাক হয়ে ভাবে মানুষ ঘুমোয়—ওদের গরুগুলো ঘুমোয়, কিন্তু পাখিদের তো ও কখন চোখ বুজে ঘুমতে দেখেনি। ওরা কি তবে ঘুমোয়না। বালিশ বিছানাই বা কই! উমা মিনতাকে আদর করে বলে—পাখিরাও তুয়ার মত ঘুমোয়। রাত্তির হলে ঘুমোয়। তুই আবার কি করে দেখবি, তুই তো তখন ঘুমিয়ে থাকিস। মিন্‌তা উমাকে বাথাগুলো শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে—তুই নিদ যাস্‌, আমি নিদ যাই, পাখিটাও নিদ যায় তাই না, উমা পিসি?

—হ্যাঁ। উমা মিন্‌তার দিকে চেয়ে উত্তর দেয়। কয়েকদিন থেকে শালিকটার শরীর খারাপ। প্রায়ই ঝিমোয়। কিংবা চোখ বুজে পালকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে জুবু থুবুর মতো বসে থাকে। আগের

মতো হাঁই হাঁই করে আর খেতে চায়না। মিন্‌তা শালিক টাকে মুখ গুঁজে বসে থাকতে দেখে বলে—উমা পিসি, চিড়িয়া নিদ যাচ্ছে। দিনের বেলায় চিড়িয়াটা নিদ যাচ্ছে কেন?

—ওর যে শরীর খারাপ।

—বুখার লেগেছে বুঝি!

—হ্যাঁ।

তারপর এক সময় মিন্‌তার মা ওকে ডাকতে এলে মিনতা রেগে মেগে বলে।

—মা আমাকে বুলাচ্ছিস, কাহে? চিড়িয়ার নিদ টুটে যাবে। মিনতার বাংলায় কথা বলার ভঙ্গি দেখে উমা নিজের মনে হেসে ওঠে। তারপর এক রকম জোর করে মিন্‌তাকে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

শালিক আর উমার জন্য মিনতার চোখে ঘুম নেই। পাশের বাড়ি থেকে ওর গলা শুনা যায়—উমা পিসি—লে, আমি বিহানে চিড়িয়ার কাছে আবো তো? ও উমা পিসি ......

এমনি করে চিৎকার করতে করতে এক সময় মিনতার চোখে ঘুম নেমে আসে। ও ঘুমিয়ে পরে। আবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে মিন্‌তা দরজা গোড়ায় এসে চিৎকার করে ডাকে, ও উমা পিসি কেঁয়াড়ি খোল না আমি চিড়িয়া দেখব। উমা দরজা খুলে দিয়ে খাঁচার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। খাঁচার মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। শালিক ছানাটা খাঁচার মধ্যে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। একটা পা লম্বালম্বিভাবে খাঁচার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আছে। চোখ দুটো বন্ধ। উমা খাঁচাটাকে ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখতেই মিন্‌তা অবাক স্বরে বলল—উমা পিসি চিড়িয়াটা আভিও নিদ্ যাচ্ছে কাহে? ওকি উঠবে না?

—না রে পাখিটা আর উঠবেনা। ও মারা গেছে।

—মরে গেলো! মিন্‌তা খুব অবাক হয়ে যায়।

—হ্যাঁরে মিন্‌তা। বেচারী অসুখ করে মারা গেল।

মিনতার খুব মন খারাপ হয়ে যায়! শালিক ছানাটা খাঁচা থেকে বার করে উমা জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাক পাশের বাড়ির ছাদ থেকে উড়ে এসে পাখিটাকে ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে যায়। মিন্‌তা শালিক ছানাটাকে নিয়ে যেতে দেখে বলল— ও উমা পিসি কৌয়া চিড়িয়াটাকে কোথায় নিয়ে গেল? কৌঁয়া বুঝি ওকে ওর বাড়ি নিয়ে গেলো? কাহে নিলো ওকে?
—কৌয়াটা ওকে খাবে বলে নিয়ে গেলো বুঝলি। কাকটা শালিক ছানাটাকে খেয়ে ফেলবে শুনে মিন্‌তা কাঁদতে লাগল। তারপর একসময় কান্না থামিয়ে বলল—তুমি কাহে ওকে সড়কে ফেলে দিলে! ওর বুঝি চোট লাগে না?

মিনতার চোখের জল তখনও শুকোয়নি। উমারও চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে পাশে পড়ে থাকে শুধু বাঁশের খালি খাঁচাটা। মিনতার মনটাও যেন খাঁচার মতই খালি।

মায়ের মুখ

সুচন্দ্র নাথ দাস

বাড়িতে এসে তোপা দেখে দিদি তুলসীমঞ্চে প্রদীপ্ত প্রদীপ রেখে প্রণাম করছে। তোপাও তুলসীমঞ্চকে প্রণাম জানাল। মায়ের ছবির কথা বলি বলি করেও দিদিকে বলতে পারল না।

পড়তে বসেও তোপা পড়ায় মন সংযোগ করতে পারল না। কেবলই মায়ের চিন্তায় চিত্ত দোদুল্যমান।

বনলতা যখন রান্নঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তোপা তখন লণ্ঠন নিয়ে চুপি চুপি দালান থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকল।

ঘরের চারিদিককার দেওয়ালে রংবেরঙের নানান ছবি বেশির ভাগই ছবি মেলায় কেনা।

গনেশ হালদারের মুদিখানার বার্ষিক ক্যালেণ্ডারের মধ্যে কিংবা মেলা থেকে দিদির কিনে নিয়ে আসা. ছবির মধ্যে মায়ের মুখচ্ছবি খোঁজা মানে ধুলোর মধ্যে সোনা খোঁজা এ কথা তোপার উপলব্ধির মধ্যে এল না।

ঘরের সমস্ত ছবি বার করে নিরীক্ষণ করবার পরও যখন মায়ের মুখের মত কোনটা মনে হ'ল না তোপার—তখন বনলতার উপর তার অভিমান হ'ল নবজীবনেব উপর রাগ হ'ল। তারা তার মায়ের ছবিখানা না রেখে কেবল অপ্রয়োজনীয় ছবিগুলো সাজিয়ে রেখেছে।

লণ্ঠনটা ঘরের মেঝের উপর রেখে, বিছানায় উঠে, বালিশে মুখ গু'জে শুয়ে রইল।

এমম সময় নবজীবন ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরল। প্রতিদিন এসে দেখে তোপা দালানে মাদুর পেতে, লণ্ঠন জ্বেলে পড়তে বসেছে। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে একটু অবাক হল নবজীবন; ডাকল তোপা তোপা—

রান্নাঘর থেকে বনলতা বলল, তোপা তো দালানে পড়তে বসেছিল।

—তোপা তো কই দালানে নেই। আলোও নেই।

বনলতা জানে তোপাকে কখনও পড়বাব কথা বলতে হয় না। আপনা থেকেই তোপা পড়তে বসে। স্কুলে যায়। আজ তার হ'ল কি? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল বনলতা ঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বলতে দেখে বলল, ঐ তো ঘরের মধ্যে তোপা কি করছে দেখ।

নবজীবনকে দেখতে বলেই বনলতা ক্ষান্ত হল না; নবজীবনের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল।

তোপাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে নবজীবন জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে রে তোপা?

বনলতা জিজ্ঞেস করল, তোর কি আজ শরীর খারাপ লাগছে?. জ্বর এসেছে?

তোপা কোন উত্তর করল না বালিশখানা আরও দৃঢ় করে জড়িয়ে ধরল।

বনলতা আদর করে তোপার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোর? কিছু বলছিস না কেন?

দিদির আদর তোপার সহ্য হল না। ঝাঁঝালো স্বরে বলল, যাও যাও, এত আদর করতে হবে না।

বনলতার বুকের মধ্যে ব্যথার রাগিনী বেজে উঠল। তোপার রাগ অভিমানের কোন কারণ খুঁজে পেল না।

নবজীবন দুঃখের সঙ্গে বলল, সোনা বাপ আমার কেন; কেন রাগ করছিস বল।

তোপা এবার বিছানার উপর উঠে বসল, দীপ্ত প্রশ্ন, আমার মায়েব ছবি কোথায়?

নবজীবন অসহায়ের মত উচ্চার্রণ করল, মায়ের ছবি!

বনলতা জিজ্ঞেস করল, মায়ের ছবি কি হবে?

তোপা বলল, আমি দেখব।

ভবিষ্যতের জন্য আত্মীয়-স্বজনের ছবি তুলে বাখার রেওয়াজ গাঁ-গঞ্জে খুব বেশি প্রচলিত নয়। যদি দু'এক বাড়িতে থাকে-তাও অবস্থাপন্ন হ'লে হয়। চাষীদের ঘরে এ রেওয়াজ নেই বললেই চলে। নবজীবনেরও জানা নেই। তাই তোপার মায়ের ছবিব কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল।

বনলতা বলল, মায়ের ছবি দেখবি কি করে? মায়ের ছবি ঘরে নেই।

নেই কেন?

তোপার এ প্রশ্নের কি জবার দেবে বনলতা? নেই মানে তো—নেই অতীতে রাখা হয়নি, তাই আজ নেই। একথা সে ছোট ভাইকে বোঝাবে কেমন করে?

দু'দিন পরে কমল শহরে ফিরে গেল। আর তার মায়ের ফটোখানা যাবার সময় তোপার হাতে তুলে দিল। কারণ ছবিখানা পাওয়ার জন্য তোপার মনের মধ্যে যে সুতীব্র বাসনা ছিল—তা সে বুঝতে পারছিল।

ছবিখানা হাতে পেয়ে তোপা পরম প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সকলের মায়ের ছবি হয়—এই ধারনায় তোপা বিশ্বাসী তাই ছবিখানা বুকের মধ্যে নিয়ে বনলতার কাছে এসে দেখিয়ে বলল, এ ছাখ্‌ দিদি মায়ের ছবি।

কার মায়ের ছবি?

কেন? আমার মায়ের ছবি।

তোপা না দেখলেও বনলতা তার মাকে দেখেছে। মায়ের মুখ এখনও তার স্পষ্ট মনে আছে অপরের মায়ের ছবিকে সে স্বীকার করবে কেন? বলল, পাগল না-কি! এ কেন আমাদের মায়ের ছবি হবে?

মায়ের ছবি এ রকম হয় না তো কেমন হয়?

এ ছবি যার মায়ের ছবি ঠিক তার মায়েরই মত।

আমাদের মায়ের ছবির মত নয়?

না। আমাদের মায়ের ছবি থাকলে দেখতিস সে ছবি অন্য রকম।

বাড়ির পিছনে দিকে একফালি বাগান। দু'তিনটে পাতিলেবু গাছের ঝোপ-ঝাড়। তোপা

সেই লেবুগাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে কমলের মায়ের ফটোখানা বের করল। একবার সামনে থেকে, একবার দূর থেকে, একবার পাশ থেকে—শতভাবে শতবার ফটোখানা দেখল, আর ভাবতে লাগল তার মায়ের ছবিখানা কেমন হ'তে পারে।

ভাবতে ভাবতে সাতদিন চলে গেল। তারপর একদিন অংকের খাতায় পেনসিল দিয়ে একটা ছবি আঁকল। মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয়ী—আমার মায়ের ছবি নিশ্চয়ই এই রকম হবে।

ছবিখানা বনলতাকে দেখিয়ে বলল, ছাখ, তো দিদি, আমাদের মায়ের ছবি এরকমটি কি-না।

ছবিখানা উল্টে-পাল্টে দেখে বনলতা বলল, না, এ রকম নয়।

তোপা বনলতার কথা বিশ্বাস করল না। নবজীবনকে ছবিখানা দেখিয়ে বলল, দেখ তো বাবা, এ ছবিখানা মায়ের মত কি-না।

নবজীবনও একবার দেখে 'না' বলল।

তোপা ক্ষুব্ধ হ'ল, বলল, এ রকম নয়, সে রকম নয়, তা'হলে মায়ের ছবি কি রকম ?

এর চেয়ে ভাল।

তবে তুমি এঁকে দেখাও।

হায় পোড়া কপাল। ছবি-টবি কি আমি আঁকতে জানি।

জানো না ?

না বাবা।

কেন জান না ?

ভগবান আমাকে ও বিদ্যে দেন নি, তাই পারি নি। ছবি আঁকা না জানার জন্য নবজীবনের উপব তোপার অভিমান হ'ল, বলল, তুমি কিছু জান না।

সত্যি, আমি কিছুই জানি নে।

তুমি একটা বোকা।

নবজীবন হাসিমুখে ছেলের কথা স্বীকার করল, হ্যাঁ। বাবা, আমি বোকা, ভীষণ বোকা।

নীলের মেলায় ঘুরতে ঘুরতে তোপা মনে মনে ভাবল, এই যে এত দোকান এর মধ্যে মায়ের ছবি নিশ্চয়ই কিনতে পাওয়া যাবে। বনলতাকে বলল, দিদি ছবির দোকানে চল্।

কেন ? ছবি কিনবি ?

হ্যাঁ।

মেলা প্রাঙ্গনে অগনিত ছোট-বড় দোকান। তার মধ্যে ছবির দোকানও শতাধিক। তোপাকে নিয়ে বনলতা এক এক করে সমস্ত দোকানে ঘুরল। তবু কোথাও তোপার মনের মত ছবি পাওয়া গেল না ?

বনলতা জিজ্ঞেস করল, কিসের ছবি কিনবি ?

মায়ের ছবি।

মায়ের ছবি কি নীলের মেলায় পাওয়া যায় রে বোকা।

তবে কোন্ মেলায় যায়, রথের মেলায় ?

না।

তাহ'লে কোথায় পাওয়া যাবে ?

কোথাও পাওয়া যাবে না।

তোপা অস্থিরভাবে চীৎকার করে উঠল, তা'হলে এত বড় পৃথিবী কিসের জন্য আছে ? কি দাম আছে এর ? আমার মায়ের ছবি কোথাও পাওয়া যাবে না।

বনলতা তোপার এ প্রশ্নের উত্তর জানে মায়ের ছবির জন্য পৃথিবীময় খুঁজতে হয় না, মনের মধ্যেই মায়ের মূর্তি আছে। কিন্তু একথা সে তোপাকে বোঝাবে কেমন করে ?

বনলতা কোন উত্তর না পেয়ে তোপা কাঁদতে কাঁদতে একাকী মেলার জনস্রোতে হারিয়ে যেতে উদ্যত হল।

বনলতা ছুটে গিয়ে তোপাকে ধরে ফেলল।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। বলতে বলতে তোপা বনলতার মুখে-বুকে এলো-পাথাড়ি চড়-কিল-ঘুষি মারল।

তোপার অস্থিরতায় বনলতার বুকখানা ব্যাথায় ভরে উঠল। কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।

বনলতার চোখে জল দেখে তোপাও স্তম্ভিত। একি করল সে। জীবনে কখনও তো সে দিদির সঙ্গে এ রকম দুর্ব্যবহার করে না।

পৃথিবীতে যদি মায়ের ছবি না পাওয়া যায়, সেজন্য দিদির কোন দোষ নেই। একথা উপলব্ধি করে তোপা দুঃখ পেল।

দিদি—

বনলতার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তোপা অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, মায়ের মুখ ঠিক এই রকমই। মনে মনে সে এতদিন মায়ের যে মুখচ্ছবির কল্পনা করেছে, আজ সে প্রত্যক্ষভাবে দেখছে। দিদির মুখখানা দু' হাতে তুলে ধরে আরও ভাল করে দেখল, হ্যাঁ এই মুখই, তার মায়ের মুখ।

(শেষ)

কুরুক্ষেত্র

সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়

দিল্লী—আম্বালা লাইনে আম্বালার পঁচিশ মাইল পূর্বে কুরুক্ষেত্র। সুদূর অতীতকাল থেকেই এই পরম পবিত্র জায়গাটির একটি ঐতিহাসিক পরিচয় আছে। ব্রাহ্মণ্য যুগেই কুরুক্ষেত্র প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিল এবং অতি পবিত্র স্থান রূপে পরিচিত ছিল। বৈদিক যুগ এবং ব্রাহ্মণ্য যুগ উভয় সময়েই কুরুক্ষেত্র ছিল সভ্যতার মধ্যমণি। কথিত আছে, দেবতারা কুরুক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র ছিল আত্মোৎসর্গের বেদী 'তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ' থেকে জানা যায় কুরুক্ষেত্রের উত্তরে আছে তুর্ঘ্ন, দক্ষিণে খাণ্ডব আর পাশেই পরিনাহ। পুরাণে আছে যে কুরুক্ষেত্রের চারদিকে সাতটি পবিত্র অরণ্য আছে, এগুলি হল, কাম্যক বন, অদিতিবন, বৈশ্যবন, ফালকী বন, সূর্য বন, মধুবন এবং সীতাবন।

ঋগ্‌বেদের কিছু কিছু সূক্তে সরস্বতী নামে একটি বিশাল নদীর সম্বন্ধে বিস্তর স্তুতিবাদ করা হয়েছে। সরস্বতীকে বলা হয়েছে শুদ্ধা, সুমিষ্ট এবং সত্য কথার উৎস এবং মহৎ চিন্তারাজির অনুপ্রাণ স্থল। এই নদী শিবালিক অর্থাৎ বহির্হিমালয়ের প্লক্ষ প্রস্রবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল। মহাভারতে আছে এই নদী কুরুক্ষেত্রের কাছেই বীণাসন নামে একটি জায়গায় বিলুপ্ত হয়ে বীনাসন এবং সরস্বতীর উৎস মুখের মধ্যবর্তী এই কুরুক্ষেত্র অতি প্রাচীনকাল থেকেই তীর্থ যাত্রীদের গম্যস্থান।

পরবর্তীকালে আর্য সভ্যতার শেষদিকে আর্যরা যমুনা এবং গঙ্গার সমভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। সরস্বতী নদীর এবং গঙ্গার মধবর্তী মধ্যদেশ ছিল আর্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থল, এই অঞ্চলটি কুরু পাঞ্চাল, এবং অন্যান্য উপজাতিদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী কৌরবদের অধিকৃত স্থানটিকে বলা হয় কুরুক্ষেত্র। মনু এই স্থানটিকে ব্রহ্মর্ষিদেশের একটি অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। পরে এটি ব্রহ্মবিত বলে পরিচিত হয়েছিল।

সাবর্ণর পুত্র রাজা কুরুর নামানুসারে কুরুক্ষেত্রের নামকরণ হয়েছিল। কঠিন তপস্যা স্বরূপ তিনি সাত ক্রোশব্যাপী এই ক্ষেত্রটি সোনার লাঙলের সাহায্যে চাষ করে চলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐস্থানে যাঁরা মারা গেছেন তাঁরা স্বর্গে যেতে পারেন। এইরকম অদ্ভুত তপস্যার জন্যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বারবার পরিহাস করেছিলেন। শেষে কিন্তু ইন্দ্র হার মানলেন। তখন স্বর্গের অন্যান্য দেবতারা বললেন যে আত্মত্যাগ ছাড়া কেউই স্বর্গে যেতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত রাজা কুরু এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যস্থতায় ঠিক হল যে যাঁরা আত্মত্যাগ করবেন অথবা এই স্থানে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করবেন তাঁরা অবশ্যই স্বর্গলাভের অধিকারী হবেন। তাই এই স্থানটি একাধারে ধর্মক্ষেত্র ও যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত হল। এই স্থানের অধিবাসীদের স্বর্গে বসবাস কারীদের মত ভাগ্যবান বলে মনে করা হয়।

পাণ্ডবরা জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং তার পুত্রদের কাছ থেকে পৈতৃক রাজত্বের অংশ দাবী করলে তাঁদের কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণের খাণ্ডব বনটি দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এখানে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে একটি অপূর্ব সুন্দর নগরী নির্মাণ করেছিলেন। এটি বর্তমানে নতুন দিল্লীর কাছে অবস্থিত। কৌরবদের রাজধানী হল

হস্তিনাপুর। এটি বর্তমান দিল্লীর উত্তর পূর্ব দিকে। পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের পরে শর্তানুযায়ী পাণ্ডবেরা বারো বছরের জন্য বনবাস ও এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেন। বন পর্বে বিষাদগ্রস্থ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলা হয়েছিল কুরুক্ষেত্র একটি পরম পবিত্র স্থান এবং ব্রহ্মার উত্তর আসন। বনবাস শেষে পাণ্ডবেরা কৌরবদের কাছ থেকে নিজেদের রাজ্য ফিরে চাইলেন। কৌরবদের প্রত্যাখানের ফলে এই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে আঠার দিনব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল! এতে উভয় পক্ষেরই বহু অক্ষৌহিনী সৈন্য ধ্বংস হয়েছিল। এই প্রান্তরেই যুধিষ্ঠির উপলব্ধি করেছিলেন যে যাঁরা পরাজিত হলেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জয়ী হলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে দ্বিধাগ্রস্ত অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এই পবিত্র প্রান্তরেই রচিত হয়েছিল শ্রীমদভাগবৎ গীতা সর্ব কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে নিজ কর্তব্য সাধনের সেই ভাগ্যবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত অমর বাণী মানব হিতার্থে এই প্রান্তর থেকেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রকে সামন্তপঞ্চক বা পরশুরামের হ্রদ অথবা রুদ্র হ্রদও বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজারা পরশুরামের পিতা জামদগ্নিকে হত্যা করেছিলেন। পাঁচটি বড় হ্রদ মৃতদের রক্তে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পরে পরশুরাম তপস্যায় পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করে বর চাইলেন যে, তিনি যেন এই শত শত মানবহত্যার পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন, পিতৃগণ তাঁকে ক্ষমা করে সেই রক্তপূর্ণ হ্রদগুলিকে পবিত্র জলের হ্রদে পরিণত করে দিলেন। প্রবাদ আছে, যে ব্যক্তি চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞা করে এখানে স্নান করে এবং পরশুরামের পূজো করে যে প্রভূত ধনশালী হয়। এই স্থানটিকে কুরুজঙ্গলও বলা হয়।

কুরুক্ষেত্রের আশেপাশে একশরও বেশি তীর্থক্ষেত্র আছে। এর মধ্যে একটি হল বরাহতীর্থ, যেখানে বিষ্ণুর বরাহ অবতার মূর্তি আছে। অল্প একটু দূরেই আছে বৈশাস্থলী। এখানে বৈশ্য তার পুত্র সুকের শোকে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন। দেবতারা মধ্যস্থ হয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। সপ্ত সারস্বত হল আর একটি তীর্থ। এখানে বাস করতেন ঋষি মানকানকা। একবার একটি সুক্ষাগ্রে কুশের ডগার আঘাতে আঙুল কেটে গিয়ে রক্তের বদলে ফলের রস বেরিয়েছিল। এতে তিনি আনন্দে উন্মাদ হয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন। সেই নৃত্যের সংস্পর্শে এসে আশেপাশের সমস্ত চলমান এবং স্থির বস্তুও নাচতে শুরু করল ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা ভীত হয়ে তখন মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ঋষির কাছে গিয়ে নিজের আঙুলে নখের আঘাত করে তুষার শুভ্র ভস্ম বার করলেন। ঋষি তখন ভীত ও লজ্জিত হয়ে নাচ বন্ধ করলেন।

ব্রহ্মা সার তীর্থে রাজা কুরু কঠিন তপস্যা করেছিলেন।

চক্রতীর্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে ভীষ্ম তাঁকে নিজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করিয়েছিলেন।

অস্থিপুরে মহাভারতের যুদ্ধে নিহত বীরদের সৎকার করা হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী পবিত্রমত তীর্থ পৃথুডাক। এবং বর্তমানে কারনাল জেলায় অবস্থিত এবং পেটোয়া নামে পরিচিত।

তৈজস তীর্থে আছে বরুণদেবের মন্দির। এখানেই ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা কার্তিককে দেব-

সেনপতিত্বে বরণ করেছিলেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগেও কুরুক্ষেত্রের প্রাধান্য একটুও কমে যায় নি। কুরুক্ষেত্রের এক মাইল দূরে থানেশ্বর এবং দিল্লীর পঞ্চান্ন মাইল দূরে কারনাল জেলার তালুক শহর পানিপথ নিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের ভূমিকা।

সপ্তদশ শতকে অবন্তী বর্মার পুত্র মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা মালবরাজের হাতে নিহত হয়েছিলেন। গ্রহবর্মা ছিলেন থানেশ্বরের, পুষ্যভূতি বংশের প্রভাকরবর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর স্বামী। গ্রহবর্মাকে হত্যা করার পর রাজ্যশ্রীকে কণৌজে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ভগ্নিপতির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এবং রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাজ্যবর্ধন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। অবশেষে হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। হর্ষবর্ধন ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে একজন শক্তিশালী রাজারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট তাঁর লেখা হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধনকে অমর করে গিয়েছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কনৌজে হর্ষবর্ধনের রাজদরবারে গিয়েছিলেন। সেই সময় বৌদ্ধধর্মের উৎকর্ষতা প্রমাণের জন্য দুটি চিত্তাকর্ষক সভা বসত কনৌজে এবং প্রয়াগে।

১০১৪ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ শাহ থানেশ্বর দখল করে সব মন্দির ভেঙে ফেলেছিলেন, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী মোগল সম্রাট বাবরের কাছে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধই ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন।

আফাগানরাজ আদিলশাশোরের একজন সুযোগ্য মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন হিমু। তিনি মোগলদের বিরুদ্ধাচরণ করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেছিলেন। অবশেষে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি মোগল সম্রাট আকবর কিংবা কথিত আছে মোগল সম্রাট নাবালক আকবরের অধিকর্তা বৈরাম খাঁ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষে আফগান এবং মারাঠারা প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করেছিল। তার ফলে ঘটেছিল ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধও ভারতের ভাগ্য নিরূপণ করেছিল। কারণ এই যুদ্ধে আফগান এবং মারাঠারা পরস্পরের শক্তিক্ষয় করেছিল। আর তা বৃটিশদের ভারতবর্ষে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল।

ইতিহাস বরাবর এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, পানিপথ অথবা কুরুক্ষেত্রে যে পক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে তারাই হয়েছে ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা।

উপসংহারে বলি, মহাভারতে আছে—কুরুক্ষেত্রে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ মাত্রেই মানুষ পাপমুক্ত হয়। সেখানের বাতাসবাহিত ধুলিকণার স্পর্শে মানুষের মুক্তি লাভ ঘটে; সেই ধুলিকণা বাতাসে প্রথম গ্রহণ মানুষকে পবিত্র করে।

দেবরাজ ইন্দ্র এবং মহারাজ কুরুর সেই চুক্তি আজও অম্লান আছে—যারা এইস্থানে তপস্যায় অথবা যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করবে হে রাজেন্দ্র! তাদের অবশ্যই স্বর্গলাভ হবে।

মাছেদের দেবতা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

হাওড়া মাদ্রাজ মেলে চেপে গুরদা রোড ছাড়িয়ে যদি আবও দক্ষিণে যাও চিলকা হ্রদ পড়বে; আঁশটে গন্ধে ঘুম ভেঙে যাবে হয়ত, উঠে বসলে হ্রদটাও দেখতে পাবে—তারপর যেখানে গাড়ি থামবে সেটা হ'ল বহরমপুর। বহরমপুর গঞ্জাম বলা হয় শহরটাকে, যেখানে নেমে ১৪ কিলোমিটার বাস কি ট্যাকসী কি ঝটকায় গেলেই গোপালপুব। গোপালপুর-অন-সী; সমুদ্রতীরের গোপালপুর।

ভারী চমৎকার জায়গা। পাহাড়ে, সমুদ্রে, জলায় নারকেল ও বাদাম গাছের বনে ঝাউগাছে অতি মনোরম। সমুদ্রের ঢেউও বিশাল কিন্তু পুরীর মত চান করতে ভয় করে না। সে জন্যে আগে খুবই যেতুম। 'ত্য বিকণ' বলে একটা সুন্দর বাড়ি ছিল—এখনও আছে কিনা জানি না—সেখানে আরও দু তিনবাব থেকেছি। 'ব্লু হ্যাভেন' বলে একটা হোটেলেও থেকেছি। জায়গা ভাল, মাছ সস্তা, আম, কলা, আনারস অন্য জায়গার তুলনায় সস্তা তো বটেই—টাটকা জিনিস বলে খুব সুস্বাদু। মনেব আনন্দে কাটত ওখানে গেলে। কিন্তু একবার ভারি একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গিছলুম।

সমুদ্রের থেকে ব্যাকওয়াটার বা নোনা জলের মাছ বেশি সুস্বাদু, আঁশটে গন্ধও কম। আমরা সেখানেই যেতুম মাছ কিনতে জেলেরা যখন মাছ তোলে তখন তখনই গিয়ে কেনায় বেশ একটা থ্রিল আছে। তাই না? ঐভাবে কিনতে কিনতেই একটি নুলিয়া বা জেলের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিছল—তার নাম ভীম।

মানুষটা ভাল। বেশ হাসিখুশি। বিকেলের দিকে এক একদিন এমনিই চলে আসত, ওদের ঘর সংসারের গল্প করত বসে বসে।

একদিনে মাছ কিনে বাজার সেরে বাড়িতে এসে আর এক দাগ চা আর মাছ ভাজা খাচ্ছি হঠাৎ শুনি বাইরে একটা সোরগোল। বেরিয়ে দেখলাম বহু লোক—এদেশী, চেঞ্জারের দল—সব ছুটছে সমুদ্রের দিকে। তার মানে ঐ দিকেই কি একটা ঘটেছে।

তবে কি হাঙ্গর ধরা পড়েছে কারও জালে? কিন্তু যেখানে এত ব্রেকার—সেখানে তো হাঙ্গর থাকবার কথা নয়। তবে কি কেউ ডুবল? তবে তাতেই বা এত লোক ছুটবে কেন?

আমিও বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্ধু ইন্দুভূষণ, আব অভিজিৎ বলে একটি ছেলে—ছেলেটি অল্প বয়সেই ফ্লাইং অফিসার হয়েছিল, প্লেন ক্রাশেই মারা যায়।

তবে একেবারে সমুদ্রের ধার অবধি পৌঁছতে হ'ল না। তার আগেই কারণটা বোঝা গেল। দেখি হাঙ্গর নয়—একটা প্রকাণ্ড ভেটকি মাছ উঠেছে জালে, ধরেছে আমাদের ভীম (এদের উচ্চারণ ভীম্ অ)। তবে ভীম একা নয়, তিন চারজন মিলে এদেশে যেমন ভেলার মত একটা বড় কাঠ বেঁধে মাছ ধরে তেমনি একটা নিয়ে বেরিয়েছিল। এই নৌকোয় বড় জাল ফেলতে ফেলতে বহুদূর যায়, তারপর এক সময় টানতে টানতে পাড়ে নিয়ে আসে। আজ জাল ভারী দেখে ওদেরও ভয় হয়েছিল হাঙ্গর বলে। অতিকষ্টে, অন্য নুলিয়া ডেকে তুলে দেখেছে এই কাণ্ড; অতিকায় এক ভেটকি।

না, বড় মাছ বলতে আমরা যা বুঝি এ তার ধারে কাছেও যায় না। তেমন সাধারণ বড় মাছ হ'লে এত লোক দেখাব জন্যে ভীড় করে আসত না।

আমরা এত বড় মাছ কখনও দেখি নি, ভেটকি মাছ যে এত বড় হতে পারে তা ভাবতেও পারিনি কোনদিন। এক আধ মণ নয়, অন্তত আড়াই মণ হবে, বেশিও হ'তে পাবে।

কত যে বড় তা একটা কথাতেই বুঝতে পারবে। চারজন জোয়ান জেলে মাছটাকে মাথায় করে নিয়ে এসে ফেলল বাজারে—তাও অতিকষ্টে। তারাও কিছু কিছু গায়ে গায়ে ধরেনি, বেশ কিছুটা দূরে দূরেই ছিল—খুব কম হ'লে দেড় হাত অন্তর। তাতেই চারজন লেগেছে, তাও মাথা আর ল্যাজ খানিকটা তো শূন্যেই ঝুলছিল। চওড়াও সেই অনুপাতেই। সমস্ত গা শ্যাওলা ধরে হলদে হয়ে গেছে। কতদিনের যে মাছ তার হিসেব নেই। এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব ছিলেন দর্শকদের মধ্যে, তিনি বললেন, At least a hundred years old!

তা সে যাই হোক, বাজারে তো এসে পড়ল। এখন এ মাছ কাটা হয় কি করে? কেউ কেউ কুড়ুল আনল। তাতে থেঁৎলে যাবার ভয় আছে। শেষে ভীমই ছুটে গিয়ে এক ছুতোর মিস্ত্রীকে ধরে নিয়ে এল দুটি টাকার কড়ারে, সে-ই করাত দিয়ে কেটে ছ সাতটা টুকরো করে দিয়ে গেল।

কাটা তো হ'ল। কিনবে কে?

এত পাকা মাছ কে খাবে?

বাকী সারাটা দিন সেই মাছ নিয়ে বসে রইল ভীম আর তার সঙ্গীরা। ভোরবেলা 'ব্যাক ওয়াটারে' যা মাছ ধরেছিল তারই দামে ছুতোরকে দু টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকী কিছু চা-টা খেতে চলে গেছে। জালের ভাড়া দেওয়া যায়নি। নিজেদের ঘরে চাল তেল নিয়ে গেলে তবে রান্না চড়বে। এই মাছই ভরসা। ওদের হাতে কিছু থাকে না। যা থাকে খেয়ে আর নেশা করে উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু কেউই কিনল না।

বাঙালী বাবুরা তো নয়ই। সায়েবরা দুচারজন এসে দাঁড়িয়েছিল—শেওলা ধরা ঐ মাছের চেহারা দেখে সরে পড়ল।

শেষে বসে থেকে থেকে হতাশ হয়ে ওরাও উঠে যে যার বাড়ি গেল। এখন ধারে চাল কিনে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সে মাছের বিরাট বিরাট টুকরোগুলো পড়েই রইল। সন্ধ্যের দিকে নাকি দু একজন আদিবাসী এসে একটা বড় টুকরোয় দড়ি আটকে টানতে টানতে নিয়ে গিছল—পুড়িয়ে খাবে বলে। কিন্তু তাও শোনা গেল সুবিধে করতে পারেনি। বিস্তর কাঠই পুড়েছে—মাছ নরম হয়নি।

এরপর কথাটা ভুলেই গিছিলুম।

পরের দিন কখন ইন্দু গিয়ে ভীমের কাছ থেকে এক টাকায় আটাশটা পার্শে নিয়ে এসেছে। পরে আবার ভীম নিজে এসে কতকগুলো বড় চিংড়ি দিয়ে দশ আনা পয়সা নিয়ে গেছে। (এখনকার ৬২ পয়সা) কিছুই জানি না! তাস খেলে, আম আর মাছ ভাজা খেয়েই সকালটা কেটে যায়—রসদ কোথা থেকে আসছে, কে আনছে সে খবরে দরকার কি!

তিন চারদিন পরে একদিন বিকেলে একা বেড়াতে বেরিয়েছে, এক জায়গায় দেখি, শুকনো মুখে ভীম বসে আছে চুপ করে—হয় কদিন কিছু খায় নি, কিম্বা জ্বরে ভুগেছে এমনি চেহারা।

কী ব্যাপার ভীম ?' ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করি।

'আর বাবু সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের কেউ বাঁচবে না, বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।' সে কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে।

'সে আবার কি ? কী হয়েছে তোমার ?' ওর অবস্থা দেখে বড় মায়া হ'ল, পাশেই বালির ওপর বসে পড়লুম।

'বাবু, মানুষের যেমন ঠাকুর থাকে—দেওতা, আমরা যাদের পুজো করি—মাছেরও তেমনি আছে। সেদিন সে মাছটাকে ধরেছিলুম আমরা। করাত দিয়ে চিরে মেরেছি—সে এখানকার, এই দরিয়ার মাছের ঠাকুর।'

(এরা কি জানে কেন সমুদ্রকে দরিয়া বলে)

আমি হেসে বললাম ফেললাম, 'ধোৎ ! মাছের আবার দেবতা।'

ভীম চটে উঠল, 'বাবু আপনারা কিছু জানো না। সব হেসে উড়িয়ে দাও। ভগবান যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন—সকলকারই একটা করে ঠাকুর আছে। গরু, মোষ, বাঘ, সিংহ, কুকুর, মাছ—সব। আবার এক এক জঙ্গলে এক এক ঠাকুর, দরিয়াতেও তেমনি ! এ মাছটা আমাদের এদিকের ঠাকুর ছিল। ও হো হো—কী করলুম, নিজে হাতে নিজের সর্বনাশ করলুম। বোঝা উচিত ছিল—অত বড় আর অত পুরনো দেখে।'

বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল আবার।

আমি তো অবাক। লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি।

হাসা উচিত নয়। মুখখানাকে গম্ভীর করে বললুম, 'কি করে জানলে ?'

'আজ কদিন আমার জালে মাছ উঠছে না বাবু—'

'কেন, পরের দিনই তো অত মাছ দিয়েছিলে আমাদের।'

'সে আমার শালা আকুর সঙ্গে ছিল বলে। কেউ সঙ্গে থাকলে উঠছে, আমি একা জাল ফেললে একটা মাছও উঠছে না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কি ?'

'ঠাকুর আমাকে স্বপ্ন দিচ্ছেন যে···দেখছি ঐ মাছেরই চেহারা—কিন্তু মুখখানা ভয়ানক হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো বিকট, কথা বলার সময় মুখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে—আমাকে সব বিশ্রী বিশ্রী মন্থি মানে শাপ দিচ্ছেন, বলছেন, তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। পরপর দুদিন দেখলাম এই স্বপ্ন। এবার বুঝছেন আমি ঠিক বলছি কিনা।'

আমি তো যা বুঝলুম, অকারণ একটা ভয়ে ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

একটা আজগুবি কথা ঢুকেছে মাথায়—এত বড় মাছ যখন তখন মাছের ঠাকুর নিশ্চয়—এইটেই ভাবছে দিন রাত, তাই ঐ স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সেকথা ওকে কে বোঝাবে।

তবু একবার চেষ্টা করলুম, 'আবে যাঃ। স্বপ্ন কি সত্যি হয়। তুমি ঐ সব ভাবছ বলেই—।

'না বাবু ওসব বলে আমাকে ভুলিও না।' তাই যদি হবে—আমার জালে আর মাছ উঠছে না কেন!'

'কৈ চলো দিকি আমার সঙ্গে, আমার সামনে জাল ফেল—কেমন মাছ না ওঠে।'

'সে তো আপনার জন্যেই উঠবে বাবু। তা তো উঠছে। শাপটা শুধু আমার ওপরেই যে।'

বুঝলুম সত্যি কথা বোঝানো যাবে না। এ রোগের অন্য ওষুধ।

চোখ বুজে একটু চুপ করে থেকে বললুম, 'ঠিক আছে। তোমার জন্যে আমি আজ রাত্তিরে মা কালীকে টেনে আনব। মা কালী জানো তো—সব ঠাকুরের ওপর ঠাকুর—তাকে পুজো করে জিগ্যেস করব তোমার কথা। তিনি যদি হুকুম করেন, মাছের ঠাকুর আর কিচ্ছুটি করতে পারে না।'

'পারবে বাবু মাকে মাটিতে নামাতে। আপনার কথা শুনবে মা।'

শুনবে না মানে। আমি যে ব্রাহ্মণ—আমার কাজই তো এই। ব্রাহ্মণ বোঝ তো, পুজো পাঠই তো আমার কাজ।'

ভীম এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ পেল। টিপ করে একটা পেন্নাম ক'রে ফেলল।

পরের দিন ভোরবেলাই সে এসে হাজির। 'বাবু কি বললেন মা?'

কি বলব তা তো ভেবেই রেখেছি। বললুম, 'তোমার বরাত খুব ভাল ভীম। মা এক কথায় দয়া করলেন। এ শাপ কিসে কাটবে তাও বলে দিলেন। বললেন, না জেনে করেছে ছেলেটা, ওর অত কিছু করতে হবে না। তুই গিয়ে ওর নামে পুজো দিস, তাতেই হবে।'

'তা পুজো হবে কি রকম? অনেক খরচ পড়বে?'

'কিচ্ছু না। তুমি একটা নারকেল আর তিনটে অন্য ফল, কিছু ফুল নিয়ে এসো। একটা আসন চাই, একটু কাঠ-কুঠো দিয়ে আগুন করবে, পিদীম তো জ্বালানো যাবে না।'

আমি চান করে তো সামনে গিয়ে বসলুম। গায়ত্রী মন্ত্রটা জানা ছিল, বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেটাই আওড়ালুম বারকতক। বন্ধুদের যেতে বারণ করেছিলুম আগেই—ওরা হেসে সব মাটি করে দেবে।

মন্ত্রপাঠ হলে জলের ধারে গিয়ে ফুল ফেললুম কিছু কিছু করে—পুষ্পাঞ্জলির মত, ওকে দিয়েও ফেলালুম। তারপর নারকেল ভেঙ্গে তার জলটাও দেওয়ালুম। এদেশেও এটা খুব মানে, সব পুজোতেই নারকেলের জল দেয়।

সে পর্ব শেষ হলে ওকে বললুম, 'এবার ঐ তিনটে ফল নিয়ে তুমি জলে নেমে যাও, ঠাকুরের চেহারাটা মনে করে, তাঁকে মনে মনে ডেকে, মাপ চেয়ে নিয়ে একে একে ফলগুলো জলে ভাসিয়ে দাও, তাতেই ভাল ফল পাবে।'

ভীমের বরাত ভাল। সেই সঙ্গে আমারও। ভীম বুক অবধি জলে নেমে ঠাকুরকে ডাকছে আর একটা করে ফল জলে ফেলছে—হঠাৎ একটা ঢেউ ভেঙে একটা কি ছোট মাছ তিড়িং করে এসে পড়ল ওর গায়ে—গলার কাছে।

আর যায় কোথায়। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'হয়েছে হয়েছে, ঠাকুর খুশি হয়েছে। দেখলে তো, নিজে থেকে তোমাকে মাছ দিয়েছেন।'

ভীমও তাই বুঝল। আমাকে অনেক পেন্নাম করে তখনই ছুটে বাড়ি থেকে জাল নিয়ে এসে জলে নেমে গেল আবার।

তারপর থেকে যে আমাদের আর মাছ কিনে খেতে হয়নি--সে কথাটা আশা করি আর বলে দিতে হবে না।

দুর্গোৎসব

অর্চনা চক্রবর্ত্তী (সভ্যা, ১০)

চৌদিকে আজ ফুল ফুটেছে
দেখবি তোরা আয়—
কালকে মোদের দুর্গা পুজো
দেব মার পায়।

মাকে আমরা বলব সবাই
আর কে আছে মা—
এই জাগতে ছড়িয়ে আছে
তোমার মহিমা।

সিপাহী বিদ্রোহ

আবীর দত্ত চৌধুরী, (সভ্য, ১১)

অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝন,
শক্ত করে যে মন।
পথের ধারেতে কামান
তার গোলা বেগে ধাবমান,
গল্প যে 'সিপাহী বিদ্রোহ'
ইংরেজ তুমি সত্যবাদী নহ।
তুমি যে লিখেছ ইতিহাস
সে যে কেবলই পরিহাস।

দূর্গাপূজার একটু কথা

চয়ন সমাদ্দার (সভ্য, ৯)

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে প্রকৃতি যখন অপরূপ রূপে সাজে, তখন চারদিকে যেন শোনা যায় উৎসবের বাঁশী। এই সুন্দর শরৎকালে আমরা আবাহন করি দেবী মহামায়াকে। দেবীর চরণে অর্ঘ দেবার জন্য প্রকৃতিও যেন তার ডালি পূর্ণ করে নানান ফুলে। শিউলি ফুল তার গন্ধে ঘোষণা করে মা আসছেন। শালুক, পদ্মের মেলা বসে যায় খালে-বিলে নদীতে। এই দেবী মহামায়াকে আমরা কল্পনা করি জননীরূপে, কন্যারূপে। শস্যশ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ যে দেবী মহামায়ার বাপের বাড়ি। কিন্তু এত সময় থাকতে আমরা শরৎকালেই কেন দেবীর আহ্বান করি—এ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে।

বিশ্বকর্মার পুত্র নলের সাহায্যে রামচন্দ্র তো সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় পৌঁছলেন। কিন্তু রাবণকে তো আর কিছুতেই পরাজিত করতে পারছেন না। তখন তিনি স্থির করলেন শক্তিরূপিনী দেবী মহাশক্তি মহামায়াকে পূজা করে সন্তুষ্ট করবেন, আর রাবণ নিধনের বর প্রার্থনা করবেন। দেবীদহ বলে একটি জায়গায় ফুটত প্রচুর নীল পদ্ম। রামচন্দ্র ঠিক করলেন তিনি দেবীর চরণে একশ আটটি নীল পদ্ম দিয়ে পাদ্য অর্ঘ দেবেন। তার অনুরোধে হনুমান নিয়ে এলেন একশ আটটি নীল পদ্ম। কিন্তু দেবী মহামায়ার লীলা বোঝা ভার। তিনি রামচন্দ্রকে পরীক্ষা করবার জন্য হরণ করলেন একটি নীল পদ্ম। রামচন্দ্র তো একটি পদ্ম কম দেখে হনুমানকে অনুরোধ করলেন আর একটি পদ্ম আনতে। তখন হনুমান কি বলেছিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে,

"শুনহে গোঁসাই
আর পদ্ম নাই
দেবী দহে বনমালী।"

তখন রামচন্দ্র চিন্তা করলেন যে সবাই বলে তার চোখ নীল পদ্মের মতো। সেই চোখ দিয়েই তিনি দেবীর পূজা শেষ করবেন। এই বলে তিনি ধনুকে তীর যোজনা করে জ্যা আকর্ষণ করতে যাবেন তখনই দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে পদ্মটি ফিরিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গার আবাহন করে-ছিলেন বলেই তারপর থেকে আমরা দূর্গাপূজা করি এই শরৎকালে। এইজন্যই এই পূজার নাম শারদোৎসব। আবাহন করি দুর্গতিনাশিনী রূপে, জননী রূপে, কন্যা রূপে। মা মহামায়াকে করে নিয়েছি আমাদের ঘরের লোক। আজ দেবী পূজার প্রাক্কালে আমার প্রার্থনা—মা দূর্গা আসুন সবার অন্তরে আনন্দের দোলা লাগিয়ে, আমরা সবাই সেই আনন্দের অংশ নেব। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই মেতে উঠব মার আগমনী উৎসবে।

মহাত্মা গান্ধী স্মরণে

রুমা রায় (সভ্যা, ১২)

আগামী ২রা অক্টোবর ১৯৮১তে আমরা আমাদের জাতির মহান সন্তান গান্ধীজীর ১১২তম জন্মজয়ন্তী পালন করব। এই মহামানব যাঁর অবদান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিদেশী বণিকের শোষণের বিরুদ্ধে, দেশবাসীর মুক্তি সংগ্রামে অসামান্য আত্মত্যাগ রেখে গেছেন, যা আমরা তার উত্তরকালের বংশধরেরা পবিত্র মর্যাদার মধ্য দিয়ে তাকে স্মরণ করব। গুজরাটের পোরবন্দরের বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর আইন ব্যবসার প্রয়োজনে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে শ্বেতাঙ্গ সরকারের হাতে তথাকার বসবাসকারী ভারতীয়দের নিগ্রহের প্রতিবাদে এক আন্দোলন শুরু করেন যা আজ সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত এবং যা ছিল তার সমগ্র জীবনের সমস্ত আন্দোলনের মূলমন্ত্র। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল অহিংস থেকে আত্মনিগ্রহের দ্বারা শত্রুকে স্বমতে আনা। এই পদ্ধতির দ্বারা জনমত গঠন করে সার্বিক ভাবে দেশ ও জাতির সকল অসাম্য ও বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে তার সকল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। জাতিভেদের ক্ষেত্রে হোক, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হোক, অসাম্যের বিরুদ্ধে হোক সকল ক্ষেত্রে তাঁর এই আন্দোলন পদ্ধতি জাতির মনে এক বিস্ময়ের ছাপ রেখে গেছে। নীলকরের বিরুদ্ধে চম্পারনের (বিহার) নীলচাষীদের ও গুজরাটের সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁকে প্রথম ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তৎকালীন বিদেশী শাসকরা গান্ধীজীর এই আন্দোলনকে এমন ভয় করতেন যে তাঁকে ঐ আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার উদ্দেশ্যে বার বার গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছেন। রাওলাট আইন প্রবর্তন করার পরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল গান্ধীজীকে কটক সরকার গ্রেপ্তার না করে পারেন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েও ইংরেজ সরকার যা শেষ করতে পারেন নি, তার এই আন্দোলনের পদ্ধতি ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন সংগ্রামে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। দেশের মুক্তির সংগ্রামে যে রণ প্রসঙ্গে তাঁহার সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী তার নিজস্ব মতামতের সার্থকতা প্রমাণ করে গেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তার এই অবদান ভুলবার নয়। সহযোগীদের সঙ্গে কখনও যখনও মতবিরোধ ঘটলেও তিনি তাঁর নিজস্ব মত থেকে দূরে সরে যান নি।

শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন গঠন-মূলক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর পরিচয় আমাদের অজানা নয়। চরকায় সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, জাতির স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা তার বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যক্রমের অন্তর্গত।

মানব দরদী হিসাবে যে ছাপ তিনি সমগ্র মানব জাতির কাছে রেখে গেছেন, যুগ যুগ ধরে আমরা সেগুলো স্মরণ না করে পারি না। অস্পৃশ্য দূরীকরণে তাঁর ভূমিকা, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের তাঁর প্রচেষ্টা, আর্তের সেবায়। দারিদ্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী চিন্তা ভাবনা ও কার্য্যক্রম আমাদের শিশুমনকে আজও ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত শক্তির মদমত্ততায় হিংস্র নীতির বিরুদ্ধে অহিংসা আন্দোলন সম্বন্ধে অনেকের যে সন্দেহ রয়ে গেছে তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে উড়িয়ে না দিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংস আন্দোলন ভারতবাসী তথা সমগ্র মানব জাতির এক বিস্ময় সৃষ্টি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা তার উত্তরসূরীরা আগামী জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে তার প্রতিষ্ঠিত মত ও পথে আগামী পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাবার স্বপ্ন দেখার এবং আমাদের কর্তব্য পালনে এগিয়ে যাব।

তাঁর আরব্ধ কাজের অনেক এখন বাকী রয়ে গেছে। সেগুলো সম্পাদন করতে পারলে তাঁর প্রতি আমরা যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারব। এই হোক তাঁর ১১২তম জন্মদিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

কালীপূজা

অর্পিতা মজুমদার (সভ্যা, ১২)

দুম্—ফটাস ফাটল বাজি
কালীপূজায় আমরা রাজি।
ফাটাব তুবড়ি ওড়াব হাওয়াই
আবার ঘুড়িতে দেব দাওয়াই।
চরকি ঘোরাব, ওড়াব ফানুস
আমাদের জ্বালায় জ্বলবে মানুষ।
ড্যাম্ কুড় কুড় বাদ্যি বাজে
মা এসেছেন পূজার সাজে।

লিমেরিক

সুনীল কান্তি সেনগুপ্ত

রাম আর শ্যাম ছিল হরহরি আত্মা,
এখন রামকে শ্যাম নাহি দেয় পাত্তা।
বরং সুযোগ পেলে
দরকারি কাজ ফেলে
পেছনেতে ধাওয়া করে মারে এক গাঁট্টা

পূজো আসছে

বিদ্যুৎ বন্দোপাধ্যায় (সভ্য, ১০)

বর্ষা গেল, শরৎ এল
স্কুলে পূজার ছুটি এল।
ভাবছি বসে মনে মনে
আসবে কবে মোদের পূজো
অনেক আগেই কেনা আছে
নতুন জামা, নতুন জুতো।
ষষ্ঠির দিনে আসবে মা
ছেলে পুলে সঙ্গে নিয়ে—
সারা বছর থাকেন তিনি
শোকে দুঃখে স্বামী গৃহে।
আকাশ দিয়ে শরতের মেঘ
যাচ্ছে হাওয়ায় উড়ে উড়ে,
আকাশ, বাতাস ভরে ওঠে
আগমনীর গানের সুরে।
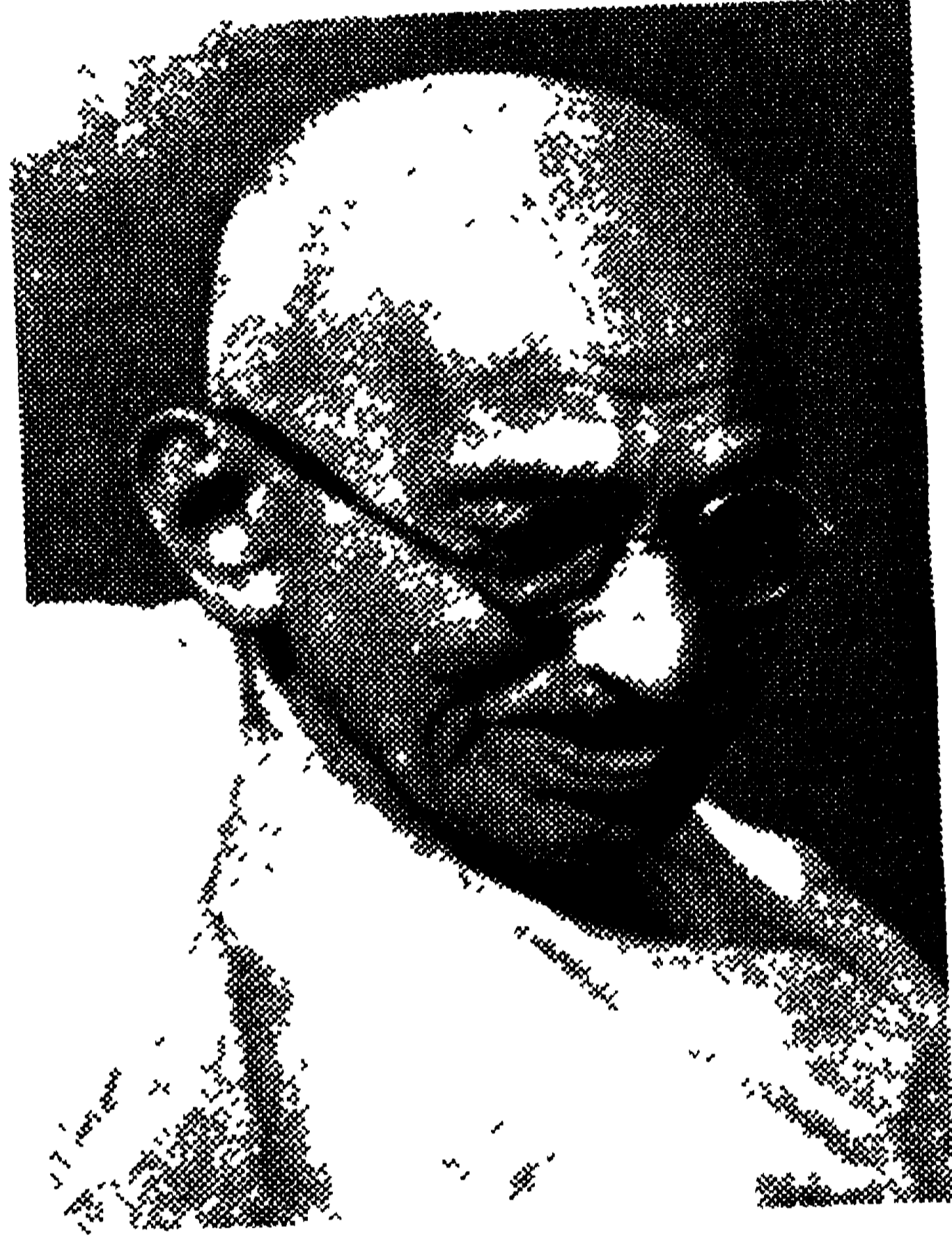
'প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের,
শক্তি বীজের বীজী,
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার—,
এই সেই গান্ধীজী!'

—সত্যেন্দ্রনাথ

বাপুজী

চন্দ্রনাথ রায়। সভ্য, ১৪

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাদের দেখা পাই নে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি, দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ যাঁর তুলনা নেই তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।"

উল্লিখিত অংশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উল্লিখিত মহাপুরুষ হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ভারতের মানুষ, ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন, ভারতের জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু এ নামে তিনি ততটা পরিচিত নন। অনেকেই হয়ত তাকে চিনতে পারবে না। আবার যদি বলি তাঁর নাম 'মহাত্মা গান্ধী' অথবা যদি বলি তার নাম 'গান্ধীজী' অথবা 'বাপুজী', তাহলে সকলে সেই মুহূর্তে মাথা নেড়ে বলবে, 'চিনতে পেরেছি।' তিনি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে স্বাধীন করেছিলেন। এখানেও বিপদ। অনেকেই জানে না তার আসল পরিচয়। তিনি যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছেন, এ কথাটিকে অস্বীকার করতে পারব না। এ এক নির্ভুল সত্য। কিন্তু তার দেহের মধ্যে মনের অন্দরে যে অদৃশ্য মানুষটি লুকিয়ে ছিল সে মিথ্যে কথা বলতে পারে না, অন্যায়কে সহ্য করতে পারে না, লোভ করতে পারে না, অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তিনি সত্য কথা বলতেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন, নির্লোভ ছিলেন এবং সত্যের পূজো করতেন। আমরা করি দেবতার পূজো, তিনি করতেন সত্যের পূজো। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী, সত্য ছিল তাঁর দেবতা।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে এটাই সম্পূর্ণ নয়, কারণ মানব জাতির পক্ষে প্রায় অসম্ভব এক কাজকে তিনি সম্ভব করেছিলেন। মানুষের এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা না বললে তাঁর মহৎ কর্মের বড় অংশই বলা হবে না। সাধারণত মানুষ হিংসা, ক্রোধ বর্জন করতে পারে না। কারণ অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এইগুলো থাকে। কিন্তু প্রকৃত মানুষের মধ্যে এইগুলো থাকে না। গান্ধীজীর পক্ষে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। এর কারণ, গান্ধীজী প্রকৃত মানুষ ছিলেন। কেউ ভাবতে পারে যে উল্লিখিত মিথ্যা কথা বলতে না পারা প্রভৃতি গুণগুলো মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু, তারা চেষ্টা করলে দেখবে যে এও সম্ভব। মানব সমাজের মধ্যে কখনও কখনও এমন লোক দেখতে পাওয়া যায় যিনি এইসব গুণের অধিকারী।

মহাত্মা গান্ধী অসাধারণ ছিলেন। তিনি হিংসা, ক্রোধ পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন মানুষকে নির্লোভ অহিংস এবং অক্রোধী হবার চেষ্টা করতে হবে। ফুলের গন্ধে যেমন ভ্রমর মধুর লোভে ছুটে আসে, গান্ধীজীর ডাকেও সেদিন শত শত মানুষ দৌড়ে এসেছিল। তারা সফল না হলেও চেষ্টা করেছিল। এই বড় কথা। গান্ধীজী নিজে নির্লোভ, অক্রোধী এবং অহিংস হয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি অপরকেও তা হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমানদের এক হবার কথা বলেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করার। কারোর মধ্যে অসাধারণত্ব না থাকলে এই ভয়ানক কাজ করবার সাহস হবে না। এ যেমন কঠিন, তেমন ভয়ংকর, বিপজ্জনক। গাছ যেমন তার অজস্র ডালপালা চারিদিকে বিস্তার করে। সেই ডালের শাখা প্রশাখা আছে, পাতা আছে, ফুল, ফল, কুঁড়ি আছে, গাছের শেকড় আছে। প্রত্যেকেই একটা কাজ করে। গাছকে ঝড়, বৃষ্টি, দুর্যোগ কোনকিছুই টলাতে পারে না, পরাস্ত করতে পারে না। কারণ গাছের নিজস্ব ক্ষমতা আছে। গাছ কারো সাহায্য নেয় না প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে বাঁচবার জন্য। মহাত্মা গান্ধীকে সু-স্বাস্থ্য গাছের সাথে তুলনা করা চলে। তাঁর প্রতিভা গাছের ডালপালার মত চারদিকে বিস্তারিত। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করতে পারত। একে কোনো প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, পরাস্ত করতে পারে নি। তিনি ধনী দারিদ্র বা উঁচু নীচের মধ্যে কোনো পার্থক্য জানতেন না। তিনি বুঝতেন যে হিন্দু মুসলমান ধনী দরিদ্র সবাই মানুষ। 'মানুষ' কথাটিই তাদের বড় পরিচয়, সমগ্র মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁকে বলা হয় অহিংসা ও সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি মানুষের দুঃখ, কষ্ট বুঝতেন এব তা প্রতিকারের চেষ্টা করতেন।

পড়াশুনা করতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বিলেতে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিরামিষাশী। ইংল্যাণ্ডে তাঁর ইংরেজ বন্ধু তাঁকে মাংসভোজী করবার চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীজী কিন্তু মাংস খেতে পারলেন না। আত্মজীবনীতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'My faith in vegitarianism grew on me from day to day.'

কিন্তু, অন্য বিষয়ে বন্ধুকে খুশি করবার জন্য পোশাক পরিচ্ছদ ও আচরণে ইংরাজী ভাবধারা গ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন। গুজরাটি পোশাক ছেড়ে সেখানকার ফ্যাশনের ইংরাজী পোশাক পড়লেন। ঘড়িতে সোনার চেন লাগালেন। প্রতিদিন দশ মিনিট করে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালেন। এবং নাচ, ফরাসী ভাষা ও কবিতা পাঠের শিক্ষা নিতে শুরু করলেন। নাচের সময় কিন্তু তিনি পিয়ানোর সঙ্গে তাল রেখে নাচতে পারতেন না। তিনি ভাবলেন যে, ইঁদুর মারতে হলে বিড়ালের প্রয়োজন বিড়ালের দুধের জন্য গরুর প্রয়োজন, গরুকে রাখবার জন্যে একজন লোক প্রয়োজন। তাহলে তিনি বেহালা বাজাতে শিখবেন। ভাবনামত তিনি বেহালা বাজান শিক্ষা শুরু করলেন। বেহালার জন্য আরও একজন শিক্ষক রাখলেন।

(শেষাংশ ৪৯ পাতায়)

ডাকাবুকোদের কাহিনী

তবু যেতে হবে

সিন্ধবাদ

যে দিকে তাকাও, যত দূর চোখ যায় ধু ধু বালির সীমাহীন সমুদ্র। একলা একজন মানুষ চলেছেন তার মধ্য দিয়ে, ধীর গতিতে, সন্তর্পণে। তাড়া-হুড়োর কাজ নয়, যেতে হবে হাজার হাজার মাইল, পাহাড় পর্বত, মরু-প্রান্তর পেরিয়ে, পথেরও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোন সুদূর অতীতে চীন থেকে ভারতে সে পথে যাওয়া আসা করত বটে বণিকেরা, কিন্তু এখন আর তার হদিশ পাওয়া মুস্কিল। তবু যাওয়া যাবে সেই পথে, নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকের দৃঢ় বিশ্বাস, তবুও যেতে হবে, তাঁর অটল সংকল্প।

হঠাৎ, এ কী। একদল সৈন্য সেই বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করছে। বাতাসে উড়ছে তাদের পতাকা, সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে তাদের বর্শা-ফলক। সেই শীতের দেশের উপযোগী পশুলোমের পোশাক তাদের গায়ে আঁটা। তারা চলেছে কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ উটের পিঠে চেপে। দেখতে দেখতে আবার হাজার হাজার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই মনে হয় তারা অনেক দূরে চলে গেল, এই আবার তারা সামনা সামনি। হঠাৎ ভোজবাজির মত সব মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

প্রথমে পরিব্রাজক ভেবেছিলেন এরা মরুভূমির দস্যু। তারপর চোখের সামনে তাদের অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে বুঝলেন তা নয়। গোবি মরুভূমিতে নানা রকম ভূত-প্রেতের বিচরণের কথা প্রচলিত ছিল স্মরণাতীত কাল থেকে। এ হয়ত তাদেরই কীর্তি, মায়া। ভয় পাবার কথাই বটে, কিন্তু কে যেন পরিব্রাজকের কানে কানে বলল, "ভয় পেও না, ভয় পেও না।'

মধ্য এশিয়ার বিশাল ভয়ংকর গোবি মরুভূমি দিয়ে এই যে চীনা পরিব্রাজক একটি ঘোড়ায় চেপে একা চলেছেন তাঁর নাম হিউয়েন-সাং, কিংবা অনেকে বলেন য়ুয়ান সা। চীনের বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীরের পশ্চিম প্রান্তের কাছে অবস্থিত ল্যানচাও থেকে রওনা হয়ে সেই প্রাচীন বাণিজ্য পথ দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, নানশান পর্বতের পাদদেশ হয়ে, দক্ষিণ গোবি পেরিয়ে, তারপর আরেকটি মরুভূমি, যার নাম শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেই টাকলামাকান অতিক্রম করে যাবেন ইয়ারখন্দ, কাশগর, তারপর সেখান থেকে দক্ষিণ মুখে পামির মালভূমি এবং হিন্দুকুশ পর্বতের বাধা পেরিয়ে পেশোয়ার। তারপর ? কোথায় তাঁর পথের শেষ ? ভারতবর্ষ।

২৯ বছর বয়সের যুবা, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিউয়েন সা দিনের পর দিন, মাসের পর মাসও এমন কষ্ট স্বীকার করে যা আমাদের কল্পনার অতীত, এমন

বিপদ বাধা জয় করে যা অতি বড় বীর-পুরুষকেও দমিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, স্থির, অবিচল সাহস আর ভরসা বুকের মধ্যে জাগিয়ে রেখে, কেন চলেছেন সুদূর ভারতবর্ষের অভিমুখে ?

আর কিছু নয়, গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান ভারতবর্ষ বৌদ্ধশাস্ত্রের মহামল্যবান গ্রন্থরাজির আকর ভারতবর্ষ। শুধু সেই জন্যে। সেই সব গ্রন্থ তিনি যত পারেন সংগ্রহ করবেন, আর সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে দর্শন করবেন বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত যত তীর্থস্থান।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে রওনা হয়ে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এদেশে এসে পৌঁছন। হর্ষবর্ধন তখন কনৌজের সিংহাসনে। প্রায় আট বছর এ দেশে কাটিয়ে হিউয়েন-সাং নিজের দেশে ফিরে যান। তিনি ফিরে গেলেন, কিন্তু তাঁর নামটি অক্ষয় হয়ে থাকল আমাদের ইতিহাসে। সেই যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস যে জানতে চায় হিউয়েন সাংকে স্মরণ না করে তার উপায় নেই। তাঁর লেখা ভারতবর্ষের বিবরণ যদি আমরা না পেতাম একটা বিরাট ফাঁক থেকে যেত স্বদেশের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানে। শুধু একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। হর্ষবর্ধন কি আশ্চর্য সম্রাট ছিলেন তোমরা নিশ্চয় জান। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগের সঙ্গমে তিনি কি কাণ্ড করতেন, কে না জানে তার কথা। ৭৫ দিনের এক উৎসবে তিনি গত পাঁচ বছরে তাঁর সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন, দুহাতে বিলিয়ে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত যখন পরণের পোশাকটি ছাড়া নিজের বলতে আর কিছুই থাকত না, তখন সেটিও খুলে নিয়ে কাউকে দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচতেন। তারপর বোন রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে পুরনো জামা কাপড় চেয়ে নিয়ে তাই পরতেন। হিউয়েন-সাং নিজের চোখে এই অবিশ্বাস্য উৎসব দেখেছেন আর তার বিবরণ লিখে গেছেন।

যাই হোক, সে সব তো অনেক পরের কথা। এখন কোথায় ভারতবর্ষ ? এখন তো হিউয়েন সাং গোবি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন পশ্চিমদিকে। কোথাও মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। অনেকক্ষণ আগেই শূন্যে মিলিয়ে গেছে সেইসব অশরীরী সৈন্যসামন্ত। চোখেরই ভুল কিনা কে জানে। মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়া খেলান ধূ ধূ বালির প্রান্তরে এ রকম অনেক মায়া বিভ্রমের কথা ভ্রমণকারীরা বলে গেছেন।

হিউয়েন চলেছেন। তার দৃষ্টি একটু বেশি সজাগ হয়ে উঠল। দূরে ওই একটা মিনার দেখা দেখা যাচ্ছে না ? তিনি দেখেই বুঝলেন ওটা একটা সরকারী প্রহরী মিনার। সান্ত্রীরা ওখানে পাহারা দিচ্ছে চারদিকে চোখ রেখে। দেখে ফেললে ওরা কি করবে, আর এগোতে দেবে কিনা কে জানে। হিউয়েন লুকিয়ে থাকলেন বালিতে একটা গর্তের মধ্যে রাত পর্যন্ত। তারপর মিনারটা পেরিয়ে যেতে যাবেন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে, হঠাৎ চোখে পড়ল এক জায়গায় কী যেন চকচক করে উঠল। জল। তাড়াতাড়ি গিয়ে হিউয়েন দেখেন সত্যিই জল। তিনি আঁজলাভরে খেয়ে নিলেন, হাত, মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর জলের পাত্রটি ভরছেন, এমন সময়ে শাঁ করে একটা তীর কোথা থেকে ছুটে এসে তার গা ঘেঁষে চলে গেল। আবার একটা।

আর লুকোচুরি করে লাভ নেই, ধরা পড়ে গেছেন। হিউয়েন চীৎকার করে বললেন, "তীর

ছুঁড়বেন না, আমি ধর্মযাজক, রাজধানী থেকে আসছি।" ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে তিনি মিনারের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গেট খুলে বেরিয়ে এল প্রহরীরা। ভাল করে দেখে নিল তারা হিউয়েনকে। ধর্মযাজকই বটে।

প্রহরীদের প্রধানের নাম ওয়াং-সিয়াং। তিনিও ভাল করে দেখে বললেন, "এখানকার তো নন, আপনি রাজধানী থেকে আসছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন আপনি বেরিয়েছেন এই দুর্গম পথে, কোথায় যাচ্ছেন?"

হিউয়েন বললেন, "ক্যাপটেন, আপনি ল্যানচাওয়ে কারো মুখে হিউয়েন সাং নামে একজন ধর্মযাজকের কথা শোনেননি, যিনি গৌতম বুদ্ধের দেশে যাচ্ছেন ধর্মশাস্ত্রের সন্ধানে?"

প্রথমে ক্যাপটেন বিশ্বাস করতে চান না। শেষকালে যখন বিশ্বাস হল তখন তিনি বললেন, "পশ্চিমের পথ অতি দীর্ঘ এবং বিপদসঙ্কুল। আপনি পারবেন না সে পথ অতিক্রম করে যেতে। কিন্তু আমি আপনাকে বাধা দেব না। টুন হুয়াং-এ আমার বাড়ি। আমি নিজেই সঙ্গে করে সে পর্যন্ত নিয়ে যাব আপনাকে।

সকালবেলা হিউয়েনের সঙ্গে মাইল চারেক পথ এসে ক্যাপটেন বললেন, "এখান থেকে সিধে রাস্তায় গেলে চার নম্বর প্রহরী মিনার। সেখানকার ক্যাপটেন ভাল লোক, আমার আত্মীয়! তাঁকে আমার নাম বলবেন।" ক্যাপটেন চোখে জল নিয়ে ফিরে গেলেন।

[পরের সংখ্যায় সমাপ্য]

(৪৬ পাতার শেষাংশ)

বাগ্মিতা শেখবার জন্য একজন বাক্‌পটু ব্যক্তির শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু, এখানেই সব আয়োজন ব্যর্থ হ'ল। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তঁার আত্মজীবনীতে 'The story of my experiments with truth', বইতে তিনি লিখেছেন 'I was a student and ought to go on with my studies. I should qualify myself to join the Inns of court. If my character made a gentleman of me, so much the better. Otherwise I should for go the ambition.'

এমনি মানুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতের অতীতকাল থেকে রামচন্দ্রের মত মানুষ জন্মগ্রহণ করে আসছে। মহাত্মা গান্ধী সদাসর্বদা রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করতেন এবং তঁার ছিল ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণ। ভারতবাসী আনন্দের সঙ্গে এই মুকুটহীন রাজাকে গ্রহণ করে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তঁার মৃত্যুতেও মোহনীয় হয়ে উঠেন। ভারতবর্ষের এই বরেণ্য পুরুষকে তাঁর জন্মদিনে প্রণাম জানাই।

জন্মদিনের উপহার
আনন্দ তার বোন শীলাকে
মেলায় এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে
এক বেদে কুকুরছানা বিক্রি করছে।
–ইস, কি মিষ্টি আমি এটা কিনবো।
–মাত্র ১০০ টাকা।
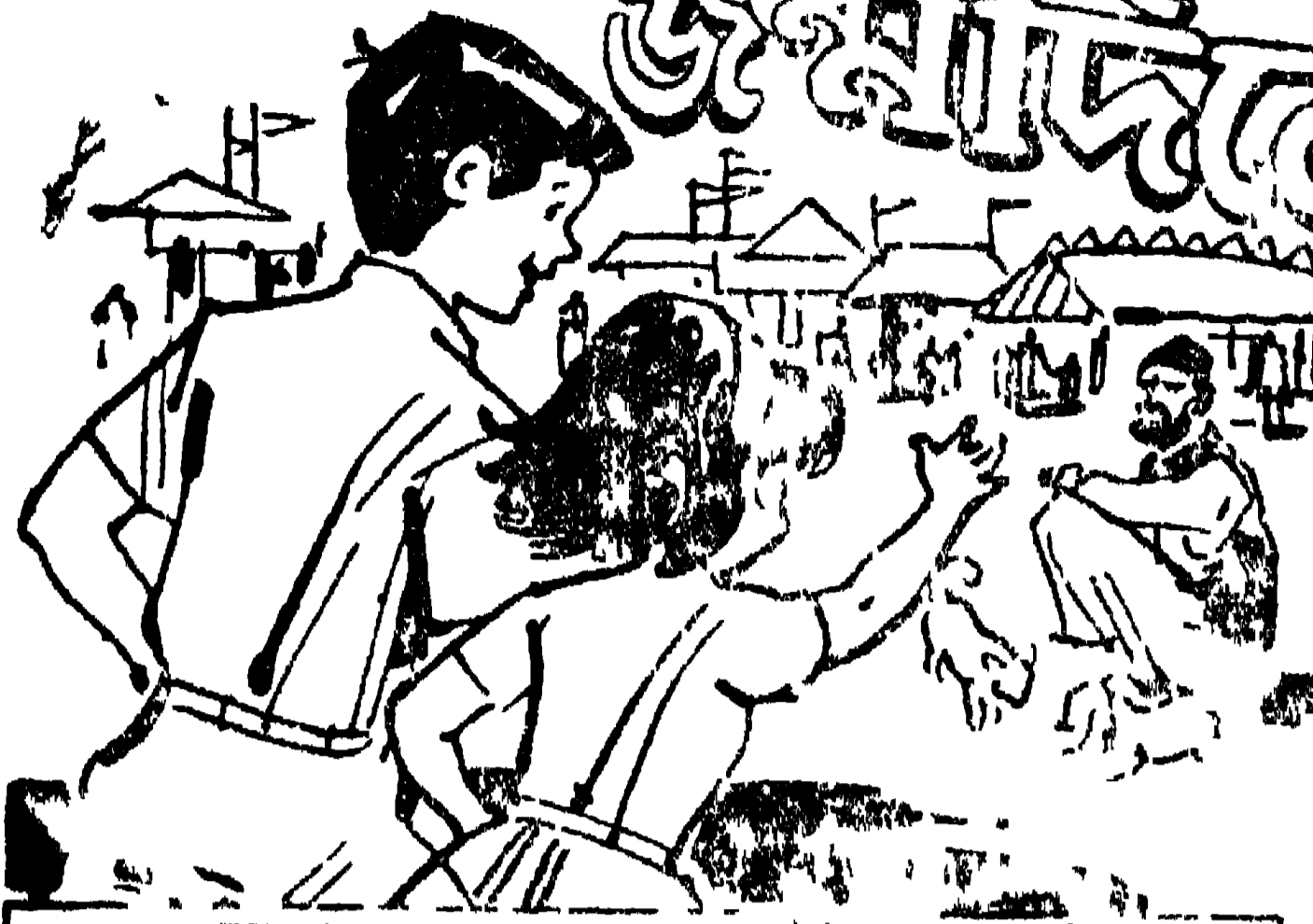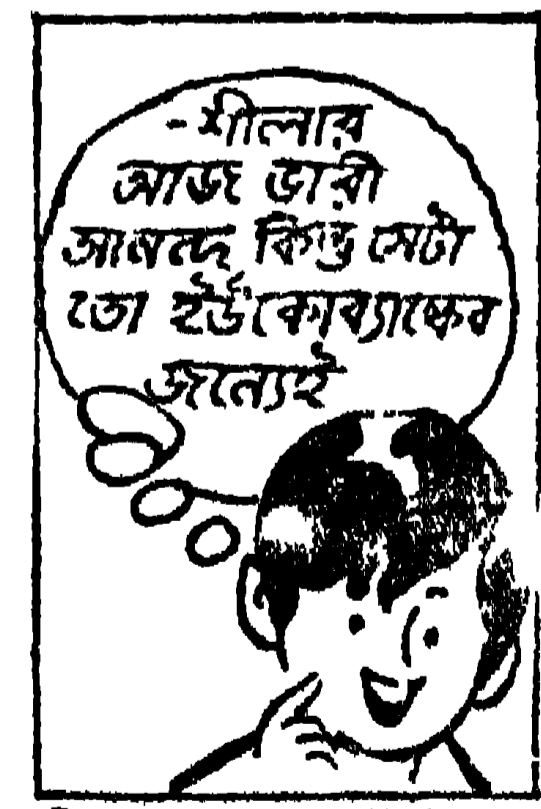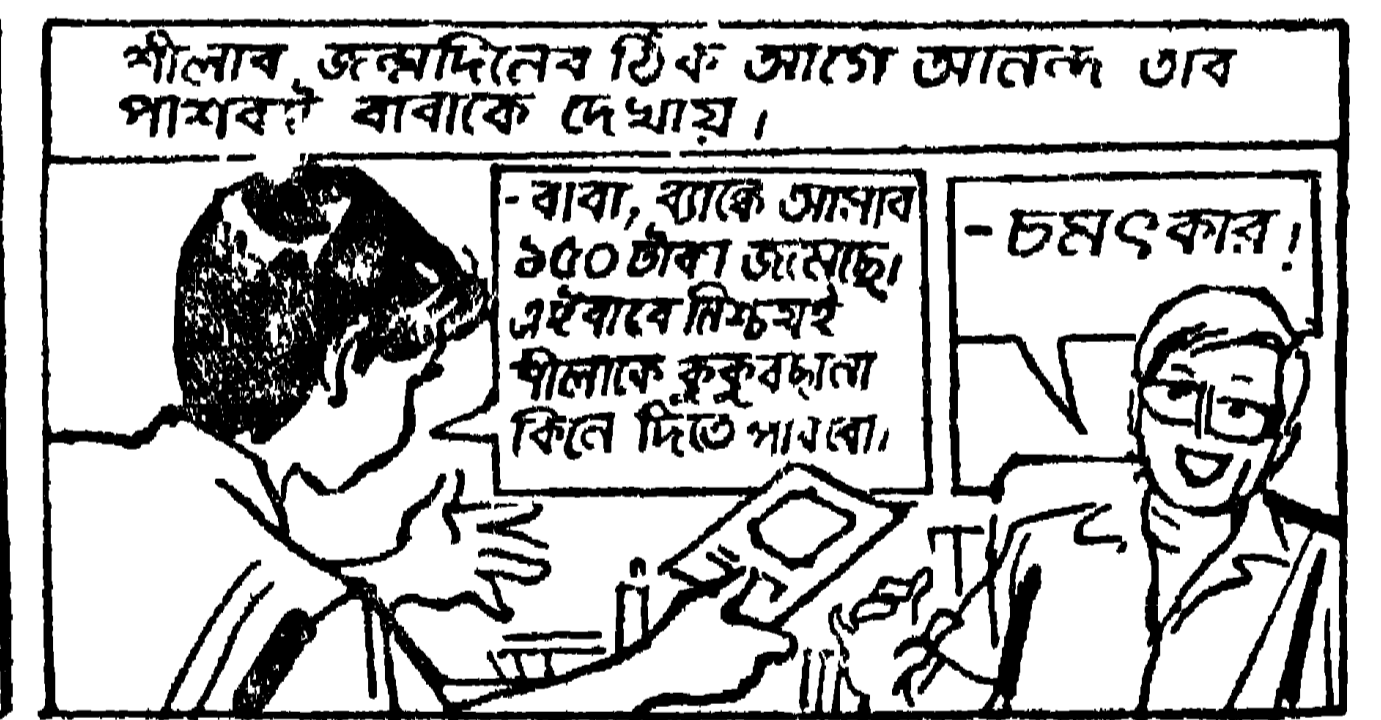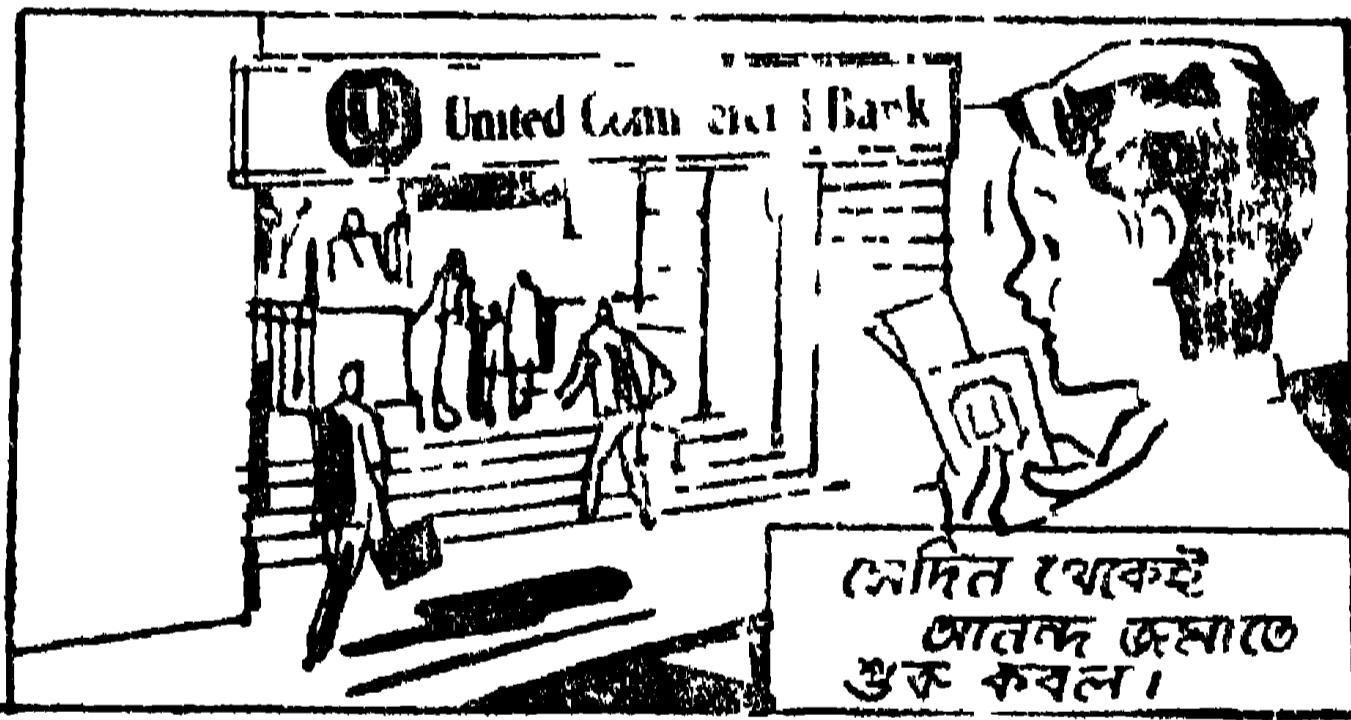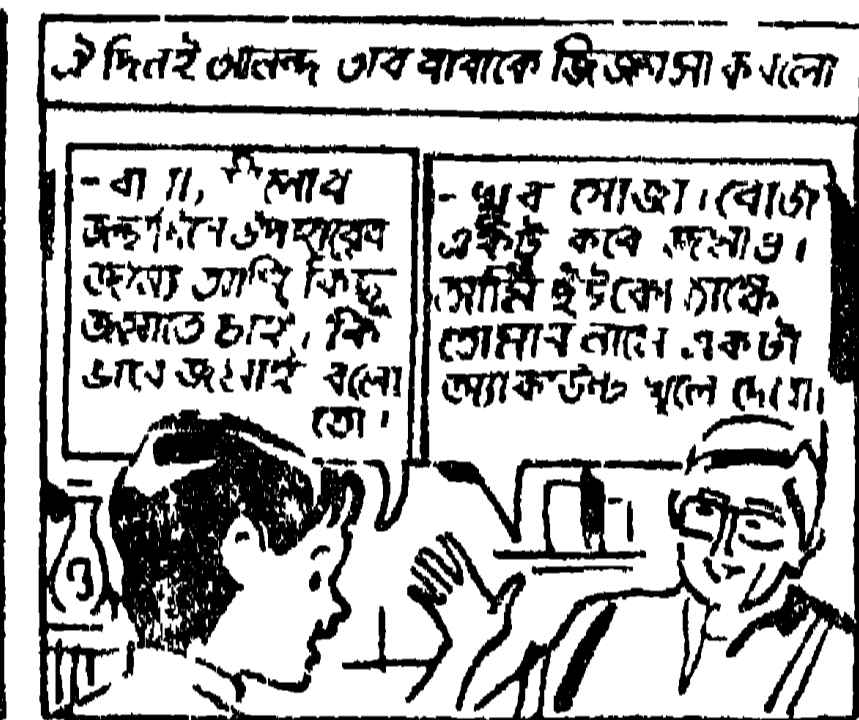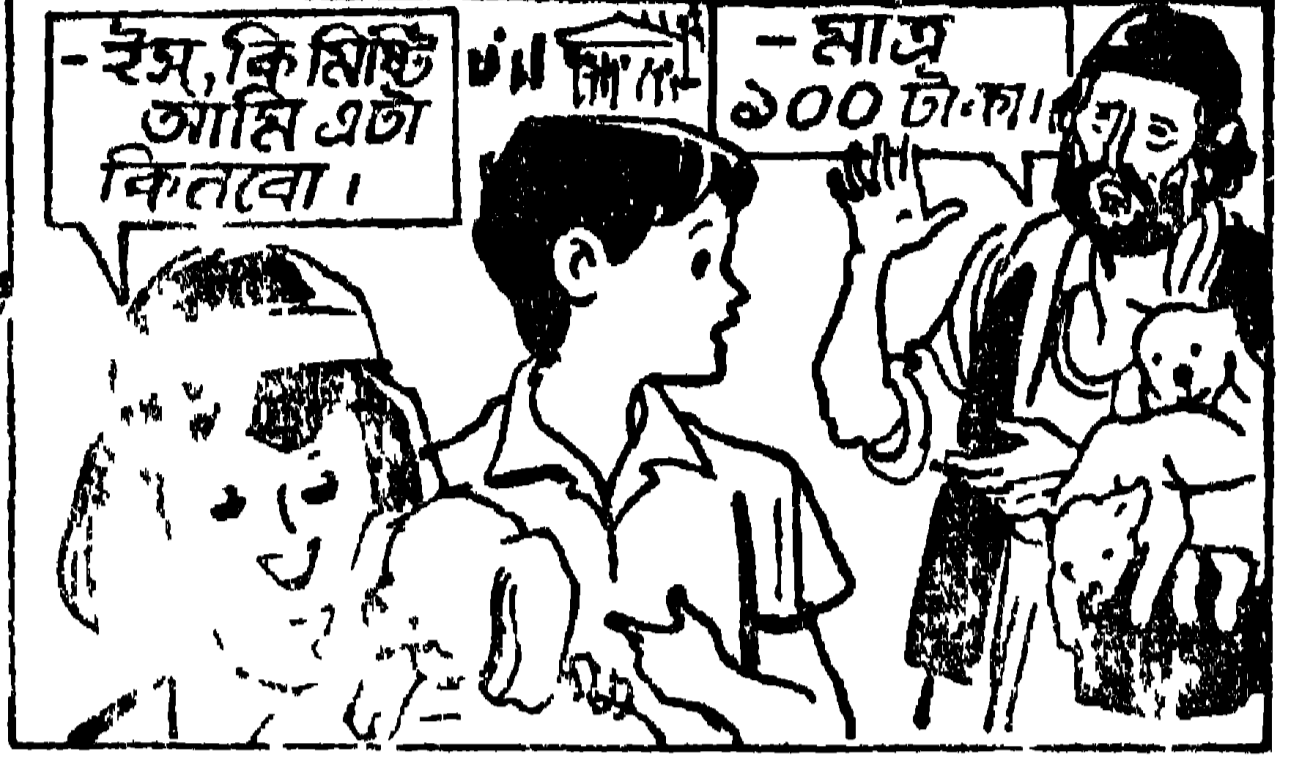
ওরা ভেঙ্গে পড়লো।
আমাদের যে মাত্র ৫ টাকা আছে
কাঁদেনা। দেখো,
এবারে তোমার জন্মদিনে আমি তোমায়
দেবো।

ঐ দিনই আনন্দ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো
জন্মদিনে উপহারের জন্যে আমি কিছু জমাতে চাই, কি ভাবে জমাই বলো তো।
–খুব সোজা। রোজ একটু করে জমাও। আমি ইউকো ব্যাঙ্কে তোমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেবো।

–ইউকোব্যাঙ্ক! আমি যা জমাবো, তা কি ওরা নেবে? সে তো খুবই কম।
শেষে দেখলে অনেক জমেছে।

United Com Bank
সেদিন থেকেই আনন্দ জমাতে শুরু করল।

শীলার জন্মদিনের ঠিক আগে আনন্দ তার পাশবই বাবাকে দেখায়।
–বাবা, ব্যাঙ্কে আমার ১৫০ টাকা জমেছে। এইবারে নিশ্চয়ই শীলাকে কুকুরছানা কিনে দিতে পারবো।
–চমৎকার!

জন্মদিনের সকাল
–আনন্দকে ধন্যবাদ দাও। তোমাকে এই কুকুরছানা কিনে দেবার জন্যে সে তার হাত খরচ থেকে এ টাকা জমিয়েছে।

–শীলার আজ ভারী আনন্দ, কিন্তু সেটা তো ইউকোব্যাঙ্কের জন্যেই

ভৌ! ভৌ!

ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম জয়

দিলীপ দত্ত

তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হতে তখনও এক ঘণ্টা বাকী। দিলীপ সরদেশাই এলেন। ধীরে সুস্থে দুজনে খেলতে লাগলেন, বিশেষত ওয়াদেকার। প্রথম ইনিংসে তিনি কতক গুলি দর্শনীয় সট নিয়েছিলেন কিন্তু এখন খুব সতর্কতার সঙ্গে খেললেন। ২ ওভারে রান হল ১টি। ওয়াদেকার আণ্ডারউডের লেগস্টাম্পেই বাইরের বলে সজোরে ব্যাট চালালেন। বলটি উইকেট রক্ষকের পেছনে উঁচু হয়ে উঠল। ফিল্ডাররা 'ক্যাচ' বলে চিৎকার করে উঠল। ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ থেকে দৌড়ে গিয়ে এডমিচ বলটি লুফলেন। কিন্তু আম্পায়ার ইলিয়ট স্থির নিশ্চিত ছিলেন না, বলটি ব্যাটে লেগেছে না প্যাডে, ফিল্ডসম্যানদের আবেদনে তিনি বললেন 'নট আউট।'

ধীরে ধীরে রান উঠতে লাগল। দিনের শেষে রান হল ১ উইকেটে ৭৬। ওয়াদেকার ২৫, সরদেশাই ১৩। আণ্ডারউড ১৫ ওভার বল করে ১ রানে একটি উইকেট। ইলিংওয়ার্থ ১২ ওভারে ১২ রান, কোন উইকেট নয়।

শেষ দিনে জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ৯৭ রানের, হাতে ৮টি উইকেট। তবু সকলের উৎকণ্ঠা। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করছে ভারত। ধারাবিবরণী শোনার জন্য ভারতের সকল ক্রীড়ামোদী সজাগ হয়ে রেডিওর সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু প্রথমেই দুঃসংবাদ। অজিত ওয়াদেকার রান আউট। সর্ট থার্ড মানে একটি রান নিতে গিয়ে ডিওলিভিয়েরার থ্রোতে একটুর জন্যে ক্রিজে পৌঁছতে পারলেন না ওয়াদেকার। বিশ্বনাথ ও সরদেশাই আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং এর নিখুঁত বোলিং এর বিরুদ্ধে ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাট করতে লাগলেন। এক ওভারে একটি রান বা দু' ওভারে একটি এইভাবে রান বাড়তে লাগল। ১১ ওভারে ১১ রান হল, তার মধ্যে ৮টি মেডেন সরদেশাই আণ্ডারউডকে স্ট্রেট ড্রাইভ করে ৪ রান পেলেন, স্নোকে ড্রাইভ করলেন মিড অফে ৩ রান। রান পৌঁছল ১১৪ এ ৮৯ রান বাকী। সরদেশাই আণ্ডারউডের বলে একটি দুরুহ ক্যাচ তুললেন। অসম্ভব তৎপরতায় এ্যালান নট ক্যাচটি ধরলেন। ৪ উইঃ ১২৪। সোলকার এবং বিশ্বনাথ ২০ মিনিটে ১০ রান যোগ করলেন। ভারতের সকলের অসম্ভব উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠা। আরও ৩৯ রান বাকী ম্যাচ জিততে। সোলকার আউট আণ্ডারউডের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে কট এণ্ড বোল্ড। ৫ উইকেটে ১০৫। ইঞ্জিনিয়ার ৬০ রান করতে পারেন। তাড়াতাড়ি কিছু রান করতে পারলে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। প্রথম বলেই ইঞ্জিনিয়ার সজোরে ব্যাট চালালেন এবং অল্পের জন্যে আউট হতে হতে বেঁচে গেলেন। বলটি উইকেটের সামান্য পাশ দিয়ে

(শেষাংশ ৫৪ পাতায়)

খেলার খোশ-খবর

শ্রীকলমচি

হেনরী রোনো বিশেষজ্ঞদের বিশেষ অজ্ঞও প্রমাণ করল

হেনরীর চারটি বিশ্ব নজীরের অধিকারী মধ্য দূরত্বের দৌড়বীর উনত্রিশ বছর বয়স্ক হেনরী রোনোর সম্পর্কে সাম্প্রতিক চিন্তা-ভাবনায় ইঙ্গিত করা হচ্ছিল যে, সে তার দৌড় জীবনের সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু, সম্প্রতি নরওয়ের নার্ভিকে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে সে তার নিজের বিশ্বনজীরের চেয়ে কম সময়ে (১৩ মিনিট ৬-২ সেকেণ্ড) দৌড়ে নতুন নজীর সৃষ্টি করে প্রমাণ করল, সে ফুরিয়ে যায় নি। প্রতিযোগিতার শেষ চক্করে অবিশ্বাস্য দ্রুত-গতিতে (৫৬ সেকেণ্ড) দৌড়ে তার ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে গড়া বিশ্বনজীর (১৩ মিনিট ৮'৪ সেকেণ্ড) ডেকে ২'২ সেকেণ্ড সময় কমিয়ে ফেলে।

পাকিস্তানের বিদ্যালয় হকিদল ভারত সফরে আসতে পারে

নভেম্বরে ১ থেকে ১৭ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য দশম জুনিয়র নেহরু হকি প্রতিযোগিতার পাকিস্তানের বিদ্যালয় ছাত্রদের একটি দল যোগ দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাপ-বেটার লড়াই (টেনিস কোর্টে)

শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হোটেল লঙ্কা ওবেরয় টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফাইনালে (পুরুষ বিভাগ) দেব লাল তার বাবা কৃতি টেনিস তারকা প্রেমজিৎ লালকে ৬-৩, ৬-৩ সেটে, সরাসরি পরাস্ত করে। ইতিপূর্বে সেলভাত্থুরাই জুনিয়র টেনিস ক্লাসিক প্রতিযোগিতায়, ১৮ বছরের কম বয়সী বিভাগে কেরালার সঞ্জয় কুমারকে ফাইনালে ৬-১, ৬-৪ সেটে পরাজিত করে।

বেটিও পেছিয়ে নেই

ঐ প্রতিযোগিতার মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতের প্রাক্তন ডেভিস কাপ অধিনায়ক নরেশ কুমারের মেয়ে গীতা কুমার শ্রীলঙ্কার এক নম্বর খেলোয়ার শ্রীরাজী পুণেরমে ৭-৬, ৬-১ সেটে পরাজিত করে। সেলভাত্থুরাই প্রতিযোগিতায় ১৮ বছরের কমবয়সী মেয়েদের বিভাগে গীতা শ্রীলঙ্কার দিলমিনি পেরিসকে ফাইনালে ৬-১, ৬-৩ সেটে পরাজিত করে।

কৃতিত্ব খেলার মাঠে—গৌরব পুলিসের

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লালবাহাদুরশাস্ত্রী সম্প্রতি ফুটবল প্রতিযোগিতার দিল্লী পুলিস দল ভারতীয় বিমান বাহিনীকে ১-০ গোলে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হল। একই দিনে কাশমীরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সর্বভারতীয় ইন্দিরা গান্ধী গোল্ডকাপ হকি প্রতি-যোগিতায় জলন্ধরের পাঞ্জাব পুলিস দল ফাইনালে টাই ব্রেকারে ৪-৩ গোলে বিহারের শিখ রেজি-মেণ্টাল সেণ্টারকে পরাজিত করে।

প্রথম এশীয় স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের সাফল্য

পাকিস্তানের করাচীতে সদ্যসমাপ্ত প্রথম এশীয় স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের জাহাঙ্গীর খান ফাইনালে স্বদেশের কামার জামানকে ১০-৮, ৯-০, ৯-০ পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। পরবর্তী চ্যাম্পিয়নশিপ ১৯৮৩ সালে জর্ডানে অনুষ্ঠিত হবে।

মহিলাদের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নিউজিল্যাণ্ডে হবে

আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত মহিলাদের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত ছয়টি দেশের মধ্যে পাঁচটি ইতিমধ্যেই সম্প্রতি জানিয়েছে। ঐ দেশগুলো হল,—ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিটেন।

ডাঃ বি, সি, রায় মেমোরিয়াল কমিটি

১, বিধান শিশু সরণি
কলিকাতা-৭০০০৫৪

ফোন ঃ ৩৫-৫৮০০
৩৫-৮০৮৬

ডাঃ বি. সি রায় জন্মশতবর্ষ উৎসব প্রতিপালন
জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ের বিবরণী

১। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ ১লা জুলাই ৯৮১ রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি কর্তৃক ডাঃ রায় জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। উদ্যানের বিভিন্ন খেলাধূলা, নাচ, গান, অংকন প্রভৃতি বিভাগের সভ্য-সভ্যাদের মাসিক ২৫ টাকা করে এক বছরের বৃত্তি প্রদান

২। প্রদর্শনী ঃ ৩০শে জুন, ৯৮১ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রদর্শনার উদ্বোধন। এ প্রদর্শনীতে ছিল মাটির পুতুলে ডাঃ রায়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনী, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও হাতের কাজের প্রদর্শনী।

৩। বৃত্তি (ক) ঃ '৮১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী ছেলে ও মেয়েকে ৫০ টাকা করে এক বছরের জন্য জন্মশতবার্ষিকী বৃত্তি প্রদান।

(খ) ঃ '৮১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিধান শিশু উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ (সর্বোচ্চ নম্বর) ও অন্যান্য বিষয়ে কৃতীকে মাসিক ৫০ টাকা করে এক বছরের জন্য বৃত্তি প্রদান।

(গ) ঃ '৮১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীকে প্রতি মাসে ৭৫ টাকা করে এক বছর বৃত্তি প্রদান।

৪। নাটক ঃ বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়ে কর্তৃক নাট্যাভিনয়।

৫। শতবার্ষিকী প্রতিযোগিতা ঃ প্রবন্ধ
পি. টি
সাঁতার

জন্মশতবর্ষের প্রথম পর্যায়ের কার্যসূচী শেষ হয়ে গেছে। নিম্নলিখিত কার্যসূচী দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে—

দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যসূচী

১। শতবার্ষিকী বক্তৃতা : বিধান স্মৃতি শতবার্ষিকী বক্তৃতার ব্যবস্থা। প্রথম বছর শতবার্ষিকী বক্তৃতা দেবেন স্বনামধন্য সাহিত্যাচার্য ডঃ সুকুমার সেন।

২ প্রতিযোগিতা : ১৪ই নভেম্বরের পর থেকে ১৪ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বাইরের ছেলে-মেয়েরাও অংশ নিতে পারবে।

বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েদের জন্য রোডরেস, গান ও নাচের প্রতিযোগিতা।

৩। আলোচনা চক্র : খেলাধুলা, চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষকতা, ব্যবসা, সাহিত্য ও হাতের কাজ প্রভৃতি বিষয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা।

৪। ডাঃ রায়ের জীবনী প্রকাশ।

৫। বিধান জিমনাসিয়াম নির্মাণ কার্য আরম্ভ।

(৫১ পাতার শেষাংশ)

চলে গেল নটের হাতে। ইঞ্জিনিয়ার সতর্ক হলেন। মধ্যাহ্নভোজে ৫ উইকেটে ১৪৬। আরও ২৭ রান। বিশ্বনাথ ২৯ রানে অপরাজিত। তিনি একটিও বাউণ্ডারী মারেননি।

মধ্যাহ্নভোজের পর ইঞ্জিনিয়ার আণ্ডারউডের বলে ব্যাকফুটে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে ৬, পুল করে ২, এবং কাট করে ৪ রান নিলেন। এক ওভারে ১২ রান। আর ১৫ রানের প্রয়োজন। ইলিংওয়ার্থ যেন হাল ছেড়ে দিলেন। লাকহার্স্টের হাতে বল তুলে দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার পুল করে দুটি বাউণ্ডারী মারলেন তারপর তিন রান বিশ্বনাথ বাউণ্ডারী মেরে খেলা শেষ করার জন্যে ক্রশব্যাটে ব্যাট চালালেন, কিন্তু ব্যাটের কানায় লেগে বল নটের হাতে। আবিদ আলি এসেই এলোপাতাড়ি ব্যাট চালালেন, অল্পের জন্যে বলটি ব্যাট স্পর্শ করল না। ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে এসে আবিদ আলীকে কি যেন বোঝালেন। আবিদ আলি পরের বল সতর্কতার সঙ্গে খেললেন। পরের বলটি অফ ষ্টাম্পের বাইরে সর্ট পীচ। আবিদ আলি কাট করলেন, বল বাউণ্ডারী সীমানা পেরোতে না পেরোতেই আনন্দ মুখর সমর্থকরা মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল ইঞ্জিনিয়ার ও আবিদ আলীকে অভিনন্দন জানাতে।

এই বিজয়ী ভারতীয় দলে খেলেছিলেন :

১ সুনীল গাভাসকার ২ অশোক মানকড় ৩ অজিত ওয়াদেকার (অধিনায়ক) ৪ দিলীপ সরদেশাই ৫ গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ৬ একনাথ সোলকার ৭ ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (উইকেট রক্ষক) ৮ আবিদ আলি ৯ ভেঙ্কট রাঘবন ১০ বিষেন সিং বেদী ১১ ভগবত চন্দ্রশেখর ১২ জয়ন্তীলাল।

হাতের কাজ

ডিমের তৈরি ফুলগাছ
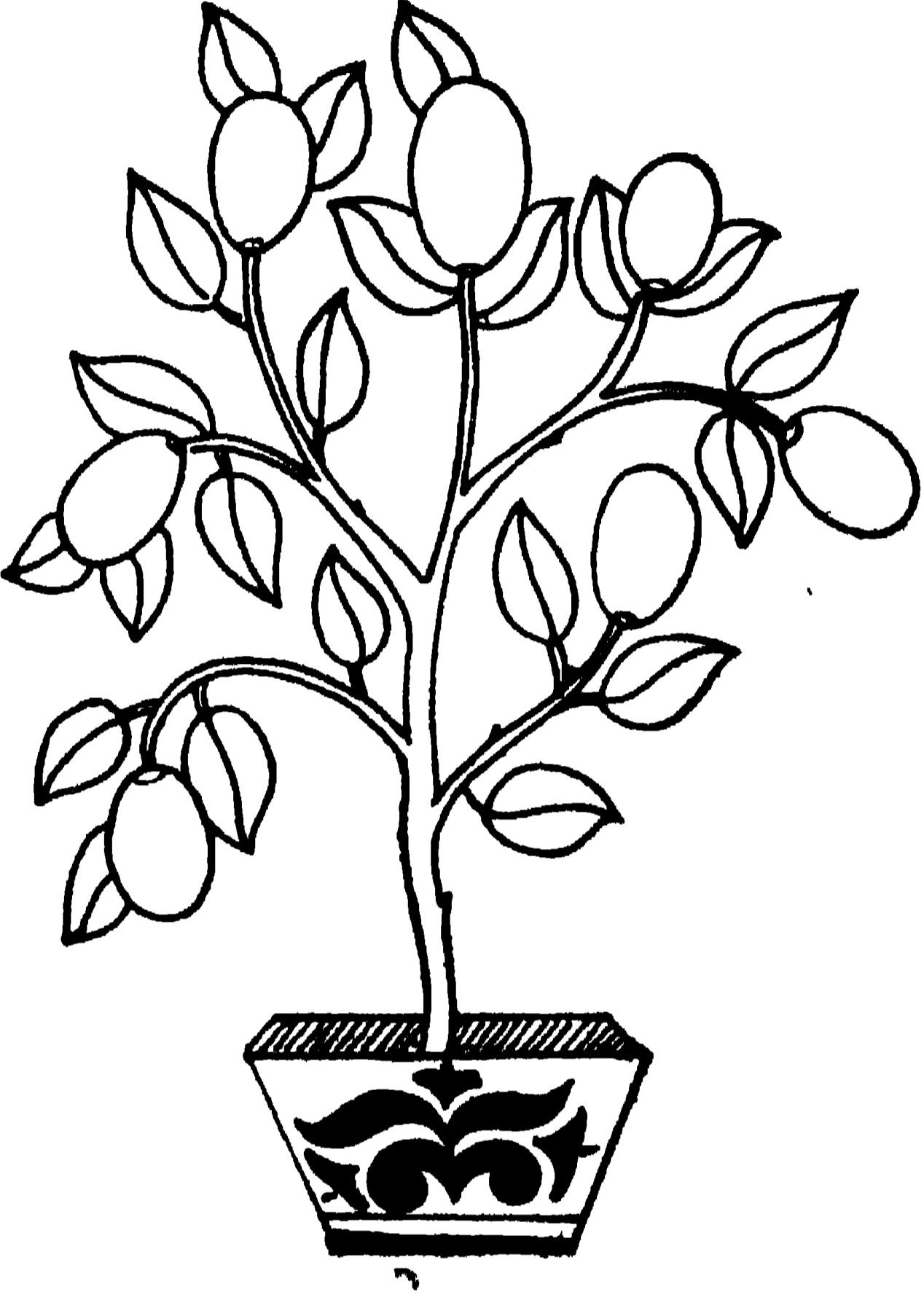
এবার আমরা শিখব কিভাবে তৈরি করা যায় ডিমের তৈরি ফুলগাছ। হ্যাঁ, হ্যাঁ ডিমের খোলা দিয়ে তৈরি করতে হবে। প্রথমে কতগুলি মুরগী, পায়রা বা চড়াই পাখির ডিম সংগ্রহ কর, যে ধরণের যোগাড় কর না কেন, একরকমের হয়।

প্রথমে ডিমটার সরু দিকটায় ছোট্ট করে একটা ফুটো কর, ফুটোটা যেন খুব বড় না হয় বরং যত ছোট করা যায় ততই ভাল। ফুটো করার পর ভেতরের অংশটাকে কোন কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাক। নাড়া হয়ে গেলে, মেশানো হয়ে গেলে সমস্ত অংশটা ঐ ফুটো দিয়ে বার করে ফেল। এই ভাবে বেশ কটা ডিমের ভেতরের অংশ বার করে ফেল। তারপর ডিমগুলি সামান্য গরম জলে ধুয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে নাও এবার কুল বা বাবলা গাছের একটা ঝাঁকড়া শুকনো ডাল সংগ্রহ করো আর সংগ্রহ কর, সবুজ রংয়ের মার্বেল পেপার, একটা নকশা করা মাটির টব (ছবির মতো), বিভিন্ন জল রং, কিছুটা এঁটেল মাটি এবং কিছুটা বালি। এখন যে মার্বেল পেপারটা তুমি সংগ্রহ করেছ তার থেকে পাতা কেটে নাও পাতার আকার নির্ভর করবে ডিমের আকারের সঙ্গে, অর্থাৎ ডিম বড় হলে হলে পাতা বড় হবে, আর ডিম ছোট হলে পাতাও ছোট হবে, সুতরাং ডিমের আকার অনুযায়ী পাতা কেটে নাও। এবার সংগ্রহ করা কুল বা বাবলার ডালটার মাথায় ডিমের খোলস-গুলো আঠার সাহায্যে আটকাও। আঠা আটকাবার সময় লক্ষ্য রেখ যেন ডিমের গায়ে আটকে না যায়। ডিমের গায়ে আঠা লেগে গেলে তার উপর ময়লা জমবে ফলে সমগ্র মডেলটাই বিশ্রী লাগবে। এবার মার্বেল পেপার থেকে কাটা পাতাগুলো ডালের বিভিন্ন জায়গায় আটকাও (ছবি দেখ)। এরপর তুমি ডিমগুলির মধ্যে বিভিন্ন ফুলের ছবি বা বিভিন্ন ফল বা দৃশ্যের ছবি কিম্বা অন্য কোন ডিজাইন (নকশা) করতেও পার। এখন পাতা ও ডিমের খোলা সমেত ডালটির গোড়ার দিকে এঁটেল মাটি দিয়ে একটু ভারী করে নাও, এবং সমস্ত জিনিসটা সংগ্রহ করা টবের মধ্যে ভরে গোড়াটা বালি দিয়ে ঢেকে দাও। এবার এটাকে তোমার পড়ার টেবিলে কিম্বা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পার। এইরকম চারটে তৈরি করে চার দেওয়ালেও রাখতে পার। সমগ্র মডেলটা কি রকম হবে তা একবার ছবিটা দেখে আন্দাজ করে নাও এবং কাজে হাত দাও।

ধাঁধা

১। ধাধাঁব মজায় এবার দেশী ও বিদেশী পাখিদের চিনে নাও।

(ক) দ্বীপপুঞ্জেব নামে অভিহিত গাইয়ে পাখি।

(খ) তোমাদের প্রিয় গল্পকাবেব স্পষ্ট চবিত্র।

(গ) নামেই কেমন আত্মীয়তাব ভাব আছে।

(ঘ) এই নাম অনেকেবই আদবেব নাম।

(ঙ) ভিন প্রদেশী মেয়েব নামে নাম।

(চ) সমুদ্র যাত্রায় সহ যাত্রী ও বন্ধু।

(ছ) অনেক দেশেব রাজকীয় প্রতীক।

(জ) এদেব চিহ্ন দেবতার শিবশোভা।

(ঝ) 'বাঘেব ঘবে ঘোগেব বাসা' এবাই প্রমাণ করেছে।

(ঞ) অন্যকে দেখাতে মজা লাগে, কিন্তু অন্য কেউ দেখালে গোঁসা হয়।

—ভবঘুরে

গত মাসের ধাঁধার উত্তর
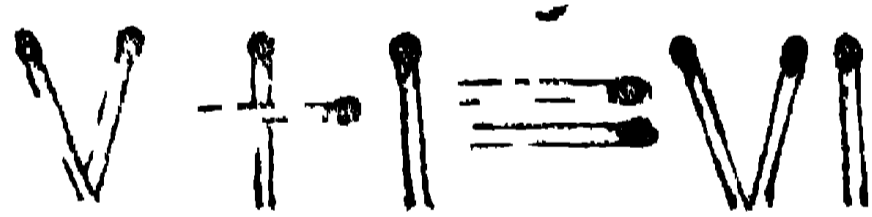
সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

সৌমেন মুখোপাধ্যায় (সভ্য, ১০), সোমনাথ দাশগুপ্ত (সভ্য, সিনিয়র), বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সভ্য, ১০), প্রদ্যোৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্য, ১১), মলয় পণ্ডিত (সভ্য, ১২)

এ সংখ্যায় যারা এঁকেছে

বিব্রত রায় (সভ্য, সিনিয়র), অপিতা মজুমদার (সভ্যা ১৩), সুতপা দাস (সভ্যা, সিনিয়র)।

'শারদীয়া পূজায় তোমাদের, যারা কাছে আছ, দূরেও আছ,--
'খেয়ালখুশী' সুখ, শান্তি কামনা করছে এবং তার সঙ্গে
'রীর আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

Regn. No. WB/EC-179 OCTOBER 1981 Re. 1·00

নিয়মাবলী

১. জুলাই মাস থেকে "খেয়াল খুশীর" বছর শুরু। বছরের যে কোন মাস থেকে খেয়াল খুশীর গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে খেয়াল খুশী প্রকাশিত হয়।

২. প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা এবং বছরে ১২ টাকা। সডাক টাকা ১৩·২৫।

৩. খেয়াল খুশীর চাঁদা মানিঅর্ডারে পাঠানো যায়।

৪. গ্রাহক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

৫. ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েরাই লেখা, ছবি, ধাঁধার উত্তর প্রভৃতি সম্পাদিকার নামে খেয়াল খুশীতে পাঠাতে পারবে।

৬. গ্রাহক চাঁদা ইত্যাদি পাঠাতে হবে খেয়াল খুশীর ম্যানেজারের নামে।

৭. অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। যারা লেখা পাঠাতে চাও তারা লেখার একটি নকল রাখবে। লেখা পাঠাবার সময় কাগজের দু'পিঠে লিখবে না। যারা আঁকা পাঠাতে চাও, তারা পেন্সিল স্কেচের উপর "চাইনিজ ইঙ্ক" বুলিয়ে দেবে।

৮. কোন কিছু জানতে চাইলে খেয়াল খুশীর কার্যালয়ে এসে দেখা করতে অথবা চিঠিও লিখতে পারো। চিঠির উত্তর পেতে হলে জোড়া পোষ্টকার্ড অথবা ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

৯. পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশকপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে।

"খেয়াল খুশী কার্যালয়"
১, বিধান শিশু সরণী
কলিকাতা—৭০০০৫৪
ফোন: ৩৫-৮০৮৬

কার্যাধ্যক্ষ

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে শ্রীদুলাল ভৌমিক কর্তৃক ১, বিধান শিশু সরণী কলিকাতা-৭০০০৫৪ হইতে প্রকাশিত ও গ্রাফিকো, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
চতুর্থ বর্ষ ॥ পঞ্চম সংখ্যা
নভেম্বর ১৯৮১
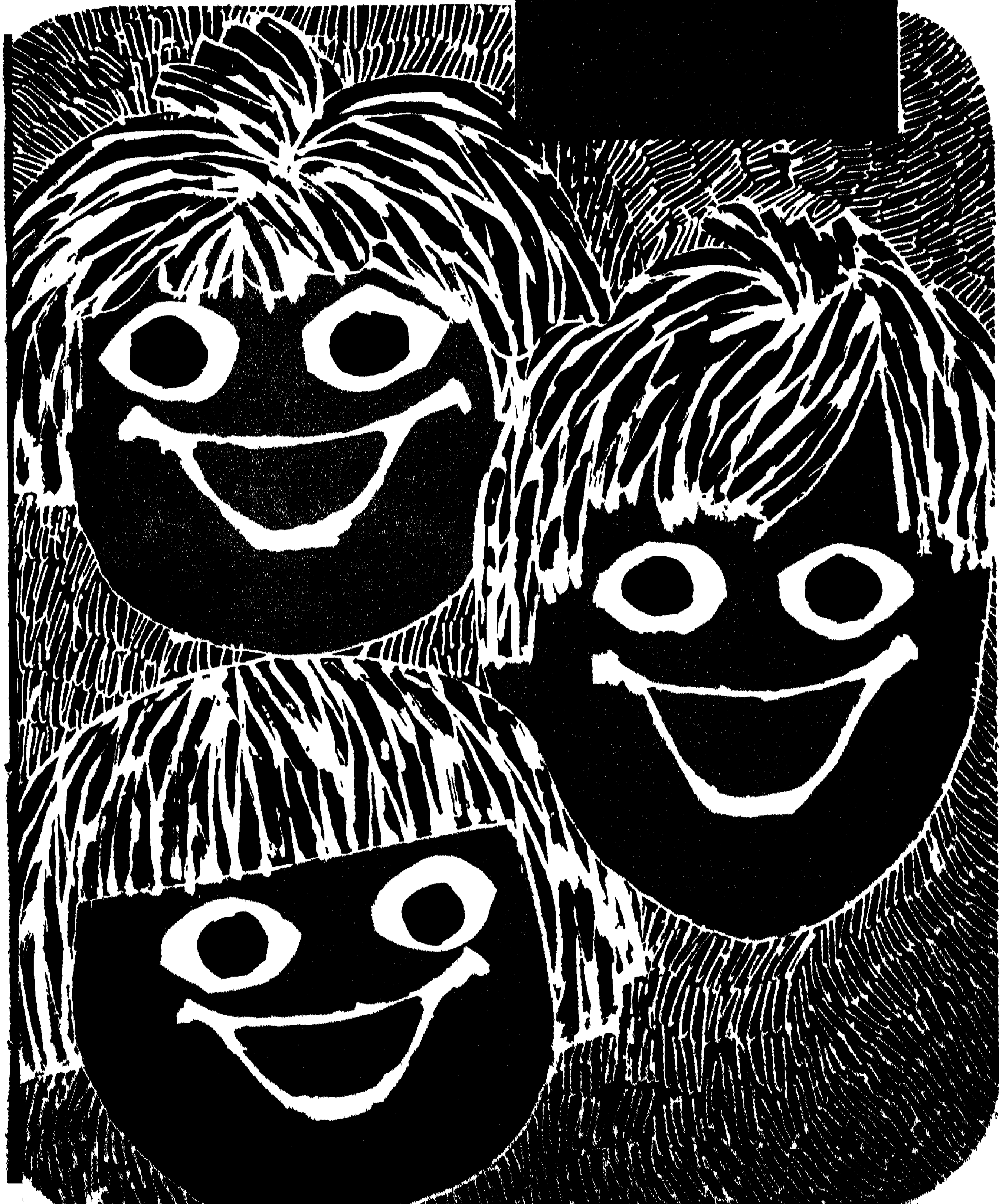
॥ বিজ্ঞাপনের হার ॥

মুদ্রিত জায়গার মাপ

পূর্ণ পৃষ্ঠা :—
১৪·৫ সি. এম × ২০ সি. এম
৬০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (হরাইজেন্টাল)
৯·৫ সি. এম × ১৪·৫ সি. এম
৩০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা [ভারটিক্যাল]
৭ সি. এম × ২০ সি. এম
৩০০·০০ টাকা

১/৪ পৃষ্ঠা :
৭ সি. এম × ৯·৫ সি. এম
১৭৫·০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৬৮৩ (১৬) টি-বি-সি/২এ—৬টি/৭৯, ২৪. ১২. ৮০.

৪র্থ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা ॥ ১লা নভেম্বর ১৯৮১ ॥ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৮
ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা ॥ দাম : এক টাকা
প্রধান উপদেষ্টা : গৌরকিশোর ঘোষ ॥ সম্পাদিকা : ইন্দিরা রায়।

আমাদের কথা □ ২

গল্প □ এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ॥ অশোককুমার সেনগুপ্ত ৫ ক্ষতি ॥ কুমারেশ ঘোষ ৯ ছবি আঁকার ফ্যাসাদ ॥ কৌশিক ঘোষ ১৩ হীরামতি রাজকন্যা ॥ ডাঃ অমিয়-নাথ ব্রহ্ম ১৫ পুতুলের বিয়ে ॥ অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ আমার প্রিয় ছোট্ট পুষি ॥ মৃত্তিকা দে ২০ পুণ্যাত্মা ॥ অনিমেষ বসু ২৪ বিরলে ॥ কণাদ মল্লিক ৩১ দশজনের একলা ভ্রমণ ৪৫

প্রবন্ধ □ জওহরলাল ॥ অতুল্য ঘোষ ৩ আন্দামান অভিযানের ডায়েরী থেকে ॥ পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ১০ দিনের শেষে ॥ সত্যজিৎ সেনগুপ্ত ১২ অথ রসাল কথনম্ ॥ ঈপিতা কর ১৪ একটি বনভোজনের অভিজ্ঞতা ॥ তাপস সিংহ ২১ ডাকটিকিটের উপকথা ॥ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ তবু যেতে হবে ॥ সিন্ধবাদ ২৭ চরিত্র-বিচিত্রা ॥ সুমথনাথ ঘোষ ২৯ ক্ষতির ইতিহাস ॥ শ্রীহর্ষ মল্লিক ৩৪ ঠাকুর দেবতার বাহন ॥ প্রণবেশ চক্রবর্তী ৩৮ পাখিদের যাযাবর বৃত্তি ॥ অভিজিৎ বিকাশ পাল ৪০ আর্যভট্টের 'অক্ষর সংখ্যা' ॥ ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত ৪৩ নমঃ ভারতভূমি, জন্মভূমি ॥ চন্দ্রনাথ রায় ৪৮

কবিতা □ মশাকে থুতু ॥ গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম ১৮ রূপকথার দেশ ॥ সন্দীপন চৌধুরী ১৮ ব্যাঙের ছাতা ॥ সৌমেন কর ২০ কথোপকথন ॥ কৌশিক দত্ত ২৬ বিয়ে বাড়ি ॥ নবনীতা ভট্টাচার্য ৩৩ সাধ ॥ অভীক মুখোপাধ্যায় ৩৩ নামের ছড়া ॥ কৃষাণু রায় ৩৩ খেয়ালখুশীর জন্য ॥ কাজল দত্ত ৩৭ আবার তুমি ফিরে এস ॥ শোভা চট্টোপাধ্যায় ৪২ ছড়া ॥ অভ্রজিৎ মণ্ডল ৪৭ তিনটুকুনি ॥ শ্যামলকান্তি দাশ ৫০ ছড়া ॥ শম্পা দে ৫০ ফুটবল ॥ শান্তনু দাশ ৫০

□ গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ৫০

খেলাধুলা □ হিরোর বিরুদ্ধে ॥ দিলীপ দত্ত ৫১ খেলার খোশ-খবর ॥ শ্রীকলমচি ৫৩

ধাঁধা □ ৫৬

প্রচ্ছদ □ পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের কথা

দুর্গা পুজো চলে গেল, কালী পুজোও। ঈদ উৎসবও গেল। ভাই ফোঁটাও। সামনেই মহরম। এমন কাছাকাছি হিন্দু মুসলমানের এতগুলো বড় বড় উৎসব এত কাছাকাছি অনেকদিন আসেনি। বিজয়া আর ঈদ তো একেবারে পিঠোপিঠি। দুটোই মিলনের উৎসব। আনন্দের পরব। আনন্দের মধ্যেই শেষ হয়েছে। এবারের শারদ উৎসবটা বড়ই রমণীয় লেগেছে।

ছুটি ফুরালো। এবার আবার শুরু হবে পড়াশুনার পালা। সামনেই পরীক্ষা। কাজেই পুজোর ছুটির আনন্দ অনেকটাই ম্লান হয়ে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেবে এক ধরনের ভয় বা ত্রাস। আমাদের দেশের পড়াবার ব্যবস্থা এমনই যে পড়ুয়ারা ইস্কুলে যেতে ভয় না পেলেও আনন্দ পায় না। পরীক্ষা নামক একটা ভীতিপ্রদ রাক্ষস সব সময়েই যেখানে চোখ পাকিয়ে খাড়া, সেখানে ছেলেমেয়েরা ভয় না পেয়ে করবে কী?

অথচ লেখাপড়াটা এমনই একটা মজার ব্যাপার যে এর মধ্যে ভয় পাবার কোনও অবকাশই থাকা উচিত নয়। পড়াশুনা মানেই তো অজানা এক জগৎ থেকে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসা। আমাদের চারপাশে রাতদিন কত কীই না ঘটছে। এই পৃথিবী রোজ একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সতত আমাদের চোখের সামনে ঘটছে বলে আমরা সেটা তেমন করে টের পাইনে, কেন না আমরাও তো নিত্য বদলাচ্ছি এই পৃথিবীটার সঙ্গে।

যা আমরা চোখ দিয়ে দেখে বুঝতে পারিনে, সেটা আমাদের বুঝতে হয় জ্ঞান দিয়ে। সেই জ্ঞান আমরা পাই, বইয়ের মধ্যে দিয়ে। পড়ার মধ্যে দিয়ে। আসলে বইটা কী? বিভিন্ন মনীষীর মননের এক একটা দলিল।

বই পড়তে গেলে বই পড়া শিখতে হয় তো? বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় সেই কারণে। কাজেই বিদ্যালয়গুলোর কাজ হওয়া উচিত এই সব পড়ুয়াদের পড়ার আগ্রহকে উস্কে দেওয়া। সেই আগ্রহকে স্তিমিত করে দেওয়া নয়। ভয় পাইয়ে দেওয়া নয়। ঘাবড়ে দেওয়া নয়।

অনেক প্রতিভাবানদের কথা তোমরা জান, যাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার নিরিখে নিতান্ত বাজে ছেলে বলে গণ্য হয়েছিলেন। অনেকে বিদ্যালয়ের চৌকাঠই মাড়াননি। কাজেই বিদ্যালয়ের নিরিখটাই যে শেষ কথা তা তো নয়। আসল কথা হচ্ছে জানা। তাই বলি তোমরা ভয় পেও না, কেন না জীবনের যা আসল পরীক্ষা তার সঙ্গে ইস্কুলের পরীক্ষার কোনোই মিল নেই।

জওহরলাল

১৪ই নভেম্বর জওহরলালের জন্মদিন। এই দিনকে 'শিশুদিবস' রূপে পালন করা হয়। নানা জায়গায় নানাভাবে শিশু সমাবেশ হয় এবং সকলের মনে যাতে শিশুদের সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ জাগে, সেইজন্য এই সমাবেশ।

জওহরলাল ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের পরাধীনতা কিছুতেই স্বীকার করতে পারতেন না। সব সময়ই মন অশান্ত এবং পরাধীনতা দূর করার কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয়, তার জন্য সচেষ্ট। কত রকম অহিংস আন্দোলনে যে তিনি অংশ নিয়েছেন, তা ভাল করে জানলে মনটা কিরকম অশান্ত ছিল, বোঝা যায়। হয়ত কোন কাজে সাময়িক কিছু ফল হয়েছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল একটাই দেশবাসীকে বিদ্রোহী করা। এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অসাম্য— এইসব বিষয়েও তিনি বলতেন এবং প্রচার করতেন ; কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল দেশের পরাধীনতা

দূর করা। দেশ স্বাধীন হলে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কাঠামো কিরকম হবে, সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা তিনি করতেন এবং কংগ্রেসের প্ল্যানিং কমিটির চৈয়ারম্যানরূপে ও করাচী কংগ্রেসের "Fundamental rights" প্রস্তাবেও বারবার তাঁর ধারণা ও মতের কথা দেশবাসীকে জানিয়েছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশের সমৃদ্ধির জন্য প্ল্যানিং কমিশন গঠন এবং তাকে কাজে রূপ দেবার জন্য তাঁর যে চেষ্টা তা সকলেরই জানা আছে। এই অশান্ত জওহরলাল ও পরিকল্পনাপন্থী জওহরলালের দুটো রূপই ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে। এই দুটোর সঙ্গেই দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই শিশুদের সম্পর্ক একান্ত ঘনিষ্ঠ। শিশু অবস্থা থেকেই অন্যায়ের প্রতি বিদ্রোহ এবং যেখানে যা সম্পদ আছে তা ব্যবহার করে দেশ গঠনের প্রতি আগ্রহ। এইভাবে যদি দেশের ছেলেমেয়েদের মন গড়ে ওঠে, সেটাই হবে স্বাধীন দেশের সত্যকারের সম্পদ। স্বাধীনতা তো কেবলমাত্র কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি নয়, এর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ দেশের সমৃদ্ধির জন্য ও সমাজের কলঙ্কমোচনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যায়।

বহু বছরের অনেক কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে থেকে যেমন মানুষকে অক্ষম ও অপদার্থ করে তুলেছিল, সেইরকম দেশের মধ্যে যেসব সম্পদ আছে, তার ব্যবহার না করে, পরনির্ভরশীলতা দেশকে চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। স্বাধীনতার অর্থ হল এই দুদিকেই সমভাবে কাজ শুরু করা এবং তাতে সফল হওয়া। পথে অনেক বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, সময় হয়ত অনেক লাগতে পারে, তবু এইভাবে ভাবা এবং শুরু করাই সবচেয়ে বড় কাজ। সেই কাজ জওহরলাল করেছিলেন। আজকে দেশের যারা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, জওহরলালের এই দিকটার কথা, তাদের ভালভাবে বুঝতে হবে এবং তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। জওহরলালের কাজের সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। তিনি নিজে কতটা করে গিয়েছিলেন, সেটা বড় কথা নয়; তিনি যে সবদিকে নজর রেখে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সেটাই বড় কথা। ছোট অবস্থা থেকেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যদি অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম শুরু করে, তার মধ্য দিয়েই তাদের জীবনের সার্থকতা প্রকাশিত হবে। এই কাজেই জওহরলালের আহ্বান।

এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড
লুইস ক্যারল

অনুবাদক : অশোককুমার সেনগুপ্ত

আজগুবি চায়ের আসর

এলিস দেখল বাড়ির সামনে একটা গাছের নীচে একটা টেবিল, বসন্তশশক আর টুপিওয়ালা বসে বসে চা খাচ্ছে। মাঝখানে একটা নেংটি ইঁদুর ঘুমোচ্ছে আর দুজনেই তার পিঠের উপরে আরাম করে কনুই রেখে কথা বলছে। এলিস ভাবল, নেংটি ইঁদুরটার তো বড় দুর্দশা। বেচারা ঘুমিয়ে আছে তাই হয়তো কিছু বলছে না।

টেবিলটা বেশ বড়, কিন্তু তিনজনে এক প্রান্তে জড় হয়ে ভীড় করে বসে আছে। এলিসকে আসতে দেখেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'জায়গা নেই, জায়গা নেই।' এলিস খুব চটে গেল। 'যথেষ্ট জায়গা আছে' বলে টেবিলের আরেক প্রান্তে একটা বড়সড় চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

বসন্তশশক খাতির করে বলল, 'একটু সুরা পান কর।'

এলিস চারদিকে তাকিয়ে দেখল। টেবিলে চা ছাড়া কিছুই নেই। বলল, 'কই, সুরাটুরা তো কিছুই দেখছি না।'

'নেই।'

এলিস রেগে বলল, 'যা নেই তা পান করতে বলাটা কোন দেশী ভদ্রতা?'

'বিনা নেমন্তন্নে এসে বসে পড়াটা কোন দেশী ভদ্রতা?'

'তোমার একার টেবিল? এতে তো অনেক লোকের চায়ের ব্যবস্থা রয়েছে দেখছি। কেবল তোমরা তিনজন কেন বসবে?'

টুপিওয়ালা এতক্ষণ কথা বলেনি, খুব কৌতূহলী চোখে এলিসকে দেখছিল। এইবার সে বলল, 'চুল বড় হয়েছে, কাট না কেন?'

এলিস বেশ কড়া সুরে বলল, 'ব্যক্তিগত মন্তব্য কর কেন? শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।'

টুপিওয়ালা চোখ বড় বড় করে তাকাল। বলল, 'দাঁড় কাকের সঙ্গে লেখার টেবিলের কি সাদৃশ্য?'

এলিস ভাবল, 'বেশ মজা! ধাঁধা জিজ্ঞেস করছে।' বলল, 'এটা আমি বলতে পারি।'

বসন্তশশক : 'তুমি কি বলতে চাও এর উত্তরটা তুমি জান?'

এলিস : 'হ্যাঁ'।

বসন্তশশক : 'তাহলে সে কথাই বললে না কেন ? যা বলতে চাও ঠিক তাই বলা উচিত।'

এলিস : 'তাই তো বলছি। মানে, যা বলছি তাই বলতে চাই।'

টুপিওয়ালা : 'দুত্তোর মানে কি এক হল ? আমি যা খাই তা দেখতে পাই আর আমি যা দেখতে পাই তাই খাই কি এক কথা ?'

বসন্তশশক : 'আমি যা পাই তাতেই খুশী আর আমি যা খুশী তাই পাই কি এক কথা ?'

নেংটি ইঁদুর (ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে): 'আমি যখন ঘুমোই তখন নিঃশ্বাস নিই আর আমি যখন নিঃশ্বাস নিই তখনই ঘুমোই কি এক কথা ?'

টুপিওয়ালা : 'তোমার বেলা একই কথা।'

সংলাপ এইখানেই থেমে গেল, কিছুক্ষণ সবাই চুপ। এলিস দাঁড়কাক আর লেখার টেবিল সম্বন্ধে কি জানে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মনে করবে কি ? কিছু জানলে তো ?

টুপিওয়ালাই আবার প্রথম কথা বলল। এলিসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আজকে মাসের কত তারিখ ?' সে পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে দেখল, সেটাকে কয়েকবার ঝাঁকাল, তারপর কানে লাগিয়ে চলছে কিনা শোনার চেষ্টা করল।

এলিস একটু ভেবে বলল, 'আজ চৌঠা।'

টুপিওয়ালা হতাশ হয়ে বলল, 'দুদিন পিছিয়ে গিয়েছে' তারপর বসন্তশশকের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আবার বলল, 'তখনই বলেছিলাম মাখনে কাজ হবে না। এখন বোঝ ঠেলা !'

বসন্তশশক আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু মাখনটা খুবই ভাল ছিল।'

টুপিওয়ালা গজগজ করতে লাগল, 'তা থাকতে পারে। কিন্তু মাখনটা লাগানোর সময় নিশ্চয়ই কিছু রুটির টুকরো ঢুকে গিয়েছে। রুটি কাটার ছুরি দিয়ে লাগানো তোমার উচিৎ হয়নি।'

বসন্তশশক ঘড়িটা নিয়ে করুণ নয়নে দেখল। তারপর সেটাকে চায়ের কাপে একটুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে আবার তুলে বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর আবার সেই আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল, 'কিন্তু মাখনটা সত্যিই ভাল ছিল।'

এলিস ঘাড় ফিরিয়ে খুব কৌতূহল সহকারে ব্যাপারটা দেখছিল। সে বলল, 'খুব মজার ঘড়ি তো। মাসের কত তারিখ দেখা যায় আর সময় দেখা যায় না ?'

টুপিওয়ালা বলল, 'সময় কেন দেখা যাবে ? তোমার ঘড়িতে কি এটা কোন বছর তা দেখা যায় ?'

এলিস বলল, 'তা কেমন করে যাবে ? বছর তো আর একটা পরে পরেই পালটায় না।'

টুপিওয়ালা বলল, 'ঠিক। সেইজন্যই আমার ঘড়িতেও সময় দেখা যায় না।'

এলিস কিছুই বুঝল না। এ এক অদ্ভুত হেঁয়ালি।

টুপিওয়ালা তার মাতৃভাষাতেই কথা বলছে আর শুদ্ধ কথা বলছে অথচ মানে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এলিস খুব বিনীতভাবে বলল, 'আমি তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না।

'আবার ঘুমিয়ে পড়েছে,' বলে টুপিওয়ালা নেংটি ইঁদুরের নাকে খানিকটা গরম চা ঢেলে দিল।

নেংটি ইঁদুর নড়েচড়ে বসল। চোখ না খুলেই বলল, 'ঠিক, ঠিক, আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

টুপিওয়ালা এলিসকে জিজ্ঞেস করল, 'ধাঁধাটার কি হল? সেই দাঁড়কাক আর লেখার টেবিল?'

এলিস বলল, 'না, আমি পারলাম না। উত্তরটা কি?'

টুপিওয়ালা: 'সে আমি জানি না।'

বসন্তশশক: 'আমিও না।'

তাহলে মিথ্যেই এতক্ষণ বকবক করা হল। এলিস ক্লান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যে ধাঁধার কোন উত্তর নেই তা জিজ্ঞেস করে এই যে সময়টা নষ্ট করলে এর তবে কি মানে হয়?'

টুপিওয়ালা বলল: 'তুমি সময়কে চেন না। চিনলে ও রকম সময়টা সময়টা করতে না, ওঁকে 'উনি' বলতে।'

এলিস: 'তার মানে?'

টুপিওয়ালা (অবজ্ঞাভরে): 'মানে আর তুমি কি বুঝবে? তুমি কি কখনো সময়ের সঙ্গে কথা বলেছ?'

এলিস: 'তা বলি নি। কিন্তু গান শিখতে গিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পা ঠুকেছি।'

টুপিওয়ালা: 'তবেই হয়েছে। তবে আর সময়ের সঙ্গে তোমার বনিবনা হবে কি? উনি ওসব ঠোকাঠুকি পছন্দ করেন না। উনি হলেন গিয়ে মহাকাল। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে তা হলে তুমি যেমনটি চাও তোমার ঘড়িকে দিয়ে উনি ঠিক তেমনটি করিয়ে দিতেন। ধর, এখন সকাল নটা, পড়ার সময়, তুমি কেবল সময়ের কানে কানে বলে দিলে যে তোমার ছুটি চাই, বাস, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল—বেলা দেড়টা, খাবার সময়!'

(বসন্তশশক আপন মনে বলল, 'আহা, তাই যদি হত গো!')

এলিস বেশ ভেবে চিন্তে বলল, 'তা হলে খুবই ভাল হত সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার যে তখন খিদে পেত না।'

টুপিওয়ালা: 'প্রথমটায় হয়তো পেত না, কিন্তু তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে ঘড়িকে দেড়টাতে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারতে।'

এলিস: 'তোমরা কি তাই কর?'

টুপিওয়ালা (মাথা নেড়ে দুঃখিত স্বরে): 'কি করে আর করি? গত বসন্তে—(চায়ের চামচ দিয়ে বসন্তশশককে দেখিয়ে) এই হতভাগা পাগল হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে—ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে

গেল যে। হরতনের রাণীর গানের জলসায়। রাণী ওঁকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন, আর আমার তো গান গাইবার প্রোগ্রামই ছিল। আমি গেয়েছিলাম।

জুল জুল জুল জুল বাদুরের ছা
আকাশের গায়ে তুই যা উড়ে যা

গানটা জান তো?

এলিস ঃ 'অনেকটা এই সুরের একটা গান শুনেছিলাম—মিট মিট মিট মিট আকাশের তারা।'

টুপিওয়ালা ঃ 'পরের লাইনগুলো জান না?'

ডানা মেলে যা না তুই আরো উঁচুতে
মাদুর পেতেছে কে আকাশে শুতে
জুল জুল জুল জুল

নেংটি ইঁদুর একটু নড়ে উঠে ঘুমের মধ্যেই গাইতে শুরু করল, 'জুল জুল জুল জুল জুল জুল জুল জুল।' আর থামে না, শেষ পর্যন্ত বেশ কষে কান মুচড়ে দিলে তবে থামল।

তখন টুপিওয়ালা আবার শুরু করল, 'ব্যস, এইটুকু গেয়েছে, হঠাৎ রাণী চেঁচিয়ে উঠলেন—সময় নষ্ট করছে, ওর গর্দান নাও।'

এলিস বলল, 'কি ভয়ানক!'

টুপিওয়ালা দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল, 'সেই থেকে সময় আমার উপরে খাপ্পা। উনি আর আমার হিসেব মত চলেন না। এখন আমার সারা জীবনই বিকেল ছ-টা?'

এলিস বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, 'তাই বুঝি এত চায়ের সরঞ্জাম?'

টুপিওয়ালা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই। সব সময়ই চায়ের সময়, মাঝখানে যে বাসনগুলো ধুয়ে নেব তারও সময় নেই।'

এলিস ঃ 'তা হলে কি কর? এক জায়গায় চা খাওয়া হলে সবে গিয়ে আরেক জায়গায় বস?'

টুপিওয়ালা ঃ 'আর কি করব? এ দিকটার চা শেষ হয়ে গেলে ওদিকটায় চলে যাই।'

এলিস ঃ 'কিন্তু পুরো টেবিলটা ঘোরা হয়ে গেলে কি কর?'

বসন্তশশক হাই তুলে বলল, 'কি একই কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করছ? অন্য কথা বল। এই মেয়েটি বরং আমাদের একটা গল্প বলুক।'

এই প্রস্তাবে এলিস বেশ ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি গল্প টল্প জানি না'।

[ক্রমশঃ]

শিশুদের যদি আমরা যত্নের সঙ্গে গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ হবে চিন্তামুক্ত।

—জওহরলাল

ক্ষতি

[ইজ্রাইল এর রূপকথা]

কুমারেশ ঘোষ

অন্যের জায়গা থেকে ইঁটপাটকেলগুলো ছুঁড়ছ কেন নিজের জায়গায়? এক বৃদ্ধ বললেন ধনী ভদ্রলোকটিকে।

ধনী ভদ্রলোক তাঁর নিজের বাগান বাড়িতে কাজ তদারক করছিলেন ; মালীরা বাবুর জমির বাজে ইঁটপাটকেলগুলো নিয়ে ঝুড়ি করে ফেলে দিচ্ছিল বেড়ার পাশের রাস্তায়। আর সেই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন ঐ বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের কথায় ধনী ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন, রাগও হল তাঁর। জবাব দিলেন, কী বলছেন আপনি? অন্যের জায়গা থেকে ওগুলো ছুঁড়তে যাব কেন আমি? এ আমার জায়গা আমার বাগান বাড়ি, আমার সাজানো বাগান।

শুনে বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, যে কথা বললাম, সে কথা বোঝবার ক্ষমতা ঈশ্বর আপনাকে দেননি দেখছি। আচ্ছা চলি।

বৃদ্ধ আর দাঁড়ালেন না সেখানে, চলে গেলেন। ধনী ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন ; যত সব পাগল। মালীদের ধমকালেন, তোরা সব দাঁড়িয়ে কেন? নে নে কাজ কর।

কয়েক বছর পরের কথা।

ধনী ভদ্রলোকের বাগান পরিষ্কার, ঝকঝক করছে। ফুলে ফলে ভরা বাগান। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ব্যবসা ফেল হয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোকের অবস্থা হয়ে গেল শোচনীয়। ভদ্রলোকের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন ছেড়ে গেলেন। ক্রমে চারিদিকে দেনা হতে লাগল তাঁর। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিক্রী করতে হল অমন সাধের সাজানো বাগান।

শেষে ভদ্রলোকের অবস্থা হল আরো সঙ্গীন। আধপেটা খাবার জোটে না পেটে। পোড়া পেটের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয় পথে পথে।

পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন হোঁচট খেলেন এক বড় আধলা ইঁটে। উঃ! যন্ত্রনায় বসে পড়লেন তিনি পথের ধারে। চোখ চেয়ে দেখেন, সেই পথ, যে পথের উপরে তিনি তাঁর মালীদের দিয়ে ঝুড়ি করে ফেলাতেন ইঁটপাটকেল ইত্যাদি। ঐ ঐ তো পাশেই তাঁর বাগান, তাঁর সেই সাধের সাজানো বাগান। মনে পড়ল সেই বৃদ্ধের কথা : অন্যের জায়গা থেকে ঢিলগুলো ছুঁড়ছ কেন নিজের জায়গায়?

সত্যিই তো! আজ ঐ বাগান অন্যের, আর এই পথই তাঁর ভরসা। নিজস্ব। একমাত্র দাঁড়াবার জায়গা।

মানুষের কখন যে কি হয় বলা যায়না, কাজেই নিজের সুবিধের জন্য পরের অসুবিধা না করাই উচিত।

পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

সময় গড়িয়ে চলে হু-হু করে। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। টুকি-টাকি, সমস্ত সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। নেভি, এয়ারফোর্স গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ তাদের সাধ্যমত করেছেন। মার্চেণ্ট নেভি জানিয়েছেন তাঁরাও তাঁদের সাধ্যমত করবেন। এখনও তিনটে বড় ব্যাপারের সমাধা হয় নি। ট্রান্সমিটার সেট ঠিক উপযোগী মিলছে না। 'মাইশোর' থেকে যদিও ডিফেন্স ফুড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমাদের খাবার দেবে বলেছে, কিন্তু প্লেনে করে আনার খরচ একটা মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আর ডিউক এর সদ্ভাবের প্রশ্ন নিয়েও দুশ্চিন্তা।

ডিউক আর আমি থাকতাম একসঙ্গে মেরিন ক্লাবে—দিনের সমস্তক্ষণই। আমরা দু'জন দু'জনকে চিনেছিলাম। এমন সময় এল কালো মেঘ। সায়েন্স কলেজে ডিউককে নিয়ে গেলাম কয়েকবার আমার বৈজ্ঞানিক কিছু টুকিটাকি কাজকর্মের জন্যে। দেখলাম ডিউক বিরক্ত হতে শুরু করল। কেন জানি না ওর ধারণা জন্মাল, আমি ওর অবাধ্যতা করব। তাহলে মাঝ সমুদ্রে আমায় নিয়ে কি হবে, এমনতর ব্যাপার এমনি ধরনের সমুদ্র অভিযানে ভয়াবহ হয়। সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একদিন অবস্থা চরমে উঠল। একদিন সন্ধ্যে থেকে এক ভবঘুরে নাবিকের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে আর আর এক ভবঘুরে ডিউক, আমিও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছি। বিষয়টা ছিল সমুদ্রের ভয়ঙ্করতাকে নিয়ে। আমি কূলের মানুষ, এই অভিযানে আমাকে অসম্ভব রকমের সাবধান হতে হবে। সারা সন্ধ্যে ধরে ওদের সন্দেহ আমার ওপর। ঘোরাফেরার পর ডিনারের সময় হ'ল। খেতে বসে ডিউক অর্ডার দিল গরুর মাংস। হঠাৎ সেই সন্ধ্যেয় আমার গরুর মাংসের প্রতি অহেতুক এক বিতৃষ্ণা জন্মাল, আমি মাথা নাড়লাম—খাব না। এই সামান্য ঘটনাটা সেখানে বাড়ল না বটে তবে ডিউক গুম হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে মেরিন ক্লাবের ছোট ঘরের ওপাশের কোন থেকে ডিউকের গলা ভেসে এল—"তোমার সম্বন্ধে আমি আজ একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি।" ডিউক এই অভিযানের নেতা, তাই চুপ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। ও বলল, "তোমার সম্বন্ধে আমার মতামত মিহির সেনকে জানাব।" অন্ধকারের তলায় আমার ভারী কম্বলটা মনে হ'ল আমায় চেপে ধরেছে, যেন তলিয়ে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে জোর সঞ্চয় করে বললাম, "তোমার মতামতটা কি, এর একটু আভাস পেলে কৃতজ্ঞ হব।" আবার সেই নিস্তব্ধতা। তারপর শুনতে পেলাম ডিউকের গলা, পরিষ্কার ভাষায় অকপট ভঙ্গিতে বলল, "তোমার অ্যাডজাস্টমেণ্ট সম্পর্কে আমার সংশয় আছে, তাই নিয়েই।"

তারপরের দিনটা কেমন যেন বন্য হয়ে উঠল

আমার কাছে, আবার সেই ক্লান্তিকর অনিশ্চয়তা। যত সন্ধ্যে হতে লাগল, মনে মনে নিজেকে বোঝালাম, ভালই হল, আর যেতে হবে না।

সন্ধ্যা হল। একসপ্লোরার ক্লাবের মিটিং চলছিল। হঠাৎ কি মনে করে মিত্থির সেন ডিউক আর আমাকে ডাকলেন পাশের ঘরে। তৈরি হয়ে নিলাম মনে মনে। পিঠের উপর হাত রেখে মিত্থিরবাবু বলে চললেন। আমি তখন উদগ্রীব হয়ে আছি; হ্যাঁ কি না জানতে। হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। শুধু সময় দিলেন। ডিউক তার হাতটা বাড়িয়ে দিল হাসি মুখে। আমি বুঝলাম আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে এরা সকলে। হঠাৎ নিজেকে বড় একা লাগল, এই কঠিন বাস্তব দুনিয়া এখানে বাবা নেই, মা নেই, ডঃ মৈত্র নেই। আমি একক, নিঃসঙ্গ।

এ ব্যাপারে মোটামুটি একটা সমাধান হ'ল। ট্রান্সমিটার আর ফড-পারচেজ আনার সমস্যার তখনও সমাধান হয় নি।

পরে ফড পারচেজ আনার সমস্যা মিটল। আই. এ. সি. সেগুলো বিনা খরচে এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু ট্রান্সমিটারের সমস্যা রয়ে গেল। অনেক মিটিং বসল, অনেক কথা খরচ হল কিন্তু হাল্কা আর পাওয়ার ট্রান্সমিটারের খবর কেউ দিতে পারল না। মিত্থিরবাবুকে খুব ক্লান্ত আর চিন্তিত মনে হতে লাগল।

ডিউক ফিরে এল খাবার নিয়ে। আমিও এলাম সাতদিন সমুদ্র ঘুরে। আমাকে পাঠানো হয়েছিল সমুদ্রে সী-সিক হই কি না তা পরীক্ষা করতে, আর অন্ধকারে সমুদ্রে একা থাকতে পারব কি না তা দেখতে। আমার উৎসাহের সীমা ছিল না যখন শুনলাম আমাকে রওনা হতে হবে স্যাণ্ড হেড্‌সে। স্যাণ্ড হেড্‌স ব্যাপারটা সাধারণ লোকের মত আমার কাছেও নতুন। যাই হোক, প্রশ্ন করা এখানে নিষেধ, শুধু কাজ করে যাওয়া। সে রাত্রে আর কোন জাহাজ মিলল না, জাহাজ ছাড়বে কাল সকাল দশটায়।

যথা সময়ে হাজির হলাম ক্যাপ্টেন পাভরির পোর্ট কমিশনের হারবার মাস্টারের অফিসে। সাত সমুদ্র থেকে আনা অভিজ্ঞতার ছাপ ক্যাপ্টেন পাভরির সারা শরীরে। সদা প্রসন্ন মানুষ বসে আছি তাঁর ঘরে, সাদা পোষাক পরা বলিষ্ঠ মানুষ এসে ঢুকলেন। পরিচয় হ'ল ক্যাপ্টেন দেশমুখ বিভাব পাইলটের সাথে। মনের ভেতরের লক্ষ লক্ষ প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই তখন দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন। বিরাট বড় আমেরিকান লাইনারে আপার ডেকে তখন আমরা দাঁড়িয়ে।

[চলবে]

মানুষের একটা বিরাট ক্ষমতা এই যে, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

—জওহরলাল

দিনের শেষে

সত্যজিৎ সেনগুপ্ত

আমাদের বাড়িটা শহর থেকে অনেক দূরে। চারদিক ফাঁকা, জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে। দূরে দেখা যায় হিমালয়, তার গায়ে ঘনবিন্যস্ত বন। তার উপর থেকে উঁকি দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা।

আমি পড়ি কাছের শহরটার একটি মাত্র স্কুলে। স্কুল থেকে যখন বাড়ি ফিরি তখন বিকেল ফুরিয়ে আসে। পুরোনো হয়ে যাওয়া দিনের আলোটাকে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে পৃথিবী হাত বাড়ায় নতুন রাতের অন্ধকারের দিকে! পড়তে বসতে বসতে সূর্যের শেষ আভাসটুকুও মিলিয়ে যায়।

স্কুলের চাপ আর আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার পড়ার চাপে আমায় অনেক রাত অবধি পড়তে হয়। সারাদিন কাজ করার পর ক্লান্ত মা-বাবা শুয়ে পড়েন, আমাকে বেশি রাত করতে মানা করে। ঘড়িটা আপন মনে চলতে থাকে।

হাতের কলমটা যখন রেহাই পায়, তখন স্বপ্ন লোক পৃথিবীর উপর ভর করেছে। কলমটার সঙ্গে ছুটি পায় ওভারটাইমে তেতে ওঠা টিউবলাইটটাও।

হঠাৎ আলো থেকে অন্ধকারে আসা চোখের মতো পড়াশুনা থেকে সবে ছাড়া পাওয়া আমার মনটা নিঝুম রাতটাকে প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। পড়ার বই-এর পাতাগুলো যত আমার মন থেকে মিলিয়ে যায়, তত আমাকে পেয়ে বসে এই নিস্তব্ধ রাত্রির এক নাম-না-জানা, আকুল-করা অনুভূতি। আর সেই রহস্যময় নিঃশব্দ ভেদ করে দূরের কোন ঝরণার রেশের মতো নানা রকম শব্দ আমার কানে ভেসে আসে। দূরে শেয়ালের ডাক মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের পুরোনো কলকাতার বর্ণনাটা। পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা ঐ বনটায় যারা ডেকে ওঠে। রাতের অন্ধকার তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আশ্রয়দাতা। সেই ডাক শুনে মনটা কেমন আনচান করে।

পাশের ছোট রাস্তা দিয়ে দশটা চারটার নিয়ম ভাঙ্গা নাইট ডিউটি দেওয়া একটি লোক অকারণে তার সাইকেলটার বেল বাজাতে বাজাতে চলে গেল। গ্রামের কোন লোক গুন গুন করতে করতে হেঁটে যায়। বোধ হয় গ্রামে ফিরছে। কোথা থেকে কানে আসে একটা অস্পষ্ট কোলাহল।

বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়িগুলোর শোঁ-শোঁ শব্দ শুনতে পাই। কোথায় যাচ্ছে জানতে ইচ্ছে করে। শোনা যায়, কামরূপ এক্সপ্রেসের হুইস্‌ল্। একটা নেড়ী কুকুর কোন অদৃশ্য চোরকে সাবধান করে দিয়ে তার সঙ্গীদের সাড়ার অপেক্ষায় বসে থাকে। সঙ্গীরা সাড়া দেয় না।

ভুতুড়ে বাঁশঝাড়গুলোকে কাঁপিয়ে দেয় এলো-মেলো খোড়ো হাওয়া। বাঁশের ভিতরে কিসের যেন ফিসফিসানি শোনা যায়। ভয়ে গা শিরশির করে ওঠে বাগানের ঝাউ গাছটার পাতাগুলো। শোনা যায় দূরে শ্মশানে—'বল হরি হরি বোল'। আমার মনটা একটা অজানা ভয়ের স্বাদ পায়।

এই রাতের পরিবেশ আমাকে কল্পনাপ্রবণ করে তোলে। আচমকা মেঘের গর্জনকে মনে হয় বাঘের ডাক। ঘরের মধ্যে কেউ হাঁটছে ভেবে আমি বিছানায় লাফিয়ে উঠি। পরে বুঝতে পারি সেটা ঘড়ির টিকটিক শব্দ। চাঁদের আলোয় জানালার পর্দার ছায়া মেঝেতে পড়েছে, হাওয়ায় ভেঙ্গে পড়া নিরীহ গাছের ডালটাও আমাকে ভয় দেখায়। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া আমার প্রাণটা ভরিয়ে দিয়ে যায় চোখ দুটো মেলা থাকতে চায় না। ঘুমের গাড়িতে চড়ে আমি পাড়ি দিই স্বপ্নপুরীর উদ্দেশ্যে। ফিরে এসে দেখি অস্থিরমনা পৃথিবী রাতকে পরিত্যাগ করে আবার সূর্যের কাছেই হাত বাড়িয়েছে।

ছবি আঁকার ফ্যাসাদ

কৌশিক ঘোষ (সভ্য, ১১)

বছর তিনেক আগের কথা। সবাই তখন ভাবত যে আমি ভাল ছবি আঁকতে পারি না। এটা ভুল (আমার মতে), দাঁড়াও এ'কে দেখাচ্ছি।

বসে পড়লাম কাগজ পেন্সিল, রঙ তুলি নিয়ে। সামনে সাবজেক্ট—আমাদের কুকুর ককি (কারণ সে একটা ঝগড়াটে স্প্যানিয়েল)। পেন্সিল স্কেচ্ শেষ। এবার রঙ বুলোব। বাঃ! নিজের আঁকা নিজেই তারিফ না কবে পাবলাম না। সবাই
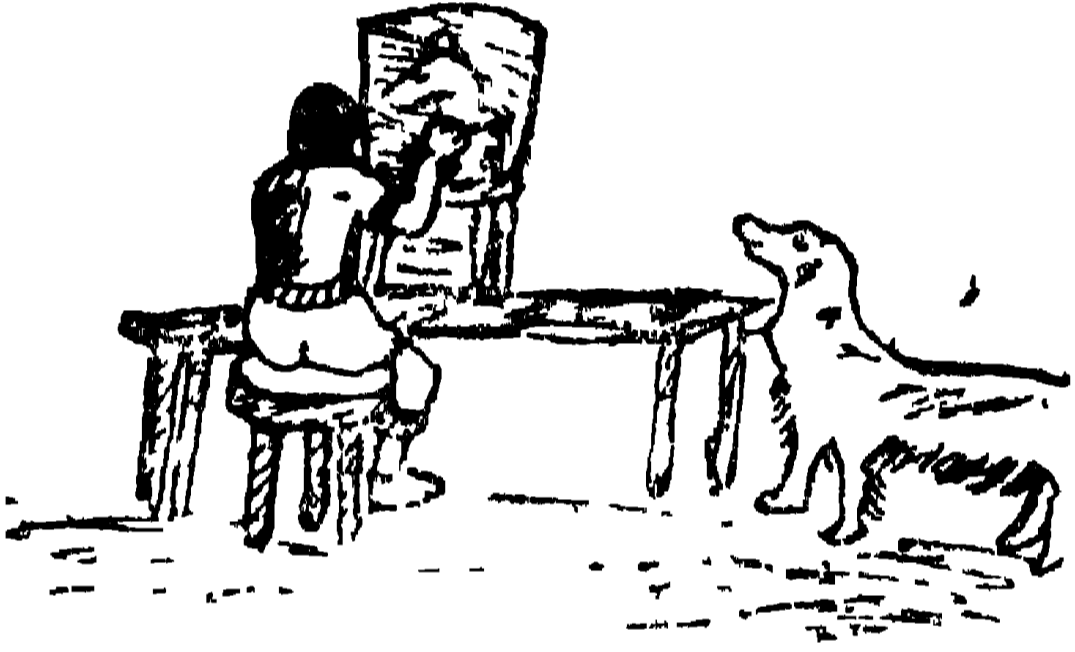
তারিফ তো করবেই। এমনকি ছবিটা মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেবে। চটাপট হাততালি দেবে আর প্রশংসা করবে ? এ যুগেব শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী (অঙ্কন বিভাগের) মহান মাস্টার কৌশিক ঘোষকে—।

একটা লোকের আনন্দ সব সময়ে টেঁকে না। ঠিক সেই সময়ে জেগে উঠল ককি। আনন্দে আমার পা ছুটো তুলছিল। তারই ছোঁয়াতে অহল্যা উদ্ধারের মতো জেগে উঠল কুকুবটা। উঠে সোজা টেবিলের উপর। বার তুই শুঁকল ছবিটা। তারপর মূর্তিমান বিভীষিকার মতো একটা বিজাতীয় ডাক ছেড়ে একেবারে ছবির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছবির দফা গয়া। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে কান ধরে টেনে আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন সব শেষ। ভিজে ছেঁড়া কাগজটার উপর দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল—"ঘৌ! ঘৌ! ভৌ! ভৌ!" (অর্থাৎ আমার রাজ্যে কুকুর আসছে না, আসবে না, এলেও তাকে সহ্য করব না)।

ঠিক তখন ঘরে হাসতে হাসতে ঢুকলেন আমার বাবা ও মা! আমার তখন চোখ ফেটে প্রায় জল বেরিয়ে এসেছে। আমার হাতটা কুকুরের কান থেকে ছাড়িয়ে মা বললেন,—একি এঁকেছিস রে ? ভাবিস না, এটা তোর পুরোনো আর্টের কুকুরের ছবি না হলেও, এ মডার্ন আর্টের কুকুরের ছবি।"

আমি অবশ্য মার সঙ্গে একমত হই নি।

জনসাধারণের কাজে আদর্শ আর নীতি জড়িত থাকে। আর সেগুলোতে থাকে পরস্পরকে বোঝাবুঝি এবং সহকর্মীর প্রতি বিশ্বাস। যদি বিশ্বাস এবং বোঝাবুঝির অভাব ঘটে, তাহলে সহজভাবে সুবিধে করা শক্ত।

অথ রসাল কথনম্

ঈশিতা কর (সভ্যা, ১১)

আমি তোমাদের ইস্কুলে একটি সাধারণ আম গাছ। সেই যেবার তোমাদের ইস্কুলে "বনমহোৎসব" হল সেইবার আমাকে এখানে নিয়ে আসা হল। তোমরা আমার চার পাশে ঘুরে ঘুরে নাচলে, সবাই মিলে গান করলে—"মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও"। প্রদীপ দিয়ে তোমরা আমায় বরণ করলে। তার পরের দিন থেকে মালী আমায় খুব যত্ন সহকারে মানুষ করতে লাগল। মালীর হাতের যত্ন পেয়ে আমি এখন এত বড় হতে পেরেছি। তোমরা এখন টিফিনের সময় আমার ছায়ায় খেলা কর, দেখে আমার খুব আনন্দ লাগে। তোমরা আমাকে খুব ভালবাস তাই না! তোমাদের কাছে আমি কাঁচা অবস্থাতে যেমন, পাকা অবস্থাতেও তেমন সমান লোভনীয়। গরমের দিনে বিকেলে আম পোড়ার সরবৎ খেয়েছ তো? আর সেই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছ—"আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি"—সেই আমসত্ত্ব তো আমারই দান, অনেকে আমাকে আদর করে ডাকে রসাল। বাড়িতে পূজো বা মঙ্গল অনুষ্ঠান হলে, আমার পল্লব ভেঙে নিয়ে যাও। ফাল্গুনে আমার গায়ে যে বোল বেরোয় তার গন্ধে মৌমাছিরা ছুটে আসে। আমার ফুল থেকে মধুও পাও। তোমরা কি ভেবেছ, আমি শুধু তোমাদের ইস্কুলের বাগানে বা ছোটখাট বাগানে জন্মে থাকি! মোটেই তা না, পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে আমার ফলন হয়। ভারতবর্ষ ছাড়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমার জ্ঞাতি ভাইরা ছড়িয়ে আছে। ভাবতে প্রায় সব রাজ্যে আমার চাষ হয়। প্রায় দশ লক্ষ হেক্টার জমি জুড়ে। পশ্চিম বাংলায় মালদা আর মুর্শিদাবাদেই আমার কদর বেশি।

তবে যত লোক বাড়ছে, তত লোকের বসতিও বাড়ছে। আমাদের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তোমাদের কাছে যখন আমি এতই প্রিয়, তবে বড় হয়ে প্রতিবাদ করবে, একটি গাছ কাটলে লোকে যেন দশটি গাছ লাগায়।

তোমরা হয়ত অনেকেই জান আমাদের পরিবার প্রায় আশিজন সদস্য নিয়ে। তাদের মধ্যে তোমাদের খুব চেনা নাম হল—আলফোঁসা, ল্যাংড়া, চৌসা, ফজলী, হিমসাগর, বোম্বাই, গোলাপখাস, মধুগুলগুলী, বেগমপসন্দ ইত্যাদি। জান তো, মুসলমান আমলে আমার খুব কদর ছিল। শুনেছি সম্রাট আকবর নাকি খুব ভালবাসতেন। তাঁর আমলে আমাদের চাষ বেড়ে যায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। মুর্শিদাবাদের নবাবরাও আমাদের খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু ইংরেজদের আমলে আমাদের অনাদর আরম্ভ হল।

আমার ফলের আঁটি যেখানে সেখানে পুঁতে দিলে গাছ বেরিয়ে যায়। কেউ কেউ আবার আমাদের গা থেকে কলম কেটে নিয়ে লাগায়। এতে ফলন ভাল ও তাড়াতাড়ি হয়।

আজকাল এত গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে যে শুধু আম গাছ কেন আমাদের মত সব গাছেরই বিপদ। সেই সঙ্গে তোমাদেরও বিপদ। আমরাই তোমাদের পরিবেশকে শোধন করি। আমরাই বৃষ্টি আনি, মরুভূমি রুখি, সবুজে ঢেকে রাখি চারিদিক। কাজেই আমাকে যেমন ভালোবাস, তেমনি অন্য গাছকেও ভালবাসবে আর সুযোগ পেলেই গাছ লাগাবে। আর বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। আর আমরা আমাদের সবুজ সবুজ হাত বাড়িয়ে ডাকব তোমাদের, আমাদের ছায়ায় ছুটোপুটি করতে।

হীরামতি রাজকন্যা

(রূপকথা)

ডাঃ অমিয়নাথ ব্রহ্ম

ছুটির দিনে দুপুরবেলা দাদুর পাশে শুয়ে গল্প শুনছে নাতি আর নাতনী।

দাদু গল্প বলছেন—

মিষ্টি দিদি দুষ্টু দাদা

গল্প বলি শোন,

জলার ধারে দুটো ব্যাঙ

তাদের খবর জান।

দুষ্টু দাদা ও মিষ্টি দিদি অবাক; বলে, না তো, ব্যাঙদের খবর জানি না তো। দাদু বলেন, তবে শোন, ব্যাঙদের গল্প বলি। সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। কলকাতা শহরটা তখন কেউ ভাবতেও পারে নি। এখানটা ছিল সুন্দর বন, বড় বড় গাছ আর ঘন জংগল। বাঘ ভাল্লুক আর সাপের রাজ্য। নদীতে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ আর তারই মাঝে পোড়ো মন্দির, বড় বড় ঢিপি, মজা মজা বড় বড় দীঘি, ডাইনী আর দৈত্য দানবের আস্তানা। শুনতে পাওয়া যেত একদিন এখানে এক বড় রাজার রাজত্ব ছিল। রাজা রাণী, রাজপ্রাসাদ, কত লোক লস্কর, হাতি ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত সব কেমন করে একদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

লোকজন কেউ ওদিকে যেত না। কেবল রাজারাজরা যখন শিকারে যেতেন, তখন হাতি, ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত, পাইক-বরকন্দাজ, অস্ত্র-শস্ত্র আর তাবু নিয়ে বনে ছাউনি ফেলতেন। কয়েকদিন শিকার করে রাজারা ফিরে যেতেন। বনের ধারে একটা দীঘি ছিল। লোকে বলত ডাইনীর দীঘি। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া যেন একটা নদী। বনের ধারে একটা নদী। নাল মিশামিশে জল আর হাওয়া দিলে বড় বড় ঢেউগুলো সাঁ সাঁ শব্দ করত, যেন একসঙ্গে অনেকগুলো ডাইনী ছুটে আসছে।

সৈন্য-সামন্তেরা দীঘির পাড়ে গেলে দেখতে পেত দুটো ব্যাঙ ভারি সুন্দর দেখতে। জল থেকে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। একটু কাছে গেলেই শুনতে পেত—

আমরা দুটো ব্যাঙ

সোনা রূপো নাম,

দিনরাত্রি করি 'ঘ্যাঙর ঘ্যাং।'

মাছ যদি কেউ ধর

কাতলা মাছের ল্যাজ কাটলে

পাবে হীরের দাম।

ছড়াটা বলেই ব্যাঙগুলো গভীর জলে ডুব দিত। কথাটা রাজামশাইএর কানে গেলে তিনি হুকুম দেন জাল দিয়ে মাছ ধরা হোক। জেলেরা জাল ফেলতে যায়, কিন্তু জলের ধারে গিয়ে দেখে বিলের মূর্তি ভীষণ। বড় বড় ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। জলের মধ্যে গুম গুম শব্দ হচ্ছে। সকলে বলে ডাইনীরা চটেছে, কেউ আর জলের ধারে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। রাজামশাইকে গিয়ে একথা জানানো হল।

এক দেশের এক রাজপুত্রের কাছে খবরটা যায়। রাজপুত্র ছিল খুব সাহসী, আর মস্ত বড় বীর। তাছাড়া, তার ছিল একটা পোষা হীরামন পাখি। রাজপুত্র তাকে খুব ভালবাসত। পাখিটাও রাজপুত্রকে ঠিক ঠিক খবর বলে দিতে পারত।

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করে, হীরামন, ডাইনীর দীঘিতে মাছ ধরতে পারব?

হীরামন জবাব দেয়,—হ্যাঁ, পারবে। তবে, সে খুব কঠিন উপায়ে ধরতে হবে। কারণ, জাল দিয়ে কেউ মাছ ধরতে পারবে না।

রাজপুত্র বলে—তাহলে কী হবে।

হীরামন উত্তর দেয়—সোনার ছিপে সোনার তারের সুতোয় একটা আংটি বেঁধে ফেললে তাতে বড় একটা কাংলা মাছ উঠে আসবে। খবরদার! মাছটার গায়ে হাত দিও না। মাছটার লেজের দিকে তলোয়ারের এক কোপ দিয়ে কাটলে একটা মজার জিনিস পাবে। বিপদ দেখলে মাছের কাটা লেজটা তলোয়ার দিয়ে জলে ফেলে দিলেই সব বিপদ কেটে যাবে।

রাজপুত্র খুব খুশি হয়। বলে কেমন করে জঙ্গল পার হয়ে যাব বলে দাও।

হীরামন রাজপুত্রকে সাবধান করে দেয়—জঙ্গলের ধারে একটা পোড়ো মন্দির পাবে। সেখানেই রাত কাটাবে। মন্দিরের মধ্যে কোন বিপদ নেই কিন্তু তার বাইরে গেলেই বিপদ।

হীরামন রাজপুত্রকে আরও সাবধান করে দেয়—যাবার সময় সিংহবাহিনীর পূজার ফুল সঙ্গে নিয়ে যাবে। বিপদ দেখলে ফুলের একটা পাপড়ি ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলেই বিপদ কেটে যাবে। রাজপুত্র পাখিকে

আদর করে বিদায় দিয়ে এল। কদিন ধরে একটা সোনার ছিপ তৈরি করিয়ে তাতে সোনার সুতো আর

সোনার আংটি। বঁড়শির মতো বেঁধে নিল। সঙ্গে নিল তার দুই বন্ধু মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্রকে। বাছা বাছা তেজী ঘোড়া নিল তিনটে আর অস্ত্রাগার থেকে বেছে নিল তিনটে ঝকঝকে তলোয়ার। সঙ্গে নিল এক মনের মত খাবার আর চামড়ার ব্যাগভর্তি জল। তারপর একটা শুভদিন দেখে তারা তিন বন্ধু বেরিয়ে পড়ল অজানার পথে।

সারাদিন ধরে ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে তারা তিন বন্ধুতে গল্প করতে লাগল। কারও মনে ভয় ছিল না। তারা ছিল খুব বীর আর তাদের বুকে ছিল দুঃসাহসের নেশা।

সন্ধ্যার সময় তারা ক্লান্ত হয়ে এসে পৌঁছল বনের ধারে। সেখানে দেখতে পেল একটা পোড়ো মন্দির রয়েছে। পাখি ঠিকই তাদের বলে দিয়েছিল। রাজপুত্রেরা ঐ মন্দিরেই আশ্রয় নিল। রাত আজ তারা এখানেই কাটাবে। ঘোড়াগুলোকে কাছেই ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হল। তিন বন্ধুতে মন্দিরটার ভেতর পরিষ্কার করে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করল। ঠিক হল তারা পালা করে রাত জাগবে। বিপদ দেখলে আর দুজনকে জাগিয়ে দেবে।

রাতের প্রথম দিকটা ভালভাবেই কাটল। তিন বন্ধুতে সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে চামড়ার থলি থেকে ঠাণ্ডা জল খেল। ঘোড়াগুলোও বেশ মনের আনন্দে কাছাকাছি ঘাস খেতে লাগল। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, ফাঁকা জায়গায় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। শুধু মাঝে মাঝে জন্তু জানোয়ারের ডাক আর হায়নার অট্টহাসি শোনা যাচ্ছিল। রাজপুত্ররা খুব সাহসী তাই তাদের কোন ভয় করছিল না। তাছাড়া তাদের সঙ্গে ছিল ঝকৃঝকে তলোয়ার আর সিংহবাহিনীর মায়ের পূজার ফুল।

কিছুক্ষণ পরেই চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ল আর সমস্ত বন অন্ধকারে ঢেকে গেল। একটা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে শাঁ—শাঁ শব্দ শোনা যেতে লাগল। ঘোড়াগুলো মন্দিরের পাশে একটা বিরাট বটগাছের তলায় আশ্রয় নিল। রাজপুত্রেরা মন্দিরের মধ্যে সতর্ক প্রহরীর মত বসে রইল।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে নামল মুষলধারে বৃষ্টি। চারদিকে শুধু ঝমঝম আওয়াজ আর বিদ্যুৎ চমকানি। কিন্তু বটগাছটা এমনই বিরাট যে তার ডালপালা সমস্ত জায়গাটাকে ছায়ার মত ঢেকে রেখেছিল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থেমে গেলে শোনা গেল ঘোড়াদের চিঁহি চিঁহি রব আর দূরে দুপদাপ ভারি পায়ের শব্দ। ঘোড়াগুলোকে দেখা গেল মন্দিরের সিঁড়ির কাছে। তারা চিঁহি রব তুলে রাজপুত্রদের ডাকছে। রাজপুত্ররা তলোয়ার নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। দূরে দেখা গেল একটা কালোপাহাড়ের মত কি এগিয়ে আসছে। হাত-পাগুলো বিরাট লম্বা আর চোখ দুটো জ্বলন্ত আগুনের গোলার মত!

রাজপুত্রেরা বুঝল পাখির মুখে শোনা সেই দুর্দ্ধর্ষ অঘা রাক্ষস এটা। তবে পাখি বলে দিয়েছিল মন্দিরের মধ্যে রাক্ষস ঢুকতে পারবে না। বিপদ দেখলে সিংহবাহিনী ফুল তলোয়ারে ছুঁইয়ে রাক্ষসের বুকে ঠেকালে তার সমস্ত হাত পা খসে গিয়ে এক জায়গায় পড়ে যাবে। তাতেও যদি সে না পালায় তা হলে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে তলোয়ার দিয়ে তার বুকে ঠেকালেই সে তাল পাকিয়ে যাবে, আর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সাবধান রাক্ষসের গায়ে যেন ছোঁয়া না লাগে।

রাজপুত্র আর তার দুই বন্ধু তলোয়ার খাপ থেকে বার করে সিংহবাহিনীর ফুল ছুঁয়ে নিল আর

রাজপুত্র তার পাগড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখল একটা ফুল। ঘোড়াগুলোকে মন্দিরের বারান্দায় তুলে এনে তারা রুখে দাঁড়াল রাক্ষসের দিকে। রাক্ষস তখন কাছাকাছি এসে গেছে, কিন্তু রাজপুত্রেরা মন্দিরের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে তাদের কিছুই করতে পারছিল না। শুধু ঝলক ঝলক আগুনের মত নিঃশ্বাস ছেড়ে তাদের পুড়িয়ে দিতে চাইছিল। রাজপুত্র তার তলোয়ার এগিয়ে রাখল আর রাক্ষসটা যেই একটু এগিয়ে এসে তলোয়ারটা কামড়াতে গেল অমনি তার বুকে সেটা ছুঁইয়ে দিতেই রাক্ষসটা আছাড় খেয়ে পড়ল। হাত-পাগুলো খসে পড়ল গাছের ডাল পালার মত। শুধু দেহটা একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল। রাজপুত্র নেমে এসে তার তলোয়ারের আগায় একটা ফুলের পাঁপড়ি নিয়ে রাক্ষসটার গায়ে ঠেকিয়ে দিল আর অমনি একটা বিরাট আওয়াজ হয়ে পাথর ফাটার মত রাক্ষসটার দেহটা চৌচির হয়ে গেল। হঠাৎ দেখা গেল মন্ত্রীপুত্র একটা করুণ শব্দ করে পড়ে মারা গেল। তার শরীরে রাক্ষসের একটা টুকরো এসে লেগেছে।

(পরের সংখ্যায় সমাপ্য)

মশাকে খুকু

গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম

ভাই মশা তুমি কেন
ঘুর ঘুর করো—
কামড়টা দিও নাকো,
ঘুষ নাও ধরো।

দুধ দেবো, ছানা দেবো,
আর কি কি চাও?
ঢুকো না কো মশারীতে
রেহাইটা দাও।

পারিনা তো জ্বালাতন
এসো নাকো পাশে,
চলে যেও মধুপুরে
তুলে দেবো বাসে।

রূপকথার দেশ

সন্দীপন চৌধুরী (সভ্য, ৮)

নীল আকাশের মাঝে,
অপ্সরীরা নাচে।

রূপকথার এই দেশ,
ভাবতে লাগে বেশ,
যদি যেতে পাই
পড়াশুনা নাই।

শুধু মজা শুধু খেলা,
চারিদিকে খুশির মেলা,
নাচব খেলব সারা বেলা।

আর কিছু না চাই,
মামন যখন ডাকবে 'টুপাই'
দেখবে আমি নাই।
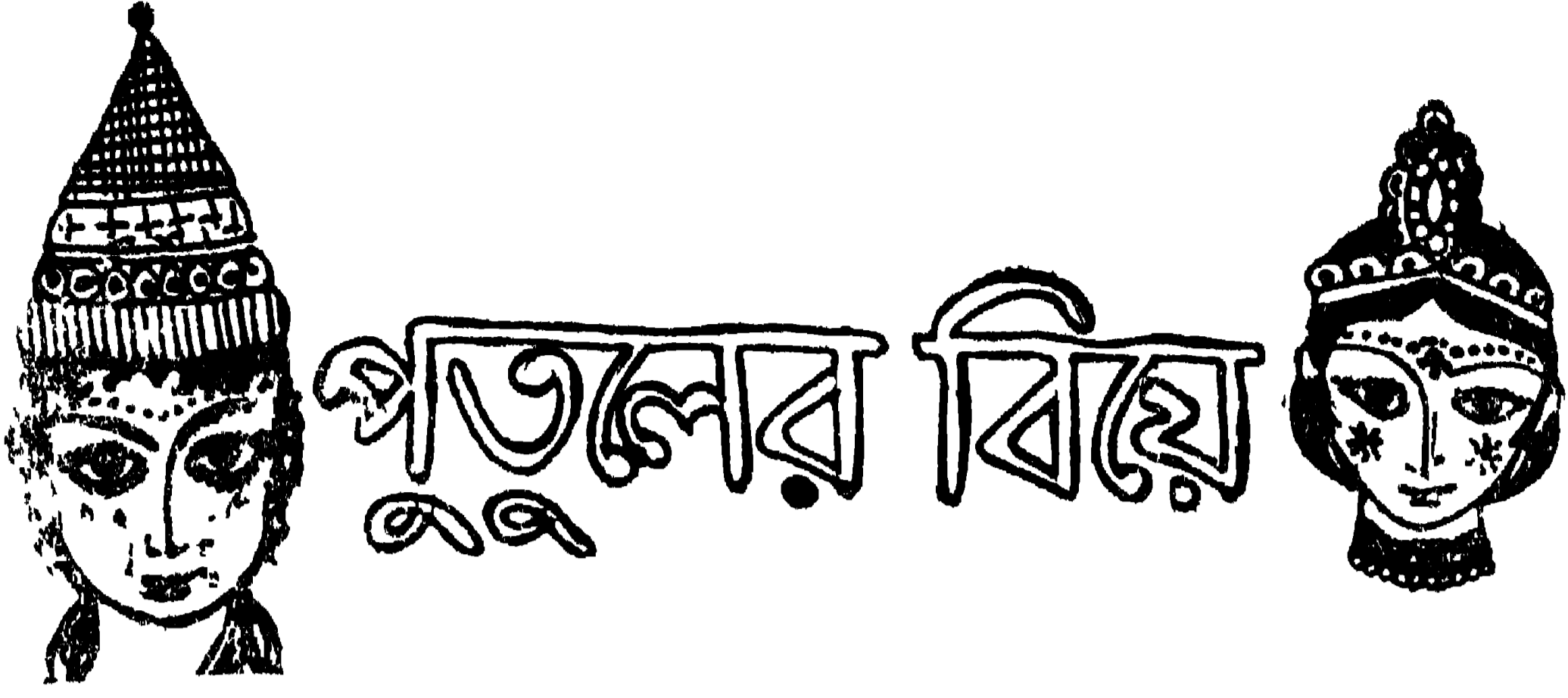
অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, ৮)

আমি একদিন ছুটির দিনে অংক করছি, দেখি কে যেন 'অনন্যা, অনন্যা' বলে ডাকছে। গিয়ে দেখি আমার বন্ধু অনিন্দিতা। হঠাৎ ও আসায় জিজ্ঞেস করলাম, কিরে, তুই এখানে কেন? ও বলল—দেখ, আমরা ঠিক করেছি আজ আমাদের পুতুলের বিয়ে দেব। আমি তো এই শুনে লাফিয়ে উঠলাম। দৌড়ে গিয়ে মাকে বললাম, মা আমরা আজকে পুতুলের বিয়ে দেব। মা বললেন, ঠিক আছে। আমি বইগুলো তাড়াতাড়ি রেখে দিলাম। আমি আর আমার বন্ধু মিলে বিকেলের দিকে একটা সময় ঠিক করলাম। তারপর বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কি মজা যে হচ্ছিল! দিদিভাই রান্না করতে লাগল—লুচি, আলুরদম, পেঁপে আলুর তরকারি, মাংস, আলুভাজা, পটলভাজা। অন্যান্য বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হল, রীণা, মিতা, সুস্মিতা, মৌ, সুচরিতা আরও অনেককে।

আমার মেয়ে আর অনিন্দিতার ছেলে। দিদিভাই রান্না করছিল ঠিকই, কিন্তু সে তো রান্নাঘরে বড়দের রান্না। ইতিমধ্যে আমার মেয়ে ও অনিন্দিতার ছেলে বলে উঠল, ও রান্না হলে চলবে না। বর কনের রান্না কই? আমরা তখনই বালির পোলাও, দেশলাই কাঠির ভাই, পাথরের কুচির তরকারি, খোলামকুচির লুচি রান্না করলাম। পুতুলদের সে কী আনন্দ! তারপর নির্ধারিত সময়ে বিয়ে হল। খুব মজা করে সময় কেটে গেল। সবাই মিলে মজা করে খাওয়া হল। সন্ধ্যে হবার পরই বন্ধুরা বলল, শোন, এবার আমাদের যেতে হবে। একে একে সবাই চলে গেল, শুধুমাত্র অনিন্দিতা আর রীণা ছাড়া। বরকনের যাবার সময় হল। আমার মনে কষ্ট হল। কান্না পেল। আমার চোখে জল দেখে অনিন্দিতা বলল, আজকের দিনটা তোদের বাড়ি থাক, কাল না হয় যাবে।

আমার পুতুল মেয়ের বিয়ের দিনটার কথা কখনও ভুলব না।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষাগত দিক থেকে ভারতবর্ষ কিন্তু অত্যন্ত সুসংবদ্ধ দেশ; তবুও যে এত উপ-ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, জনশিক্ষার অভাবই তার কারণ।

আমার প্রিয় ছোট্ট পুষি

মৃত্তিকা দে (সভ্যা, ৮)

আমার একটি ছোট্ট বিড়াল ছিল। আমি তার নাম রেখেছি পুষি। পুষির গায়ের রং সাদা ধবধবে। তার তিনটি বাচ্চা ছিল। একদিন পুষিটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর পুষির বাচ্চাগুলো শুধু ঘরের মধ্যে মিঁউ মিঁউ করছিল। ওদের দেখে তখন আমার খুব দুঃখ হল। সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম পুষিকে খুঁজতে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে এসে যখন ঠাকুর ঘরে গেছি, দেখি মা পূজো করতে বসেছেন আর আমার প্রিয় পুষি ঠাকুর ঘরে মিঁউ মিঁউ করে কাঁদছে।

পুষির হঠাৎ ঠাকুর ঘরে যাওয়া দেখে ভাবলাম পুষির কি ভাবান্তর ঘটল! যে মাছ ছাড়া আর কিছু জানে না বলে রান্নাঘর ছাড়তে চায় না, সে নাকি আজ সব ছেড়ে ঠাকুর ঘরে! তাহলে কি আজ পুষিকে মাছ দেওয়া হয়নি, ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হয়েছে, তাই কলা খেয়ে কি সে কাঁদছে!

ব্যাঙের ছাতা

সৌমেন কর (সভ্য, ১০)

ছাতা মাথে দিই আমি
রোদ আর বৃষ্টিতে
পাছে মাথা পোড়ে, ভেজে
রোদে আর জলেতে।
কিন্তু ব্যাঙ ছাতা তার
কখন মাথায় দেয়?
কোলাব্যাঙ্, কুনোব্যাঙ্
দেখি নাতো হায়!
দেখি বটে মাঝে মাঝে
বই এর পাতাতে
ব্যাঙ আছে বসে সেথা
দিয়ে ছাতা মাথাতে।
আসলে ব্যাঙের ছাতা
ব্যাঙ করে না কো ভাই
ওটা এক জাতীয় ছত্রাক-
উদ্ভিদ জেনো তাই।
তবু কবে থেকে কেন
জানি না তো—
ব্যাঙের ছাতা নামে তা
হলো পরিচিত।
ব্যাঙও হাসি মুখে
মেনে নিল তা—
সেই থেকে পেটেন্ট হল
ব্যাঙের ছাতা।

একটি বনভোজনের অভিজ্ঞতা

তাপস সিংহ (সপ্তম, ১০)

মানুষ নানা ঘটনায় কত রকম যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার ঠিক নেই। মানুষ অজানাকে জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগে এবং অজানাকে যখন দেখে তখন মানুষের মধ্যে নানা রকমের অভিজ্ঞতা আপনা আপনি চলে আসে। অনেকে নিজের অভিজ্ঞতাটি নিজেকেই বুঝতে দেয় না, কিন্তু এমন কত শত লোক আছে যারা তাদের অভিজ্ঞতাটাকে আরও কল্পনা দিয়ে বাড়াতে চায়। সেই রকম আমার একটি বন-ভোজনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলাম।

১লা জানুয়ারী আমরা পাড়া থেকে বড়, ছোট বাবা ও মা'রা সবাই চললাম মধ্যমগ্রামে বন-ভোজন করতে। আমরা মোট ৫০ জন ছিলাম সবাইকে নিয়ে। আমরা সব জিনিস নিয়ে সকাল সাড়ে সাতটায় লরিতে উঠলাম। আমার এই প্রথম লরিতে চড়া। আমাদের লরি আটটায় ছাড়ল। আমরা সাড়ে নটায় মধ্যমগ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। মধ্যমগ্রামে গিয়ে আমার গ্রাম দেখা হল, যদিও এটাকেও পুরোপুরি গ্রাম বলা যায় না। আমার জীবনে প্রথম এই গ্রাম দেখা। কত গাছ, কত রকমের পাখি, মাঝে মাঝে মাটির ঘর। আমরা একটি বাগান বাড়িতে বনভোজন করতে গেছিলাম, আগে থেকেই সেটিকে ঠিক করা হয়েছিল। বাগান-বাড়িতে দেখলাম কত গাছ। আম, বাতাবী, কলা, নারকেল, লঙ্কা ও কুল গাছ। ফুলগাছও ছিল। আমরা গিয়েই প্রথমে সব জিনিস গুছিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ বাদে তিন চারজন লোক সবাইকে ডেকে জড়ো করল এবং সবাইকে সকালের জল খাবার হিসেবে কলা, পাঁউরুটি, ডিম দিল। সবার খাওয়া হয়ে গেলে চা-এর জল বসানো হল। আবার সবাইকে ডেকে চা দেওয়া হল। আমি কিন্তু চা খেলাম না। আমার পাড়ার পাঁচ-ছটা বন্ধুও গিয়েছিল, তাদের সাথে আমি খুব খেলতে লাগলাম। মা অবশ্য আমাকে খালি খেলতে বারণ করছিল। আমার খুব রাগ হল। এই দেখে দিদি মাকে বলল একদিন একটু খেলুকই না। আর বাবা দাবা খেলতে বসে গেল লোকেদের সঙ্গে। আর আমার মা, দিদি, ছোটদি কি করছে তাকিয়েও দেখলাম না। কারণ আমি তখন খেলায় ব্যস্ত। বাগান বাড়ির সামনে একটা পুকুর ছিল। অনেকে স্নান করতে গেল। আমিও পুকুরে স্নান করতে চাইলাম। মা করতে দিল না। আমি আমার বন্ধুদের বললাম গাছে উঠি। সবাই রাজী হল। কিন্তু আমি গাছে উঠতে জানি না। জানব কেমন করে, কোন দিন গাছে উঠি নি। আমার বন্ধুরাও গাছে উঠতে জানত না। আমরা উঠতে পারলাম না। বরং হাত-পা ছরে গেল। খালি পড়ে যেতে লাগলাম। এই দেখে বাগান বাড়ির একটা লোক এগিয়ে এল। বলল কি তোমরা গাছে উঠতে পারছ না? এই দেখ, বলে লোকটা গাছে উঠে গেল। গাছে উঠে বলল এই ভাবে উঠতে হয়। নামার আগে বলল, এইভাবে নামতে হয়। আমি খানিকটা শিখে নিলাম। গাছে উঠে একটা নীচু ডালে বসলাম। হঠাৎ দেখি সবার ছবি তোলা হচ্ছে, আমি গাছ থেকে নেমে ছুটে যেতেই আমারও ছবি তোলা হল, একটু পরেই খাবারের ডাক পড়ল। আমি সবার সাথে খেতে

বসলাম। ভাত, ডাল, মাংস, চাটনী তরকারি ও দই হয়েছিল। দই আগে থেকেই কিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মা আর আমি সারা দুপুরটা পুকুরের পাড়ে ও বাগানের আশে-পাশে ঘুরলাম। বিকেলে বাগান বাড়ির লোকেরা ডাব পেড়েছিল, সেই ডাব খাওয়া হল। কয়েক ঘণ্টা বাদেই চলে যেতে হবে। তাই একটু দুঃখ হল আবার একটু খেললাম, বিকেলে বড়রা চা খেল। পাঁচটা বাজল সবাই বলল, এবার ফেরা যাক। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সবাই ঠিকঠাক হয়ে নিল, ছ-টায় সবাই লরিতে উঠল। আমার মা, বাবা, দিদি, ছোটদিও আমিও উঠলাম লরিতে। লরি চলতে শুরু করল। আমি পেছনে বাগানবাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম বিদায়, বিদায়। জানিনা আর আসব কিনা এখানে, দেখব কিনা এ সবুজভূমিকে। আর আমার মনে পড়ল আনন্দের সময়গুলি। পরক্ষণেই মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরের কথাটি—"পৃথিবীর দ্রুত শক্তি হল মানুষের চিন্তা শক্তি।"

স্কেচ : আশিস চট্টোপাধ্যায় (সভ্য, সিনিয়র)

ডাকটিকিটের উপকথা

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যানডেনেভিয়ার ফোকলোর অনেক প্রাচীন। নরওয়ে ও সুইডেনের মানুষ তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসাবে ফোকলোরকে গ্রহণ করে থাকে। আর তার মধ্যে নেই কি? ক্রিস্টমাসের ছুটিতে আত্মীয় বন্ধুদের উপহার দেওয়া এবং ইস্টারে ডিম পাঠানো ও সে দেশে যেমন লোকাচার তেমনি হর‍্যাস্কোপ বা জাতপত্রিকা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় যে আলোচনা প্রকাশিত হয়, তা-ও লোকাচার হিসেবে ধরা হয়। অতিপ্রাকৃত অবস্থা ও ভূত প্রেত দত্যি-দানাতেও তাদের প্রাচীন বিশ্বাস নানান কাহিনী সৃষ্টি করেছে। স্ক্যানডেনেভিয়ার ফোক লোর বংশানুক্রমে মুখে মুখে চলে আসছে। লোকসংগীত, উপকথা ও কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই লোকাচার এখনও সুপ্রচলিত। তাই সে দেশে লম্বা লম্বা রূপকথা এখনও চালু আছে। বহুকাল থেকে এইসব রূপ-কথা ও কাহিনী সুইডেনের ছেলেমেয়েরা শুনে আসছে। তবে সে দেশে লিজেণ্ড ও ফেয়ারী টেলের মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে। লিজেণ্ড আকারে ছোট আর কাহিনীগুলি লম্বা। যিনি বলবেন আর যারা শুনবে তাদের বিশ্বাস ও ধৈর্যের উপর কাহিনীগুলি নির্ভর করে।

এই বছর, ১৯৮১ সালের ইউরোপার ডাকটিকিট ছুটিতে সুইডেন ছুটি উপকথার ছবি দিয়েছে—একটিতে আছে অরণ্যের রাণীর ছবি আর অন্যটিতে ট্রোল বা বেঁটেভূতের একটি ছবি। স্ক্যানডেনেভিয়ার উপকথায় বেঁটেভূতদের অনেক কাহিনী আছে। এই সব বেঁটেভূত বসবাস করে পাহাড়-পর্বতের গুহায়। তারা গ্রাম জনপদে এসে চুরি করে খাবার ও বিয়ার সংগ্রহ করে। ভয়ে কেউ তাদের বাধা দিতে পারে না। শুধু খাবারই নয় সুযোগ পেলে বেঁটে-ভূতেরা মেয়েদের ও বাচ্চাদের চুরি করে তাদের পাহাড়ের আস্তানায় নিয়ে যায় এবং তাদের চেহারা বদলে দেয়। যারা বীর তারা সাহসের সঙ্গে বেঁটে ভূতদের মোকাবিলা করতে পারে এবং তাদের বুদ্ধিতে হারিয়ে মেয়ে ও বাচ্চাদের উদ্ধার করে। ডাক টিকিটে একজন সাহসী অশ্বারোহীকে দেখানো হয়েছে, যিনি বেঁটেভূতের প্রকাণ্ড হাতের নীচ থেকে সরে পড়ছেন। বেঁটেভূতের বিরাট নাক ও কান, যা আমাদের দেশের রাক্ষস-খোক্ষসদের মত। দ্বিতীয় ডাকটিকিটে আছে অরণ্যের রাণীর ছবি। সবটাই তাঁর গাছের ডাল-পাতায় ঘেরা। তবে অরণ্যের রাণীর খেঁক-শিয়ালের মত একটি লম্বা লেজ থাকে আর তাকে না দেখলেও তার সেই লেজ দেখে তাঁকে চেনা যায়। অরণ্যের রাণীর পিঠ একটা বড় গাছের কাণ্ডের মত। কাঠুরেরা তাই বনে গিয়ে তাকে চিনতে পারে না এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারায়। যে সব শিকারী বা কাঠুরে অরণ্যের রাণীকে সন্তুষ্ট করতে পারেন, তারা তাঁর পূর্ণ সহায়তা পেয়ে যায়। আজকাল ডাকটিকিটে বিভিন্ন দেশের উপকথার ছবি প্রায় ছাপা হয়।

পুণ্যাত্মা

অনিমেষ বসু

রাস্তার মোড়ে ঐ যে লাল বাড়িটা—যেটা ঘোষালদের বাড়ি বলে পরিচিত, তার একমাত্র ছেলে জয়দীপ। ওরা স্বচ্ছল—অবস্থাপন্ন। কিন্তু যাই হোক না কেন অতটুকু ছেলে, যার বয়স দশ কিংবা এগারর বেশি নয়, তারই কি ঔদ্ধত্য! এদিকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, কিন্তু কথাবার্তায় দশম শ্রেণীর ছাত্রকেও ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য ওর এরকমটা হবার জন্য বাড়িতে অভিভাবকদেরও কিছু কিছু দায়িত্ব আছে বৈকি। বাড়িতে ঠাকুর চাকর - কাজের লোক যারা আছে তাদের সঙ্গে জয়দীপের দূরত্বটা যে বেশ সেটা সে ভালই বোঝে। শুধু তাই বা কেন ওদের সঙ্গে জয়দীপের আচার ব্যবহারও অনেকটা বড়দেরই মত। এরই ভেতর বাড়ির কাজের বাচ্চা ছেলেটা—যার নাম হাবু, যার সঙ্গে জয়দীপের বয়সের খুব একটা পার্থক্য নেই—তারই ওপর জয়দীপের শাসন বা আস্ফালনটা বেশি। যদিও অনেক সময় খেলার সাথির অভাবে ঐ হাবুকে সঙ্গে নিয়েই জয়দীপের লুডো বা ক্যারাম খেলাটা চালিয়ে নিতে হয়।

এই তো সেদিনের ঘটনা। সকালবেলা চায়ের কাপ ডিশ ধূতে গিয়ে হাবু এক জোড়া কাপ ডিশ ভেঙে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে জয়দীপ ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে নিয়ে আসে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও হাবুকে ধমকায়। তা ছাড়া মায়ের হাতের দু'চারটা চড়ও জুটল হাবুর ভাগ্যে। চোখ মুছতে মুছতে হাবু অন্য কাজে চলে যায়।

দেখতে দেখতে সকাল ন'টার সাইরেন বেজে গেল। জয়দীপের স্কুলের বাস এসে গেল। ও স্কুলে চলে গেল। ঐ দিন বাংলার ক্লাসে বাংলার মাস্টার মশায় গল্প সহযোগে বিদ্যাসাগর যে দয়ার সাগর ছিলেন তা ছাত্রদের বুঝিয়ে বললেন। ঐ আলোচনা শুনে জয়দীপের মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। সে ভাবল, বাড়ির কাজের লোকেদের সঙ্গে সবসময় সে যে ব্যবহার করে তা ঠিক নয়।

স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে প্রথমে জয়দীপ পার্কে বেড়াতে গেল। কিন্তু পার্ক থেকে ফিরেই কি খেয়ালে ট্রানজিস্টার রেডিওটা নিয়ে এলোপাথাড়ি তার নবগুলো ঘোরাতে লাগল কিন্তু হঠাৎ ওর হাত থেকে রেডিওটা মেঝেতে পড়ে গেল। আর আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছে ব্যাপারটা খুলে বলল জয়দীপ। কিন্তু মা কিছু না বলে বলল—বাবা অফিস থেকে এলে দেখিও। এখন গিয়ে পড়তে বস। বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে শুনল রেডিওটার কথা। নবগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল সত্যিই বাজছে না। রেডিওটা আলমারির মাথায় তুলে রেখে বলল, কাল সারাতে দিতে হবে, কেন না অনেক সখের এই রেডিওটা আমার।

এই ঘটনায় জয়দীপের সাজ্ঘাতিক মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল সকাল বেলা একটা কাপ ডিশ ভাঙ্গার জন্য তারা সবাই মিলে হাবুকে কত বকেছে, মেরেছে। অথচ সে নিজে

যে এত বড় একটা অন্যায় কাজ করল—একটা দামী জিনিস নষ্ট করল, কই তার জন্য বাবা বা কেউ তো তাকে মারল তো না-ই এমন কি বকল পর্যন্ত না।

রাতে খাবার শেষে বিছানায় শুতে গিয়েও জয়দীপের কেবল সেই কথাটাই মনে হতে লাগল। আর ভাবতে লাগল যে কাল থেকে হাবুকে বা বাড়ির অন্যান্য কাউকে সে আর শাসন করবে না—কিছু বলবে না। এমনকি মা বকলেও মাকে বারণ করবে ওদের বকতে। এইভাবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুমের ঘোরে কে যেন একজন এসে দাঁড়াল জয়দীপের সামনে। বলল—'এস আমার সঙ্গে।' জয়দীপ বলল, 'কোথায়?' লোকটা বলল 'এসই না, সব দেখতে পাবে।' সেই লোকটার যেতে যেতে একটা সুন্দর বনের মধ্যে প্রবেশ করল, বনের অনেক ভেতরে একটা কুটির। সেই কুটিরের কাছে গিয়ে লোকটা বলল, 'আমি এখানে আছি তুমি ঐ কুটিরের ভেতর যাও।' জয়দীপ বলল, 'কি আছে ওখানে?' লোকটা বলল, 'আগে যাও দেখতে পাবে সব,' জয়দীপ বলল, 'আমার ভয় করছে।' লোকটা বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। 'তুমি আগে যাওই না, আমি তো আছি।'

আস্তে আস্তে জয়দীপ সেই কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করল। দেখতে পেল কুটিরের এক কোণায় একটা চেয়ার পাতা, আর তার ওপর বসে আছেন এক ঋষি পুরুষ যাঁর পায়ে চটি, পরনে ধুতি, গায়ে চাদর জড়ানো, মাথা প্রায় কেশবিহীন, চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। কে উনি? তারপর বিস্ময়ে বলে উঠল—'বি-দ্যা-সাগর! - পুণ্যাত্মা, দয়ার সাগর, মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর' জয়দীপ হাত জোড় করে বলল—'গুরুদেব, আপনি পুণ্যাত্মা, দয়ার সাগর -আমি পাপী, নিষ্ঠুর, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

বিদ্যাসাগর বললেন—'কে বলে তুমি পাপী? জয়দীপ তুমিও পুণ্যাত্মা। যে কোন অন্যায় বা পাপ কাজ করে মনে তা স্বীকার করে, তার জন্য অনুতপ্ত হয়, এবং অনুক্ষণ কাজের বা ব্যবহারের মাধ্যমে সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করে সে কখনও দুরাত্মা, হতে পারে না। তোমার চারপাশে যে সব মানুষ আছে তাদের ভালবাস, দরকারে তাদের প্রতি দয়া দেখাও, তবে তোমাকেও লোক পুণ্যাত্মা বলবে, দয়ার সাগর বলবে।' জয়দীপ হাঁটু গেড়ে বসে বিদ্যাসাগরের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করল। বিদ্যাসাগর ওর মাথায় হাত রাখলেন।

এক অনির্বচনীয় আনন্দে স্মিত হেসে বিছানায় পাশ ফিরে শুল জয়দীপ—কি এক আবেশ যেন তাকে ছেয়ে রেখেছে সে মুহূর্তে।

কথোপকথন

কৌশিক দত্ত (সভ্য, সিনিয়র)

খাঁচার পাখি খাচা ছেড়ে পালিয়ে এল যখন
বনের এক পাখির সাথে দেখা হল তখন।
আলাপ হল দুই পাখিতে অনেকক্ষণ ধরে,
বল্‌ল হঠাৎ বনের পাখি খাঁচার পাখিটিরে,
"কেমন করে খাঁচার থেকে পালিয়ে এলি বল ?"
খাঁচার পাখি করে উত্তর, "সে যে অনেক ছল।
ছিলাম খাঁচার মধ্যে আমি অনেকদিন ধরে
পেট তখন ভরতো আমার ছোলা ও মটরে।
দেখতাম আমি আকাশেতে পাখিরা সব ওড়ে।
আমি থাকব খাচার মধ্যে সারা জীবন ধরে—
এই ভেবে কাঁদতাম আমি, 'বাঁচাও ভগবান।'
আমার প্রভু ভাবত আমি গাইছি, বুঝি গান।
প্রভুর মেয়ে বুড়ি রোজ ফিরে ইস্কুল থেকে
ছোলা ও মটর আমায় খাওয়াত ডেকে ডেকে।
হঠাৎ করে এল একদিন সেই শুভক্ষণ
যখন আমি খাঁচা ছেড়ে আসতে পেলাম বন।
ছোলা জল দিচ্ছিল বুড়ি খাঁচার দরজা খুলে
কষে দিলাম জোড় কামড় তার ছোট্ট আঙ্গুলে।
চিৎকারে সে তুলল মাথায় পাঁচতলা বাড়ি—
সেই সুযোগে পাখা আমি মেললাম তাড়াতাড়ি।
উড়তে উড়তে চলে এলাম একেবারে বনে
বনেতে এসেই হলাম মোরা মিলিত দুজনে।"
দুই পাখি বহুক্ষণ কথাবার্তা বলে,
দুইজনে পাখা মেলে দূরে গেল চলে।

ডাকাবুকোদের কাহিনী

তবু যেতে হবে

সিন্ধবাদ

(শেষাংশ)

আবার পথে। রাত হয়ে গেল চার নম্বর প্রহরী-মিনারে পৌঁছতে। সময় বয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে চলতে হবে। হিউয়েন ভাবলেন এখানে আর দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি একটু জলের জোগাড় করে নিয়ে আবার রওনা হবেন। কিন্তু ভাবলে কী হবে? জলের ধারে যেই গিয়ে নেমেছেন, আবার সেই তীর! প্রায় তাঁকে গেঁথে ফেলেছিল আর কি। অগত্যা তিনি এগিয়ে গেলেন মিনারের দিকে। প্রহরীরা তাঁকে তাদের ক্যাপটেনের কাছে নিয়ে গেল। ওয়াং-লিং-এর নামে কাজ হল। রাত্রিবেলা কিছুতেই ক্যাপটেন হিউয়েনকে যেতে দিলেন না। সকাল বেলা সঙ্গে দিয়ে দিলেন একটা চামড়ার বড় বোতল, জলের। কিন্তু এ কথাও বলে দিলেন, 'পাঁচ নম্বর মিনারের দিকে যাবেন না। ওখানকার লোকগুলো ভাল নয়। আপনার বিপদ হতে পারে। বরং এখান থেকে মাইল তিরিশেক দূরে-ইয়েসা প্রস্রবণ আছে। সেখানে জল নিয়ে নেবেন।"

কোথায় ইয়েসা প্রস্রবণ? হিউয়েন যে টাকলামাকান মরুভূমিতে ঢুকে পড়েছেন। আড়াই-শ মাইল সামনে ধূ-ধূ করছে, তার আকাশে কোন পাখি নেই, মাটিতে কোন জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। গাছ-পালা, লতা গুল্ম, কিছুই তো চোখে পড়ে না। পৃথিবীটা যেন কঙ্কালের মত পড়ে আছে। জল? কোথায় জল?

পথ হারিয়ে গেছে। হিউয়েন সাং কী করে বেরোবেন সেই মৃত্যু-লোক থেকে? তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। সঙ্গে পাত্রে একটু জল অবশ্য আছে। সেটাই খেয়ে ফেলবেন? অগত্যা সেই পাত্র মুখে ধরতে গেলেন। হাত থেকে জলের পাত্র পড়ে গেল। টাকালামাকান শুষে নিল হিউয়েনের শেষ জল বিন্দুটি পর্যন্ত।

এখন উপায়? আবার কি চার নম্বর মিনারে ফিরে যেতে হবে? হিউয়েন ভেবে চিন্তে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। জল ছাড়া কী করে চলবে? খানিকদূর যেতেই তার মন বেঁকে চলল। ফিরে

যাবে? ফিরব বলে তো পথে বেরোই নি। বরং বেরোবার সময় মনে মনে পণ করেছিলাম ভারতবর্ষে পৌঁছতে যদি না পারি, একপাও আর এ দিকে ফিরব না। মরি যদি তাও ভাল।"

আবার ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন পশ্চিমের দিকে।

হিউয়েন-সাং চলেছেন করাল ভয়ংকর টাকলামাকানের মধ্যে দিয়ে। সারা রাত সেখানে রহস্যময় বিভীষিকার রাজত্ব, সারাদিন হু-হু বইছে বালির ঝড়। ভয় নেই হিউয়েন-সাং-এর, ভয়কে তিনি জয় করেছেন। কিন্তু কী তৃষ্ণা। পাঁচটা দিন, এক ফোঁটা জল পড়ে নি মুখে। শরীরের ভেতরটা অসহ্য জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছে। অবসাদের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন হিউয়েন। আর চলবার ক্ষমতা নেই। বালির উপর তিনি শুয়ে পড়লেন। সেই অবস্থাতেই প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। "হে বোধিসত্ত্ব, হিউয়েন সাং এই যাত্রায় চলেছে ধন-সম্পদের কামনায়, কোন জাগতিক লাভের আশায়, খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভে নয়, সর্বোত্তম ধর্মের সন্ধানে। আমি বিশ্বাস করি বোধিসত্ত্বের করুণাময় দৃষ্টি সকল জীবের ওপর, সকলের দুঃখ যাতে দূর হয়। আমার কষ্ট কি তিনি জানতে পারবেন না?"

মন প্রাণ দিয়ে হিউয়েন-সাং প্রার্থনা করে চলেছেন নিরন্তর। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তাঁর সারা দেহমন জুড়িয়ে দিল স্নিগ্ধ শীতল বাতাস। কোথা থেকে এল কে জানে, তাঁর মনে হল যেন বরফ গোলা জলে নেয়ে উঠলেন। তিনি আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন অল্প সময়ের জন্যে। স্বপ্ন দেখলেন এক বিরাট পুরুষ তাঁকে ডেকে বলছেন, "ঘুমিয়ে আছ কেন? সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ না কেন?"

জেগে উঠে হিউয়েন-সাং আবার রওনা হলেন। যেতে যেতে হঠাৎ ঘোড়াটা যেন নিজের খেয়ালে অন্য এক দিকে চলতে লাগল। যত হিউয়েন রাশটানেন, যত তাকে ঘোরাতে চেষ্টা করেন, সে কিছুতেই মানে না, খানিক দূর যেতে হিউয়েন অবাক হয়ে দেখেন সবুজ ঘাস। ঘোড়া সেই ঘাস খেল পেট পুরে। আবার খানিক দূর এগিয়ে দেখেন টলটল করছে জল, আয়নার মত ঝকঝক করছে। ঘোড়া থেকে নেমে এসে সেই জল আকণ্ঠ পান করলেন হিউয়েন। নতুন জীবন ফিরে এল তাঁর দেহে।

নতুন উদ্যমে যাত্রা সুরু করলেন তিনি। আরও দুদিন যাত্রার পর মরুভূমি শেষ হল।

কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও অনেক দূরে।

জন নায়ক লেনিন

সুমথ নাথ ঘোষ

রুশদেশের দূর গাঁ থেকে একবার এক বুড়ো চাষী দু'দিনের পথ হাঁটতে হাঁটতে শহরে এল লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক ঘুরে ঘুরে খবর করে শেষে লেনিনের ঠিকানাটার খোঁজ পেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। ওইরকম সব বড় বড় জননায়কদের কাছে ইচ্ছামত যখন তখন তো যাওয়া যায় না, আগে থাকতে একটা ছাড়পত্র করে নিতে হয় সমিতির অফিস থেকে।

যাই হোক, ছাড়পত্র হাতে করে যখন সেই বুড়োটি লেনিনের বাড়ির ফটকে গিয়ে হাজির হল তখন একটি দারোয়ান এসে জিজ্ঞেস করলে কী চাই।

বুড়োটি বললে, আচ্ছা ভাই, লেনিন কী এখন বাড়িতে আছেন, বলতে পার ?

সেই বুড়ো চাষীটার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দারোয়ানটি বললে, আছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমার কি দরকার ?

আছে কিছু।

শুনি না কি ? বলে দারোয়ান উৎসুক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একটু ইতস্তত করে বুড়োটি তখন বললে, এই মানে আমাদের চাষীদের দুঃখদুর্দশা ও অসুবিধার কথা তাঁকে একটু শোনাতে চাই ; তাই এতদূর গাঁ থেকে এসেছি।

ও, তাই নাকি ? আচ্ছা যাও ভেতরে, ঢুকে সামনে একটা সিঁড়ি দেখতে পাবে, সেটা দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেলেই দেখতে পাবে, সামনের একটা ঘরে তিনি এখন বক্তৃতা দিচ্ছেন।

বুড়ো লোকটা ভিড় ঠেলে অতিকষ্টে ওপরে উঠে, লেনিনের চেহারা ভিড়ের ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখে অবাক হয়ে গেল। অতি সাধারণ চেহারা। উনি যে গোটা রাশিয়ার ভাগ্যবিধাতা দেখে একেবারেই বোঝা যায় না।

তিনি তখন উত্তেজিতকণ্ঠে কি একটা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বুড়োটি আরও একটু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মন দিয়ে শুনতে লাগল। তার চারদিকে যতসব শ্রোতা সকলেরই মুখে চোখে একটা গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা। বক্তৃতা শেষ না হলে তো আর নিজের কথা শোনানো যায় না।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে বুড়ো মনোযোগ দিয়ে শুনে শেষ হবার আগেই নেমে এল ওপর থেকে।

তখন সেই দ্বারীটি তাকে প্রশ্ন করলে, কি দাদু, এর মধ্যে নেমে এলে তোমার কথা শোনালে না ?

না, ভাই। বৃদ্ধ উদ্ভাসিত মুখে জবাব দিলে, আর দরকার হল না।

কেন ? কেন ? শুনি ? সাগ্রহে প্রশ্ন করে দ্বারী।

দেখলাম, আমাদের সুখ দুঃখের কথা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানেন উনি। আমি যা শোনাতে এসেছিলুম উনি তা আগেই শুনিয়ে দিলেন।

এর আসল কারণ এই যে লেনিন ওপর থেকে নেতা হননি। অতি সাধারণ মানুষের মতই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের সুখদুঃখের শরিক হতে পেরেছিলেন।

এই লেনিন সম্বন্ধে আরও একটি গল্প মনে পড়ছে। তোমাদের শোনাবার লোভ সামলাতে

পারছি না। খুব ছোট গল্প, কিন্তু এর ভেতরে রয়েছে যে আদর্শ সেটা খুব বড।

একদিন একটি ছেলে, লেনিনের সব গ্রামেরই ছেলে পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলে, নীল রঙের সার্ট গায়ে, চটি পায়ে একটি লোক হেঁটে চলেছে সেই পথেই।

ছেলেটি যে লেনিনের সব খবর রাখে, সে জন্যে মনে মনে তার খুব গর্ব ছিল। তাই লোকটি কাছে আসতে তার সঙ্গে গল্প করবার জন্যে তার মুখটা টগবগ করে উঠল।

লোকটিকে দেখে খুব গাঁইয়া বলেই ছেলেটির ধারণা হল। তাই প্রথম কথাটাই সে বললে, জান আমাদের এই গ্রামেই লেনিনের বাড়ি।

উদাসীনকণ্ঠে লোকটা বললে, তাই নাকি। হ্যাঁ, আমার কিন্তু ভারি তাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

কেন? বিস্মিত চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে লোকটি বলে, লেনিনকে দেখে কী হবে?

বারে! এতবড লোক, আমাদের দেশের যিনি গৌরব তাঁকে চোখে দেখা তো পরম সৌভাগ্য।

লোকটিকে চুপ করে থাকতে দেখে, ছেলেটি প্রশ্ন করে, তুমি বুঝি বিদেশী—তাঁকে দেখনি।

একটু থেমে লোকটি এবার জবাব দেয়—না আমি তাকে চিনি।

তুমি লেনিনকে চেন। বিস্ময় দুচোখে যেন ধরে না ছেলেটির—দেখেছ তাঁকে। মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বলে, হাঁ, লোকটি কেমন দেখতে বল না? ছেলেটির কণ্ঠ আবেগে কেঁপে ওঠে।

লোকটা চলতে চলতে, একটু থেমে বাঁ পায়ের চটিতে আঙ্গুলটা শক্ত করে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, এমন কিছু নয়।

এতে যেন আগ্রহ আরও বেড়ে যায় ছেলেটির। বলে, তবু কেমন দেখতে বল না।

বললুম তো, এমন কিছু নয় অনেকটা ঠিক আমার মত।

ধ্যেৎ। বলে ছেলেটি অবিশ্বাসের চাউনি দেয় তার মুখে। তখন লোকটি বললে, অনেকেই বলে আমার সঙ্গে নাকি তাঁর হুবহু মিল আছে চেহারার?

তোমার মত চেহারা! হতেই পারে না। জান, লেনিন কতবড মানুষ তোমার বোধহয় ধারণা নেই। ছেলেটির মনে তখন দৃঢবিশ্বাস। লোকটি ওই বলে তার কাছে বাহাদুরী নিচ্ছে।

তাহলে, যাই! বলে লোকটি পাশের একটা গলির পথে চলে গেল।

ছেলেটি গম্ভীরমুখে কি যেন তখন ভাবছিল। বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে একটি মহিলা তার বাগানে কাজ করছিল। পথের ধারেই বেড়া দেওয়া বাগান। ছেলেটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, লেনিনের সঙ্গে এতক্ষণ তুমি কিসের গল্প করছিলে? লেনিন এই লোকটি! কি বলছেন? বিস্ময়ে তার চোখ দুটি বুঝি কপালে উঠে যায়। মহিলাটি বললে, কেন তুমি ওকে আগে কি কখনও দেখনি? না। বলতে বলতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছেলেটি ছুটল যে গলিটার মধ্যে তিনি ঢুকেছিলেন সেই দিকে যদি এখনও তাকে ধরতে পারে।

বিরলে
রিচার্ড ই. বায়ার্ড

অনুবাদকঃ কনাদ মল্লিক
(ক্রম. জীনময়র)

(২য় পর্ব)

লিটল আমেরিকার ওরকম একটা পরিণতি আশঙ্কা করলেও মনে মনে আমরা সকলেই জানতাম ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। তবুও সাবধানের মার নেই—রসদপত্রের কিছু অংশ অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে হল, যাতে দৈবক্রমে লিটল আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কপাল না ভাঙে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে এই টানা হ্যাঁচড়ার কাজ শেষ করার দিন-কয়েকের মধ্যেই আমাদের সমস্ত ভয়-ভাবনাকে অমূলক প্রমাণ করে লিটল আমেরিকা ভাঙ্গা বরফের চাদর আবার জমাট বেঁধে জোড়া লাগাতে শুরু করল। যে বিপদ থেকে বাঁচতে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেই বিপদ যদি আসি-আসি করেও বিনা আক্রমণেই বিদায় নেয় তাহলে আনন্দের থেকে বিরক্তিই বোধ হয় তার বেশি হয়। আমাদের অবস্থাও হল অনেকটা সেইরকম। শেষ পর্যন্ত, ভাঙা-ছেঁড়া উদ্যম আর শক্তি সম্বল করেই আবার 'বোলিং অ্যাডভান্স' প্রকল্পের কাজে নামলাম, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে 'বোলিং অ্যাডভান্সের' ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অস্পষ্ট।

১৫ই মার্চ মধ্যরাত্রে গ্যাসোলিন বাতির আলোতে দুটো ট্রাক্টরের পেছনে বাঁধা স্লেজ গাড়িতে বোলিং অ্যাডভান্স আবহাওয়া কেন্দ্রের ঘর-দোর তৈরি করার মালমশলা বোঝাই করা হল। আরও দুটো ট্রাক্টরের স্লেজে তোলা হল খাবার, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি, বই-পত্র, কাপড়-জামা আর নানারকম টুকিটাকি জিনিস—তুষারমরুর নিষ্প্রাণ বুকে অভি-যাত্রীর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেগুলি অপরিহার্য, যথাসম্ভব মাল বোঝাই করা সত্বেও যা রসদ নেওয়া হল তাতে তিনজন অভিযাত্রীর প্রয়োজন কোনমতেই মেটে না। ওদিকে ট্রাক্টর-বাহিনী যে দ্বিতীয় দফায় বাকী জিনিস নিয়ে যাবে তার সময়ও নেই কারণ মেরুরাত্রি আসন্ন সুতরাং, আমাদের পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন নিতান্ত অপরিহার্য।

যাইহোক পরদিন অর্থাৎ ১৬ই মার্চ সকালে নয় জন অভিযাত্রীকে নিয়ে ট্রাক্টরবাহিনী লিটল আমেরিকা থেকে বোলিং অ্যাড্‌ভান্স কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত জায়গাটির উদ্দেশে যাত্রা করল। ১৭৮ মাইল দীর্ঘ পথে তাদের জন্য নিশানা রেখে গিয়েছেন ক্যাপ্টেন ইনেস টেলর ও তাঁর দল।

যাত্রা-শুরুর পর থেকেই ট্রাক্টরবাহিনীর কাছ থেকে বেতারে আমাদের কাছে নিয়মিত নানারকম দুঃসংবাদ পৌঁছতে-আরম্ভ করল। প্রথমে খবর পেলাম যে লিটল আমেরিকার ২৭ মাইল দক্ষিণে দুটো ট্রাক্টর একটা গভীর চোরা-খাদে পড়তে পড়তে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। দ্বিতীয়বার শুনলাম আরও ৫০ মাইলের মধ্যে যে 'খাদের উপত্যকা' (Valley of Cevasses) নামের একটা চোরা খাদে ভরা অঞ্চল আছে, সেটাকে এড়াতে গিয়ে ট্রাক্টরবাহিনীকে পাকদণ্ডী ঘুরতে হয়েছে, এ কাজ করতে গিয়ে একটা ট্রাক্টর সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ায় সেটাকে পথেই ফেলে যেতে হয়েছে। বোলিং

অ্যাডভান্সের ঘাটতি রসদের ভাড়ারের থেকে আরও বেশ কিছুটা বিয়োগ হল। এই সমস্ত গুরুতর খবরের সঙ্গে তুষার ঝড়, হাড় কাঁপানো রক্ত-জমান ঠাণ্ডার বিবরণ তো ছিলই।

২১ শে মার্চ সন্ধ্যায় ট্রাক্টর বাহিনী খবর পাঠাল যে লিটল আমেরিকা থেকে ১২৩ মাইল দূরে ক্যাপ্টেন ইনেস-টেলরের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে নিতান্ত আকস্মিকভাবে, ক্যাপ্টেন তাঁর দলবল নিয়ে প্রবল তুষারঝড় আর নিদারুণ খাদ্যাভাবের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ফিরে আসছিলেন লিটল আমেরিকার দিকে। দৈবক্রমে ট্রাক্টর বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীসাথিদের সম্ভবতঃ এই মেরুর বুকেই শেষ শয্যা নিতে হত। মানুষ মানুষের কষ্ট আর কত দেখতে পারে! তার ওপর এঁরা তো আমার সহকর্মী। তাই, ঠিক করলাম, ট্রাক্টর-বাহিনীকে আরও দূরে যেতে দিয়ে কাজ নেই। বেতারে তাদের নির্দেশ দিলাম যে তারা যে পর্যন্ত গিয়েছে, তারই কাছাকাছি বোলিং অ্যাড্‌ভান্স কেন্দ্রের জন্য যেন জায়গা ঠিক করে। বোলিং অ্যাডভান্স কেন্দ্রের জমি নির্ধারিত হল ৮০ ৮ মিনিট দক্ষিণ অংশ, ১৬৩ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে।

২১ শে মার্চ রাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলাম—স্থির করলাম যে অ্যাডভান্স আবহাওয়া কেন্দ্রে আমি একাই থাকব। প্রথমতঃ দেখলাম সেখানে এ পর্যন্ত এতটা রসদ পথ পৌঁছে গেছে তা' মাত্র একজনেরই উপযুক্ত এবং বাকী রসদ সেখানে নিয়ে যাবার সময় ও সুযোগ ও আর নেই। দ্বিতীয়তঃ দলনায়ক হিসাবে এই দায়িত্ব আমারই। তৃতীয়তঃ এবং শেষপর্যন্ত একলা সেখানে থাকতেই আমার আগ্রহ বেশি।

বোলিং অ্যাডভান্স কেন্দ্রে আমি পাকাপাকি-ভাবে না বসা পর্যন্ত আমার এই একা থাকার সিদ্ধান্তের কথা বেতার-মাধ্যমে আমেরিকায় পাঠান হয় নি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায়। প্রকৃত পক্ষে, সেখানকার লোক এই খবর জানবার পর বিভিন্ন মহলে বহু বিতর্ক ও ভুল-বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়েছিল এবং নানারকম গুজব রটেছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন যে আমার সহ-অভিযাত্রীরা আমাকে নির্বাসন দিয়েছেন, কারো মতে আমার এখানে একা থাকার উদ্দেশ্য নিজনে প্রাণভরে নেশাভাঙ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। দশচক্রে ভগবান ভূত আর আর কাকে বলে।

অভিযান শেষে লিটল আমেরিকা ফিরে আসার পর জেনেছিলাম যে আমার সিদ্ধান্তের কথা আমেরিকায় প্রচারের দু'দিনের মধ্যেই বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি আমাকে এই বিপদসঙ্কুল কাজ থেকে বিরত হবার অনুরোধ করে আমার প্রতি বেতার বার্তা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু, আমার মনোবল অটুট রাখার জন্য আমাদের অভিযানের অন্যতম সদস্য ও বন্ধুবর মিঃ চার্লস মারফি এই বেতারবার্তাগুলির কোনটিকেই লিটল আমেরিকা থেকে আমার কাছে পাঠান নি।

আমার সহকর্মীদের লিটল আমেরিকাতে ফেলে যাচ্ছি বলে সাময়িক দুশ্চিন্তা যে হয় নি তা' নয়; কিন্তু, এঁরা সকলেই প্রকৃতির পাঠশালায় আত্মরক্ষার কৌশল শিখেছেন বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। উপরন্তু, সহনেতা ডঃ পোলটারের উপর দলের ৫৫ জনকে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে আমি একরকম নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম।

২২ শে মার্চ সকালে এরোপ্লেনে রওনা দিলাম অ্যাড্‌ভান্স কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। পাইলট লিটল

আমেরিকার আকাশে কয়েকবার চক্কর দিলেন। নীচের দিকে চেয়ে হু'চোখ ভরে দেখলাম ধোঁয়ায় ঢাকা অলসসুখ-তন্দ্রায় আচ্ছন্ন লিটলআমেরিকাকে। উত্তরের দিগন্ত-রেখায় বরফের আচ্ছাদনে কঠিন হয়ে ছিল রস সাগর।

উড়তে উড়তে একসময় আমরা তুষারের শুভ্র বুকে ট্রাক্টরের চাকার দাগ স্পষ্ট দেখলে পেলাম। প্রতি ৩ মাইল অন্তর এক একটা ছোট কমলা রঙের পতাকা আর প্রতি ২৫ মাইল দূরে দূরে এক একটা উঁচু বরফের স্তূপের উপর একটা করে বিরাট কমলা পতাকা চোখে পড়ল--এই-ই আমাদের পথের নিশানা, জীবনের দিশারী। ক্রমে দিগন্তের গোপন থেকে একটা কালো বিন্দু বার হয়ে এসে আমাদের চোখের ওপর বাড়তে লাগল ক্রমশ, শেষে দেখলাম সেটা কতকগুলো তাঁবুর সারি—ভবিষ্যৎ বোলিং অ্যাড্‌ভান্স কেন্দ্রের জমিজায়গা।

[ক্রমশ]

বিয়েবাড়ি

নবনীতা ভট্টাচার্য (বয়স-৯)

বিয়ে বাড়ি, বিয়ে বাড়ি
নাম শুনলেই মজা,
অনেক রকম খাবার পাতে
লুচি পাঁপড় ভাজা।

সাধ

অভীক মুখোপাধ্যায় (বয়স, ১৩)

পাখি ওড়ে আকাশে
ডানা মেলে বাতাসে
যেথা খুশি উড়ে যায়,
বাধা কারো নাহি পায়।
আমার যদি থাকত ডানা
শুনতাম না কারো মানা—
উড়ে যেতুম ইচ্ছে মত
দেশ বিদেশ আছে যত।

নামের ছড়া

কৃশানু রায় (সভ্য, ৭

ভীনিত পোদ্দার
আমাদেরই সদার

কৌশিক দত্ত
খোঁজে সাপের গর্ত

অরিন্দম হাজরা
যায় চেপে বজরা।

খালেদ খান—
সদাই করে গান।

রনেন বিশ্বাস,
ফেলে জোরে নিঃশ্বাস

কৃশানু রায়
বই পড়তেই চায়।

ক্ষতির ইতিহাস

শ্রীহর্ষ মল্লিক

ভূবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সাথে প্রধানতঃ ভূ-পৃষ্ঠের দু ধরণের পরিবর্তনের কথা বলেন। অবশ্য পৃথিবীর পবিবর্তন তো প্রধানতঃ তার ভূ-পৃষ্ঠের ওপরেই হয়। সেই দু'রকম পরিবর্তন হল : আকস্মিক পবিবর্তন ও ধীর পরিবর্তন। আকস্মিক পরিবর্তনেব কথা যাক, আগে ধীর পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়, সেটা জানা হোক।

রোদ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়। মাটি ফেটে যায়, পাথর ভেঙে যায়। নদীব প্রবাহ পরিবর্তিত হয়—আপাতদৃষ্টিতে এগুলি কিছুই না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে খুব ধীবে ধীবে হতে হতে এগুলিই শেষ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠেব পবিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। এই পরিবর্তনে সময় লাগে বেশি, তবে প্রভাব হয় দীর্ঘস্থায়ী।

আকস্মিক পরিবর্তন হল ঠিক এর বিপরীত। হঠাৎ হঠাৎ হয়, কখন হবে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। হতে খুব অল্প সময় নেয়। এমনধারা কয়েকটি আকস্মিক পরিবর্তন হল : ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, হারিকেন, টর্নেডো জাতীয় প্রবল ঝড়, বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি। অনেকে অগ্নিকাণ্ডকে এর মধ্যে ধরতে চান, তবে সেটা ঠিক ভৌগোলিক কারণে না হলে এই তালিকাভুক্ত না করাই ভাল। ঠিকভাবে বলতে গেলে এগুলি পৃথিবীর এক একটা বিরাট ক্ষতির ইতিহাস। কারণ, এর তো কোন গঠনমূলক দিক নেই, যা আছে তা সামান্যই। তবে ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরীতে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়, যাব ফলে সমগ্র নগর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেকথা এখানে বলা ভাল। এব কারণটা প্রাকৃতিক না অপ্রাকৃতিক তা বোধহয় আজও গবেষণা করে দেখা হয়নি। শুধু একটা প্রবাদ চিবস্মবণীয় হয়ে আছে : রোম যখন পুড়ছিল, তৎকালীন রোম সম্রাট নাকি তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন।

অগ্নিকাণ্ডের কথা যাক, তার চেয়ে বরং অগ্ন্যুৎপাতের কথা বলা ভাল। কারণ পৃথিবাতে বিভিন্ন স্থানে আগ্নেয়গিবির বদমেজাজের জন্য কম ক্ষতি হয়নি।

ঐতিহাসিককালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল তা হল ৭৯ খ্রীস্টাব্দে ইটালীব বিসুবিয়স পর্বতের কাণ্ড। পম্পেই ও হারকুলেনিয়ম নামক দুই শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেই অগ্নিকাণ্ডে। দু'হাজারের বেশি লোক মৃত্যুবরণ করে।

তারপর দীর্ঘদিন তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্ন্যুৎপাতের সংবাদ প্রাকৃতিক ভূগোলের ইতিহাসে নেই। ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে ঘটল সেই আবার ইটালীরই দক্ষিণ অংশে—নায়ক সেই বিসুবিয়স পর্বত। এবারে অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে হল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প—যাকে বলে ত্র্যহস্পর্শ। এর ফলে মারা গেল চার হাজার লোক।

ঠিক এর ৩৮ বৎসর পরে ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে ইটালীর কাটানিয়া অঞ্চলে এটনী পর্বতের অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল। এতে যে কত লোক মারা গেল, তার কোন হিসাব নেই। কেউ কেউ বলেন ২৪ হাজারের মত।

তারপর ১৭৮৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আটল্যান্টিক মহাসাগরের ছোট দ্বীপ আইসল্যাণ্ডে ঘটল এক বিস্ফোরণ—আগ্নেয়গিরির নাম হল স্ক্যাপটার। এর ফলে দ্বীপের সমগ্র অধিবাসীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

এ জাতীয় আর কিছু দুর্ঘটনার তালিকা হল : ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার আমবাওয়া দ্বীপে টামবাবো আগ্নেয়গিরি। এতে মারা যায় ১২০০০ লোক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার সেই বিখ্যাত ক্র্যাকাটোয়া দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত স্মরণাতীত কালের মধ্যে যা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। ৩৬০০০ লোক মৃত্যুবরণ করল আর কত লোক যে হারিয়ে গেল, তার কথা কেউ জানে না। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মাউন্ট পিলির বদমেজাজের ফলে প্রাণ দিল ৩০ হাজার লোক। ১৯৬৩ সালে হল বালি দ্বীপে মাউন্ট আগুং-এর অগ্ন্যুৎপাত। ৭৮ হাজার লোক দেশ ছেড়ে পালাল—মারা গেল দশ হাজারেরও বেশি লোক।

অগ্ন্যুৎপাতে যা ক্ষতি হয়েছে এই পৃথিবীর তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি হয়েছে ভূমিকম্পের দ্বারা।

সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিকম্পের বিবরণ পাওয়া যায় ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঘটেছিল সিরিয়ার অ্যান্টিয়োখ নামক স্থানে। এতে প্রাণহানি হয় ২৫০ হাজার লোকের। তারপর ঘটল জাপানের ভূমিকম্প ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে—ফলে তিন বর্গমাইল অংশ চলে গেল জলের তলায়। ৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের করিন্থ দ্বীপে যে ভূমিকম্প হয়, তাতে মারা যায় ৪৫ হাজার লোক। ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের পর জাপানে আবার ভূমিকম্প হল ৮৬৯ সালে -এবারে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে মারা গেল হাজার জন। ১০৩৮ সালে চীনের আনসি প্রদেশে যে ভূমিকম্প হয় তাতে ২৩ হাজার লোকের ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্পের দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশগুলির নাম এবারে তালিকার আকারে লিখে দিই—মনে রাখতে সুবিধা হবে :

	খ্রীষ্টাব্দ	দেশ	নিহত
(১)	১২৯০	চিহ্‌লী, চীন	১ ,
(২)	১৪৫৬	নেপলস, ইটালী	৭ , ০
(৩)	১৫৫৬	সেনসী, চীন	৮ ,
(৪)	১৬৯৩	কাটানিয়া, ইটালী	৬০,০
(৫)	১৭০৩	টোকিও, জাপান	২ , ০
(৬)	১৭৫৫	লিসবন	৬০,০০০
(৭)	১৮৮৪	কলচেস্টার, ইংল্যাণ্ড	সমগ্র শহর
(৮)	১৯০৮	ইটালী, সিসিলি	১০০,০০০
(৯)	১৯২০	কানসু, চীন	১০০,০০০
(১০)	১৯২৩	টোকিও, ইয়োকোহামা	২০০,০০০

(১১)	১৯৩২	কানসু, চীন	৭০,০০০
(১২)	১৯৩৫	ভারত, পাকিস্তান	৫০,০০০
(১৩)	১৯৩৯	চিলি, দক্ষিণ আমেবিকা	৪০,০০০
[১৪)	১৯৫৭	কাস্পিয়ান উপকূল	১৮,০০০
(১৫)	১৯৬৮	ইরান	১২,০০০

ভূমিকম্প ছাড়া নানাবিধ ঝড়ও দেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। ঝড়ের তীব্রতা অনুযায়ী তার নানারকম নাম হয়। তার মধ্যে প্রধান হল—টাইফুন, সাইক্লোন, টর্ণেডো ও হারিকেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ যাবৎকাল যে সব ভয়াবহ ঝড় সংঘটিত হয়েছে তার সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। গৃহহীন লোকদের কথা ও সম্পত্তি নাশের কথা বাদ দিলেও, মৃতের সংখ্যাও যথেষ্ট। নীচের তালিকা থেকে পৃথিবীর ভীষণ ধরনের কয়েকটা ঝড়ের চিত্র পাওয়া যাবে।

খ্রীষ্টাব্দ	ঝড়	দেশ	নিহত
১৭০৩	ঝড়	ইংল্যাণ্ড	৮,০০০
১৭৩৭	সাইক্লোন	কলিকাতা	৩০০,০০০
১৮৬৪	সাইক্লোন	কলিকাতা	৭০,০০০
১৮৭৬	সাইক্লোন	বাংলাদেশ	২০০,০০০
১৮৮১	টাইফুন	চীন, ইন্দোচীন	৩০০,০০০
১৮৮১	সাইক্লোন	বম্বে	১০০,০০০
১৮৮৪	টর্নেডো	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১০,০০০
১৮৯৬	টর্নেডো	সেণ্টলুই	শহর
১৯০০	হারিকেন	টেক্সাস	৬,০০০
১৯০৬	টাইফুন	হংকং	৫০,০০০
১৯৩৭	টাইফুন	জাপান	৪,০০০
১৯৪২	সাইক্লোন	বঙ্গদেশ	৪০,০০০
১৯৪৭	টাইফুন	জাপান	২০,০০০
১৯৫২	টাইফুন	ফিলিপাইন	১,০০০
১৯৫৬	টাইফুন	চীন	২২,০০০
১৯৫৯	টাইফুন	জাপান	৭,০০০
১৯৬০	সাইক্লোন	বাংলাদেশ	১০,০০০
১৯৬১	টাইফুন	বাংলাদেশ	২,০০০
১৯৬৩	সাইক্লোন	বাংলাদেশ	২২,০০০

আকস্মিক পরিবর্তনকারী বা ক্ষতিসাধনকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মধ্যে বন্যার শক্তিও যে কম নয় তা বলাই বাহুল্য। বন্যা দিয়ে বিশ্ব ধ্বংস হওয়ার কাহিনী পৃথিবীর বহু ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়। এ যাবৎকালের উল্লেখযোগ্য বন্যার নাম ও ক্ষয়ক্ষতির তালিকা হল :

খ্রীষ্টাব্দ	দেশ	নিহত
১২২৮	হল্যাণ্ড	১০০,০০০
১৬৪২	চীন	৩০ ,০০০
১৭৮৭	পূর্ব ভারত	১০,১০০
১৮৮৭	চীন	৯০০,০০০
১৯১১	চীন	১০০,০০০
১৯৩৯	চীন	১০০,০০০
১৯৫৩	উঃ য়ুরোপ	২,০০০
১৯৫৫	ভারত, পাকিস্তান	১৭,০০

এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে মানব সভ্যতার ইতিহাস। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ইতিহাস। ধীর প্রাকৃতিক পরিবর্তন মানুষ রোধ করতে পারলেও আকস্মিক পরিবর্তনের এই ধারাকে রোধ করতে না পারলেও এ ক্ষতি বেড়েই চলবে।

খেয়াল খুশীর জন্য

কাজল দত্ত

লিখছি ছড়া
চুপচাপ্।
করছে কে রে
ধুপধাপ্?
কাগজ আছে, কালি আছে
আসছে নাকো ছন্দ,
মনের সাথে চলছে তাই
বেজায় এক দ্বন্দ্ব।
এমন সময় ডাকছে কে
শুধু খেলার জন্য?
লিখছি ছড়া দেখছ নাকো—
'খেয়ালখুশীর' জন্য।
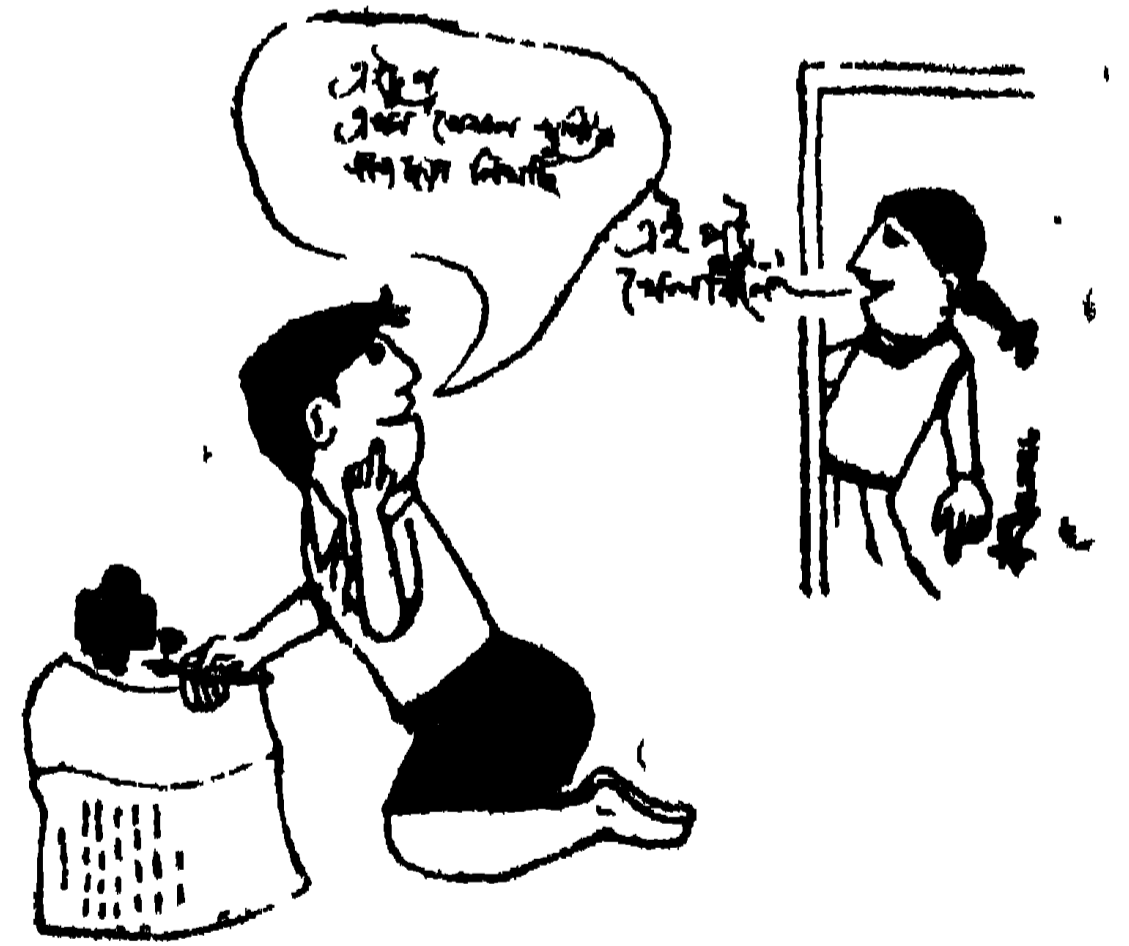
দেবী লক্ষ্মী : বাহন পেচক

প্রণবেশ চক্রবর্তী

মা দুর্গা যখন আমাদের ঘরে আসেন, তখন তিনি একা আসেন না। সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর দুই মেয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং দুই ছেলে কার্তিক ও গণেশকে। আমরা জানি, ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর পূজা আমাদের ঘরে ঘরে হয়। তবে লক্ষ্মী শুধু ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী নন, তিনি শ্রী ও সৌন্দর্যের দেবী। তাই আমরা কোন সুন্দর ঘর সংসার দেখলে তাকে বলি লক্ষ্মীশ্রী। মা দুর্গার সঙ্গে একবার আমরা লক্ষ্মীর পূজা করি। আবার ঠিক তারপরেই পূর্ণিমায় আলাদা করে লক্ষ্মীপূজা করে থাকি। দেবী লক্ষ্মীর পূজা ঘরে ঘরেই হয়, সেজন্য আমরা সকলেই লক্ষ্মীর প্রতিমা দেখেছি। সোনার মত উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ। সমুদ্র থেকে উঠে এসেছেন তিনি—চারটি বিশাল হাতি তাঁর অভিষেক করছে জল ঢেলে। তাঁর হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, আরেক হাতে শালি ধানের মঞ্জরী এব পদ্ম। তিনি বেদবতী—হাতে তাঁর অক্ষমালা। আবার তিনিই বরাভয়দায়িনী—শুভা, কমলা এবং শ্রী। দেবীর অনেক নাম—কমলা, বিদ্যা, বিষ্ণুপ্রিয়া, পদ্মালয়া, ক্ষীরোদতনয়া, ভূলীলা, রুক্মিনী, সুখপ্রদা ইত্যাদি অসংখ্য নাম তাঁর।

দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, "বাণিজ্যরূপা বণিজাম"—অর্থাৎ, ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি বাণিজ্যরূপিণী। তিনি সর্বশস্যাত্মিকা—সকল প্রকার শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সকল মানুষের জীবিকার উৎস—"জীবনোপায়রূপিনী"। রাজগৃহে যিনি রাজলক্ষ্মী, প্রতি গৃহে তিনিই গৃহলক্ষ্মী। সরস্বতীর মত লক্ষ্মীরও একটা নদী রূপ আছে। বলা হয়ে থাকে, দেবী লক্ষ্মীই শাপভ্রষ্টা হয়ে পদ্মানদী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। আর এই পদ্মানদীর দৌলতেই বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা এবং শস্যশ্যামলা। তাঁর দয়াতেই আমরা কৃষিকাজ করে অন্নের সংস্থান করতে পারছি। তাঁর এক নাম কমলা। নদীতে কমল বনই তাঁর বাসস্থান।

দেবী লক্ষ্মীর এক নাম ভূলীলা। ধন বা ঐশ্বর্যের একটি বড় উৎস হল ভূ বা ভূমি। ধান, গম, রবি-শস্য, ফলমূল, বন সম্পদ, ইত্যাদি সবকিছুই ভূমির উপর নির্ভরশীল। কৃষিকাজের জন্য চাই সীতা বা লাঙল—তাই লক্ষ্মীর আরেক নাম সীতা। কৃষিকাজ করতে হলে চাই বৃষ্টি। তাই লক্ষ্মীর এক হাতে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের অস্ত্র অঙ্কুশ। শুধু তাই নয়, জলের দেবতা যে বরুণ, তাঁর অস্ত্রপাশ লক্ষ্মীর হাতেই শোভা পায়। ভূমি এবং জল একসঙ্গে

হলেই সম্পদ সৃষ্টি হয়। লক্ষ্মীর হাতে তারই প্রতীক শালিধানের মঞ্জরী। ধান যখন থাকে—সেই শরৎকালেই আমরা দেবীর আরাধনা করি।

দেবীর ভূলীলা নামটি যেমন কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি সম্পদসৃষ্টির আরেকটি উৎস খনির সঙ্গেও যুক্ত। লক্ষ্মীর আরেক নাম রুক্মিনী—রুক্ম হচ্ছে সোনা, যা খনি থেকে পাওয়া যায়। ঐশ্বর্যের তৃতীয় উৎস হচ্ছে সমুদ্র। সমুদ্রকে বলা হয় রত্নাকর। লক্ষ্মীকে বলা হয় সমুদ্রতনয়া—দেবতা ও অসুরের সম্মিলিত সমুদ্রমন্থনের কালে ক্ষীরোদ সাগর থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। লক্ষ্মীর আবির্ভাব যেমন সম্পদের উত্তোলন, আর সেই জন্যেই সেই সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে দেবতা ও অসুররা রক্তাক্ত কলহে লিপ্ত হয়।

দেবী লক্ষ্মী যেমন ঐশ্বর্যের দেবী তেমনি আবার বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। পূববঙ্গে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সময় দেবী মূর্তির পাশে কলা গাছের বাকল দিয়ে তৈরি করা একটি নৌকা বসানো হয়। এটা বাণিজ্যেরই প্রতীক। আগেকার দিনে লোকে নৌকায় বাণিজ্য করতে যেত। এছাড়া কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সময় গো-বান ব্যক্তিকে গো মাতা সুরভির, ছাগবান ব্যক্তিকে ছাগাধিপতি হুতাশনের এবং অশ্ববান ব্যক্তিকে অশ্বাধিপতি রেবন্তের পূজা করতে হয়। এর দ্বারা বোঝান হয় যে, দেবী লক্ষ্মী পশুসম্পদেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ধন সম্পদ সবসময় চঞ্চল—এক হাত থেকে সহজেই অন্য হাতে চলে যায়। আবার বেশি টাকা পয়সা হাতে পেলে মানুষের শুভবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সম্পদ কখনও স্থির থাকে না। আজ যিনি ধনী, কাল তিনি গরীব হয়ে যেতে পারেন, অনেকে হয়েছেনও। সেইজন্যই লক্ষ্মীকে বলা হয় চঞ্চলা। শুধু সম্পদে বা ধনে নয়, যেখানে শুভবুদ্ধি এবং সৎ আচরণ দেখা যায়, সেখানেই লক্ষ্মী থাকেন।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, পেঁচা বা পেচক কেন লক্ষ্মীর বাহন? যে দেবী শ্রী, সৌন্দর্য এবং শুভ বুদ্ধির প্রতীক, তাঁর বাহন কেন এমন একটা কুৎসিৎ পাখি? এই পেঁচাকে বলা হয় যমের দূত। আবার এই পেঁচাই কেন লক্ষ্মীছেলের মত লক্ষ্মী দেবীর পায়ের কাছে বসে আছে?

লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে কেন পেঁচাকে বেছে নেওয়া হয়েছে—সেটা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এটা ঠিকই হয়েছে। শস্যের শত্রু হচ্ছে ইঁদুর, আর ইঁদুরের শত্রু হচ্ছে পেঁচা। পেঁচা যেন মানুষের লোভ এবং হিংস্রতার প্রতীক। আমরা জানি, দিনের আলোয় পেচক একেবারেই শান্ত এবং নিরীহ। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সে হিংস্র এবং রাত্রে যখন সে উড়ে যায়, তখন তার পাখার কোন শব্দও হয় না। পেঁচা যেন অর্থলোলুপ অসৎ মানুষের প্রতীক—যে কিনা মানুষের শত্রু। আবার আরেকটি প্রতীক—সেটা হচ্ছে সংযম, পেচক যেমন দিনে দেখতে পায় না, তেমনি লক্ষ্মী দেবী যেন মানুষকে বোঝাতে চাইছেন, তোমরাও পরের ধন সম্পদে অন্ধ হও। আবার এই পেচকই যেন লক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসে পরমার্থ চিন্তা করছে। সাধকরা নিশাচর এবং দিনে নির্জনবাসী। পেঁচাও তাই। সাধুরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন, তারা গোপনচারী—পেচকও তাই। পেচকের মধ্যে আমরা সেই সাধকভাব লক্ষ্য করি। তাই, পেঁচা লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাহন।

পাখিদের যাযাবরবৃত্তি

অভিজিৎ বিকাশ পাল (সভ্য, ১৩)

নানা রঙান পালকে ঢাকা পক্ষীকুল চিরদিনই কৌতূহল প্রিয় মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সমগ্র প্রাণীজগতের মধ্যে সবচেয়ে দেহ ও ঋতু সচেতন প্রাণী হল পাখি। তাই পৃথিবীর উত্তর মণ্ডলে হেমন্তের ধূসর ছায়া ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই শীত প্রধান দেশে পাখিরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়, কারণ এটা তাদের পালক পরিবর্তনের সময়, এর কারণ আর কিছুই নয় পাখিকে এরপর এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সে তখন যাবে দক্ষিণ মণ্ডলের দূর দেশে যেখানে তাদের শীতটা তাদের দেহকে এত মারাত্মকভাবে পীড়া দেবে না। এই সময় তাদের দেহে তৈরি হবে শক্ত পালক যা প্রয়োজনে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিতে সাহায্য করবে।

এই পালক পরিবর্তন কিন্তু পাখিদের ক্ষেত্রে মোটেই সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। তবে পালক পূর্ণতা লাভ করলেই অল্প দিনের মধ্যেই আবার তাদের দেখা যায় লোকালয়ের ধারে কাছে। এই সময় উইলোরেন পাখিদের গান শোনা যায় লোকালয়ের আশেপাশে। পক্ষী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রত্যেকেই বলেন যে পাখি ঐ গান করে তাদের দেহ-তন্ত্রীগুলিকে ঠিকঠাক করে নেয়। শুরু করে ওদের দল বাঁধা। তবে কোকিল ও অধিকাংশ শিকারী প্যাখিরাই এই যাত্রাপথে সাধারণতঃ নিঃসঙ্গ পাড়ি দেয়।

যাযাবর পাখিরা প্রধানতঃ নির্দিষ্ট সময়েই দেশ ছেড়ে যায় শীতকালে;দিন ছোট ও রাত বড় হয়। সুতরাং সম্ভবত এই দেখেই যাযাবর পাখিরা অপেক্ষাকৃত অল্প শীত প্রধান অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করাকে প্রকৃষ্ট সময়রূপে গণ্য করে। বলা বাহুল্য এই সময়ের পাখিদের নানা আচরণ সম্পর্কে পৃথিবীর পক্ষী বিশারদদের কাছে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে।

পাখিদের চলা ফেরা সাধারণতঃ মন্থর ও নিরুদ্বেগ, ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনূর্দ্ধ ২৫০০ ফুটের মধ্যে তারা অবস্থান করে ও ২০ থেকে ২৫ মাইল দূরে নিজেদের আস্তানা স্থাপন করে। বাকী সময় মাঠে মাঠে পথে পথে খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। তবে 'টার্ণষ্টোন' নামে এক প্রকারের পাখি পবন বেগে উড়ে চলে। ২৫ ঘণ্টায় ৫১০ মাইল। মলাউ হাঁস যায় ৫ দিনে ৯০ মাইল, তবে অন্য পাখিরাও যখন কান্তার মরু বা দুস্তর পারাবারের বাধা অতিক্রম করে তখন তারাও একটানা উড়তে পারে। গিলমট পাখিরা ভাল উড়তে পারলেও সামনে সমুদ্র পড়লে শত শত মাইল সাঁতরে চলে।

আরেকটি বিস্ময়কর বস্তু হচ্ছে এদের নৈশ অভিযান। ঠিক আরব বেদুইনদের মত। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে আকাশের একটি নির্দিষ্ট ও অতি ব্যবহৃত পক্ষী পথে নির্দিষ্ট ঘণ্টায় ৯০০ পাখি সেই পথ অতিক্রম করেছে। এই চলার সময় বিহঙ্গেরা কাকলি ও ক্রেঙ্কার ধ্বনির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

পাখিদের দেশান্তর যাত্রা ও চলাফেরার কারণ সম্পর্কে "নানা মুনির নানা মত" অনেকের মতে, পাখিরা গ্রহনক্ষত্র দেখে দিকনির্ণয় করে এবং তা প্রমাণ করবার জন্য সুইডিশ বিজ্ঞানীরা রাডারে করে দেশান্তর যাত্রী পাখিদের ছবি তুলে প্রমাণ করতে চাইছেন যে মেঘলা রাতে পাখিদের দেশান্তর-যাত্রা প্রায় বন্ধ থাকে। অথচ নির্মেঘ রাত্রে তারা আকাশ কালো করে উড়ে চলে।

অনেকের মতে পাখিদের এই আকাশচারণে বিপুল শক্তিক্ষয় হয়। তাই তারা দিনের বেলা যতটা সম্ভব উদর পূরণের দ্বারা শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। আবার অনেকের মতে মাংসাশী ও পক্ষীখাদক পাখি যেমন—ঈগল, বাজ, চিল প্রভৃতিদের হাত থেকে বাচবার জন্যই পাখিরা বিশেষতঃ ছোট পাখিরা রাত্রে চলে। এতে আততায়ীর আক্রমণ এড়ান যায় বটে, কিন্তু এই সময় পক্ষীজগতে ঘটে ভয়ঙ্করতম মহামরণ। শত সহস্র পাখি পাখা বন্ধ করে লুটিয়ে পড়ে শিলাময় প্রান্তরে উষর মরুর বুকে অথবা সদা গর্জন মুখর সমুদ্রের কোলে, অনেক সময় অস্পষ্ট কুয়াশা বা ধোঁয়াশায় বিভ্রান্ত হয়ে আছড়ে পড়ে আলোকস্তম্ভের গায়ে। কখনও বা ঝড়ের তাড়নায় বিভ্রান্ত হয়ে চলে যায় গন্তব্যস্থল থেকে অনেক দূরে অজানা অচেনা এক দেশে। সুতরাং পাখিদের যাযাবর বৃত্তির ঝুঁকিও কম নয়।

জীব বিবর্তনের কোন ধাপে এসে কি প্রয়োজনে পাখিরা এই বিস্ময়কর যাযাবর-বৃত্তি গ্রহণ করল তা আজও এক দুর্জ্ঞেয় ও চির রহস্যাবৃত।

এ সম্বন্ধে নানা বিজ্ঞানীর নানা মত। এমন কি প্রাচীনকালে ইউরোপের সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করত যে শীতকালে পাখিরা চাঁদে চলে যেত। এছাড়া বহুকাল আগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা ধারণা প্রবল ছিল যে হিমযুগে যখন ইউরোপের উত্তরভাগ তুষারাবৃত হয়ে যেত তখন পাখিরা দক্ষিণ মণ্ডলে উড়ে আসত। পরে এটা তাদের এক সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই মতকে বড় একটা প্রাধান্য দিতে চান না, কারণ, ইউরোপের এই ব্যাপার বাৎসরিক ছিল না এবং একবার শুরু হলে চলত বেশ কয়েক বছর।

তবু প্রশ্ন থেকে যায় এই যাযাবর বৃত্তি কেন সব পাখিদের ক্ষেত্রে হয় না? কেনই বা ব্রিটেন প্রভৃতি অঞ্চলের পাখিরা ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে না গিয়ে যায় সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায়? কেন তুন্দ্রা অঞ্চলের ডান কিং, স্যাণ্ডারলিং প্রভৃতি পাখিরা যায় প্যাটাগোনিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে? এই যাযাবর-বৃত্তিতো কিন্তু সকলের এক না। মিশরের শকুনরা দেশত্যাগী হয় সাতবছরের জন্য, আবার ইংলণ্ডের বিখ্যাত রবিনদের স্ত্রী পাখিরাই কেবল দেশত্যাগী হয় আর সেই দুঃসহ শীত সহ্য করে পুরুষ রবিনেরা থেকে যায়।

আরও গভীরতর রহস্য হচ্ছে তাদের প্রত্যাবর্তন। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাখির পায়ে সন তারিখ যুক্ত আংটি পড়িয়ে পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গেছে যে পাখিরা প্রতি বছর প্রায় একই স্থানে ফিরে আসে। কিন্তু কি ভাবে তারা যায় আর কি ভাবেই বা ফেরে? বয়োজ্যেষ্ঠ পাখিরা কনিষ্ঠদের চালনা করে এমতও ধোপে টেকেনি, কারণ বেশিরভাগই দেখা যায়, বড়রা আগে দেশত্যাগ করেছে, ছোটরা পরে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেও দেখা গেছে যে এ মত খাটে না

পাখিদের এ সম্বন্ধে "আঞ্চলিক চুম্বক তথ্য" নামে একটি থিয়োরী বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন। অবশ্য এখন পরীক্ষার মাধ্যমে তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং বিহঙ্গের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন রহস্য এখনও দুর্জ্ঞেয়, তবে অনেকের মতে পাখিদের একটি বিশেষ ভৌগোলিক জ্ঞান আছে যার দ্বারা তারা মোটামুটিভাবে একটা অঞ্চলে ফিরে আসতে পারে। তারপর সম্ভবতঃ গাছপালা পাহাড়পর্বত, নদী-নালা জলাভূমি দেখে গন্তব্য স্থানে যায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়,—প্রশান্ত মহাসাগরীয় সোনালী প্লোভার বা বাটানরা কি করে নিয়মিতভাবে ২০০০ মাইল দিক-চিহ্নবিহীন দুস্তর পারাবারের বাধা ডিঙোয়?

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পাখির পৃথিবী' গ্রন্থের ঋণ অনস্বীকার্য।

আবার তুমি ফিরে এস

শোভা চট্টোপাধ্যায়

সূর্যঝরা পথ দিয়ে তব জয়যাত্রা
যেদিন করেছিলে শুরু—
সে পথে অনন্তকাল ধরে আজও তোমার
জয়ের ভেরী বাজছে
কোটি কোটি কণ্ঠে গর্জে উঠছে—
'জয়তু বিধান'।
কিন্তু, অবকাশ বুঝি এখনও হয়নি
ফিরে আসার?
স্বর্গের পরিক্রমা হয়নি শেষ?
কিন্তু, দেশের সব কিছুর যে এখনও বাকী
তাই, তোমার সেই আত্মবিশ্বাসে অবিচলিত
ধীর স্থির শান্ত সংযত বীরমূর্তি
আবার আমরা দেখতে চাই।
কবে তুমি নবজন্ম নেবে?
অশোক চক্রশোভিত পতাকা হস্তে
কবে আসবে এগিয়ে হে সাগ্নিক?

কবে তোমার দুর্জয় তেজ শিক্ষার অগ্নি জ্বালিয়ে
অঙ্গুলি নির্দেশে জানাবে তোমার
সত্যকারের পথ নির্দেশ।

ফিরে এস, ফিরে এস, ফিরে এস,
হে মহান বীর,
দেশ জননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান
আবার তুমি নতুন করে নতুন দিনে
ফিরে এস।

আর্যভট্টের 'অক্ষর সংখ্যা'

ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত

'এক চন্দ্র দুই পক্ষ' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে পদ-সংখ্যা (word numerals) অর্থাৎ সংখ্যা-জ্ঞাপক পদের ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছিল, ('খেয়াল-খুশী'—৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য) তখন জানিয়েছিলাম পরে কোন সুযোগে অক্ষর সংখ্যা (letter numerals) বা সংখ্যা-সূচক অক্ষরের কথা সংক্ষেপে বলব। অক্ষর-সংখ্যা হিন্দুদের এক কৌশলী আবিষ্কার। ঐতিহাসিক ক্রমিকতার দিক থেকে বলা যায় প্রধানতঃ পদ সংখ্যার অসুবিধাগুলি দূর করতে প্রাচীন গাণিতিকগণ অক্ষর-সংখ্যার প্রবর্তন করেছিলেন।

পদ-সংখ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি 'খ-লোক-কর্ণ-চন্দ্র' পদ চতুষ্টয় দ্বারা চার অঙ্কের সংখ্যা ১২৩০ লেখা হয়েছে। ছন্দঃবিজ্ঞানের শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখে যেখানে খুব বড় সংখ্যার প্রয়োজন ছিল না, সেখানে পদসংখ্যার ব্যবহারে তেমন অসুবিধা হত না, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত শাস্ত্রে যেখানে স্বভাবতঃই 'লক্ষ কোটি' বা 'মিলিয়ন-বিলিয়ম' নিয়ে কাজ, সেই সব ক্ষেত্রে কোন বড় সংখ্যাকে পদ রূপ দিতে একটা গোটা শ্লোক বা একাধিক শ্লোক লেগে যেত। তা ছাড়া একই সংখ্যা বিভিন্ন পদ সমন্বয়ের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া ছন্দের দিক থেকে সুবিধাজনক হলেও তাতে গাণিতিক সঠিকতা (exactness) ক্ষুন্ন হ'ত। অথচ সঠিক সংবাদ সংক্ষেপে নিবেদন করা বিজ্ঞান তথা গণিতের ধর্ম। তাই হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ পদ-সংখ্যার এই অসুবিধাগুলি দূর করতে অক্ষর-সংখ্যার সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য বিভিন্ন গণিতজ্ঞ তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনের তাগিদে সংখ্যাকে অক্ষরে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সূত্র গ্রহণ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধে প্রথম আর্যভট্টের (৪৯৯ খৃষ্টাব্দ) সূত্র নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা লিখনের সম্ভাবনার পথ প্রথম দেখিয়েছিলেন সম্ভবত প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পানিনি (আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি তাঁর ব্যাকরণে স্বরবর্ণের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করে-ছিলেন। যেমন অ = ১, ই = ২, উ = ৩। ইত্যাদি। একান্ত প্রাথমিক এই ধরণের ব্যবহার ছাড়া অক্ষর-সংখ্যার ব্যাপক প্রচলনের তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত। প্রথম আর্যভট্টই অক্ষর-সংখ্যার প্রকৃত পথিকৃৎ। তিনি তাঁর 'দশ গীতিকা' গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলিকে ব্যবহার করতে একটি নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। নিয়মের সূত্র-যুক্ত উক্ত শ্লোকটির অনুবাদ করলে দাঁড়ায় "ক হইতে সুরু করিয়া 'বর্গ' অক্ষরগুলি 'বর্গ' স্থানে, 'অবর্গ' অক্ষরগুলি 'অবর্গ' স্থানে ও ঙ নয়টি স্বরবর্ণ 'বর্গ' ও অবর্গ' (স্থানে) নয় জোড়া শূন্য হিসাবে (ব্যবহৃত হইবে) এইভাবে 'য' 'ঙ' [ঙ + ম] এর সমান (হইবে)। নয়টি 'বর্গ' স্থানের পর একই (নিয়ম পুনরায়) চলিবে।" এই নিয়মে উল্লিখিত 'বর্গ' অক্ষরের অর্থ ক-বর্গ, চ-বর্গ ট-বর্গ, ত-বর্গ ও প-বর্গের অক্ষর অর্থাৎ 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত বর্গীয় বর্ণ বা স্পর্শবর্ণ, 'অবর্গ' অক্ষর—য, র, ল, ব (ম), শ, ষ, স, হ অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণমালায় বাকী

বর্ণগুলি এর 'বর্গ' স্থানে ও 'অবর্গ' স্থানের অর্থ যথাক্রমে (১ম, ৩য়, ৫ম,…) ও যুগ্ম স্থান অযুগ্ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ,) নয় জোড়া অর্থাৎ আঠারটি শূন্য ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে স্থানীয় মানের জায়গাগুলি পূর্ণ করতে—যে ব্যবস্থা হিন্দু গণিতে সুপ্রচলিত ছিল।

এখন দশমিক প্রথায় স্থানীয় মানের ক্ষেত্রে আর্যভট্টের এই নিয়মের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করা যাক:

ঔ		ও		ঐ		এ		ঌ		ৠ		উ		ই		অ	
অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব	অ	ব
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

এই ছকে বন্ধনীর নীচের 'অ' = অবর্গ এবং 'ব' = বর্গ' মোট আঠারটি স্থান নয় জোড়া শূন্যের দ্বারা পূর্ণ করে প্রত্যেক জোড়ায় বর্গ-স্থান ও অবর্গ-স্থান লেখা হয়েছে 'ক' থেকে 'ম' বর্গ-অক্ষরগুলি কেবল বর্গস্থানে বসবে এবং যথাক্রমে ক - ১, খ — ২, গ = ৩, ঘ = ৪, ঙ — ৫, চ - ৬, ছ - ৭, জ - ৮, ঝ - ৯, ঞ — ১০, ট = ১১, ঠ — ১২, ড = ১৩, ঢ = ১৪, ণ = ১৫, ত = ১৬, থ ১৭, দ — ১৮, ধ - ১৯, ন - ২০, প - ২১, ফ = ২২, ব (ব) = ২৩, ভ - ২৪, ম = ২৫ বোঝাবে। আর 'য' থেকে 'হ' অবর্গ অক্ষরগুলিকে কেবল অবর্গ স্থানে বসানো যাবে এবং য = ৩, র ৪, ল — ৫, ব (ব) ৬, শ - ৭, ষ ৮, স ৯, হ = ১০ হবে। প্রথম বর্গ ও অবর্গ যুগ্মস্থানকে স্বরবর্ণের অক্ষর 'অ' দ্বারা, দ্বিতীয় বর্গ ও অবর্গ যুগ্মস্থানকে 'ই' দ্বারা—এইভাবে শেষ পর্যন্ত নবম যুগ্মস্থানকে 'ঔ' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। একটা কথা জানাই, ঌ (লৃ) এর মত লেখা 'ঌ' (উচ্চারণ 'লি') অক্ষর তোমাদের অনেকের চেনা নয় বর্তমানের ব্যবহার নেই বলে, তবে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ বা অনুরূপ বই থেকে তোমরা অক্ষরটা চিনে নিতে পারবে। উক্ত ছকে স্বরবর্ণগুলির কোন সংখ্যা মান নেই—তারা ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় মান বোঝাতে। এই স্বরবর্ণগুলির বিশেষ কোনটি নির্দিষ্ট অক্ষর সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দশমিক প্রথায় স্থানীয় মানের ক্ষেত্রে তার যথার্থ স্থান নির্দেশ করে মান। যেমন, 'অ' স্বরবর্ণ যুক্ত হয়ে অবর্গ বর্ণ 'য' অর্থাৎ য + অ = য বোঝাবে ৩ দশক ৩০ (এখানে অবর্গ য ৩ এবং 'অ' স্বরবর্ণের অবর্গ স্থান উপরের ছক অনুসারে স্থানীয় মানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অর্থাৎ দশকের স্থান)। আবার বর্গঅক্ষর ঙ্ — ৫। 'অ' সংযুক্ত হয়ে বর্গস্থানের হিসেবে প্রথম স্থানে অর্থাৎ এককের স্থানে বসে ৫ একক — ৫ হবে। এইভাবে শ্ + ই শি = ৭০০০ খি - ২০০, কৃ - ৫০,০০০,০০০ এবং নৃ = ২০,০০০,০০০। যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে অক্ষরের সংখ্যা মূল্যায়ন হবে যোগনীতিতে (additive principle)। যেমন ঙ্ম = ঙ্ + ম্ + অ = (৫ + ২৫) একক ৩০। তোমরা আগেই জেনেছ য - ৩০। এই কারণে আর্যভট্টের শ্লোকাংশে আছে—"য ঙ্ম—এর সমান হবে।" একটা অসুবিধার কথা জানাই।

[পরের সংখ্যায় সমাপ্য]

দশজনের 'একলা' ভ্রমণ

ম, জ, স, আ, স, দ, স, র, প, গ

শেষ-বেশ দশজন ঠিক হ'ল। দাদুকে বলতেই দাদুর উৎসাহের অন্ত নেই। বাড়ির অনুমতি পাওয়া অবশ্য একটু শক্ত। কারণ, আমরা যদিও সবকটি প্রায় ১১-১২ ক্লাসের ছাত্র, কিন্তু বাড়ির ছেলে হিসেবে খুবই নাবালক। দশজনে যাব, তাও বাড়িতে শুনতে হল, "হ্যাঁরে, একলা যাবি?" কথাটার মানে অতি সোজা—দশজনে একলা অর্থাৎ আরও অনেক বেশি বয়স্ক কেউ একজন সঙ্গে গেলে ভাল হয়। শেষ অব্দি মত মিলল, ব্যস্। মধুপুরে বাড়ি ঠিক হয়ে আছে—এবার অন্য সব ব্যবস্থা। প্রথম হাঙ্গামা তো রেলের টিকিট। আমাদের শ্রদ্ধেয় মোমিনদা এগিয়ে এলেন, শুধু টিকিট নয়—মায় সিট্ রিজার্ভেশন অব্দি করে দিলেন। অর্থাৎ আমরা বিধান শিশু উদ্যানের দশজন সিনিয়র সদস্য পুজোর ছুটির কয়েকটা দিন মধুপুরে কাটিয়ে আসব। সাতদিনের কম থাকব না, সঙ্গে প্রত্যেকের ১০০ টাকা থাকবে, যাবার টিকিট এবং যেদিন যাব, সেদিন সকালের জল খাবার। আরও একটা শর্ত করা হল, যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমরা নিজেরা রেঁধে খাব।—পরিচিত কারও বাড়ি যাব না। অনেকে শুনে বললেন, "পাগল! এই বাজারে ওই টাকায় সাতদিন থাকা যায়?" কেউ কেউ উৎসাহও দিলেন। তবে আসল জায়গায় উৎসাহ তো পেয়েই গেছি, মানে দাদুর কাছে, আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, নিশ্চয়ই ঐ টাকায় সাতদিন থাকা যাবে।

মহালয়ার দিন ভোর চারটেয় রেডিওর শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাত্রা শুরু হল। সকলেই উল্টোডাঙ্গা ষ্টেশনে এলাম, সেখানে বিপত্তি। সময়মত প্রথম ট্রেন এল না, দ্বিতীয় ট্রেনও এল না। সবার বুক ঢুকপুক করছে, যদি শেয়ালদায় গিয়ে মধুপুর যাবার ট্রেন পাওয়া না যায়! তৃতীয় ট্রেন যখন এল, তখন সকলের মনে একটা উদ্বেগ।

শেয়ালদা পৌঁছে দৌড়, দৌড়, দৌড়। আর ভীড়, কি ভীড়! সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের অধিবাসী এসে যেন জড়ো হয়েছে—আর সবারই লক্ষ্য ঐ ট্রেনখানি। উপভোগ করার মত অবস্থা, কিন্তু আমাদের যা মানসিক অবস্থা—গাড়িতে ওঠাই এক বিপদ। ঠেলে ঠুলে, অনুনয় বিনয়, খোশামোদ করে গাড়িতে উঠে যখন সংরক্ষিত আসনে বসলাম, তখন আমাদের মনোভাব ওয়াটার বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সৈন্যদের মত, আমরা যেন অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। ভাল করে বসে চারদিক চেয়ে দেখি, ওমা, এত ভিড়ের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁদের মোটঘাট বসবার জায়গায় রেখে সদর্পে বসে আছেন। এ যেন এক আলাদা পৃথিবী। গাড়ি ছাড়বার আগে ঝগড়া ঝাঁটি, কত কোলাহল। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পর দেখা গেল যাত্রীদের মধ্যে যেন কতদিনের বন্ধুত্ব। এ ওর ঘটি থেকে জল খাচ্ছে, কেউ কেউ সিগারেট দেওয়া নেওয়া করছে, আবার যারা হাত পা ছড়িয়ে বসেছিল, তারা হাত পা গুটিয়ে অপরের বসবার জায়গা করে দিচ্ছে, আমাদের মন তখন উশখুশ করছে ঐ খাবার গুলোর দিকে। মোড়ক খুলে দেখা গেল দাদুর নিজের তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাগুলো ভালই হয়েছে।

দুটি ডিম, দুটি কলা, একটি আপেল, একটি শশা, আলু সেদ্ধ, আর দশ স্লাইস করে পাঁউরুটি। সঙ্গে সকলের জন্য বড় বোতলের এক বোতল জেলি, আর দুটো কৌটায় মরিচ আর নুন। এই হল মাথা পিছু বরাদ্দ। ওহো, ভুল হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সকলের জন্য শতাধিক নারকেল নাড়ু। একটু একটু খাচ্ছি, আর বাইরের দৃশ্য দেখছি।

ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে গেল—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি। তারপরই ভাটপাড়া—কাছেই তো কাঁঠালপাড়া। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, আর ভাটপাড়ায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মনটা আর তখন খাওয়ার দিকে না। পরম শ্রদ্ধেয় জন্মভূমি—আপনা আপনি দু'হাত মাথায় ঠেকে গেল। কিন্তু দেখা গেল যে হাত মাথায় ঠেকিয়েই রাখতে হবে, নৈহাটির একটু দূরেই তো সাধক রামপ্রসাদ, আর নৈহাটী থেকে একটু বেঁকে গাড়ি যখন হুগলী পোল পেরিয়ে ওপারে যাবে, তার আগেই তো গরিফা ষ্টেশন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। হুগলী ঘাট দিয়ে গাড়ি গেল। সেই হুগলী, হাজী মহম্মদ মহসীনের টাকায় হুগলী কলেজ, হাসপাতাল আর মস্তবড় ইমামবাড়া হয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, হুগলী চুঁচড়ো একই মিউনিসিপ্যালিটি, একদিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আরেকদিকে কেশবচন্দ্র সরকার। আবার এই হুগলী থেকে পাঁচ মাইল দূরে সুগন্ধা গ্রাম, স্যার তারকনাথ পালিতের বাড়ি, যাঁর বসতবাড়িটি বালীগঞ্জ সায়েন্স কলেজ এবং যিনি কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। বর্ধমানে গাড়ি পৌছল। দামোদর পেরিয়ে তোরকোনা গ্রামে স্যার রাসবিহারী ঘোষের বাড়ি। বিশ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গাড়ি চলেইছে, আমরাও একটু একটু খাচ্ছি। অনেক পথ মাড়িয়ে গাড়ি পানাগরে এল। এখান থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে বীরভূম জেলায়, এখানে কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। অজয়ের ধারে কেন্দুবিল্বে জয়দেব, সেখান থেকে সোজা গেলে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, আবার সেখান থেকে সোজা গেলে নান্নুরে চণ্ডীদাস। অপূর্ব ঘটনা, পানাগড় ছাড়িয়ে দুর্গাপুর—ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ শিল্পাঞ্চল, যা একদা ছিল দশ মাইল ব্যাপী বন। মনটা খুশি আর বুকটা গর্বে ভরে উঠল। বিধানচন্দ্রের সৃষ্টি এই দুর্গাপুর, আর আমরা সেই বিধান শিশু উদ্যানের সভ্য। তার পরই কয়লার খনি আর বড় বড় কারখানা, তার মধ্য দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। ষ্টেশন চিত্তরঞ্জন। আগে নাম ছিল মিহিজাম। এখানেই ভারতবর্ষের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা। লোকোমোটিভ ইঞ্জিনে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি, ডিজেল ইঞ্জিনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। এখন চলেছে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন তৈরি। চিত্তরঞ্জন যেন আশীর্বাদ করছেন। ঐ যাঃ, লিখতে ভুলে গেছি। ট্রেন থেকে দেখা গেল মাইথনের জলাধার। ডি. ভি. সি. দামোদর জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার একটি জলাধার। দামোদরের ছিল সর্বনাশা-রূপ। বর্ধমান, হুগলী, এবং হাওড়া জেলার অনেকটা অংশ বছরে সাতমাস বানের জলে ডুবে থাকত। দামোদরে যে সব নদী পড়েছে মাঝে মাঝে তাদের জল আটকে অনেকগুলি জলাধার তৈরি হয়েছে—কুমুর, তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত এই চারটি হল জলাধার। এবং এই জলাধার গুলির জল দুর্গাপুরে প্রকাণ্ড ব্যারাজ করে বর্ষায় যে অতিরিক্ত জল হয় তা সারা বছরের জন্য সঞ্চয় করে রাখা হয়। বর্ধমান হুগলী ও হাওড়া-মূলত তিনটি জেলায় অনাবৃষ্টির সময় সেচের জন্য জল ছাড়া হয়। আর যে সব

জায়গায় জলাধার হয়েছে, সেই সব জায়গায় জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এর নাম হল 'হাইডেল', আর কয়লা থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তাকে বলে থার্মল। এশিয়ায় অন্যতম সর্ববৃহৎ থার্মল পাওয়ার স্টেশন ডি. ভি. সি-র অন্তর্গত বোকারোয়। ডি. ভি. সি পরিকল্পনার ফলে একদিকে যেমন বন্যার প্রকোপ কমেছে, অন্যদিকে সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে। চিত্তরঞ্জনের পরেই কারমাটার। কারমাটারের বর্তমান নাম হয়েছে বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ ভাগে এখানেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন। নাম শুনলেই কেমন রোমাঞ্চ হয়। আমরা বিধান শিশু উদ্যানের ছেলে মেয়েরা বছরের প্রথম দিন ১লা বৈশাখ, বিদ্যাসাগর দিবস হিসাবে পালন করি। একথা ভাবলেও মনটা গর্বে ফুলে ওঠে আমরা বিদ্যাসাগরের বংশধর। তারপরই মধুপুর। ২-৪৫ মিনিট নাগাদ মধুপুরে নামলাম। মধুপুরে নামার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একটা কুসংস্কারকে তো জয় করা হয়েছে। পাড়াপড়শি ও সমাজের অনেকেই বলে থাকেন ডিম আর কলা অযাত্রা। কিন্তু আমরা তো ডিম আর কলা দুই-ই খেতে খেতে এসেছি এবং সঙ্গেও এনেছি। ট্রেনে খুব মজা করেছি এবং সবাইয়ের শরীর ও বেশ ভাল আছে। তাহলে ব্যাপারটা যে নিছক কুসংস্কার, তা সম্বন্ধে মনে কোন দ্বিধা রাখা উচিত নয়, এ-তো অযাত্রা নয়, এ শুভযাত্রা।

ট্রেনে নিজেদের মধ্যে যেসব খুঁটিনাটি হয়েছিল, তা না লেখাই ভাল। কেউ বা ভাগের চেয়ে একটা ডিম বেশি খেয়েছিল, কেউ বা সারাক্ষণই নাড়ু খেয়েছিল। যাক্‌গে এসব ঘরোয়া কথা না লেখাই ভাল। আবার অন্যান্য সহযাত্রীদের মধ্যেও লক্ষনীয় ঘটনা ঘটেছিল যেমন, পরিস্কার কাপড়-জামা পরা চকচকে চেহারা—সিগারেট খেয়ে গাড়ির ভেতরেই ফেলছেন আবার মলিন জামা কাপড় পরা শ্রমিক শ্রেণীর চেহারা—বিড়ির টুকরো বাইরে ফেলছেন, যেমন, গাড়িতে ওঠবার জন্য এবং গাড়িতে উঠতে না দেবার জন্য যাঁরা মারামারি করছিলেন তারা নিজেদের টিফিন কৌটো খুলে ভাগাভাগি করে খাচ্ছেন। কোন অবগুণ্ঠনবতী মা কালি-ঝুলি মাখা অপরের বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছেন। আবার মাঝে মাঝে উলটোটাও ঘটছে, কি বিচিত্র এই ট্রেনযাত্রা!

ছড়া

অভ্রজিৎ মণ্ডল (সপ্তম, ৭

আমার স্কুল টাকি
নাইকো সেথায় ফাঁকি।
প্যারীমোহনে থাকি—
দিদির নাম টুকটুকি।

নমঃ, ভারতভূমি জন্মভূমি

চন্দ্রনাথ রায় (সভ্য, সিনিয়র)

মানুষ যে নিষ্পাপ, এ কথা কোন মানুষ জোর করে জোর গলায় যুক্তি সহকারে বলতে পারবে না। কিন্তু শিশুরা যে নিষ্পাপ একথা কোন মানুষই স্বীকার করতে পারবে না। আমি বলব, শিশুদের সাথে যে মানুষ মনে প্রাণে মিশতে পারে, সে নিজেও নিষ্পাপ। সত্যি কি মিথ্যে জানি নে, তবে একজন মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করলেই একথা বোঝা যাবে। নিষ্পাপ না হলে কোনো মানুষের পক্ষে নিষ্পাপের সাথে দীর্ঘ সময় সদ্ভাব রেখে চলা খুবই শক্ত কাজ। এটা যে কঠিন সেকথা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। কিন্তু সেই কঠিন কাজের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যে মানুষটি শিশুদের মনের গভীরে প্রবেশ করত সক্ষম হয়ে ছিলেন, শিশুদের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন, বর্তমানে যাঁর জন্মদিনে 'শিশু-দিবস' (১৪ই নভেম্বর, ২৮শে কার্ত্তিক) পালিত হয়, সেই মানুষটি ছিলেন ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশেব প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীন ভারতের (ব্রিটিশদের রাজত্ব থেকে স্বাধীন) প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কোন ব্যক্তি করে দেননি, অর্থাৎ তাঁকে কোন ব্যক্তি সেই পদে বসিয়ে দেন নি তিনি নিজ কর্মের দ্বারা ও পরিশ্রমেব দ্বারা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীত্ব অর্জন করেছিলেন। সে সময় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাজ খুব সোজা ছিল না। দীর্ঘ ১০০ বছরের অন্তহীন সংগ্রামের পর দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ এর জন্য গায়ের রক্ত জল করেছে। মৃত্যু বরণ করেছে হাসি মুখে, তারা সংসারের মায়া ত্যাগ করেছে, আজাদ-হিন্দ-বাহিনী এবং নেতাজী শুভাষচন্দ্রের সাথে গলা মিলিয়ে বলেছে—জয় হিন্দ। মহাত্মা গান্ধীর পথে অহিংসার যুদ্ধ করেছে। নিজের হাতে নিজের জীবন আত্মাহুতি দিয়ে তারা দেশকে, জন্মভূমিকে, মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন সফল করে তারা অমর হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশীরা ভারতবর্ষ থেকে যা শোষণ করে নিয়ে গেছে, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সব আবার নতুন করে তৈরি করে নিতে হবে। এক শত্রু বিদায় হয়েছে বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে কেন? সারা পৃথিবী জুড়ে বহু অজানা শত্রু ভারত-বর্ষের দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, অনেক কাল ধরে। তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন। সমস্যা এবং প্রয়োজনের কথা লিখতে গেলে লম্বা ফর্দ হয়ে যাবে। হাজারো সমস্যা, হাজারো প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলিকে নিজের সাংসারিক সমস্যাব মত দেখে যে মানুষটি তার সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন, যে মানুষটি মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, গান্ধীজীর বাণী সবাব ঘবে পৌছে দিয়েছিলেন, যিনি শিশুদেব প্রাণের থেকে বেশি ভালবাসতেন, সেই মানুষ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথাই লিখছি।

অল্পবয়সে সকলে তাঁকে 'প্রিন্স' অর্থাৎ 'রাজপুত্র' বলত। কারণ তিনি ধনীর পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা হলেন মতিলাল নেহরু। বিলেত থেকে দেশে ফিরে দেশের অবস্থা দেখে জওহরলাল চমকে গেলেন। দেশের মানুষ অনাহারে বাস করে, তার ওপরে বিদেশীদের জুলুম। ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটি করে না। দেশের অমূল্য সম্পদ বিদেশীরা লুঠ করে নিজেদের দেশে নিয়ে চলেছে, কারুর কিছু বলবার সাহস নেই। সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে

বিদেশীরা একটা বিশাল দেশ জয় করে নিল, আর সেই দেশের মানুষ ঘরের শত্রুকে কিছু বলবে না, এ হতে পারে না। বিপ্লবীরা ঘরে ঘরে প্রতিহিংসার আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তারা প্রাণের ভয় করেন না তারা জানেন না বিদেশীরা তাঁদের লুঠ করতে এসেছে, তাঁদের লক্ষ্য শত্রু নিধন করা। তারা আপন মায়ের থেকে দেশের মা'কে বড় করে দেখলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই সজ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করছিলেন না, তাঁদের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই তাঁরা অন্ধের মত বাঘের গর্তে পা দিচ্ছিলেন, এবং ফল হচ্ছিল নির্মম। কারণ, তাঁদের কোন দলপতি নেই, কোনো পরিকল্পনা নেই। অস্ত্রের অভাব, অস্ত্রে শিক্ষিত মানুষের অভাব, অর্থের অভাব, তাছাড়া দেশের মানুষেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। জওহরলাল নেহরুর সামনে এলেন গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র। সংগ্রামের নতুন যুগ শুরু হল। জওহরলাল নেহরু সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। ইচ্ছা করলে তিনি অর্থের স্বপ্ন দেখতে পারতেন, আরও ধনী হয়ে সুখে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু পরাধীন থেকে কি লাভ ; তার থেকে মৃত্যুবরণ করা আরও সুখের, জওহরলাল নেহরু সেটা বুঝেছিলেন এবং সেইজন্যেই অন্য দশজন মানুষের সঙ্গে তাঁর তফাৎ।

জহুরী রতন চেনে। গান্ধীজীও জওহরলাল নেহরুকে চিনতে পারলেন। অল্প সময়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। দুজনে মিলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিলেন। কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা করল দেশকে শত্রুমুক্ত করবে। নেতৃবর্গ পরিচালিত কংগ্রেস হয়ে উঠল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর প্রধান এবং প্রিয় শিষ্য হলেন।

দেখতে দেখতে দেশ জুড়ে আন্দোলন আরম্ভ হল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। অহিংস আন্দোলনের বাণী ভারতের সব ঘরের দ্বারে পৌঁছে দিলেন জওহরলাল। সবার মুখে গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রর নাম এবং মতিলাল নেহরুর সুযোগ্য পুত্র জওহরলাল নেহরুর নাম। ব্রিটিশ বুঝতে পারল যে ভারতবাসী মাতৃভূমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করবেই। তারা শীঘ্র ভারত পরিত্যাগ করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ হলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি। জওহরলাল নেহরু হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর মুখে ধন্য ধন্য রব উঠল। দেশ গঠনে জওহরলাল উঠে পড়ে লাগলেন। দেশবাসীর সহযোগিতায় ভারতবর্ষের উন্নতির সব প্রচেষ্টা শুরু হল।

গোলাপ ফুল ভালবাসতেন জওহরলাল। শিশুদের মতই গোলাপ ফুল নিষ্পাপ। তাঁর জামায় সবসময় গোলাপ ফুল লাগানো থাকত। বাড়ির সামনে গোলাপের বাগান ছিল। এই মানুষটির হৃদয়ও গোলাপ ফুলের মত নিষ্পাপ, শিশুদের মত কোমল, বাঘের মত সাহসী। গাড়ি করে যাবার সময় তিনি পথে শিশুদের কণ্ঠে নিজ হস্তে মাল্যদান করতেন। জওহরলালের নেতৃত্বে কবির কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা"।

তিনটুকুনি

শ্যামলকান্তি দাশ

১.

খায় আলু কাঁচকলা
বরবটি শিমটি
ও-পাড়ার এক ঠেঙে
মরা ঘোড়া নিমটি।
ভোরবেলা রাত কানা
শিশিরের চিমটি
খেয়ে দেয়ে বেজে ওঠে
কোকিলের ডিমটি।

২.

পায়রা বলে, "পায়রাণী,
মুড়কিমুড়ি কিনতে গিয়ে
মিথ্যে হলুম হয়রানি
একটুখানি চোখের ভুলে
ঠকিয়ে দিল ময়রাণী।"

৩.

কাক বলে, "কাকিনী
বিকেলের রান্নাটা
কী রকম চাখিনি।
বেল পেকেছিল তাই
টাকে তেল মাখিনি।"

ছড়া

শম্পা দত্ত (সভ্য, ৯

শালিক ডাকে কিচির মিচির
পায়রা ডাকে বকম বকম
কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ
তোমরা বাইরে যেও না কেউ

ফুটবল

শান্তনু দাস (সভ্য, ৯

খেলার আসর পাড়ি,
ভাবতে ভাবতে মরি।
সবার সেরা ফুটবল
ভারত কিন্তু দুর্বল।
এশিয়াতে যোগ দিল
প্রায় খেলাতেই হেরে গেল,
শ্রেষ্ঠ খেলা ফুটবল
প্রমাণ তাহার কোথায় বল ?

গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ২রা অক্টোবর যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হল বিধান শিশু উদ্যানে। ঐদিন সকাল ৭-৩০ মিনিটে মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রী অপরেশ ভট্টাচার্য সমবেত ছেলেমেয়েদের সামনে গান্ধী সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের ব্যাণ্ড সহকারে পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিকেলবেলার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ সরলা ঘোষ। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আরও দুজন বক্তা উপস্থিত ছিলেন—অধ্যক্ষ ডাঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী ও সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র। মঞ্চে গান্ধীজী ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতিকৃতি সাজানো হয়। শাস্ত্রীজীরও ঐ একই দিনে জন্মদিন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভানেত্রী ও বক্তারা গান্ধীজী ও শাস্ত্রীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর বিধান কলাকেন্দ্রের সভ্য-সভ্যারা উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করে। উদ্বোধন সংগীতের পর ২রা অক্টোবর দিনটির গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন শ্রী অপরেশ ভট্টাচার্য এবং গান্ধীজী সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন। সভানেত্রী ডাঃ ঘোষ গান্ধীজীর আদর্শের কথা ছোটদের সামনে বলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা তাদের সামনে তুলে ধরেন। সভানেত্রীর বক্তব্যের পর একে একে বক্তারা গান্ধীজী ও শাস্ত্রীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। সাহিত্যিক মিত্র গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে প্রত্যেককেই গান্ধীজীর পথ, আদর্শ অনুধাবণ করতে বলেন, অনুসরণ নয়।

সকলের বক্তব্যের পর বিধান শিশু উদ্যানের ছেলেমেয়েরা গান, আবৃত্তি ও পাঠ করে শোনায়। উদ্যান সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আনন্দ সংবাদ

ডাঃ. বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটি উদ্যানের সিনিয়র সভ্য শ্রীমান মানব নন্দীকে ডাঃ বি. সি. রায় জন্মশতবর্ষে প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিদ্যা গবেষণা বৃত্তি প্রতি মাসে ২০০ টাকা হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই বছরের ১৯৮১-র ১লা জুলাই থেকে এই বৃত্তি কার্যকরী হবে বলে স্থির হয়েছে।

হিরোর বিরুদ্ধে

দিলীপ দত্ত

(ক্রিকেটের এক অনন্য প্রতিভা অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টর ট্রাম্পার। যাঁরা ট্রাম্পারের খেলা দেখেছেন তাঁরা অনেকেই তাঁকে ব্রডম্যান, হবসের চেয়ে বড় ক্রিকেটার মনে করেন। ১৯১৫ সালে ৩৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। সে সময় প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। কিন্তু যুদ্ধের সেই বিভীষিকার মধ্যেও ট্রাম্পারের মৃত্যুসংবাদ ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

আর্থার মেইলী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার একজন প্রখ্যাত গুগলী বোলার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনি অনেকগুলি টেস্ট ম্যাচ, খেলেছেন সম্মানের সঙ্গে।

ট্রাম্পারের প্রতিভা যখন মধ্যগগনে, তখন আর্থার মেইলী ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে বল করার সুযোগ পান। মেইলী তখন উঠতি খেলোয়াড়। ট্রাম্পার ছিলেন মেইলীর 'হিরো'। সেই হিরোর বিরুদ্ধে প্রথম বল করার অভিজ্ঞতা এই লেখায় বর্ণিত হল।)

প্যাডিংটনের সঙ্গে রেডফার্নের দলের খেলা। প্যাডিংটন ভিক্টর ট্রাম্পারের ক্লাব। রেডফার্নের পক্ষে নিবাচিত হলেন আর্থার মেইলী। মেইলীর কাছে এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনি একজন সামান্য ক্লাব ক্রিকেটার। ট্রাম্পারের মত বিশ্ববিজয়ী ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে খেলবেন এ হতেই পারেনা। খেলার দিনে হয়ত যুদ্ধ বেধে যাবে, কি ভুমিকম্প হবে বা ট্রাম্পার হয়ত অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। খেলার আরম্ভের আগে কত কি ঘটতে পারে। বিছানায় বসে মেইলী ট্রাম্পারের ছবির দিকে চেয়ে রইলেন। ঘরেব কোনায় দাঁড় করানো ট্রাম্পারেরই একটি ব্যবহৃত ব্যাট সেটা মেইলী এক আত্মীয়ের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। মেইলী ভাবতে লাগলেন তাঁর দেবতা উইকেটে এসেছেন। আম্পায়ারের কাছে গার্ড চাইলেন 'টু লেগস প্লিজ'। এ কল্পনাও করা যায় না।

মেইলীর বাবা বললেন, "ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলছ? যদি তোমার বল করতে দেয় 'তা কি হবে জানিনা।"

মা প্রতিবাদ করে বললেন, "চেষ্টা করলে কি না হয়।"

মেইলীর কিন্তু খেলায় কি হবে সে সম্বন্ধে চিন্তা ছিলনা। তাঁর চিন্তা এমন কিছু না ঘটে যাতে ট্রাম্পারের বিপক্ষে খেলার সুযোগ নষ্ট না হয়ে যায়। মেইলী ট্রাম্পারের খেলা কখনও দেখেননি। খেলার মাঠের কাছে দাঁড়িয়ে ট্রাম্পারকে ভেতরে যেতে দেখেছেন। একবার ট্রামে ট্রাম্পারের সামনে বসেছিলেন। কিন্তু মনে পড়ল পকেটে পয়সা নেই তাই তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হয়েছিল। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে কোনদিন ট্রাম্পারের সঙ্গে কথা বলবেন। খেলা তো দূরের কথা।

মেইলী প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা পর্যন্ত নিজেই নিজের প্যান্ট সার্ট ইস্ত্রি করতেন। সেদিন কিন্তু

তিনি তাঁর প্যান্ট সার্ট ইস্ত্রি করতে লাগলেন, একবার নয় বারবার। সকালে উঠেই দেখেছিলেন আকাশে মেঘ আছে কিনা। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো খেলা হবেনা। আকাশ পরিস্কার তবু ভয় হল যদি হঠাৎ বৃষ্টি আসে। ঘড়ির দিকে চাইলেন, ঘড়িটা স্লো নয়ত? থেমে যাইনি তো। মনে হল ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে তাকে বল করতে না দিতে পারে। বা ট্রাম্পার হয়ত তাঁর বল করার আগে আউট হয়ে যেতে পারেন। হঠাৎ মনে হল ট্রাম্পার এখন কি করছেন। তাঁর মত নিশ্চয়ই তাঁর নিজের প্যান্ট ইস্ত্রি করতে হয় না। হয়ত এখন তিনি প্রাতঃরাশ খাচ্ছেন। আচ্ছা, তিনি কি জানেন মেইলী তাঁর বিরুদ্ধে খেলছে আজ। দূর ট্রাম্পার তাঁর মত নগণ্য ক্লাব ক্রিকেটারের নামই শোনেননি কোনদিন। সকালটা আর কাটে না। ভাবলেন যাই বাগানে একটু মাটি কুপিয়ে আসি, নানা তাহলে ক্লান্ত হয়ে পড়ব, একটু শুয়ে থাকি, বাপরে যদি ঘুমিয়ে পড়ি। সারা সকালটা ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলার আনন্দে মাথার ঠিক ছিল না মেইলীর।

অবশেষে মেইলী মাঠে পৌঁছলেন, পৌঁছেই দলের অধিনায়ক হ্যারী গডার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন "উনি এসেছেন?"

"কে উনি" বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন গডার্ড বোকার মত প্রশ্ন করেছে জেনে মেইলী আর কোন কথা বললেন না।

প্যাডিংটন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিল। ট্রাম্পার ব্যাট করতে নামলেন। গডার্ড বললেন, "আর্থার তোমাকে ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে বল করতে দেব না ভাবছি, যদি তোমাকে মারতে আরম্ভ করে তাহলে হয়ত আর গ্রেড ক্রিকেটেও তুমি চান্স পাবে না।" মেইলী ভাবলেন ঠিক কথা। কিন্তু কোন ব্যাটসম্যান তাঁর বল পেটাবে এতেও তিনি ভীত নন। তিনি শুধু চান ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে বল করতে। ঠিক যেন নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত। হেরে গেলে ক্ষতি কি, বলতে তো পারা যাবে নেপো-লিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

ট্রাম্পার কিছুক্ষণ ব্যাট করার পর, অধিনায়ক ডাকলেন মেইলীকে বল করার জন্য। তিনি ততক্ষণ তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন।

মেইলীর মাথা ঘুরতে লাগল। প্রথম বলটা তিনি করেছিলেন কিনা মনে নেই। তাঁর সতীর্থরাও ভবিষ্যতে তার সেই প্রথম বলটির কথা তাকে বলেননি। সেই বলটির কি অবস্থা হয়েছিল তাও তিনি জানেন না। হয়ত ৬ বা ৪ কিছুই মনে নেই। কেবল মনে আছে তুমুল হর্ষধ্বনির পর তাঁর হুঁস এসেছিল।

পরের বলটা তার খুব মনে ছিল। চমৎকার এক লেগস্পিন, লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে অফ স্টাম্প থেকে লেগ স্টাম্পের দিকে এল চমৎকার লেংথে। অন্য কোন ব্যাটসম্যান হলে আর ফিরে তাকাতে হোত না। নির্ঘাৎ বোল্ড। কিন্তু ট্রাম্পার বলটি দেখতে লাগলেন চিতা বাঘের মত, তারপর বা পা বাড়ালেন বলের লাইনে। ব্যাটটি কাঁধের ওপর থেকে নেমে এল চাবুকের মত, তারপরেই অফসাইড বাউণ্ডারীর রেলিং এ বলটি লাগার শব্দ। অপূর্ব একটি সট, সকলেই বলটির গতি অনুসরণ করেছিলেন।

একজন কিন্তু বলের দিকে দেখেন নি। তিনি হলেন ভিক্টর ট্রাম্পার, কারণ তিনি জানেন বলটা কোথায় যাবে।

আর দুটো বল করার পর মেইলীর মনে পড়ল ট্রাম্পার গুগলীর স্রষ্টা বাসানকোয়েটরের বল খেলতে অসুবিধা হয়েছিল। মেইলী গুগলী বল করতে পারেন। পরের বলটি গুগলী দেবেন সিদ্ধান্ত করলেন।

ভাগ্য তাঁর সহায় ছিল। বলটি সুন্দর উচ্চতায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অফ স্টাম্পের ওপর এল, বলটিতে টপস্পিন ছিল একটু বেশি, টপস্পিন বেশি থাকলে বল যেখানে মাটিতে পড়ার কথা তার প্রায় এক ফুট আগে পড়ে। এ ক্ষেত্রেও হল তাই। ট্রাম্পার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে পা বাড়ালেন, কিন্তু বলটি হঠাৎ মাটিতে পড়ায় ট্রাম্পারে পা বলের লাইনে গেল না, ফুট খানেক তফাতে রইল। ট্রাম্পার আরও বেশি জায়গা নিয়ে ব্যাটটা চালালেন, কিন্তু ব্যাটে লাগল না। ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক দিয়ে সোজা গেল উইকেটরক্ষক কন হেসের হাতে। ট্রাম্পার তখন ক্রিজ থেকে দুগজ বাইরে। হেস ষ্টাম্প করলেন। ট্রাম্পার আউট, ষ্টাম্পড হেস বা আর্থার মেইলী।

ট্রাম্পার ক্রিজে ফিরে আসার কোন চেষ্টা করেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি পরাস্ত তার ফলও তিনি ভোগ করবেন। প্যাভিলিয়নে ফিরে যাবার সময় মেইলীকে বলে গেলেন "চমৎকার বল, আমার পক্ষে খেলা সম্ভব নয়।"

কিন্তু মেইলীর মনে বিজয়ের উল্লাস নেই। তিনি নিঃশব্দে তাঁর হিরোর যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলেন। একটি ছোট ছেলে যেন একটি সুন্দর পাখি-কে মেরে ফেলেছে, মনে হল তাঁর।

খেলার খোশ-খবর

শ্রীকলমচি

সপ্তম ললনা জাতীয় ক্রীড়া উৎসব হায়দ্রাবাদে হবে

প্রমীলাদের সপ্তম জাতীয় উৎসব এ মাসের ১৯ থেকে ২৩শে তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে তেরেটি রাজ্য যোগদান করতে সম্মতি জানিয়েছে।

কুক—বয়কটকে বয়কট করা নিয়ে জল আরও ঘোলা হচ্ছে

এই মরশুমে ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যানগুলিতে (টেষ্ট কেন্দ্র) এ বছর আর বোধহয় ক্রিকেট এসোসিয়েশন-সহ বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির বাণিজ্য করা হবে না। আর দেখা যাবে নিপুণ হাতে অনিপুণ ক্রিকেট রসিকদের পশমবোনা বড় বড় টিফিন ক্যারিয়ার আর ফ্লাস্ক থেকে খেলা চলাকালীন খাদ্য ও পানীয় বিতরণ।

আর সেই সঙ্গে উজ্জ্বল রঙ্গীন বস্ত্রসমারোহও বোধহয় দেখাবার সুযোগ থাকবে না।

এই সমস্ত কিছু অঘটন ঘটানোর (যদি সতিই ঘটে) মূলে রয়েছে ভারত সরকারের একটি নির্দেশ। তা' হল এই মরসুমে ভারত সফরকারী ইংল্যাণ্ড দলে যদি জিওফ কুক জিওফ বয়কট খেলতে আসেন তবে ভারত সরকার এই সফরের অনুমতি দেবে না।

কারণ, কুক ও বয়কট বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

এই মতাদর্শ ভাল কি খারাপ, রাজনৈতিক অথবা অরাজনৈতিক-এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক বলার ও শোনার আছে। তবে সরকারের নির্দেশ প্রত্যেক নাগরিকের মানা কর্তব্য সুতরাং দ্বিমতের সুযোগও কম।

কিন্তু আমাদের দেশের কিছু খেলোয়াড়ও অনুরূপ পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, সরকার তাদের কি বাতিল করবেন অথবা আগামী ডেভিসকাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমাদের সম্ভাব্য প্রতিযোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস দলে ঐ রকম বিতর্কিত খেলোয়াড় থাকার প্রবল সম্ভাবনা। সরকার তাদের কি বয়কট করতে বলতে পারবেন?

এশীয় ক্রীড়ায় প্রশিক্ষণের জন্য আর এক বিদেশী প্রশিক্ষক এলেন

আগামী এশীয় ক্রীড়ায় ভারতের বাস্কেটবল দলকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সোভিয়েট প্রশিক্ষক সার্গোই স্ট্রোজসভ এখানে এসে পৌঁছেছেন। ইতিমধ্যে তিনি পাতিয়ালার ক্রীড়া শিক্ষায়তনে ছিলেন, কলকাতায় এশীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত আছেন এবং থাকবেন ১৯৮২'র এশীয় ক্রীড়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রশিক্ষকের সহধর্মিনী ও নামী বাস্কেটবল খেলোয়াড় এবং এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খেলায় আটবার দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

চীনা রাজনীতিবিদের বিশেষ সম্মান—তাদের রাজা খেলায়

বিশ্ব ব্রীজ প্রতিযোগিতায় বারমুডা বোল (Bermuda Boul) টফির খেলা শেষের দিকের খেলাগুলো যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তখন ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিজ প্রেস এসোসিয়েশন (International Bridge Press Association) "বর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্রীজ ব্যক্তিত্বের" সেরা খেতাবটির জন্য চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সহ-সভাপতি দেং হিমোগিং-এর নাম ঘোষণা করেছেন।

দেংকে চীন দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর ব্রীজ খেলাকে পুনরায় জনজীবনে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এবং চীনাও পাশ্চাত্যের ব্রিজ খেলোয়াড়দের যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসের স্বীকৃতিস্বরূপ এই খেতাব দেওয়া হয়।

ধাঁধা

১।

(ক) বাড়ির বৌমা বোবা কিনা জানতে হলে তাকে একথা বলতেই হবে।

(খ) দুর্গম পথ অতিক্রম করতে গেলে এর দেখা পাওয়া যাবেই।

(গ) এর নাম শুনলেই গ্রাম বাংলার এক বিশেষ গানের কথা মনে পড়ে।

(ঘ) কাউকে বেশি সাজতে দেখলে এই নামে আদর বা ঠাট্টা করা হয়।

(ঙ) বাড়ির বৌমার বৌ কাটা দিতে গেলে একথা বলতেই হয়।

(চ) ছেঁড়া কাটার কথা উঠলে এর নামই সবার আগে মনে পড়ে।

(ছ) এর নামেই কার বৌ তা বোঝা যায়।

(জ) নভোচারী ধাঙর।

(ঝ) দেবীর নামেই নাম।

(ঞ) সেবা পরায়ণা মহীয়সীর নামেই ধন্য।

—ভবঘুরে

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(ক) ক্যানারি, (খ) লালমোহন, (গ) কাকাতুয়া, (ঘ) বুলবুল, (ঙ) মুনিয়া, (চ) সী গাল, (ছ) ঈগল, (জ) ময়ূর, (ঝ) কোকিল, (ঞ) বক।

সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

তিনটি বা তার বেশি উত্তর যারা পাঠিয়েছ তাদের নাম দেওয়া হল :—

সৌমেন মুখোপাধ্যায় (সভ্য, ১০), সোমনাথ দাশগুপ্ত (সভ্য, সিনিয়র), বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্য, ১০), প্রদ্যোৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্য, ১১)।

এ সংখ্যায় যারা এঁকেছে

নীলাঞ্জনা দাস (সভ্যা, ১২), কৌশিক ঘোষ (সভ্য, ১১), আশিস চট্টোপাধ্যায় (সভ্য, সিনিয়র), রণেন মজুমদার (সভ্য, সিনিয়র)।

শিশু দিবস

'শিশু দিবস'— তোমাদেরই দিন। তোমরা এই দিনটি মজা করে কাটিও, তার সঙ্গে তোমাদের প্রিয় চাচা নেহরুকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল না— যাঁর জন্মদিনটিই 'শিশু দিবস' হিসেবে চিহ্নিত।

Regn. No. WB/EC-179 NOVEMBER 1981 Re. 1·00

নিয়মাবলী

১. জুলাই মাস থেকে "খেয়াল খুশীর" বছর শুরু। বছরের যে কোন মাস থেকে খেয়াল খুশীর গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে খেয়াল খুশী প্রকাশিত হয়।

২. প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা এবং বছরে ১২ টাকা। সডাক টাকা ১৩·২৫।

৩. খেয়াল খুশীর চাঁদা মানিঅর্ডারে পাঠানো যায়।

৪. গ্রাহক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

৫. ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েরাই লেখা, ছবি, ধাঁধার উত্তর প্রভৃতি সম্পাদিকার নামে খেয়াল খুশীতে পাঠাতে পারবে।

৬. গ্রাহক চাঁদা ইত্যাদি পাঠাতে হবে খেয়াল খুশীর ম্যানেজারের নামে।

৭. অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না। যারা লেখা পাঠাতে চাও তারা লেখার একটি নকল রাখবে। লেখা পাঠাবার সময় কাগজের দু'পিঠে লিখবে না। যারা আঁকা পাঠাতে চাও, তারা পেন্সিল স্কেচের উপর "চাইনিজ ইঙ্ক" বুলিয়ে দেবে।

৮. কোন কিছু জানতে চাইলে খেয়াল খুশীর কার্যালয়ে এসে দেখা করতে অথবা চিঠিও লিখতে পারো। চিঠির উত্তর পেতে হলে জোড়া পোষ্টকার্ড অথবা ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

৯. পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশকপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে।

"খেয়াল খুশী কার্যালয়"
১, বিধান শিশু সরণী
কলিকাতা—৭০০০৫৪
ফোন : ৩৫-৮০৮৬

কার্যাধ্যক্ষ

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে শ্রীদুলাল ভৌমিক কর্তৃক ১, বিধান শিশু সরণী কলিকাতা-৭০০০৫৪ হইতে প্রকাশিত ও গ্রাফিকো, ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

ডিসেম্বর ১৯৮১
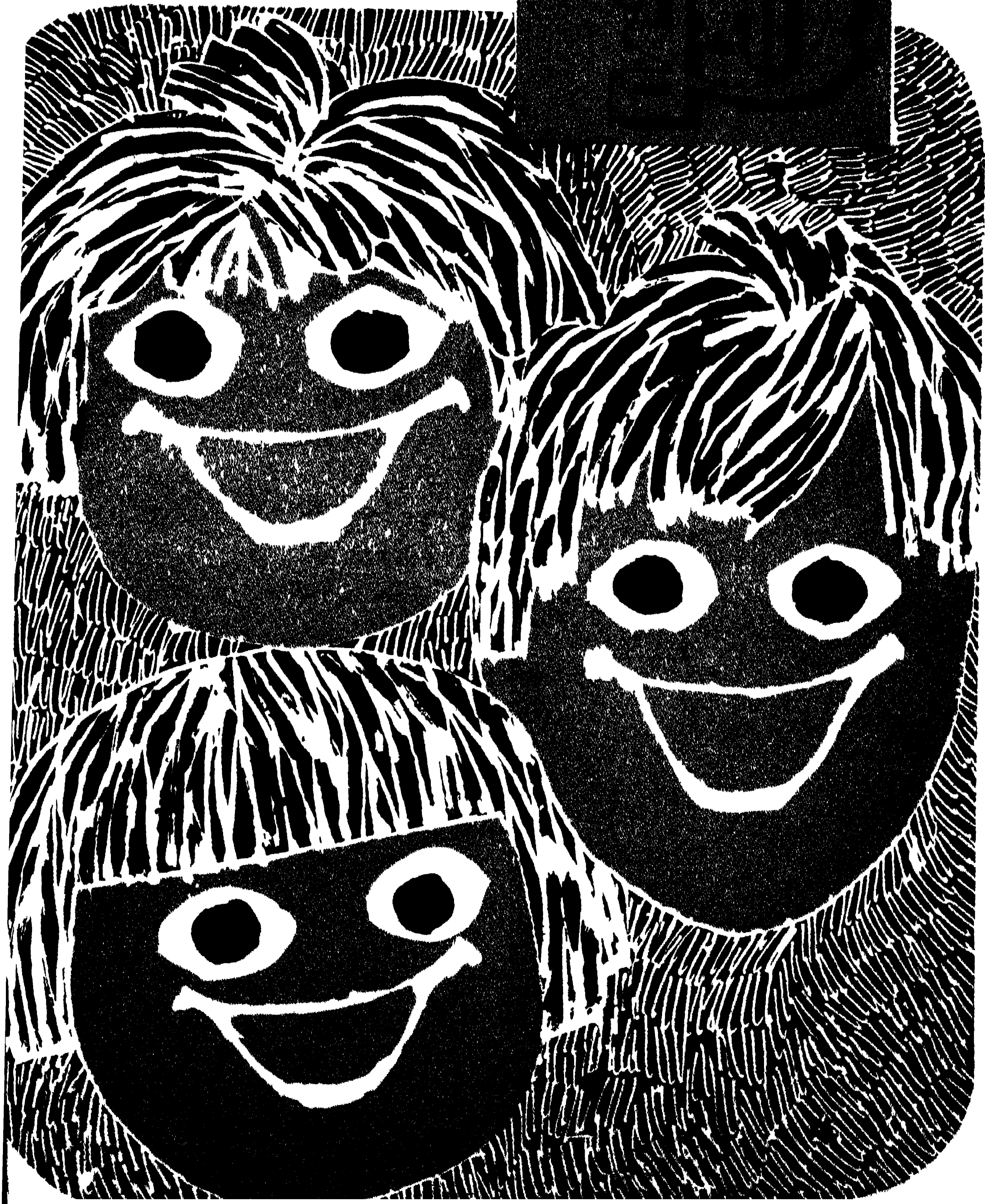
॥ বিজ্ঞাপনের হার ॥

মুদ্রিত জায়গার মাপ

পূর্ণ পৃষ্ঠা :—
১৪·৫ সি. এম × ২০ সি. এম
৬০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা (হরাইজেণ্টাল)
৯·৫ সি. এম × ১৪·৫ সি. এম
৩০০·০০ টাকা

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা [ভারটিক্যাল]
৭ সি. এম × ২০ সি. এম
৩০০·০০ টাকা

¼ পৃষ্ঠা :
৭ সি. এম × ৯·৫ সি. এম
১৭৫·০০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৬৮৩ (১৬) টি-বি-সি/২এ—৬টি/৭৯, ২৪. ১২. ৮০.

৪র্থ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ ১লা ডিসেম্বর ১৯৮১ ॥ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৮
ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা ॥ দাম : এক টাকা
প্রধান উপদেষ্টা : গৌরকিশোর ঘোষ ॥ সম্পাদিকা : ইন্দিরা রায়।

আমাদের কথা □ ২

গল্প □ এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ॥ অশোককুমার সেনগুপ্ত ৫ হীরামতি রাজকন্যা ॥ ডাঃ অমিয়নাথ ব্রহ্ম ৮ গল্প নয়, গপ্পো ॥ সুশান্তকুমার পাল ২৩ শখ ॥ অভিজিৎ দে ৪১ বিরলে ॥ কণাদ মল্লিক ৪৩

প্রবন্ধ □ গ্যালিলিওর ছাত্র ॥ মন্মথনাথ ঘোষ ৩ আন্দামান অভিযানের ডায়েরী থেকে ॥ পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ১৩ ভারতের চিত্রকলা ॥ অহিভূষণ মালিক ২০ চিড়িয়া-খানা ॥ সৌমিত্রশঙ্কর দত্ত ২৬ ভাষাশিক্ষার আসর ॥ অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য ২৭ আর্যভট্টের 'অক্ষর সংখ্যা' ॥ ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত ৩০ দশজনের 'একলা' ভ্রমণ ॥ মানব নন্দী ৩৩ ঠাকুর দেবতার বাহন ॥ প্রণবেশ চক্রবর্তী ৩৯ যে চিন্তা —সব সময়ের, সব কালের ॥ ইন্দিরা রায় ৪৮ সর্বনাশা লোডশেডিং ॥ পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯ আদর্শ ক্রিকেটার ॥ কৌশিক দত্ত ৫১

কবিতা □ প্রার্থনা ॥ বাসব চট্টোপাধ্যায় ১২ বেচারা কাক ॥ তরুণ সাহা ১৫ বিহারে বিহার ॥ আশিস চট্টোপাধ্যায় ১৭ ছিনতাই রাহাজানি ॥ সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত ২৯ যীশু ॥ বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ (বৈদ্যুতিক) পাখার প্রস্তি ॥ রূপা মুখোপাধ্যায় ৩২ তারা ॥ দেবজ্যোতি বসু ৩২ ফুলের মত ॥ ঝুমকা ভাদুড়ী ৩২ রিডিং রুম ॥ মলয় পণ্ডিত ৩২ বড়দিন ॥ প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২ ভিখারী রাম ॥ শান্তনু চক্রবর্তী ৪৬

□ শিশুদিবস : নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ৪৭

খেলাধুলা □ খেলার খোশ-খবর ॥ শ্রীকলমচি ৫৩

হাতের কাজ □ তৈরি কর মজার ঘড়ি ৫৪

ধাঁধা □ ৫৬

প্রচ্ছদ □ পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের কথা

এলো যে শীতের বেলা — সত্যিই শীতের সময় এসে গেছে। হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া প্রকৃতিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। প্রকৃতির রূপ এখন শুষ্ক, রুক্ষতায় ভরা। তোমরা দু'চোখ মেলে প্রকৃতিকে দেখ যদি — বেশী কিছু না, শুধু তোমাদের শিশু উদ্যানকেই ভাল করে লক্ষ্য কর, তাহলে দেখবে সমস্ত উদ্যানে একটা রুক্ষতার বেশ। গাছে গাছে পাতা ঝরার পালা শুরু হয়েছে। শুকনো পাতার মচমচানি শব্দ শিরশিরে হাওয়ায় আরও প্রকট হয়ে উঠছে। শীতের আগমনবার্তা তোমাদের কাছেও খুব একটা সুখপ্রদ নয় — কারণ, এই শীতকালেই তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, যাকে তোমরা সব থেকে বেশী ভয় পাও— বার্ষিক পরীক্ষা। কিন্তু, একটা কথা তোমাদের সবাইকে মানতে হবে যে, এই সময়টাই তো সবচেয়ে ভাল সময় যখন এই শীত প্রকৃতি রাজ্যে দিব্যি করে জাঁকিয়ে বসবে, তখন তোমরা মনে মনে এই শীতকেই ধন্যবাদ জানাবে। এই সময় লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই — শুধু খেলা আর খেলা, তার সঙ্গে বেড়ানো। তোমাদের মনের মত খোরাকও সব ভীড় জমায় চারপাশে — সার্কাস, ম্যাজিক, ক্রিকেট আরও কত কী। যে কোনদিন শুধু বেরিয়ে পড়া মিষ্টি দুপুরে। গায়ে গরম জামা, মনে ফুর্তি নিয়ে তোমরা উপভোগ কর আরও কত দেখা, অ-দেখা, জায়গা বেড়িয়ে। এই সময়ে তো বড় দিনের উৎসব। এই উৎসবেও এখন সবাই মেতে ওঠে আনন্দে। তবে, এখন বড়দিন বলতে শুধু কেক, কমলালেবু খাওয়া আর বেড়ানো।

কিন্তু, বড়রা তো তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন বড়দিনটা আসলে কি। বড়দিনই শুরু করে আনন্দ উৎসবের পরিবেশ। ঐ সময়েই তো যীশু খৃষ্ট জন্মেছিলেন। যিনি শুধু বলে গেছেন ভালবাসতে, আরও বলেছেন — মারের বদলে দাও ভালবাসা। যে অত্যাচার করে তাকে কোলে টেনে নাও। এই হলেন সেই যীশু, যাঁর জন্মদিন আমরা উদ্যানে পালন করছি। তোমরাও নিশ্চয়ই যীশুর কথা সব সময়ে মনে রেখে অন্য বন্ধুবান্ধবদের তাঁরই মত ভালবাসতে শিখবে।

আর দেখ না, প্রকৃতি দেবীও তো তাই বলছে। শীত শেষ হলেই বসন্ত। তখন কেবলই চারিধারে আনন্দধারার পরিবেশন। বসন্তে সে তার অরূপণ দান বিলিয়ে দেবে তোমাদেরই জন্যে — তোমাদের দেবে পরম শান্তি।

গ্যালিলিওর ছাত্র

মন্মথ নাথ ঘোষ

আমি গল্প শুনতে তোমরা সবাই ভালবাস। কিন্তু কল্পনার গল্পের চেয়ে বাস্তবজীবনের গল্প অনেক সময় কি রকম চমকপ্রদ হয়, তোমরা অনেকেই সে খবর রাখ না। তার কারণ জীবনীগ্রন্থ আজকাল তোমরা কেউই পড়তে চাওনা। অথচ এই সব বিশ্ববিখ্যাত মানুষদের জীবনে কত যে সব বিচিত্র কাহিনী মণি মুক্তার মত ছড়িয়ে আছে, শুনলে তোমরা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। একদিন এই মানুষটি কোথায় যেন কাজে গিয়েছিলেন। পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছেন। সন্ধ্যার তখনও দেরি। অপরাহ্ন শেষ হয় হয়। কিন্তু টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল বলে ফিকে কুয়াশার মত আবছা অন্ধকারের ভাব। পথে লোকজনের চিহ্ন ছিল না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অন্যমনস্ক ভাবে হেঁটে চলেছেন। এমনসময় তাঁর কানে একটা ডাক এসে পৌছল। বাবু শুনছেন, ও বাবু, বাবু। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গ্যালিলিও। তাঁকে কি কেউ ডাকছে নাকি? এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। পথে তো কোন লোকজন নেই। পিছনের দিকে ফিরতেই দেখেন, একটা ছেলে রাস্তার ধারে একটা ম্যাজিক দেখানোর বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাঁকে হাতের ইশারায় ডাকছে।

তার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখেন ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে একটা বাক্স নিয়ে। খেলাঘরের বায়োস্কোপ বাক্স তার তিনদিকে তিনটে চোঙ লাগানো। এ বাক্স আমাদের এখানে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে হাটের দিনে খুবই দেখা যায় "দেখো বাবু বায়োস্কোপ, মজার মজার কত ছবি লাট সাহেবের প্রাসাদ দেখ, হাবড়াকা ব্রীজ দেখো" ইত্যাদি ইত্যাদি বলে হাতে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গ্যালিলিও তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমি কি ডাকছিলে খোকা?

হাঁ বাবু। একটি বার দেখে যান আমার বায়োস্কোপ। গ্যালিলিও এই ছেলেটীর কি জবাব দেবেন বোধহয় ইতস্ততঃ করছিলেন। ছেলেটি যেন কাতর কণ্ঠে মিনতি করলে, হে বাবু একবার দেখুন, নইলে আজ আমার খাওয়া জুটবে না। সকাল থেকে এখনও বউনী করতে পারিনি, কেউ দেখেনি।

মনের মধ্যে হাসি চেপে তিনি এবার বললেন, কী দেখাবে? এতে কি আছে? ছেলেটি এবার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, ভাল ভাল অনেক রকমের ছবি আছে। সূর্যের কত গ্রহ নক্ষত্রের ছবি, এ রকম কখন দেখেননি। মনে মনে খুব কৌতুহল বোধ করেন গ্যালিলিও যখন তাকে ছেলেটি বললে, এরকম কখন দেখেননি!

ছেলেটি জানত না যে, সে যাঁর সঙ্গে কথা কইছে তিনি সেই বিশ্ববিখ্যাত গ্যালিলিও, আকাশ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশেষ করে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রের পরিস্থিতি গতিবিধি ও নানা তথ্য আবিষ্কার করে বৈজ্ঞানিক সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছেন।

তাই কৌতুহলবশত ছেলেটির মুখে সূর্যের কথা

শুনে বললেন, সূর্য? সূর্যের সঙ্গে যে আমার বনে না। আচ্ছা চল যাই তবু —

বলে এগিয়ে গিয়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়ে দাঁড়ালেন।

মূর্খ ছেলেটি জানত না যে সূর্য সম্বন্ধে ওই কথা বলার পিছনে কি অর্থ গোপন ছিল। সে জানত না যে এই সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে, তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং এই তথ্য প্রচার করার জন্য তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

ছেলেটি ওদিকে গড়গড় করে মুখে বলে চলেছে সূর্যের আকার কি রকম, সেখান থেকে কতদিনে আলো পৃথিবীতে আসে, সূর্য চন্দ্রের গায়ে কালো কালো কত গহ্বর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে একটার পর একটা ছবির সঙ্গে পাখিপড়ার মত শেখানো বুলি বলে সে এমনি করে জীবিকার্জন করে।

গ্যালিলিও সবই বুঝতে পারলেন তবু ছেলেটির বলার ধরণ দেখে তাঁর মনে হল, ছেলেটির এদিকে আগ্রহ আছে এবং কিছু বোঝে ও বটে।

তাই সব বলা শেষ করে ছেলেটি বললে, জানেন, আপনাকে যা বললুম, স্বয়ং গ্যালিলিওর তাই মত। তাই নাকি? তা খোকা তুমি ত দেখছি বেশ বলতে পার, এ বিষয়ে তুমি কি আরও কিছু শিখতে চাও? শিখবে তুমি লেখাপড়া?

ছেলেটি ম্লান কণ্ঠে উত্তর দিলে, খুবই ইচ্ছা করে, কিন্তু কি করে শিখব, আমরা বড় গরীব। বাবা আর খাওয়াতে পারবেন না বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কোন মতে এই ছবি দেখিয়ে যা রোজগার হয়, তার অর্দ্ধেক দিতে হয় এই ছবির বাক্সটার মালিককে।

গ্যালিলিও বললেন, তুমি যদি সত্যি সত্যি লেখাপড়া শিখতে চাও তো আমি শেখাতে পারি, তোমার একটা পয়সাও লাগবে না। যদি আমার কাছে তুমি থাক।

ছেলেটি যেন কানে ভুল শুনছে, বিশ্বাস করতে পারেনা সে কথা।

গ্যালিলিও আবার অভয় দিয়ে বলেন, কোন ভয় নেই। আমি বাজে কথা বলছি না। আমারই নাম গ্যালিলিও। ছেলেটির তখন আনন্দে দুই চোখে জল এসে পড়ে। গ্যালিলিওর কিন্তু একটুও ভুল হয়নি সেদিন। ছেলেটির সত্যি সত্যি বিদ্যানুরাগ ছিল।

তাই এই ছেলেটিই ভবিষ্যৎ জীবনে বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ্ ভিভিয়ানী ভিন্‌সেন্‌ৎসিও নামে পরিচিত হয়।

এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড

লুইস কার্ল

অনুবাদক : অশোক কুমার সেনগুপ্ত

বসন্তশশক আর টুপিওয়ালা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'তা হলে নেংটিইঁদুর বলুক।' তারপর নেংটি-ইঁদুরকে জাগানর জন্য দুজনে একসঙ্গে তাকে চিমটি কাটতে লাগল।

নেংটি ইঁদুর আস্তে আস্তে চোখ খুলল। ঘুম জড়ান গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমি ঘুমোচ্ছিলাম না। তোমরা যা বলছিলে সব শুনেছি।'

বসন্তশশক বলল, 'একটা গল্প বল।'

এলিস : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গল্প বল।'

টুপিওয়ালা : 'তাড়াতাড়ি। নয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়বে।'

নেংটিইঁদুর গড় গড় করে বলে চলল, 'সে অনেক দিনের কথা। তিন বোন—এলিস, লেসি আর টিলি। তারা একটা কুয়োর মধ্যে থাকত —'

এলিস বলল, 'কি খেয়ে থাকত ?' খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তার বরাবরই খুব আগ্রহ।

নেংটি ইঁদুর একটু ভেবে বলল, 'ঝোলাগুড়।'

এলিস বলল, 'তা কি করে হয় ? রোজ ঝোলাগুড় খেলে অসুখ করবে যে।'

নেংটিইঁদুর বলল, করেছিলই তো। তিনজনেরই খুব অসুখ করেছিল।'

এলিস কল্পনা করতে চেষ্টা করল শুধু ঝোলাগুড় খেয়ে কেমন করে থাকা যায়, কিন্তু সে ভেবে কোন কূলকিনারা পেল না। তখন সে অন্য প্রশ্ন করল, 'তারা কুয়োর মধ্যে থাকত কেন ?'

বসন্তশশক এলিসকে বলল, 'আরও একটু চা নাও।'

এলিস বিরক্ত হল। বলল, 'আরও একটু নাও মানে কি এখনও তো একটুও নিই নি।'

টুপিওয়ালা : কিছু না নিয়ে থাকলে তার কম নিতে পার না, তার বেশি তো নিতেই পার। যা নেবে কিছু-নার থেকে তাই বেশি।'

এলিস : 'তোমাকে কে ফোড়ন কাটতে বলেছে ?'

টুপিওয়ালা বিজয়ীর ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'এবার কে ব্যক্তিগত মন্তব্য করছে, এ্যাঁ ?'

এর উত্তরে কি বলা যায় এলিস ভেবে পেল না। সে একটু চা ঢেলে নিল আর সঙ্গে রুটি মাখন। তারপর নেংটি ইঁদুরকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কুয়োর মধ্যে থাকত কেন ?'

নেংটি ইঁদুর একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ওটা যে ঝোলাগুড়ের কুয়ো।'

এলিস রেগে বলল, 'দুর। তাও কখনও হয় নাকি?' কিন্তু টুপিওয়ালা আর বসন্তশশক একসঙ্গে বলে উঠল, 'চুপ, চুপ, গল্প চলুক।' নেংটিইঁদুর ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'যদি শান্তশিষ্ট হয়ে শুনতে না পার তো তুমিই গল্পের শেষটা বল, আমরা শুনি।'

এলিস নরম হয়ে বলল, 'না, না, বল। দিব্যি করে বলছি আমি আর কথা বলব না। ঝোলাগুড়ের কুয়ো একটা থাকতে পারে ধরে নিলাম।'

এবার নেংটি ইঁদুর রেগে গেল। বলল, 'একটা, একটা মানে? যাক শোন, তা তিনবোনে তো কুয়োর মধ্যে থাকত আর ছবি আঁকত —'

এলিস তার দিব্যির কথা ভুলে গিয়ে বলল, 'কি আঁকত?'

এবার নেংটি ইঁদুরকে ভাবতে হল না। ঝটপট জবাব দিল, কেন ঝোলাগুড়।'

টুপিওয়ালা বলল, 'এ কাপটা নোংরা হয়ে গিয়েছে। একটা করে চেয়ার এগিয়ে বসা যাক।'

বলতে বলতেই সে একটা চেয়ার এগিয়ে গেল। তার খালি চেয়ারটাতে এগিয়ে এসে বসল নেংটিইঁদুর আর নেংটিইঁদুরের চেয়ারে বসন্তশশক। এলিসকে এসে বসতে হল বসন্তশশকের জায়গায়। এই ব্যবস্থায় সুবিধে হল একমাত্র টুপিওয়ালারই, আর সবাইকে অন্যের এঁটো কাপপ্লেটের সামনে এসে বসতে হল। এলিসের কপালেই সব চেয়ে মন্দ, কারণ বসন্তশশক একটু আগেই দুধের জগটা তার প্লেটের উপরে উলটে ফেলেছে।

পাছে নেংটিইঁদুর আবার চটে যায় তাই এলিস বেশ সাবধানে মোলায়েম করে বলল, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে ওরা কুয়োর থেকে ঝোলাগুড় আঁকত কি করে। তুলি কোথায়?'

টুপিওয়ালা বলল, 'তুলি?' কেন, জলের কুয়ো থেকে জল তুলি না? তেমনি ঝোলাগুড়ের কুয়ো থেকে ঝোলাগুড় তুলি। এতে আর মুস্কিলটা কোথায়?'

এলিস টুপিওয়ালার কথায় কান না দিয়ে নেংটি ইঁদুরকে বলল, 'ওরা তো কুয়োর মধ্যেই ছিল?'

নেংটি ইঁদুর বলল, ছিলই তো, ঠিক মধ্যিখানে।'

এলিসের মাথা গুলিয়ে গেল, সে চুপ করে গেল।

নেংটিইঁদুর হাই তুলতে তুলতে আর চোখ ডলতে ডলতে প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলে চলল, 'তিন বোনে ছবি আঁকত। 'ম' দিয়ে যত জিনিস আছে, সব কিছুরই ছবি আঁকত —'

এলিস বলল, '"ম" দিয়ে কেন?'

বসন্তশশক বলল, 'নয়ই বা কেন?'

এলিস চুপ করে গেল।

নেংটি ইঁদুর এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। টুপিওয়ালা তাকে একটা চিমটি কাটতেই সে ধড়মড় করে উঠে বলতে লাগল, "ম" দিয়ে সব জিনিসের ছবি আঁকত — মুষিক, মেঘ, ময়ূর, মমতা, মেধা

মন। তোমরা তো খুব মন মন কর — নরম মন, বাঁকা মন, সোজা মন—কত রকম মনের কথা বল মনের ছবি কখনও দেখেছ?'

এলিস ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমতা আমতা করতে লাগল, 'মনের ছবি? মানে, আমি —'

টুপিওয়ালা বলল, 'তবে চুপ করে থাক। দেখনি তো কথা বলছ কেন?'

এই অহেতুক অশোভন ব্যবহার এলিসের সহ্য হল না, সে ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এরা সাধারণ ভদ্রতা জানে না, এখানে থাকা যায় না। নেংটিইঁদুর ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর বাকী দুজন তার চলে যাওয়াটা গ্রাহ্যই করল না। এলিস অবশ্য যেতে যেতে দু একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল, তারা আবার তাকে ডাকবে ভেবে। শেষবার যখন পিছন ফিরে তাকায় তখন দেখে তারা দুজনে মিলে নেংটি-ইঁদুরকে চায়ের কেটলিতে ঢোকানোর চেষ্টা করছে।

এলিস বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কক্ষণও আর ওখানে যাচ্ছি না। এমন বোকাদের আসর আর কখনও দেখি নি।'

বলতে বলতেই দেখে একটা গাছের গুঁড়িতে একটা দরজা। এলিস ভাবল, 'ভারি অদ্ভুত তো। তা আজ তো সবই অদ্ভুত। ভিতরে গিয়ে দেখতে হচ্ছে।' সে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল।

আবার সেই বড় হল ঘরটা আর সেই ছোট কাঁচের টেবিলটা। এলিস নিজের মনেই বলল, 'এবার আমায় ঠেকায় কে দেখি।' টেবিলের উপর থেকে ছোট সোনার চাবিটা নিয়ে বাগানে যাওয়ার ক্ষুদে দরজাটা খুলে ফেলল। সেই ব্যাঙের ছাতা সে পকেটে রেখে দিয়েছিল, এইবারে তা বের করে হিসেব করে একটুখানি খেয়ে নিজেকে এক ফুট মত করে নিল। তারপর দরজা দিয়ে সেই সুরঙ্গপথে—আর তারপরই অবশেষে সেই সুন্দর বাগানে। আঃ, কি সুন্দর। কত রঙবেরঙের বাহারী ফুল আর চারদিকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা।'

[ক্রমশঃ]

হীরামতি রাজকন্যা

ডাঃ অমিয় নাথ ব্রহ্ম

(শেষাংশ)

দুই বন্ধুতে তখন খুব দুঃখে কাঁদতে লাগল আর সিংহবাহিনীর কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল। এদিকে ভোর হয়ে এসেছে, তাদের এগিয়ে যেতে হবে। গাছে গাছে পাখিরা জেগে উঠে কিচিরমিচির করছে। মরা রাক্ষসটার সমস্ত শরীর, রক্ত মাংস চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পচা দুর্গন্ধে চারিদিক ভরে উঠেছে। রাজপুত্রেরা খুবই বিপদে পড়ল। চিন্তা করে কোন উপায় ঠিক করতে পারছিল না, কি করে মন্ত্রীপুত্রকে বাঁচান যায়।

এমন সময় দূরে ঝুম্ ঝুম্ পায়ের নুপুরের শব্দ শোনা গেল। মনে হল কে যেন এগিয়ে আসছে। একটু পরে তারা শুনতে পেল মিষ্টি গলায় কারা যেন বলছে—

রাজপুত্র কোটালপুত্র
ভাবছ কেন ভাই
কুয়োর জলে প্রাণ বাঁচবে
ছিটাও না তাই।

রাজপুত্রেরা এতক্ষণ লক্ষ্যই করে নি যে মন্দিরের পিছনে একটা ই'দারা আছে। তাড়াতাড়ি দড়ি বেঁধে চামড়ার থলিগুলো ভরে জল তুলল, দৌড়ে এসে মন্ত্রীপুত্রের গায়ে সেই জল ছিটোতেই মন্ত্রীপুত্র বেঁচে উঠল। চোখ চেয়েই বলল একটু জল দাও ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। রাজপুত্রেরা কুয়োর জল মুখে দেবে কি না ভাবছে এমন সময় আবার সেই মিষ্টি সুর—

জল দাও জল দাও
নেই কোন ভয়
রাজকন্যা হীরামতি
মিথ্যাবাদী নয়।

রাজপুত্রেরা খুব অবাক হল। কে এই মিষ্টি সুরে গান গায়? কে এই রাজকন্যা হীরামতি?

যা হোক, মন্ত্রীপুত্রকে ঐ কুয়োর জল খেতে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরেই মন্ত্রীপুত্র সুস্থ হয়ে উঠে বসল। তার শরীরে আর কোন কষ্ট নেই—উপরন্তু অনেক শক্তি বেড়ে গেছে। রাজপুত্রেরা হাতমুখ ধুয়ে সকলেই মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করে রাত্রের খাবার কিছু খেয়ে নিল, আর কুয়োর জল খেয়ে নিল পেট ভরে। তাদের শরীরও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। এবার যাত্রা। কিন্তু রাক্ষসের দেহটা কি হবে?

ওকে তো ছোঁয়া যাবে না। হঠাৎ দেখা গেল বটগাছের কয়েকটা পাতা খসে পড়ল রাক্ষসটার গায়ে আর তা থেকে বড় বড় পোকা বের হয়ে রাক্ষসটার মাংসগুলো বেমালুম খেয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে শত শত পাতা খসে পড়ল আর নিমেষের মধ্যে রাক্ষসের দেহটা যেন ভোজবাজীর মত পোকাদের মুখে মুখে মিলিয়ে গেল। রাজপুত্রেরা তো অবাক, এত বিস্ময়ও থাকতে পারে। কিন্তু কই আর তো সেই মিষ্টি শব্দ শোনা গেল না।

রাজপুত্রেরা ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হল। ঘোড়ায় উঠেই তারা আবার সেই মিষ্টি স্বর শুনতে পেল—

রাজপুত্র রাজপুত্র চল জলার ধার,
হীরামতি রাজকন্যা দেখ একবার।

রাজপুত্রেরা কিছুই দেখতে পেল না শুধু শুনতে পেল সে নুপুরের শব্দ ধীরে ধীরে বনের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পেল দুটো ব্যাঙ—একটার রং সোনার মত আর একটার রূপোর মত চলেছে লাফাতে লাফাতে।

তিন বন্ধুতে ঘোড়ার পিঠে চলেছে, ব্যাঙ যে পথ দিয়ে গেল সেই পথে। পাখির কথা মত বেশ কিছুটা জঙ্গল পার হলেই সেই ডাইনীর জলা, যেখানে আজ দিনের মধ্যে মাছ ধরে ফিরে আসতে হবে, রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে থাকা চলবে না। রাজপুত্রেরা তাই ঘোড়া চালিয়ে দিল জোরে। কিন্তু জঙ্গল ভীষণ ঘন। বড় বড় গাছ আর বেতের ঝাড়, জায়গায় জায়গায় সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢোকে না। গভীর জঙ্গলে কত বড় বড় সাপ গাছের ডালে জড়িয়ে রয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ যেতে দেখতে পেল খানিকটা ফাঁকা মাঠ, আর তার শেষেই সেই জলা যার মিশকালো জল সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে পাড়ের দিকে।

রাজপুত্রেরা জলার ধারে এসে দাঁড়ায়। সোনার ছিপ, আর সোনার সুতোয় সোনার আংটি বেঁধে ফেলতে যাবে এমন সময় আবার সেই ঝুমঝুম শব্দ। রাজপুত্রেরা কান পেতে শোনে মিষ্টি সুরের ছড়া—

রাজপুত্র রাজপুত্র এমন করে নয়
দক্ষিণ কোনে হীরামতি রাজকন্যা রয়।
জলে হাত দিও না
মাছ যেন ছুঁয়ো না।
মাছের লেজে হীরের আংটি
জলে ফেলে দাও—
ডাইনীবুড়ি মরলে তবে
রাজকন্যা নাও।

রাজপুত্র বুঝতে পারে নিশ্চয়ই এ কোন বন্ধুর উপদেশ। তাছাড়া হীরামনও তাকে একই কথা বলেছিল। জলের ধারে দেখা যায় সেই ছুটো ব্যাঙ, সোনার মত আর রূপোর মত যাদের গায়ের রং।

রাজপুত্র দীঘির দক্ষিণ কোনায় এসে সোনার ছিপে সোনার সুতো আর সোনার আংটি বেঁধে যেই দীঘির জলে ফেলেছে অমনি চারিদিকে ভীষণ শব্দ ওঠে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। দীঘির জলে ওঠে বিরাট বিরাট ঢেউ আর তা রাজপুত্রের দিকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাড়ে, কিন্তু রাজপুত্র জল ছুঁলেই বিপদ, তাই দূরে দূরে থাকে। হঠাৎ দেখা যায় সুতোয় টান পড়েছে। রাজপুত্র আস্তে আস্তে টেনে তুলতে থাকে। জল থেকে উঠে আসে একটা কাতলা মাছ—আংটি কামড়ে ধরে। রাজপুত্র ঠিক ঠিক তাকে তুলে আনে ডাঙায়।

অদ্ভুত সুন্দর কাতলা মাছ। নাকে নোলক। গলায় মুক্তোর মালা। লেজের দিকটা যেন সোনার ঝালর দিয়ে মোড়া। চোখ ছুটো অপরূপ; মুখখানা যেন ছোট মেয়ের মত। দীঘির জল লাফিয়ে উঠে মাছটাকে আটকাতে চেষ্টা করে। জলের মধ্যে থেকে ধক্ ধক্ করে আগুনের হল্কা উঠে পাড়ের দিকে ছুটে আসতে থাকে। এদিকে রাজপুত্র অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই সুন্দর মাছটার দিকে, ভুলে যায় মাছের লেজের দিকটা কেটে ফেলতে। আগুন যখন প্রায় পাড়ের কাছে এসেছে তখন রাজপুত্রের হুঁশ হয়। তাড়াতাড়ি খাপ থেকে তলোয়ার বের করে মাছটার লেজের দিকটা এক কোপে কেটে ফেলে। একটা কাতরানির শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রাজপুত্র বাঁচাও, বাঁচাও। মাছটার লেজের দিকে কি যেন একটা জ্বলজ্বল করছে, আর শব্দটাও সেখান থেকে আসছে। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি মাছের কাটা লেজটাতে হাত দিতে যায় কিন্তু মন্ত্রীপুত্র তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে টেনে নেয়। এদিকে তখন আগুনের ঝলক প্রায় মাছের গায়ের কাছে এসে গেছে। কোটালপুত্র তাড়াতাড়ি তার তলোয়ার দিয়ে কাটা লেজটা দীঘির জলে ফেলে দেয়।

একটা যাদুমন্ত্রে যেন সমস্ত দীঘিটা শান্ত হয়ে যায়, আগুনের ঝলক মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই।

সবচাইতে আশ্চর্য কাতলা মাছটা ছেড়ে বেরিয়ে আসে এক অপরূপ কন্যা। নাকে হীরের নোলক, কানে হীরের দুল, সোনার মত রং আর, মেঘের মত কালো চুল। ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট কাঁপিয়ে বলে— আমি হীরামতি, ডাইনীর যাদুতে মাছ হয়ে ছিলাম। আমার দুই সখী সোনা আর রূপো ব্যাঙ হয়ে কত দিন এই জলে আটকে রয়েছে। তারপর রাজপুত্রদের প্রণাম জানায়। দেখা যায় ঝুমঝুম শব্দ করতে করতে দুই দেবকন্যার মত মেয়ে জল থেকে উঠে আসছে। পায়ে তাদের রূপোর ঝুমুর, গলায় মুক্তোর মালা, কানে সোনার দুল।

রাজপুত্রেরা সকলেই চেয়ে থাকে অবাক বিস্ময়ে। দীঘির জলে সূর্যের আলো পড়ে ঢেউগুলো রূপোর মত চিক চিক করছে, তারা যেন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এদিকে বেলা হয়ে যেতে থাকে। রাজপুত্রদের সন্ধ্যার আগেই পার হয়ে যেতে হবে ঐ গভীর জঙ্গল। রাজপুত্রের ঘোড়ায় তিন কন্যা উঠে বসে। রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র একটা ঘোড়ায় চাপে। কোটালপুত্রের ঘোড়ায় মালপত্র তুলে নিয়ে সকলে জোরে ফিরতে থাকে। দুপুরের পর জঙ্গল পার হয়ে সকলে সেই পোড়ো শিবমন্দির আর বিরাট বটগাছের তলায় এসে পৌঁছয়। তারা সকলেই ক্লান্ত তাই এখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। রাজপুত্রেরা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াদের ছেড়ে দেয়। মন্দিরের দালানে তারা বিশ্রাম করতে থাকে। রাজকন্যারা কুয়োর জলে স্নান সেরে মন্দিরে পূজো দিতে যায়। মন্দিরের কত দিনের পুরনো ঘণ্টা হঠাৎ বাজতে শুরু হয়ে যায়। রাজকন্যারা ভক্তিভরে পূজো করে শিবের মাথায় কুয়োর জল ঢালতে থাকে আর সেই জল মন্দিরের পিছনে দিকে জঙ্গলে যত গড়িয়ে যেতে থাকে দেখা যায় এক একটা গাছ থেকে এক এক জন রাজপুরুষ বেরিয়ে আসতে থাকেন। শেষে রাজকন্যারা একটা থলি করে জল এনে বটগাছটার গায়ে ছড়িয়ে দিতেই দেখা যায় বৃদ্ধ রাজা ও রাণীমা বেরিয়ে আসছেন সঙ্গে অগনিত সৈন্য সামন্ত। রাজকন্যারা চিনতে পারে তাদের বাবা মা ও অসংখ্য আত্মীয় স্বজনকে। তারা সকলকে প্রণাম করে। রাজা ও রাণী তাঁদের কন্যাদের বুকে জড়িয়ে ধরেন, রাজপুত্রদের স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করেন।

সেই এক অপরূপ দৃশ্য। চারিদিকে শুধু আনন্দের মেলা। সারা বেলা শিব মন্দিরে সকলে পূজো করে সন্ধ্যার আগেই রাজপুত্রেরা সকলকে নিয়ে রওনা হয় বাড়ির দিকে। এবার আর বিপদ নেই। জঙ্গল পার হয়ে তারা ডাইনীর রাজত্বের বাইরে চলে এসেছে। সারা রাত চলে ভোরবেলায় রাজপুরীর সিংহ-দ্বারে এসে পৌঁছয়। রাজ প্রহরীরা সসম্মানে রাজপুত্রদের দ্বার খুলে দেয়।

রাজপুত্রেরা সকলকে নিয়ে সিংহবাহিনীর মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। মন্দিরে দুই রাণীমা সোনার থালায় দেবী সিংহবাহিনীর পূজো সেরে ফিরতে গিয়ে রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের দেখে খুব খুশি হলেন। তাঁরা রাজকন্যাদের আর অন্য সকল মেয়েদের নিয়ে যান অন্দর মহলে। রাজমন্ত্রী, কোটাল এসে সকল অতিথিদের নিয়ে যান রাজপুরীর বিশ্রাম কক্ষে, সেখানে মহারাজা এসে বৃদ্ধ রাজাকে

আলিঙ্গন করলেন, সকল আত্মীয় স্বজন সৈন্য সামন্তদের নমস্কার জানিয়ে পরিচর্যার সকল ব্যাবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

রাজপুত্র তার নিজের মহলে গিয়ে হীরামনকে আদর করে জিজ্ঞেস করে—হীরামন বল দেখি রাজকন্যা হীরামতি দেখতে কেমন?

হীরামন বলে — সোনার প্রতিমা, হাসলে সব দুঃখ ভুলে যেতে হয়, কাঁদলে পাষাণ গলে যায়। দাদু এইটুকু বলে থেমে যান। দুষ্টু দাদা বলে, — বল না দাদু তারপর কি হল?

দাদু মিষ্টি দিদির মুখের দিকে তাকান। মিষ্টি দিদি বলে, — হীরামতির বিয়ে হল রাজপুত্রের সঙ্গে আর সোনা রূপোর বিয়ে হল মন্ত্রীপুত্র আর কোটাল পুত্রের সঙ্গে।

দাদু বলেন, হ্যাঁ ঠিক বলেছ। রাজামশাই মন্ত্রী-আর কোটাল তাঁদের ছেলেদের বিয়ে দিলেন খুব ধুমধাম করে। কত গরীব লোকদের দান করা হল হাজার হাজার টাকা। বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হল। রাজারাণী আর হীরামতি রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল। একমাস ধরে সমস্ত রাজ্য জুড়ে উৎসব চলল। মহারাজা হীরামতি রাজকন্যার বাবাকে তাঁর রাজত্ব আবার সুন্দর করে গড়ে দিলেন। হীরামতি এখন যুবরাণী। তিনি বৃদ্ধ রাজার কাছে আব্দার করে সমস্ত প্রজাদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে লাগলেন। এতে সকলেই খুব খুশি হল। তোমরাও খুব খুশি তো?

প্রার্থনা

বাসব চট্টোপাধ্যায় (সভ্য, সিনিয়র)

হে মহামানব, শান্তির বাণী প্রচার করেছ সারা বিশ্বে,
স্নেহধারা বর্ষণ করেছ সবার উদ্দেশে।
পুষ্প সম নিজেরে সঁপি দিয়ে জনগণের সেবায়,
বিনিময়ে চাওনি কিছুই, কিন্তু আমরা হায়।
ক্রুশবিদ্ধ করে,
চেয়েছি তোমায় মারতে।
তখন তো বুঝিনি অমৃত সুধা আছে তোমার কাছে
তাই তো এখন অমর হয়ে বিরাজ করছ আমাদের মাঝে।
ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলছ মনের মাঝারে
তাই তো স্মরণ করছি খ্রীষ্ট-মাস দিনটিরে।
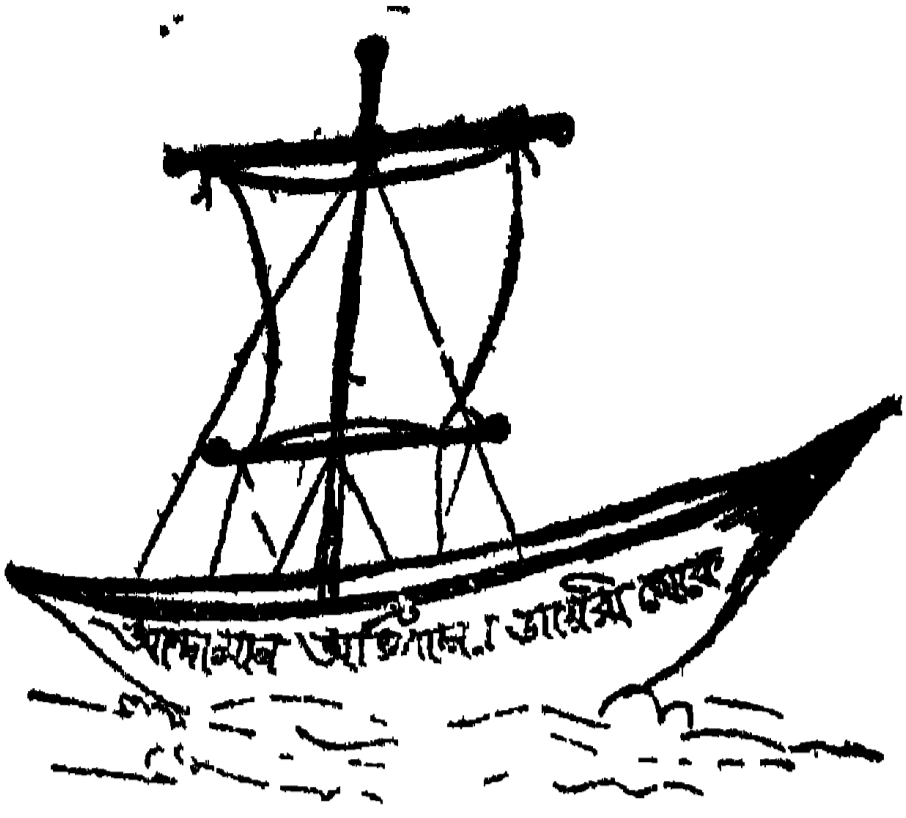
পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা থেকে সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত গঙ্গা গেছে এঁকেবেঁকে, গভীরতাও খুব কম। কলকাতা পোর্ট কমিশনের সার্ভেশিপ আর ড্রেজার যা সব সময় মাপজোপ করে, কেটে কুটে পথ করে রাখে, আর পোর্টের ক্যাপটেনরা সেই হিসেব করে জাহাজ নিয়ে যান। পৃথিবীর সমস্ত পোর্টে ঢুকতে হলে সেই পোর্টের রিভার পাইলট বা পোর্ট পাইলট দরকার লাগে। এটা পৃথিবীর জাহাজী জগতের আইন। পাইলটদের দায়িত্ব কিন্তু নদীর মোহনায় গিয়েই শেষ হয় না। মোহনার জল খুবই অগভীর। তাই গভীর সমুদ্রে বরাবর পৌঁছে তবেই কাজ শেষ। গভীর সমুদ্র শুরু হয় মোহনা থেকে, আর ৩০ মাইল ভেতরের জায়গাটাকে বলা হয় স্যাণ্ড হেডস্। ওখানে নোঙর করা থাকে পোর্টের একটা জাহাজ, যার নাম পাইলট ভেসেল, যার কাজ পোর্ট থেকে যে সব জাহাজ আসে তার পাইলটদের স্যাণ্ডস্ হেডসে্ পৌঁছোবার পর পাইলট ভেসেল থেকে মোটর বোট পাঠিয়ে পাইলটদের নিয়ে আসা হয় পাইলট শিপে, আবার যখন অন্য জাহাজ আসে, পাইলটদের উঠিয়ে দেওয়া হয় সেই জাহাজে। তাঁরা সেই জাহাজ নিয়ে আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। দিনরাত্রি সারা বছর ধরে চলেছে ওদের কাজ শৃঙ্খলা আর সাগরের পটভূমিকায়।

আমাকে নিয়ে ক্যাপটেন দেশমুখ হাজির করলেন জাহাজের চূড়ায়। যন্ত্রপাতি ভরা ঘরটায় ঢুকতেই বুঝলাম যে এটা নিশ্চয়ই জাহাজ চালানোর ঘর হবে। এটা আমার কাছে এক নতুন জগৎ। যা দেখতে পাচ্ছি তাই আদেখেলার মত দেখছি। মনে হচ্ছে বয়সটা বুঝি অনেক কমে গেছে। জাহাজ চালাবার ঘর বা জাহাজের ব্রিজ থেকে তখন দেখছি ক্যাপটেন দেশমুখ দূরে তাকিয়ে কি সব লক্ষ্য করছেন আর সমানে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন, পোর্ট ৩০, স্টারবোর্ড ১০, মিডশিপস্ স্টেডি হাফ —এ হেড···। কিন্তু কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়।

গঙ্গার হলুদ জল কেটে জাহাজ চলেছে এগিয়ে। আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম। এতদিন ধরে গঙ্গার সাজানো বয়াগুলোর সম্বন্ধে অহেতুক একটা বিতৃষ্ণা পোষণ করতাম, এখন বুঝলাম জলের ওপর ওদের সাজিয়ে রাখা হয়েছে চিহ্ন হিসাবে। গঙ্গার অভ্যন্তরে গভীর অংশের হদিস পাইলটরা ঠিক করেন, আর সেই ভাবে এঁকে বেঁকে জাহাজ চালান হয়। এদের হিসেবের এক চুল ভুলের সাক্ষী রয়েছে উলুবেড়িয়ার কাছে। বিরাট বড় একটা জাহাজকে মনে হবে যেন কে গেঁথে দিয়েছে গঙ্গার গায়ে। ক্যাপটেন দেশমুখ বলেছিলেন যে একটু ভুল হলেই এই বিরাট বড় জাহাজটা গিয়ে ধাক্কা খাবে জলের তলায় লুকনো বালির চরে, আর তারপর।

আমার জীবনে এই প্রথম জাহাজ চড়া, আমি

ঘুরে ফিরে দেখতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলাম জাহাজের ছাদটা জলের সীমানা থেকে অনেক উঁচুতে। কাঁচা রোদে শীতেরবেলায় হু হু করে হাওয়া বইছে চারধার থেকে। ক্যাপটেন দেশমুখ দেখতে পেয়ে কাছে ডাকেন, খিদে পেয়েছে কিনা প্রশ্ন করলেন এবং কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। এইসব জাহাজে খাবার ঘরের ফ্রিজে খাবার থাকে, যে যতটা পারে বার করে নিয়ে খেয়ে নেয়, কেউ খাবার সাজিয়ে দেয় না, বা বেশি খেলে অভিযোগ করে না।

খেয়ে দেয়ে দুপুরের দিকে একটু খানি জায়গায় এককালি বিছানা পেয়ে মেজাজে ঘুম দিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল গড়িয়ে চলেছে। 'মিড্‌শিপ্‌স স্টারবোর্ড ৩০' সমানে চেঁচিয়ে চলেছেন দেশমুখ সাহেব। মনে মনে বললাম, 'পারেও বাবা।'

সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা ছেড়ে ছিলাম, এখন প্রায় বিকেল পাঁচটা, এখন আরও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা লাগবে স্যাণ্ডহেডস-এ পৌঁছুতে। গঙ্গা এখানে দু'ধারে অনেকদূর অবধি বিস্তৃত। মাঝে মাঝে জেলে ডিঙি চোখে পড়ে, আর বাদবাকি নিঃসঙ্গ শূন্যতা। দাঁড়িয়ে আছি ছাদে। অন্ধকার গড়িয়ে এল। সাদা পোশাক পরা মানুষটাকে দেখে জাহাজী পাইলটদের সম্বন্ধে একটা আগন্তুক সমবেদনার ভাব মনে মনে আমায় ঘিরে ধরল। এলোমেলো ভাবতে ভাবতে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ বাদে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে হঠাৎ কেমন যেন গাটা শিরশির করে উঠল, এত কালো আর এতবড় যে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, তবে কি সাগরে এসে গেছি? দেশমুখ সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলাম, কোথায় আছি জানতে। রাতের অন্ধকারে পথ নির্দেশ করছে লাইট হাউস থেকে বিভিন্ন রঙের আলো জ্বেলে। ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে ক্যাপটেন সাহেব বললেন, আমরা এখন আপার গ্যাসপার লাইট হাউসের কাছাকাছি আছি, স্যাণ্ডহেডস আসতে এখন কিছু দেরি।

তারারা জ্বলছে অনেক ওপরে, আর চারদিকে ধু ধু করছে অন্ধকার—দাঁড়িয়েছিলাম আপার ডেক-এর বারান্দার রেলিং ঘেঁসে। অনেক নিচে সাদা ফেনার রাশে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে যাচ্ছে পেছনে। একবার যদি এই রেলিং ডিঙিয়ে ওখানে গিয়ে পড়ি। কল্পনা থমকে যায়। সামনের দিকে অনেক দূরে মনে হল যেন অন্ধকারটা একটু ফিকে। দেশমুখ সাহেব বেরিয়ে এলেন ব্রিজ থেকে, জানালেন যে স্যাণ্ডহেডস আসছে। ক্রমশ অন্ধকারের ভেতর ফুটে উঠল আলোর রেখা। পাইলট ভেসেল জাহাজের গতি কমে এল, তারপর থেমে গেল জাহাজ। এতক্ষণ জাহাজের ইঞ্জিনের আওয়াজে সমুদ্রকে শুনতে পাইনি। এখন কান ভরে গেল সেই রহস্যময় ছন্দে। দেশমুখ সাহেব এবার বেরিয়ে এলেন হাতে ব্যাগ নিয়ে, আমরা নিচে নেমে পড়লাম। পাইলট ভেসেল-এর দিকে একটা মোটর বোটের আওয়াজ ভেসে এল, ক্রমশ বাড়তে লাগল সেই আওয়াজ। তারপর মোটর বোট এসে দাঁড়াল জাহাজের গা ঘেঁসে অনেক নীচে। দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। জাহাজের সার্চ লাইট জ্বলে উঠল। সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করলাম। ভয় নয়, একটা ফিকে দুশ্চিন্তা আমার মনের ভেতরে, যদি হাত ফসকে নিচের কালো জলে পড়ি? ভাবতে ভাবতে আরও

নীচে এসে গেলাম, এবার দেখতে পেলাম ভাল করে মোটর বোটটাকে। বড় বড় ঢেউ একবার আকাশের দিকে ছোঁ মেরে উঠছে তারপর আছাড় খেয়ে পড়ছে নীচে। এবার নিশ্চিন্ত হলাম। ঠিকমত যদি একবার পা কষিয়ে বোটের মাঝখানে গিয়ে না দাঁড়াতে পারি, নির্ঘাৎ অতলে। এক সময় সেই মুহূর্ত এল, চোখ বন্ধ করে নিজেকে সঁপে দিলাম সেই খামখেয়ালী নাগর দোলাটায়। দেশমুখ সাহেবের সাড়া পেলাম, সাবাশ, আজ তো সমুদ্র শান্ত, যখন ঝোড়ো হাওয়া থাকে, তখন সত্যি খুব মুস্কিল হয়। মাঝ সমুদ্রে 'আংরেজে' চলার আগেই আংরের মত ছোট মোটর বোটেই হল চাপতে। আমরা ঢেউ ভেঙে চললাম পাইলট ভেসেলের দিকে। লোয়ার ডেক ঘেঁসেই মোটর এসে দাঁড়াল, আবার সেই দোলা, আবার লাফ। যাত্রা শেষ হল। আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে দেশমুখ সাহেব চলে গেলেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কেবিনের দিকে। আমাকেও নিয়ে গেলেন, আলাপ হল আমারই বয়সী এক অফিসার মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে।

(চলবে)

বেচারা কাক

তরুণ সাহা

চড়াই করে কিচির মিচির
কাক করে কা-কা,
কাকের বাসায় জন্ম নিল
কোকিলের এক ছা।
বোকা কাক ভাবল মনে
এই বুঝি তার ছানা,
বড় করে তুলল তাকে
খাইয়ে নানান খানা।

পরের ছানার জন্য কাক
কষ্ট অনেক করে,
কোকিলের মা মনের সুখে
এদিক ওদিক ঘোরে।
কাকের বাসায় কোকিল ছানা
যেই না হল বড়,
কোকিলের মা, বাবা এসে
সেথায় হল জড়।
নিয়ে গেল তাদের ছানা
কাকের বাসা থেকে,
বেচারা কাকের প্রাণটা গেল
কা-কা করে ডেকে।
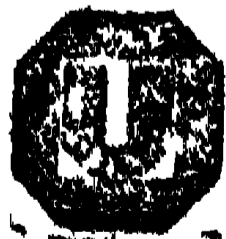
বিহারে বিহার

আশিস চট্টোপাধ্যায় (সভ্য, সিনিয়র)

পুজোর ছুটি কাটবে কোথা ভাবছি দিবারাত্রি
অবশেষে সবাই হ'লাম মধুপুরের যাত্রী।
বাড়ি ঠিক, টিকিট করা, সবই সারা হল,
একশ' টাকা হাত খরচাও আগাম এসে গেল।
উল্টোডাঙ্গার ফার্স্ট ট্রেনে সবচেয়ে ফাষ্ট এসে,
রিজার্ভ করা সীটগুলোকে দখল করি শেষে।
বড়রা কেউ সঙ্গে নেই, আছে তাঁদের আশিস্,—
"নির্বিঘ্নে আবার যেন, তোরা ফিরে আসিস্।"
কলকাতাকে জানিয়ে বিদায় ট্রেন চলল ছুটে,
হঠাৎ দেখি কখন যেন সূর্য গেছে উঠে।
দুই ধারেতে সবুজ মাঠ মাঝে পাতা রেল,
(মোদের) সাথে খাওয়া, গল্প আর গাড়ির হুইসেল।
চিন্তা নেই পড়াশুনার, পাশ করি বা ফেল,
চিন্তা ছোটে বিহার পানে যেমন ছোটে মেল।
দুপুর গড়ায় বেলা বাড়ে আর বাড়ে উৎসাহ,
আমরা দশ, হাসির রস, আর সাথে নেই কেহ।
'জ্যোতির্ময়ী'তে উঠি যখন, জ্যোতি তখন নেই,
দোষ দেব আর কাকে ? হেথায় জ্যোতিবাবু নেই।
লোডশেডিং এর প্রকোপ দেখে অবাক হলাম যেই,
এক নিমেষেই আলো এল, পর নিমেষেই নেই।
কোথায় হাট কোথায় বাজার যাচ্ছি পায়ে হেঁটে—
ফিরছি আবার সবাই মিলে মজায় টাঙ্গায় উঠে।
ছুটছে ঘোড়া খট্, খটাখট্, উড়ছে পথের ধুলো ;
থামল গেটে, অপেক্ষমান যেথায় 'জিমি, হুলো।'

বিকেল বেলার টিফিন সেরে ঘুরতে যখন যাই,
তাকিয়ে দেখি পশ্চিমেতে সূর্য ডোবে ভাই।
আঁধার নেমে আসার আগেই সূর্য গেল ডুবে—
সন্দেহ হয়, আবার কি সে, উঠবে ভোরে পুবে!
সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে 'ডায়েরী' লেখার ধূম
খাওয়ার শেষে গল্পগুজব তার পরেতে ঘুম।
কথায় কথায় উঠল কথা দেওঘরেতে যাব
'মধুপুরে' টিকিট, গাড়ি, সবই ঠিক পাব।
প্রথমে যোসিডি গিয়ে বদলী করে গাড়ি
যা হোক করে পৌঁছে যাব সেথায় তাড়াতাড়ি।
পরদিনেতেই রওনা হ'লাম আগের কথা মত
মোদের মতই 'বৈদ্যনাথে' যাচ্ছে যে লোক কত।
কারও সাথে বাপ মা আছে, কারও কাঁধে বাঁক—
মোদের সাথে কেউ নেই তাই করছি যে হাঁকডাক।
টাঙ্গায় করে ঘুরে এলাম বৈদ্যনাথের ধাম
যা দেখেছি মনে আছে সব কিছুরই নাম।
ন'লক্ষা মন্দির দেখে, গেলাম তপোবন
আশ্রম আর "জ্যোতিন্দ্র স্মৃতি ভবন"।
কুণ্ডেশ্বরী মন্দির দেখার পরে, রইল শুধু বাকী
চিত্রকূটের পাহাড়, শুনি, দেখার মত নাকি!
বৈদ্যনাথ মন্দিরের দ্বার, বন্ধ মোদের কাছে
পুজো দিলে 'বৈদ্যনাথে' তবেই খোলা আছে।
পাণ্ডাগুলো বৃদ্ধ হ'লেও বুদ্ধু স'বে যেজায়
"পূজো দেবার সাথে নাকি ভক্তি যুক্ত হেথায়।"
বুদ্ধু মার্কা পাণ্ডা সনে বচসায় নেই কাজ—
তার চেয়ে বরং চলরে সবাই প্যাঁড়া কিনি আজ।
যদিও আজ করছি স্বীকার প্যাঁড়া কেনার চেয়ে
মজা আছে অনেক বেশি, চাখতে গিয়ে খেয়ে।
এমনি করে সাঙ্গ হল বৈদ্যনাথে ঘোরা
খরচা হ'ল খাবার খেয়ে, দিয়ে টাঙ্গা ভাড়া।

কাটছিল সব দিনগুলো ভাই, আনন্দ আর সুখে
ষষ্ঠীর দিন ফিরব ব'লে মন ভরল দুঃখে।

(ট্রেনে) জানলা-ধারে বসা নিয়ে ঝামেলার নেই শেষ
জানলা-ধারে বসতে মজা, আনন্দ অশেষ।
ছোট্ট ছোট্ট স্টেশন কত পেরিয়ে গেল গাড়ি
দুই ধারেতে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে টিলার সারি।
'চিত্তরঞ্জন', 'বিদ্যাসাগর' গড়া যাঁদের নামে
তাদের কথা মনে পড়ে যখন গাড়ি থামে।
'আসানসোল' আর 'রাণীগঞ্জ' নাম ভূগোল বইয়ে পড়া
আজকে এরা সত্যিকারের পড়ল চোখে ধরা।
দুর্গাপুরের দুগেগাঠাকুর দেখতে নারাজ মন
তার চেয়ে হেথায় দেখার মত শিল্প-উন্নয়ন।
বিধান রায়ের স্বপ্ন বুঝি সফল হেথায় আজ—
উপায় নেই ঘুরে দেখার, এ যে পথের মাঝ!
যাওয়ার সময় দিন ছিল, আর ফেরার সময় রাত
আসা-যাওয়ার বহিঃদৃশ্যের অনেক তফাৎ।
ট্রেনের মৃদু ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা আসে চোখে
তন্দ্রা ভেঙ্গে মন ভরে যায় আকাশ, মাটি দেখে।
হাওড়াতে ভাই পৌঁছে গেলাম পরদিন সকালে
পুজোর টানে মধুর দেশ ছাড়লাম অকালে।

এমন একজন ব্যক্তির নামের সঙ্গে তোমরা পরিচিত হও, যিনি অন্ধ হয়েও পর্বত অভিযানে ও টেনিস খেলায় অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন—তাঁর নাম স্যার ফ্রেন্সিস জোসেফ কেলবেন। এই অন্ধ মানুষটি ভাগ্যের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে একে একে জয় করেছিলেন মণ্ট ব্যাঙ্ক, এঞ্জার জাংফ্রু ও মেটারর পর্বত শৃংগ। আর দক্ষ টেনিসিয়ান হিসেবে তাঁকে একবার সম্মানিত হয়েছিল নাইট উপাধিতে ভূষিত করে।

ভারতের চিত্রকলা

রাষ্ট্রকূট-পল্লব-পাণ্ড্য

অহিভূষণ মালিক

অজন্তার মত ইলোরাও দাক্ষিণাত্যের একটি ছোট্ট গ্রাম। ছোট্ট হলেও গ্রামটি বিশ্ববিখ্যাত, কারণ পাহাড় কেটে এখানে কৈলাসনাথের বিরাট মন্দির গড়া হয়েছে। কারুকার্যই শুধু নয়, মন্দিরের স্থাপত্য শিল্প এত উচ্চাঙ্গের যে আধুনিকতম স্থপতিরাও এর ইঞ্জিনিয়ারিং দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। শুধুই কী পাথর খোদাই আর স্থাপত্যের মুন্সিয়ানা? ভিতরের দেয়ালে আছে রঙবেরঙের চিত্রকলা। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ ছবি বিশেষ নজরে পড়ে না। মাথার সিলিং আর দেব দেবীর চারপাশের ঠাকুর দেবতা, পশুপক্ষী আর ফুল লতাপাতার বাহারে ঠাসা। একটি সুন্দর নটরাজরূপ দেখা যায়। বাদামিগুহার নটরাজের সঙ্গে তুলনা করলে রাষ্ট্রকূটদের এই কৈলাসনাথের মন্দিরের নটরাজকে কিছু কম মনে হবে না। নটরাজ নাচছেন সেই 'চতুর' ভঙ্গিমায়, যে ভঙ্গিমায় বাদামিতে ইন্দ্রের সভায় ভরতকে নাচতে দেখা গেছে। ইতিহাস বলে—খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতকে ঘটে চালুক্য রাজত্বের অবসান এবং ঐ শতকেই রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গা আধিপত্য বিস্তার করেন দাক্ষিণাত্যের বেশ কিছু অংশে। দন্তিদুর্গার কাকা প্রথম কৃষ্ণ। ইনি দন্তিদুর্গার মত অত দুর্দান্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু তার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে, তিনি হলেন কৈলাসনাথ মন্দিরের নির্মাতা।

কৈলাসনাথ মন্দির বাস্তবিকই স্বয়ম্ভর শিবের উপযুক্ত বাসগৃহ। যে স্থপতির ওপর এই মন্দির গড়ার ভার পড়েছিল তিনি নিজেই বলেছেন, 'জানি না কেমন করে এমন মন্দির বানালাম।' বুঝতেই পারছ পাহাড় কেটে মস্ত মন্দির বার করা কী চাট্টিখানিক কথা! ইতালীর ভাস্কর শ্রেষ্ঠ মিকেলাঞ্জেলো বলতেন, 'পাথরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে মূর্তি, ঐ মূর্তিকে মুক্ত করাই হল ভাস্কর্য।' সুতরাং যদি বলা হয় ইলোরার পুরো মন্দিরটাই একটি ভাস্কর্য, নিশ্চয় ভুল বলা হবে না। ইলোরার অনেক আগে কাঞ্চিপুরমে পট্টড়কল মন্দিরও তৈরি হয়েছিল পাহাড় কেটে। এ থেকে প্রমাণ হয়, কাঞ্চিপুরমের পূর্বতন শাসকদের পরাজিত করলেও রাজা কৃষ্ণকাঞ্চির আরটকে আদৌ হেয় করার চেষ্টা করেননি, বরং ভক্ত হয়ে তার পুনরাবৃত্তিই করেছেন। ফরাসী অধ্যাপক যুভো দুবরেই ইলোরা আর কাঞ্চির দুই শিবমন্দিরের একই রকম কারু-কার্য দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ইলোরার শিল্পীরা নিশ্চয় কাঞ্চির শিল্পীদের গুরু বলে ধরে নেন। কাঞ্চির মন্দিরে ছবি আছে সেকথা আগে কেউ জানত না, কিন্তু দুবরে সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কাঞ্চির মন্দিরের ইলোরার মত ছবি পাওয়া যাবে। দেয়ালের ঝুল-কালি নোংরা ভাল-ভাবে পরিষ্কার হবার পর দেখা গেল সত্যিই মস্ত মস্ত ছবি ঢাকা পড়েছিল এতকাল। সে সব রচনার, দুঃখের বিষয়, মর্ম উদ্ধার করা মুস্কিল—খুব চোট খাওয়া ছবি।

ইলোরায় মূল প্রভাব পড়েছিল চালুক্য আরটের,

একটু মন দিয়ে দেখলেই তা ধরা পড়ে। যেমন—বিদ্যাধরেরা তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আকাশে উড়ছেন, এপাশে ওপাশে মেঘ,—বাদামিতেও আছে আবার ইলোরাতেও আছে। বর্ণের আসঞ্জন, কালোবরণ রূপেব পাশে গৌব বরণের উপস্থাপনা বিদ্যাধরদের ওড়ার ঢং ইত্যাদি ইলোরায় যা দেখা যায় তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে রাষ্ট্রকূট শিল্পীদের আদর্শ ছিল বাদামির ছবি। গরুড়ের পিঠে চেপে চলেছেন লক্ষ্মী ও নারায়ণ, লক্ষ্মী নারায়ণের সূচাল নাক আব অদ্ভুত একবকম চোখ। স্টাইলটি দেখা যায় ১৪।১৫ শতকের গুজবাটি কলাকৌশলে ঢুকে পড়েছে। রাষ্ট্রকূটেবা ঐ স্টাইল কোথা থেকে পেয়েছিলেন বলা যাবে না। হতে পারে ও স্টাইল রাষ্ট্রকূটদের নিজস্ব সৃষ্টি। কাজের মধ্যে, সেকালেব শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার নির্দেশ ছিল না। পূর্বসূরীরা যে নিয়মে কাজ করে গেছেন সেই নিয়মেই মেনে চলতে হত। বিষয়বস্তুও এক হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। কোনও ধর্মীয় কাহিনী কিংবা বিশ্বাস যা ওপরওয়ালা আঁকতে বলবেন তাইইতো আঁকতে হবে শিল্পীকে। আব ক্রিয়াকৌশল এবং ব্যাকরণ অজন্তাব সঙ্গে বাদামিব যেমন মিল, বাদামিব সঙ্গে কাঞ্চির মিল, কাঞ্চির সঙ্গে ইলোরার মিল, এইভাবেই এককাল থেকে অন্যকালে চলে এসেছে।

দক্ষিণ ভারত কিছু কম বড় জায়গা নয়, সবটাই এক রাজার বা এক রাজবংশের অধীনে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। ছোট ছোট অনেক রাজত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন রাজার শাসনে। একটা ব্যাপারে ঐ রাজাদের চরিত্রে ছিল অভিন্নতা; গানবাজনা; ছবি আঁকা, মূর্তিগড়া প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের অনুরাগী আর সমঝদার হিসেবে সবাই বিখ্যাত। কেউ হয়ত এসে বললেন, তিনি অন্য রাজ্যে দেখে এসেছেন অপূর্ব এক মন্দিব, স্থাপত্য, ক্রিয়াকৌশলে আর কারুকার্যে অমন মন্দিরের দোসর মেলা কঠিন। এ রাজ্যের রাজা মশাইয়ের কানে গেল কথাটা, তিনি কী এ হার স্বীকাব কবে বসে থাকবেন? কিছুতেই নয়, ডাক পড়ল সেবা সব শিল্পীদের। তারা ভিন্ দেশীয় হলেও আপত্তি নেই, এ রাজ্যেও দারুণ একটা কিছু বানাতে হবে। গড়ে উঠল আরেকটি চোখ জুড়ান মন্দিব। এই-ভাবে মন্দিরে মন্দিরে ভরে গেল সারা দাক্ষিণাত্য।

রাষ্ট্রকূটদের একশ বছব আগে থেকে পল্লবদেব রাজত্ব শুরু হয়। পল্লবদের রাজত্বকাল ৭ থেকে ৯ শতক পর্যন্ত আর রাষ্ট্রকূটদের ৮ থেকে ১০ শতক। ৮ শতকে একদিকে যেমন বাষ্ট্রকূটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইলোবাব চারুকলার বিস্তার হচ্ছিল, তেমনি অন্য দিকে কাঞ্চিতে পল্লবরাও তাদের অনুগত শিল্পীদের কাজে লাগিয়ে মস্ত মস্ত সুকুমার শিল্প সৃষ্টি করে চলেছিলেন। কাঞ্চিপুরমের শিব মন্দির তৈরি হয়েছিল ৭ শতকের একেবারে শেষে। ইলোরার মন্দির যে ঐ কাঞ্চির মন্দিরেব পাল্টা জবাব সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

তামিলনদ অঞ্চলে পাহাড় কেটে মন্দিব, বাড়ি ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করার চিন্তা প্রথম মাথায় আসে পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্মণের। কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দির মহেন্দ্র বর্মণের এক বংশধর রাজা রাজসিংহেরই সৃষ্টি। তাঁর রাণার নাম ছিল রঙ্গপতাকা। বঙ্গপতাকারই পরামর্শে এ কৈলাস-মন্দির তৈরি হয়। কেমন দেখতে হবে, কেমন কারুকার্য হবে তার নির্দেশনা আসত রাণী সাহেবার

কাছ থেকে। রঙ্গপতাকা ছিলেন সত্যিই মহিয়সী মহিলা, তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় আরও অনেক আছে। দাক্ষিণাত্যে পাহাড় কেটে স্থাপত্য শিল্প অবশ্য চালু হয় বহুকাল আগেই বিজয়বদ রাজ্যে। মহেন্দ্র বর্মণের মাতা ছিলেন বিজয়বদের বিষ্ণুকুণ্ডি বংশের কন্যা। মামা-বাড়ির আরট দেখে মহেন্দ্র-বর্মন, নিজরাজ্যে তামিলনদেও ঐ পাহাড় কেটে মন্দির আর অট্টালিকাদি নির্মাণ করার রেওয়াজ শুরু করে দেন।

কাঞ্চিতে শুধু কৈলাসনাথের মন্দিরেই নয়, আরও অনেক গৃহাদি আছে যেখানে সুন্দর সুন্দর ভিত্তি চিত্র দেখা যায়। মমন্দুর গুহামন্দিরের অলঙ্করণ বাস্তবিকই দেখবার মত। পাথর গাঁথনি করেও বেশ কিছু মন্দির বানিয়েছিলেন পল্লবরা। মহেন্দ্রবর্মণের পরবর্তীকালে কেমন ধারা ছবির স্টাইল আর ক্রিয়াকৌশলটাই বা কেমন হয়েছিল তা বুঝতে পারার মত বহু ছবি দেখা যায় ঐ সব পাথর গাঁথা মন্দিরে। অধ্যাপক ডুবরেইকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তিনি না দেখতে পেলে ঐ শিল্প সম্ভারের হদিস যে কবে পাওয়া যেত, বলা মুস্কিল। কত নিখুঁত ছিল আকৃতির উপস্থাপনা আর শারীর-স্থান জ্ঞানই বা কত নির্ভুল ঐসব নাম না জানা মহা মহা শিল্পীদের। শিব, উমা, স্কন্দ—এরাই দখল করে আছেন আসর পল্লব আরট-এর। রঙ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া বোকামি। কারণ শত শত বছর পর আমরা যে রঙটা দেখতে পাচ্ছি তা সেকালের আর্টিস্ট অবশ্যই দেখাতে চান নি।

গৌতমবুদ্ধের মত আরও ২৪ জন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে। বুদ্ধেরই প্রায় সমসাময়িক তাঁরা। ব্রাহ্মণদের অতিমাত্রায় গোঁড়ামি আর অব্রাহ্মণদের ওপর তাদের দাপট বেশ কিছু লোককে বিদ্রোহী করে তোলে। বুদ্ধ যেমন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ঐ ২৪ জন মহাপুরুষও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে জৈন ধর্মের প্রবর্তন করেন। এঁদের তীর্থঙ্কর বলা হয়। তীর্থঙ্কর মানে মহাপুরুষ। সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম হয়েছিল মহাবীর এবং জিন। জিন অর্থে জয়ী এবং জিন থেকেই জৈন ধর্ম। মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম বর্ধমান। জিনের ভক্তরাও সংখ্যায় নেহাত কম ছিলেন না, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে একসময় জৈন ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। জৈন-ধর্ম ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-ভারতের সীমা ডিঙিয়ে বিদেশেও চলে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের বহু নৃপতি ধর্মে জৈন ছিলেন। এইসব জৈন রাজাদের মধ্যে আবার অনেকে পরে নতুন করে হিন্দু দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইলোরার কৈলাস নাথের মন্দির তৈরি হবার বহুপূর্বে জৈনরাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অজন্তার মত কিছু গুহাও বানান হয়েছিল; সেগুলির ভিতরে তীর্থঙ্করের চেহারা দেখা যায়। ঐসব মূর্তি বুদ্ধদেবের চেহারা বলে ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নয়। অলঙ্করণেও যেন বৌদ্ধ শিল্পীদেরই অনুসরণ করা হয়েছিল জৈন আরট-এ।

গল্প নয়, গপ্পো

সুশান্তকুমার পাল

প্রিয় খেয়াল খুশীর ছোট্ট বন্ধুরা—আমাদের ছোবলদার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক এবং অফুরন্ত গল্পের খনি,—আমাদের অতিপ্রিয় ছোবলদা। সব সময় গল্প ওঁর ঠোঁটের আগায় তৈরি হয়েই থাকে। মৌচাকে ঢিল মারলে যেমন তৎক্ষণাৎ মৌমাছিরা ছুটে আসে, ঠিক তেমনই ছোবলদাকে একটু উসকে দিলেই তাঁর থেকে গরম গরম গল্প বেরুতে থাকে। ছোবলদা'র ভাষাতেই বলি যে, তাঁর গল্প ভেঁজি-পেঁজি গল্প নয়। স্বয়ং নোবেল কমিটি ঐ সকল গল্পের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেবার কথা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন—ছোবলদা রিফিউজ করে বলেছে, ঐ সব ছেলে ভুলোনো পুরস্কার দিলে তাঁকে ছোট করা হবে।

সে যাইই হোক্, এ হেন ছোবলদার আমরা অনেকদিন বাদে দেখা পেলাম। —এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলেন কে জানে!

দেখলাম ছোবলদা, একটা শতচ্ছিদ্র ছাতা মাথায় দিয়ে কোট-প্যান্ট বুট-জুতো পরে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যাচ্ছেন। এ রকম অবস্থায় ছোবলদাকে দেখে আমার একটু প্রেস্টিজে লাগল। আমার নন্-ফ্রেণ্ডস্‌রা যদি এই অবস্থায় ছোবলদাকে দেখে ফেলে তাহলে টিটকারি দিয়ে বলবে, ঐতো তোদের ছোবলদার কি দশা!

আমি ছোবলদাকে ডাকলাম জানালা দিয়ে। তিনি আসতেই দেখলাম ওঁর কোলে একটা বিড়াল বাচ্চা। ঘরে এসেও ছোবলদা বিড়ালবাচ্চা কোলে করে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললাম ছাতাটা বন্ধ করুন। উনি হেঁই হেঁই হেঁই করে উঠলেন—চুপ কর। বুদ্ধু কোথাকার! —সন্ন্যাসীর মাথায় ছাতা ধরতে হয় সব সময়।

ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে না পারার আগেই ছোবলদা বললেন, রিসেন্টলি গেসলাম নর্থপোলে। ওখান থেকেই এটা নিয়ে এসেছি!

এবার বুঝতে পারলাম ছোবলদার টক-ঝাল-মিষ্টি গপ্পো আরম্ভ হয়ে গেছে। ততক্ষণে আমার পাশে অনি, বিভা, কুট্টি, সোনা, বাপী, ঝুমা সব জড় হয়ে গেছে। বিভা আমাকে চিমটি কেটে হাসতে বারণ করে বলল চুপ!

—আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসলাম।

ছোবলদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগলেন। দেখ্ তোরা বাইরে বেরুবি না! ঘরের মধ্যে পুঁতে পড়ে থাকবি! সারা দুনিয়ায় কি ঘটছে, ঘটবে তার জন্য তোদের মাথা ব্যথা নেই!

হঠাৎ বিভা অধৈর্য হয়ে আদুরে গলায় বলল ছোবলদা,—শুরু করুন!—ছোবলদা এবার হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বললেন, তোদের সব ব্যাপারেই অধৈর্য। জীবনে কোনদিন সাকসেস্‌ফুল হতে পারবি না। একটা ঘটনা ডিসকাস করতে গেলে তার আগে একটু ভূমিকার দরকার হয় না?—সোনা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কিছু মনে করবেন না ছোবলদা,—তারপর বিভাটাকে এক ধমক দিয়ে বলল, তোর না সব কিছুতেই বেশি বেশি!

একটু থেমে আবদারের স্বরে বলল, ছোবলদা শুরু করুন।

ছোবলদা বিড়ালটার গলায় বারকয়েক হাত বুলিয়ে বলতে শুরু করলেন।—আমি

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের একান্ত অনুরোধে রিসেন্টলি নর্থপোলে গেসলাম। আমেরিকার বিজ্ঞানী পরিষদ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখতে পেয়েছেন নর্থপোলে নাকি একরকম অদ্ভুত ধোঁয়া কন্‌সট্যাণ্ট বেরুচ্ছে। ওই ধোঁয়া তাদের নিউট্রোণ বোমা আবিষ্কারে প্রতিকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য আমাকেই তারা নির্বাচিত করেছে। বুঝতেই তো পারছিস দেশ বিদেশে একটু নাম থাকলে যা হয়!

আমরা মাথা নেড়ে বললাম। বটেই তো ছোবলদা আবার পুনোরুদ্যমে শুরু করলেন।

চললাম। লোকজন অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ সবই আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট দিল। সমুদ্র পেরিয়ে ক্রমশঃ নর্থপোলের দিকে যতই এগোতে থাকলাম ততই দেখলাম শুধু বরফ আর বরফ। —তোরা হয়ত ভূগোলে পড়ে থাকবি নর্থপোলে ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত্রি। তখন নর্থপোলে রাত্রি চলছিল। অতএব আমাদের জাহাজের সবকটা হাইপাওয়ারের টর্চলাইট একসঙ্গে জ্বেলে দিলাম। কিছুদূর এগোবার পর আমার সঙ্গীরা আর এগুতে চাইল না। কারণ জাহাজ আর বরফের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল না।—যদিও বরফ কাটা কল দিয়ে বরফ কেটে কেটে এতদূর আসা হয়েছিল। অতএব আমি ওদেরকে ভীতু কাপুরুষ বলে একাই বরফের ওপর দিয়ে খালি পায়ে অন্ধকারের মধ্যে টর্চ হাতে হাঁটতে লাগলাম।

—আমরা গা টেপাটেপি করছিলাম।—গল্পটা বদহজম না হলে হয়।

কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখলাম, সামনের একটা বরফের চাঁইয়ের ভেতর থেকে বগ.বগ. করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি আমি পকেট থেকে চুম্বক কম্পাস আর ম্যাপ বার করে দেখলাম নর্থ-পোল আর কতদূর?—হিসেব করে দেখলাম একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি!

আমার তখন আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু ধোঁয়ায় আমার দারুণ চোখ জ্বালা করছিল দেখে হঠাৎ আমার হেডে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে যে গর্তটা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল সেটা একটা কিছু দিয়ে বোজাতে গেলাম, কিন্তু ওমা। দেখি গর্তটা নড়ছে। যতবারই গর্তটা বোজাতে চেষ্টা করছিলাম ততবারই গর্তটা সরে সরে যাচ্ছিল। এইটুকু বলে ছোবলদা থেমে গেলেন। ছোবলদার ঐ এক দোষ। কিছুতেই কথা শেষ করতে চান না। বিশেষ করে দরকারী কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান।—আমরা উত্তেজিত হয়ে বললাম তারপর……তারপর?

—ছোবলদা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়ালটার গলায় আর একবার হাত বুলিয়ে বললেন, আমিও নাছোড়বান্দা। জোর করে পকেট থেকে হাতুড়ি, পেরেক বার করে একটা ছোট কাঠ ঐ গর্তটায় মেরে বন্ধ করবার চেষ্টা করছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ দেখি গোঁ গোঁ গ্যাঁক গ্যাঁক আওয়াজ হচ্ছে। শব্দটা কিছুক্ষণ মন দিয়ে শুনে বুঝতে পারলাম এটা মানুষের গলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। বেশ কান পেতে শুনতে লাগলাম। এটা কি ভাবার কথা। মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এটা নর্থপোলের ভাষা। তোদের এখানের মতো তো আর ওখানে বাংলা হিন্দি ভাষা চলে না। তাই আগে থেকেই অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি থেকে ঐ নর্থপোল লিটারেচারে মাষ্টার ডিগ্রী

নিয়ে তবেই নর্থপোলে স্মোক ইনভেস্টিগেট করতে গেছিলাম। নাহলে তোদের মতো, পড়াশুনা না করেই চাকরীর পরীক্ষা দিতে গেলে বার বার ফেল করে বেকার হয়ে বসে থাকতে হতো।

—ছোবলদার ঐ এক স্বভাব! বেশ রসালো গুলতাপ্পি মারা গপ্পের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা। আমরা মেনে নিতাম। ছোবলদা তো ছোবল দেবেই!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম আমরা। তখন ছোবলদা, আবার ধমক্ দিয়ে বললেন, এখন আর শুনতে চাইবি কেন? ইম্পপর্টেন্ট কথা, পৃথিবীর কথা, বিশ্বমানবের কথা ভাল লাগবে কেন?

বুঝতে পারলাম ছোবলদা রেগে গেছেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি সবাইকে ধমক দিয়ে বললাম তোরা সব মন দিয়ে শোন।

ছোবলদা ঢোক গিলে আবার বলতে লাগলেন—কিছুক্ষণ বাদে নর্থপোলের ভাষা পরিষ্কার বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কি সর্বনাশ! একজন মুনিঋষি এখানে দশ হাজার বৎসর ধরে তপস্যা করছে আর আমি কিনা তাঁরই নাকের গর্ত থেকে গঞ্জিকার ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ করতে যাচ্ছি। আর একটু হলেই দমবন্ধ হয়ে পুণ্যবান সাধুটি মারা যেতেন। মাঝখান থেকে পাপের দায়ে আমাকে নরকে যেতে হতো। মুনিঋষির কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলাম। তিনি ঐ নর্থপোলের ভাষায় আমাকে বললেন, আমি দশ হাজার বৎসর ধরে বরফের নীচে চাপা পড়ে আছি। আমাকে উদ্ধার কর। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বরফকাটা কল বার করে আমি একাই অবিরাম ১০৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে তাঁকে বরফের তলা থেকে মুক্ত করলাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস দীর্ঘজীবি হও। ভগবানের কৃপা লাভ কর।

তাঁকে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সাহসী রাখতে বেশ জোরে জোরে চিৎকার করে আমি নর্থপোলের ভাষায় কলকাতার সব বিচিত্র গল্প যেমন, উড়ালপোল, যাদুঘর, পাতাল-রেল এরোপ্লেন, প্রভৃতি নানারকম গল্প বলতে লাগলাম। মনে মনে কিন্তু ভয়ে কাঁপছিলাম। হঠাৎ তিনি ধরে বসলেন আমাকে ভায়া ওগুলো একটু দেখিয়ে দিতে হবে।—আমাদের সময়ে পুষ্পক রথ, অগ্নিবাণ ঢেঁকি ছিল।—আমিও সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ করে বললাম নারদমুণি তো ঐ ঢেঁকিতে চড়েই যাতায়াত করত। এখন আমাদের মোটর গাড়ি, বাস, ডিলাক্স, মিনিবাস, ট্যাক্সি কত কিছু যানবাহনের ব্যবস্থা। মুনিঋষিটি নাছোড়বান্দা হয়ে বললেন, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যেতেই হবে। আমি বললাম তোমার (এই কিম্ভূতকিমাকার চেহারা) প্রকাশ্যে বললাম, হে, ঋষিবর! তোমার বিশ্বরূপ সংবরণ কর। তোমার এরূপ দেখলে কলকাতার সব মানুষ আঁতকে উঠবে, ভির্মি খাবে। তখন ঋষিবর ম্লান হেসে বললেন, কিরূপে তুমি দেখতে চাও আমাকে? আমার মুখ ফস্‌কে হঠাৎ অলুক্ষণে কথা বেরিয়ে গেল বিড়াল (কারণ তোরা তো জানিস বিড়াল আমার দু'চক্ষের বিষ)।

অতএব কিম্ভূতকিমাকার মুনিঋষিটি বিড়ালে পরিণত হতে হতে বললেন আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে, সেখানে ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ আমাদের পূর্বপুরুষের ছাতার ব্যবসা ছিল কিনা! তাই ওটাই আমার একমাত্র বংশ পরিচয়।

চিড়িয়াখানা

সৌমিত্র শঙ্কর দত্ত (সভ্য, ৮)

আমাদের কলকাতায় একটি বড় চিড়িয়াখানা আছে। আমি বাবার সঙ্গে ছোট থেকেই কলকাতার চিড়িয়াখানায় অনেকবার গেছি।

দেশ বিদেশের নানা রকম পাখি ও পশু এই চিড়িয়াখানায় আছে। এ ছাড়া অনেক গাছও আছে। একটি ঝিলও আছে। ওই ঝিলে শীতকালে যাযাবর পাখিরা এসে ভীড় জমায়। গণ্ডার দেখতে কাজিরাঙ্গা, সিংহ দেখতে গিরের জঙ্গল, ক্যাঙ্গারু দেখতে অসট্রেলিয়া যেতে হয় না, যে কোনো চিড়িয়াখানাতে গেলেই আমরা এসব দেখতে পাই। জন্তুদের আরামে থাকবার মত বড় জায়গাতেই তাদের রাখা হয়।
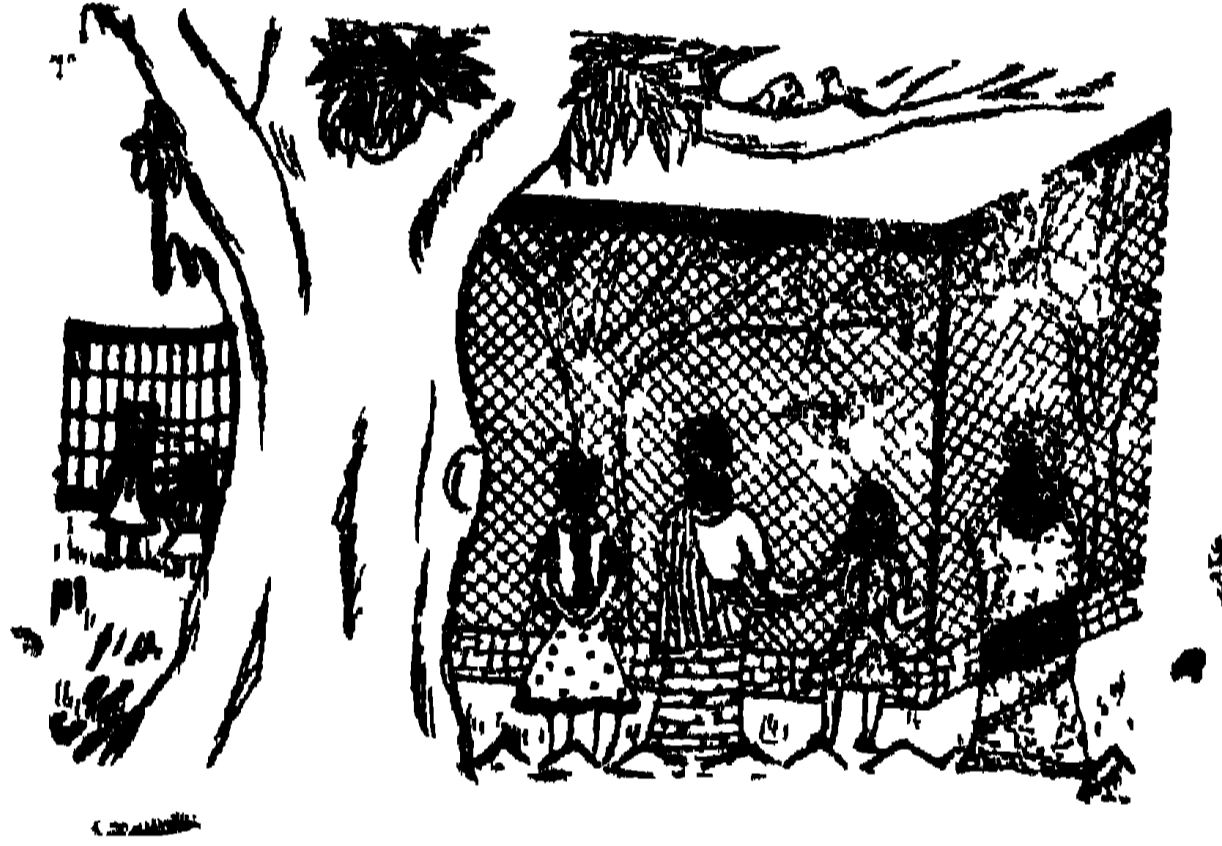
শীতকালে চিড়িয়াখানার ঝিলে যে বিদেশী পাখিরা আসে, তারা উত্তরের শীতের দেশগুলো থেকে হাজার হাজার মাইল উড়ে উড়ে কলকাতার চিড়িয়াখানায় আসে। আবার শীতের শেষে চলে যায়। এদের মধ্যে বেশির ভাগই হাঁসজাতীয় পাখি। ওদের দেখতেই আমি প্রায় প্রায়ই শীতের দিনে যাই চিড়িয়াখানায়। সকাল বেলায় পাখি ও পশুদের খেতে দেওয়া হয়। নানা জাতের সাপ এই চিড়িয়াখানায় আছে। শীতকালে সাপেদের ঘর বন্ধ থাকে। কলকাতার চিড়িয়াখানার মধ্যেই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি মিনি চিড়িয়াখানা আছে। তার নাম Chidrens' zoo। সেখানে গেলে আমরা খুব আনন্দ পাই। কলকাতার চিড়িয়াখার পাশেই পশুপাখিদের একটা হাসপাতালও আছে। অসুস্থ পশুপাখিদের সেখানে চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ভারতবর্ষে দিল্লীর চিড়িয়াখানা পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে জানি। তবে আমি কিন্তু, আমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানাকে খুবই ভালোবাসি।

ভাষাশিক্ষার আসর

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

অব্যয়কে আমরা নানান শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রধানতঃ অব্যয় তিন শ্রেণীর। (১) অন্বয়ী অব্যয় (২) অনন্বয়ী অব্যয় এবং (৩) অনুসর্গ।

দুই বা তার বেশি পদ অথবা দুই বা তার বেশি বাক্যকে একত্র জুড়ে দিতে আমরা 'এবং', 'ও', 'আর', 'আরও', 'অপিচ', 'অধিকন্তু', 'উপরন্তু' প্রভৃতি অব্যয় শব্দের ব্যবহার করি। যেমন ; রাম ও লক্ষণ ; "রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটরানীর নতুন গহনা গড়াতে গেলেন, আর রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড় রানীর কাছে গেলেন।" ইত্যাদি। এ সকল অব্যয় বাক্য বা পদের সংযোগ সাধন করে বলে এ গুলিকে বলে সংযোজক অব্যয়। সাধারণত দুই শব্দের মধ্যে 'ও' এবং দুই বাক্যাংশের মধ্যে 'এবং' বসে। সচরাচর চলিত ভাষাতে 'আর' ব্যবহার করা হয়। 'এবং' চলিত ও সাধু, উভয় ভাষাতেই খাটে।

অব্যয় যে শুধু শব্দ বা বাক্যকে জুড়ে দেওয়ার বা যুক্ত করার কাজই করে, তা নয়। কিছু কিছু অব্যয় শব্দ বা বাক্যকে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে। যথা—রাম বা রহিম ; "তুমি এখনি ও বাড়ি যাও, অথবা দেরি না করে হরিকে পাঠাও।" এ সব ক্ষেত্রে একটা বিকল্পের ইঙ্গিত থাকে। এ ধরনের অব্যয়কে বলে বিয়োজক অব্যয়। "পানীয় জল সঙ্গে নিও, নইলে কষ্ট পাবে।" এ বাক্যে 'নইলে' বিয়োজক অব্যয়। আবার, কিছু কিছু অব্যয় প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে। যেমন : "লোকটি ধনী, কিন্তু বিনয়ী।" "তলোয়ারের ধার না থাকুক, লখারানার কিন্তু কথার ধার খুবই ছিল।" আবার, "আমি মারি নাই, বরং সেই মারিয়াছে' বলা যেতে পারে এ ধরনের অব্যয়পদ বাক্যের অর্থ-সংকোচ ঘটায়। এ অব্যয়গুলিকে বলে সংকোচক অব্যয়। অনেক অব্যয়পদ হেতু বা কারণ ব্যক্ত করে। যেমন : সুতরাং, অতএব, তাই বলিয়া, কারণ ইত্যাদি। যথা : "সে আজ স্কুলে আসে নাই, কারণ তার বাবা অসুস্থ।" "তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?" উপরের বাক্য দুটিতে 'কারণ' ও 'তাই বলিয়া' অব্যয় পদ। এ সব অব্যয়কে বলে হেতুবোধক অব্যয়। অনেক সময় জোড়া অব্যয় একই বাক্যে ব্যবহার করা হয়। এ রকম অব্যয়কে বলে নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়। যেমন : "যদি বৃষ্টি হয়, তবে ঠাণ্ডা পড়বে।" "যেমন কর্ম,তেমন ফল"। "যদিও তিনি দরিদ্র, তথাপি তিনি সুখী।" এ সব বাক্যে যদি-তবে' যেমন-তেমন, যদিও-তথাপি ইত্যাদি নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়। আবার, যেন, মতো, মতন, যেমন প্রভৃতি উপমাদ্যোতক অব্যয়। উদাহরণ : "পূর্ণিমার চাঁদ যেন

ঝলসানো রুটি।" অন্বয়ী অব্যয়কে এভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—(১) সংযোজক অব্যয় (২) বিয়োজক অব্যয় (৩) সংকোচক অব্যয় (৪) হেতুবোধক অব্যয় (৫) নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় এবং (৬) উপমাদ্যোতক অব্যয়।

অনন্বয়ী অব্যয়গুলি বাক্য বা শব্দের মধ্যে অন্বয়, অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রকাশ করে না। এ সকল অব্যয় মুখ্যতঃ মনের ভাব প্রকাশ করে। আনন্দ, বিস্ময়, ক্ষোভ, ঘৃণা, যন্ত্রণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মনের ভাব প্রকাশ করত অনন্বয়ী অব্যয়গুলি ছাড়া আমাদের চলে না। মনের ভাব নানান রকমের হয়। মনের ভাব প্রকাশক অব্যয়গুলিকেও অনুরূপ ভাবে নানান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :

১। সম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় : হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, যা বলেন, তা বটে ইত্যাদি।

২। অসম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় : না, না তো, মোটেই না, আদৌ না ইত্যাদি

৩। অনুমোদন সূচক অব্যয় : বেশ বেশ বেশ, আচ্ছা, বাঃ, বাঃ বাঃ, বাহবা প্রভৃতি।

৪। বিস্ময়সূচক অব্যয় : অ্যাঁ, ও, ইস্ ইত্যাদি। উদাহরণ : 'ও, তাই বল।'

৫। ভয় সূচক অব্যয় : ওরে বাবারে, বাপরে, মাগো ইত্যাদি।

৬। যন্ত্রণাসূচক অব্যয় : উঃ, ওঃ, মাগো, বাবারে ইত্যাদি।

৭। করুণাজ্ঞাপক অব্যয় : আহা, আহারে, মরি, মরি প্রভৃতি।

৮। ঘৃণাসূচক অব্যয় : ছিঃ, ছি ছি, থুঃ, থুঃ থ্যো, দ্যুৎ ইত্যাদি।

উদাহরণ : 'দ্যুৎ! আমার বয়স হল আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'

তিন্নি কাতর মুখে বলল, 'দাদুমণি। তোমার ঝুলি থেকে অব্যয়ের আর কত নাম বের করবে, শুনি?' রাখি বলল, 'কাতারে কাতারে অব্যয় শিখতে গিয়ে ব্যাকরণের রণ যে কঠিন হয়ে উঠবে। অন্য পড়া শিখব কখন?' দাদুমণি বলল, 'ঠিক কথা। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামের মত এ সব অব্যয়ের এত নামকরণ না করে একটা নাম রাখাই সঙ্গত। এক কথায় বলা চলে মনোভাবপ্রকাশক অব্যয়। যে সব অব্যয় সম্মতি, অসম্মতি, অনুমোদন, বিস্ময়, ভয়, যন্ত্রণা, করুণা, ঘৃণা, আনন্দ, প্রশংসা, বিরক্তি, খেদ প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করে, তাদের বলব মনোভাব প্রকাশক অব্যয়।

রাণা অবান্তর কথায় না গিয়ে মূল প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সে জিজ্ঞাসা করে, 'মনোভাব প্রকাশক অব্যয় ছাড়া অনন্বয়ী অব্যয় আর কি কি হতে পারে?' মনোভাব প্রকাশক অব্যয়ছাড়া আরও কয়েক শ্রেণীর অনন্বয়ী অব্যয় আছে। তা হল : (১) বাক্যালংকারসূচক অব্যয় এ গুলি বাক্যের সৌন্দর্য বাড়ায়। যেমন : 'আমি তো জানি না।' এখানে তো' অব্যয়টি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেনা, বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধন করে মাত্র। "তুমি না যাবে?" 'না' এখানে বাক্যালংকারসূচক অব্যয়। (২) প্রশ্নসূচক অব্যয় : কেন, কি, তাই নাকি ইত্যাদি। "কি নাম তোমার!" (৩) সম্বোধনবাচক অব্যয় : ওরে, ওগো, এই যে, ওহে, হে, ইত্যাদি। উদাহরণ : "এই করেছ ভাল নিঠুর, হে।" "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।"

তোমাদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে এর আগে দাদুমণি বলেছিল প্রথম থেকেই অব্যয়ের পঠন-পাঠনে সময় ব্যয় করা ভাল। তার কারণ, একই অব্যয় অন্বয়ীও হতে পারে, আবার অনন্বয়ীও হতে পারে ; অর্থাৎ একই অব্যয় শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। 'রাম ও শ্যাম একই স্কুলে পড়ে', বাক্যটিতে 'ও' সম্বোধন বাচক অব্যয়। 'মাগো ! কত বড় সাপ !' 'মাগো' এখানে ভয়সূচক অব্যয়। 'মাগো আর পারিনে !' 'মাগো' কষ্টসূচক অব্যয়। 'হবেও বা', বাক্যটিতে 'বা' সন্দেহসূচক অব্যয়। 'কেনই বা হবে না', বাক্যে 'বা', নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। 'বৃষ্টি এল যে !' বাক্যে 'যে' বিস্ময়সূচক অব্যয়। আবার, 'যে বৃষ্টি !' বাক্যে 'যে' আধিক্যসূচক অব্যয়। আবার, একই শব্দ বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : 'রাম বেশ ছেলে।' বাক্যটিতে 'বেশ' বিশেষণ পদ। 'সে বেশ খেতে পারে।' এ বাক্যে 'বেশ' ক্রিয়ার বিশেষণ। আবার, 'বেশ, এবার যাও', বাক্যে 'বেশ' অনুমোদনজ্ঞাপক অব্যয়। আসল কথা, শব্দের প্রয়োগ দেখে তার অর্থ বুঝে নিতে চেষ্টা করা উচিত।

তিন শ্রেণীর অব্যয়ের মধ্যে অন্বয়ী এবং অনন্বয়ী অব্যয় নিয়ে আলোচনা শেষ হয়েছে। বাকি আছে অনুসর্গ। অনুসর্গ অব্যয়গুলি বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে বিভক্তির কাজ চালায়। কতকগুলি অনুসর্গ-কারক বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে ইত্যাদি। কারক ছাড়া বিশেষ সম্বন্ধে বা অর্থেও অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটে। জন্য, নিমিত্ত, মধ্যে, ভিতরে, লাগিয়া, পিছে ইত্যাদি। উদাহরণ : "দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?"

ছিনতাই রাহাজানি

সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত

ঘুট ঘুটে রাত্তির
এক ট্রেন যাত্রির
ভয়ানক চিন্তা,—
দিনেতেই ছিনতাই
রাত্রিতে কি না জানি
নির্ঘাৎ রাহাজানি।
তেরো আনা ছিল পুঁজি,
তাড়াতাড়ি ট্যাকে গুঁজি।

যীশু

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্য, ১০)

বেথেলহেমে জন্ম তোমার
নামটি তোমার যীশু,
কত লোককে প্রাণ দিয়েছ
বাঁচিয়েছ বহু শিশু।
জন্মিলে যবে ২৫শে ডিসেম্বর
ইতিহাস তোমায় স্মরণ রাখবে
তুমি হবে চির অমর।

আর্যভট্টের অক্ষর সংখ্যা

ডঃ বসন্তকুমার সামন্ত

(শেষাংশ)

তাতে বর্গীয় 'ব'এর পেট কাটা চেহারা তাকে অন্ত 'ব' থেকে পৃথক করত। বাংলা অক্ষরে এই অসুবিধা এড়াতে বর্গীয় 'ব' কে নিম্নরেখা করা যেতে পারে অর্থাৎ বর্গীয় 'ব' হবে 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব' হবে শুধু 'ব'। আঠারটি অংকযুক্ত সংখ্যার চেয়ে বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে উপরের ছকটি পুনরায় অনুসরণ করা হবে—কেবল তফাৎ বোঝাতে অং, ইং,......উং অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত স্বরবর্ণ লেখা যেতে পারে। এই হিসাবে বর্তমানের আট কোয়াড্রিলিয়ন (Quadrillion)=৮,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বোঝাতে আর্যভট্টীয় পদ্ধতিতে লেখা হবে মাত্র একটি যুক্তাক্ষর 'জং'=জ+খ+ং।

কোন সংখ্যা লিখতে যেখানে একাধিক অক্ষর প্রয়োজন, সেখানে সেগুলি লেখা হত 'অঙ্কানাং বামতো গতি' সূত্র অনুসারে অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁদিকে। এই সূত্র পদসংখ্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত ছিল এবং পূর্ব প্রবন্ধে তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

নিয়ম জানার পর তোমরা পরিচিত সংখ্যাগুলিকে আর্যভট্টীয় পদ্ধতিতে অক্ষর সংখ্যার দ্বারা লিখে এবং ঐভাবে লেখা অক্ষর সংখ্যাকে পুনরায় পরিচিত সংখ্যাতে পরিবর্তিত করে মজার ধাঁধার সমাধানের আনন্দ পেতে পার। 'আর্যভট্টীয়' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ছকের সাহায্যে পদ্ধতিটি ভালভাবে বোঝার জন্য। দশ কোটির চেয়ে ছোট সংখ্যার জন্য স্বরবর্ণের 'ঋ' পর্যন্ত নিলেই চলবে (কারণ, 'ঋ' পর্যন্ত মোট আটটি স্থান আছে আটটি অঙ্কের জন্য এবং দশ কোটির চেয়ে ছোট সংখ্যা আট অঙ্ক বিশিষ্ট)।

সংখ্যা	ঋ অ ০	 ব ০	উ অ ০	 ব ০	ই অ ০	 ব ০	অ অ ০	 ব ০	সংখ্যার অক্ষর রূপ
৪,৩২,০,০০০=	ঘ ৪	য ৩	খ ২		০	০	০	০	=খ্যু ঘৃ
৫৭,৭৫৩,৩৩৬=	ল ৫	ছ ৭	শ ৭	ঙ ৫	য ৩	গ ৩	য ৩	চ ৬	=চ্যাগিয়ু ঙলু ছলৃ

কাজেই দেখা যাচ্ছে বেশ বড় সংখ্যাও অক্ষর সংখ্যার সাহায্যে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা যায়। এই

দিক থেকে বিশেষ সুবিধা থাকলেও অক্ষর সংখ্যা রূপের সব থেকে বড় অসুবিধা উচ্চারণগত। যেমন, 'খ্যুগৃ' উচ্চারণ করা গেলেও অপর উদাহরণটির উচ্চারণ সহজসাধ্য নয়, তাছাড়া, আর্যভট্টের সূত্রানুসারে কোন সংখ্যার অক্ষর রূপ একেবারে নির্দিষ্ট হওয়ার বিচিত্রতার আস্বাদ মেলে না।

অক্ষর সংখ্যা লিখনের ক্ষেত্রে কতপয়দি পদ্ধতির (Katapayadi System) কয়েকটি প্রকারভেদ, 'অক্ষর পল্লি' (অর্থাৎ, অক্ষর পদ্ধতি) এবং অন্যান্য কিছু এলাকাভিত্তিক পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। সেগুলির কথা সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছে থাকল।

সংখ্যাকে অক্ষরে লেখার প্রশ্ন সমাধান করার পরে বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ অক্ষর-সমস্যাকে সংখ্যায় লেখার চেষ্টা অবশ্যই একটা বৈচিত্র্য আনবে। তবে, এক্ষেত্রে যে কোন অক্ষর-সমষ্টিই সংখ্যা হবে না। সংখ্যায় 'অনুবাদ' যোগ্য হতে হলে তাতে অ—ই—উ—ঋ—৯—এ—ঐ—ও—ঔ এই আটটি স্বরবর্ণের এক বা একাধিক বর্ণ উপস্থিত থাকবে ক্রমিকতা রেখে। এ কথা বুঝবে উপরের উদাহরণ দুটি থেকে, প্রথমটিতে আছে আগে 'উ' তারপরে 'ঋ' এবং দ্বিতীয়টিতে আছে পরপর অ—ই—উ—ঋ। সংখ্যারূপ আসবে এমন কয়েকটি পদ—ঘটি, শনি, লিচু, লঘু, মেসো, জতুগৃহে। এদের মধ্যে ঘটি=১১০৪, জতুগৃহে=১,০০০,০০৩,১৬০,০০৮।

বাকি পদগুলির এবং এই ধরণের অক্ষয়-সমন্বয় সংগ্রহ করে আর্যভট্টীয় প্রথায় সেগুলির সমাধান তোমরা করতে চেষ্টা করবে। যারা পারবে তাদের আগেই সাধুবাদ জানাই এবং গণিত প্রেমিক সেই কিশোরদের উদ্দেশ্যে সগৌরবে ঘোষণা করি—'নবযুগে আর্যভট্টদের জয় হোক।'

[এই নিবন্ধ রচনায় ডঃ বি. বি. দত্ত ও ডঃ এ. এন. সিংহ রচিত History of Hindu Mathematics গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে]

খৃষ্টমাসের উৎসব এখন ২৫শে ডিসেম্বর পালিত হয়। কিন্তু, এই উৎসব প্রথম শুরু হয়েছিল মে মাসে। খৃষ্টের জন্মের ২০০ বছর পরে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ২০শে মে এই উৎসবের প্রথম প্রবর্তন হয়। পরে, দিন বদল করে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এপ্রিল মাসে। তারপরে জানুয়ারী মাসের ৬ তারিখে। শেষ পর্যন্ত খৃষ্টের মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে এই উৎসবের দিন ধার্য হয় ২৫শে ডিসেম্বর। সেই থেকে ঐ তারিখেই খৃষ্টমাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

(বৈদ্যুতিক) পাখার প্রতি

রূপা মুখোপাধ্যায় (সভ্যা, ১০)

কখন থেকে তাকিয়ে আছি
শুধু তোমার পানে,
কখন তুমি উঠবে নড়ে
সেই আশাটাই প্রাণে।
চুপটি করে ঝুলে আছ—
বুঝি না কি কারণ,
হাত গুলোতে কি হয়েছে ?
নাড়া তোমার বারণ ?
ঘামে ভিজে সারা শরীর
একটুও হাওয়া নেই,
একটুখানি নড়চড় —
মজায় ঘুম দিই।

ফুলের মত

ঝুমকা ভাদুড়ী (সভ্যা, সিনিয়র)

আমি তখন ছিলাম অনেক ছোট
দাদু বলতেন, 'ফুলের মত ফোটো।'
মনে ভাবতাম মল্লিকা না হেনা
তারা যেন অনেক দিনের চেনা…
তাদের মত ফুটব বনে বনে
মাতিয়ে আমি মনের কোনে কোনে
পাগল হাওয়ায় দুলব মাথা নেড়ে
ভবঘুরেদের মনটা নেব কেড়ে
গন্ধে গন্ধে মাতিয়ে দেব বন
ধুলিবিহীন করব নিজের মন,
তারপর যেই সূর্য যাবে ঢলে
আমি আবার ঘুমোব মার কোলে।

তারা

দেবজ্যোতি বসু (বয়স, ৭)

আকাশে অনেক তারার মেলা,
চাঁদের সঙ্গে করে যে খেলা।
সূর্য যেমনি বার হয় —
তারারা তখন মিলিয়ে যায়।

রিডিং রুম

মলয় পণ্ডিত (সভ্য, ১২)

শিশুউদ্যানে যাচ্ছি আমি,
ঘুমে দিয়ে ফাঁকি —
উদ্যানেতে এসেই আগে
লাইব্রেরীতে ঢুকি।
'দিদি, রিডিং রুমের তালা
খোলাব চাবি কই ?'
কথাগুলো বল্লাম আমি
বাগিয়ে একটা বই।
গল্পের বই পড়লাম কত
চেয়ারেতে বসে —
বাড়ি গিয়ে পড়তে বসলেই,
ঘুম লাগাই কষে।
বই পড়তে ভারী মজা
লাইব্রেরীতে ভাই,
শিশু উদ্যান দারুণ জায়গা
চল সবাই যাই।

দশজনের 'একলা' ভ্রমণ

(১ম পর্ব)

মানব নন্দী (সভ্য, সিনিয়র)

রবিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর,—'৮১ যাত্রা শুরু হল। যাত্রাস্থল মধুপুর। যাচ্ছি আমরা বিধান শিশু উদ্যানের দশ বন্ধু—আমি, জয়ন্ত, বাপি (সুব্রত রায়চৌধুরী), সুশান (সুশান্ত দত্ত), নির্বাক (সজল দত্ত), গৌতম, আশিস, দীপায়ন, প্রদীপ ও রাণা। সঙ্গে আমাদের দেওয়া হয়েছে সকালের খাবার এবং মাথাপিছু একশ টাকা ও মধুপুর যাওয়ার টিকিট।

নিজেদের মধ্যে শর্ত এই যে, এই টাকায় সাতদিন থাকতে হবে, ফেরবার ট্রেনভাড়া, বাসভাড়া এর মধ্যেও থাকতে হবে, আর পরিচিত কারোর বাড়ি থাকা চলবে না।

যাত্রা শুরু হল আজ, কিন্তু তার তোড়জোড় চলেছে অনেকদিন আগে থেকেই। প্রথমে ঠিক হল দেওঘর, তারপর পুরী, শিমুলতলা এবং অবশেষে এই মধুপুর।

আমাদের যাওয়ার কথা সকাল ৬°০২ মিনিটের মজঃফরপুর ফাস্ট প্যাসাঞ্জারে। জীবনে এই প্রথম এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই। আমরাই আমাদের 'লিডার', 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই মধুপুর ভ্রমণে'—এইরকম এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা এই বয়সে খুব কম ছেলেরই হয়।

ঠিক ছিল সকাল ৪°৫২ মিনিটের ডাউন ট্রেনে যাব উল্টাডাঙ্গা থেকে শিয়ালদহ। তারপর ওখান থেকে ট্রেন ধরব।

আজ আমাদের যাত্রার দিনটি সত্যিই খুব শুভ। আজ মহালয়া। আনন্দে আর উৎসাহে গতরাতে তো ঘুমই হয়নি। সারাদিন যাবার তোড়জোড় করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তাও কিছুতেই ঘুম আসে না। যদিও বা একটু ঘুমিয়ে পড়লাম, রাত ঠিক তিনটের সময় আবার ঘুম ভেঙে গেল।

বাড়ি থেকে বেরোলাম ভোর সাড়ে চারটেয়, সঙ্গে সজল। তখন মহালয়ার সবেমাত্র শুরু হয়েছে দেবীপক্ষের আবাহনী গান। চারিদিকে খুশির আমেজ। আমরা আরও বেশি খুশি হয়ে চললাম ষ্টেশনের দিকে।

চারদিক অন্ধকার। তখন পুরোপুরি রাত। ভেবে অবাক হই, অন্য কোনদিন এই সময় ঘরের বাইরে বেরোন আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ, ভয় নামক বস্তু। অথচ, আজ চলেছি অত্যন্ত খুশ মেজাজে, যেন ভয় কাকে বলে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই।

উল্টাডাঙ্গা ষ্টেশনে আমরা সকলে মিট (meet) করলাম। তারপর ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষা। কিন্তু, ৪°৫২ বেজে গেল—ট্রেন এল না, যত বেশি সময় চলে যাচ্ছে, আমাদের উৎকণ্ঠাও তত বাড়ছে। কারণ, পৌনে ছটার মধ্যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছতেই হবে। সকাল ৫°০২ মিনিটে দ্বিতীয় ডাউন ট্রেন। কিন্তু, তারও পাত্তা নেই। আমাদের তুলে দিতে এসেছিল অপু (সুব্রত রায়)। ওর উক্তি—

তোদের দেখে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। আমি বললাম—আচ্ছা একটা ট্যাক্সি করলে কেমন হয়? জয়ন্ত বলল—একটা ট্যাক্সিতে আমরা সকলে উঠলে তার টায়ার বলে কিছু থাকবে না।

কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে। এমন সময় ট্রেনের আলো দেখা গেল দূর থেকে। সকলেই বলল,—দু-নম্বরে ট্রেন আসছে। এই বলে সকলে এগিয়ে চলল। আমি গেলাম না, বললাম, নিশ্চিত না হয়ে আমি কিছুতেই যাব না।

ওরা ওদের মালপত্র নিয়ে অনেক এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ট্রেনটি কাছে এগিয়ে এসেছে। এবং দেখা গেল ট্রেনের আলো পড়ছে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের লাইনের দিকে। অর্থাৎ, চার নম্বরে ট্রেন আসছে। আমায় কম দৌড়তে হল, কিন্তু মালপত্র নিয়ে ওদের দৌড়তে হল অনেক বেশি। অতি কষ্টে ওভারব্রিজ পার হয়ে, আমরা যখন চার নম্বরে পৌঁছেছি তখন দেখা গেল—ট্রেনটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন নয়, একটা মালগাড়ি।

অতএব, লাগেজ নিয়ে আবার ওভারব্রীজে ওঠ। ছোটাছুটির মাঝে অপুর চটি গেল ছিঁড়ে। ও একহাতে চটি আর এক হাতে ব্যাগ নিয়ে ব্রিজে উঠল। কিন্তু, ট্রেনের চিহ্নমাত্র নেই। ৫'২০ মিনিট। সকলে বলাবলি করছে যে, যদি ট্রেন না পাই তবে উল্টাডাঙ্গাতেই হাত দেখিয়ে ট্রেন থামিয়ে উঠে পড়ব। এমনসময় ষ্টেশনের নীচে দেখা গেল একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, কে যাবে এই ওভারব্রীজ পার হয়ে? যদি ইতিমধ্যে ট্রেন এসে যায়? অপুই একমাত্র ছেলে যে যেতে পারে। অতএব ওকেই সকলে অনুরোধ করলাম, কিন্তু ওর চটি ছিঁড়ে গেছে বলে ও নিজেই ইতস্তত: করছিল। অগত্যা জয়ন্তই ছুটল। জয়ন্ত যখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে, তখন আবার ট্রেনের আলো দেখা গেল দূর থেকে। ওকে ডাকাডাকি করে ফিরিয়ে আনা হল। এবার আর ভাগ্যদেবী আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বিফল করলেন না, আসল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে শিয়ালদহ পৌঁছলাম।

আমাদের সিট রিজার্ভেশন ছিল। খুঁজে খুঁজে সঠিক কামরায় ঢুকে দেখা গেল যে রিজার্ভেশন বলে কিছু নেই। কালো কোট পরা একজন ভদ্রলোক ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা তাঁকেই ধরলাম। তিনি বললেন—টিকিটে সিট নাম্বার দেওয়া থাকলেও ট্রেনে সিট নাম্বার নেই। তোমরা যেখানে খুশি বসে যাও। কিন্তু আমরা সমস্বরে প্রতিবাদ করলাম—আমরা সকলে একই জায়গায় বসব। এইভাবে দশজনকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখে ভদ্রলোক বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন—দাঁড়াও, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা মুখোমুখি দুটো বেঞ্চে বসলাম, কিন্তু একজন অবাঙালি কিছুতেই উঠতে চাইল না। তখন তাকে একরকম কোলে করে দরজা দিয়ে বার করে দেওয়া হল।

ট্রেনে তো বসা গেল, ট্রেনও ছাড়ল সময়মত। ট্রেনে উঠে আমাদের প্রথম কাজ হল খাওয়া। অতএব, খাবারের ব্যাগ বার করা হল। আমরা যখন পাঁউরুটি আলুর দম খাচ্ছিলাম, তখন জানলা দিয়ে দেখলাম—বিধান শিশু উদ্যানের ঝাউগাছগুলো দূরে চলে যাচ্ছে।

ট্রেন দমদমে থামলে এক স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক এসে প্রথমে বন্ধ দরজায় বেশ জোরে ধাক্কা দিলেন। কিন্তু, দরজা খুলল না। কারণ, সেই কালো কোট গায়ে লোকটির পরামর্শ অনুযায়ী আমরা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দরজা খুলতে না দেখে তিনি জানালার সামনে এসে বললেন—দরজাটা খুলে দাও তো।

আমরা বললাম,—পারব না।

—পারবে না মানে? এটা কি তোমাদের কেনা কামরা?

—দরজা কি আমরা বন্ধ করেছি নাকি? ট্রেনের দরজা কিভাবে খুলতে হয় তাই-ই আমরা জানি না।

সকলে একসঙ্গে কথা বলায় কারোর গলাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। বাপি এই কলহে যোগ না দিয়ে জানলার সামনে বসে আপনমনে কলা খেয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক অতঃপর বাপিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—ভাই, দরজাটা খুলে দাও না। বাপি হাতের ডিমটা আস্তে আস্তে জানলায় ঠুকতে ঠুকতে বলল,—খাচ্ছি।

—খাচ্ছ তা কি হয়েছে? ভদ্রলোক এবার রেগে গেলেন।

—কিছুই হয়নি, বাপি আস্তে করে উত্তর দিল।

—তাহলে তোমরা দরজা খুলবে না?

—না। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা—এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল, কিন্তু, তিনি মজা দেখাতে আর এলেন না। ট্রেন তখন বেশ কিছুটা এগিয়েছে এবং আমরা সবে জমিয়ে গল্প করতে শুরু করেছি, সেই ভদ্রলোকটিকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি মজা করতে আসছেন না। আমাদের কাছাকাছি এসে তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন—আমি একজন পুলিস অফিসার। দেখি তোমাদের টিকিট।

আমরা আরও জোরে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে বললাম—দেখি আপনার আইডেন্টিটিকার্ড।

তিনি কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে পকেট থেকে বার করলেন একটা মানিব্যাগ। যেন ওটাই ওঁর পুলিস অফিসারের চিহ্ন।

বাপি ডিমটা শেষ করে বেশ নম্রভাবে বলে—দাদা, আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। আপনিই বলুন, খেতে খেতে কি কেউ দরজায় হাত দেয়?

—আরে, রাখ তোমার খাওয়া।

—আরে, রাখুন আপনার পুলিস অফিসার।

—দেখ, আমার এক ছেলে আমেরিকায় থাকে। আমি—। পিছন থেকে আর একজন বাঙালী এসে তথাকথিত পুলিস অফিসারকে থামিয়ে দিলেন, বললেন,—আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীদের

সঙ্গে এইভাবে ঝগড়া করছেন ? আসুন এদিকে আসুন। এই বলে তিনি সেই পুলিস অফিসারকে টেনে নিয়ে চললেন।

ট্রেন ছুটে চলেছে। একটার পর একটা ষ্টেশন চলে গেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম। কোনটার নাম বৈঁচি, আবার কোনটার নাম বৈঁচিগ্রাম। আমাদের দশজনের তু'জন এখন ঘুমোচ্ছে, চারজন খেলছে লুডো, তুজন দাবা এবং আমি আর জয়ন্ত তাকিয়ে আছি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। এক অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে ভর করেছে। আমরা যেন চলেছি কোন দূরদূরান্তের পানে, কোন বাধা নেই, কোন গণ্ডী নেই। কল্পনা করতে ভাল লাগল, যদি সারাজীবন এইভাবে যেতে পারতাম। কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—শুধু চলছি আর চলছি কোন সুদূরের পানে—তাহলে কী ভালই না হত।

আমরা যত এগিয়ে চলেছি, চারিদিকের দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন হচ্ছে তত বেশি। কলকাতা ছেড়ে ট্রেন যত এগিয়ে চলেছে, বড় বড় বাড়ির সংখ্যা তত কমেছে আর বেড়েছে গাছপালা ও ফাঁকা জায়গার সংখ্যা। ট্রেন আসানসোলে পৌঁছলে ট্রেনের ইঞ্জিন পরিবর্তন করা হল, ছিল ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, হল কয়লার ইঞ্জিন। ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। এতক্ষণ জানলার পাশে বসার জন্য আমাদের মধ্যে রেষারেষির সীমা ছিল না। কিন্তু এখন আর কেউই জানলার সামনে বসতে চাইল না। কারণ, কয়লার ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো। রাণীগঞ্জ পৌঁছে দেখলাম ট্রেন লাইনের পাশে পড়ে আছে প্রচুর কয়লা—যেন পর পর ছোট ছোট কয়লার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। ভাবতে অবাক লাগল যে, এখানে পাহাড় প্রমাণ কয়লা পড়ে আছে আর কলকাতায় কয়লার কী ভীষণ অভাব। অথচ, দূরত্ব তো খুব একটা বেশি নয়।

যেতে যেতে বৃষ্টি নামল। প্রথমে টিপ. টিপ. করে বৃষ্টি শুরু হল। দূরে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে যে তু'একটা গাছ দেখা যাচ্ছিল, তাও ঝাপসা হয়ে এল। জানলার পাশে বসেছিলাম। হাতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ছিল—ভীষণ ভাল লাগছিল। কিন্তু কিছু পরে বৃষ্টির বেগ গেল বেড়ে। এবার বৃষ্টির ফোঁটাগুলো হাতে তীরের মত বিঁধতে লাগল। অগত্যা জানলা বন্ধ করে দিতে হল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামল। জানলা খুলে দিলাম। চোখে এসে পড়ল এক ঝলক ঝলমলে আলো, মুক্ত বাতাস আর গ্রামের সবুজ সৌন্দর্য। কিছু সময় পরে আবার বৃষ্টি, আবার রোদ, আবার বৃষ্টি—যেন রোদবৃষ্টির খেলা চলছে। আমরা এরই মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চললাম।

যেতে যেতে একটা মাঝারি আকারের ব্রীজ পড়ল। ব্রীজের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটি নদী। ব্রীজটি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে আর খোলা। নীচের দিকে তাকালে মনে হয় যেন আমরা ঝুলছি, এক্ষুণি জলে পড়ে যাব। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগে বিহারের বাগমতী নদীতে সেই ভয়ংকর তুর্ঘটনার কথা। কী সাংঘাতিক! ভাবতেই আমার গা শিউরে উঠল। এইভাবে জলের নীচে চাপা পড়ে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে হাজার হাজার লোক। এতদিন ঘটনাটা কাগজেই পড়েছি। এই প্রথম ব্যাপারটা আমি উপলব্ধি করতে পারলাম।

চিত্তরঞ্জনে পৌঁছলাম। এই লাইনে পশ্চিমবাংলার সর্বশেষ ষ্টেশন। একটু আগে দেখে এসেছি, একটা বোর্ডে লেখা আছে, 'স্বাগতম পশ্চিমবাংলা'। বিজ্ঞানের কী অসীম ক্ষমতা! এই তো কয়েকঘণ্টা আগে আমরা ছিলাম পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে—কলকাতায়। আর এই কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমরা বিহারে প্রবেশ করেছি, পশ্চিমবাংলার পশ্চিম দিক দিয়ে, অথচ এব জন্য আমাদের এতটুকুও কষ্ট করতে হয়নি।

একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করলাম। পশ্চিমবঙ্গে এত ধান উৎপন্ন হয়। রেললাইনের দু'দিকে যতদূর দেখা যায়, শুধু ধানগাছ। মাঝে মাঝে দু'একটা বড় বড় গাছ আছে। কিন্তু, বাকি শুধু ধানগাছ আর ধানগাছ। কোথাও মাটি দেখা যায় না। শুধু সবুজ আর সবুজ। গাছগুলোর কিছুটা জলে আধডুবন্ত, আবার কিছু গাছের আগায় জলমাত্র নেই। তাও তো পশ্চিমবঙ্গের ধান-মানচিত্রের সামান্য একটা অংশ আমি দেখলাম। তাতেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠল।

ট্রেন ছুটে চলেছে, ঘড়ির কাঁটাব সঙ্গে তাল মিলিয়ে। একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল। কলকাতার মাটি পুরোপুরি কালো। তারপব যত আমরা এগিয়েছি, মাটির রঙ পরিবর্তিত হয়েছে—কালোর সঙ্গে কিছু লাল মিশেছে, আর বিহারে তো এই রঙ পুরোপুরি লাল। যেন এখানকার মাটি তৈরি হয়েছে ইঁট গুঁড়ো করে।

হঠাৎ জয়ন্ত বলে উঠল,—দেখ, দেখ, একটা ছেলে হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর লাঠির গায়ে কয়েকটা পয়সা লাগান। প্রথমে আমাব চোখ পড়েনি। তারপর দেখলাম একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে ট্রেন লাইনের পাশে দাঁড়িযে আছে, তাদের জীর্ণ বেশবাস প্রচার করেছে তাদের দারিদ্র্যকে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে লাঠি। যতই এগোচ্ছি, একই দৃশ্য চোখে পড়ল। ওবা এইভাবে যে কেন দাঁড়িয়ে আছে, অনেক চেষ্টা কবেও বুঝতে পারলাম না। এরা কি এইভাবে ট্রেন যাত্রীদের কাছে সাহায্য চাইছে? হবে হয়ত।

বিহারে লক্ষ্য করলাম অসংখ্য ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে। তবে অত্যন্ত উঁচু নীচু। এখানে চাষবাস প্রায় অসম্ভব। কোন জমি রেল লাইনের চেয়ে অনেক উঁচু, আবার তাব ঠিক পাশের জমি প্রায় কুড়ি ফুট নীচে। অসংখ্য ফাঁকা মাঠ পড়ে রয়েছে। কেউ সেই মাঠে নেই। আমার ভীষণ লোভ হল। কলকাতায় মাঠের কি ভীষণ অভাব—আমরা একটু খেলব, তার জায়গা নেই। আর এখানে মানুষের কি ভীষণ অভাব। মাঠের পব মাঠ পড়ে রয়েছে, কিন্তু ব্যবহার করবার কেউ নেই।

রেল লাইনের পাশা দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। স্বভাবতই রাস্তার রঙ লাল। কিন্তু রাস্তা দিয়ে কেউ যাতায়াত করছে না। মাঝে মাঝে দুই একটা সাইকেল যাচ্ছে, তাও সংখ্যায় খুবই কম। বিরাট জনহীন প্রান্তরের মধ্যে এই একফালি সরু রাস্তা যোগাযোগ রক্ষা করছে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

আমরা মধুপুব পৌঁছলাম বেলা দুটো নাগাদ। তারপর টাঙ্গায় করে চললাম আমাদের নির্দিষ্ট বাড়িতে। এই প্রথম টাঙ্গায় উঠলাম, এখানকার প্রত্যেকটা ঘোড়া আকৃতিতে ছোট এবং রোগা।

ছোট্ট ষ্টেশনের অন্যান্য লোকের বেশবাস দেখেও মনে হয় এরা খুবই সরল এবং দরিদ্র। কলকাতায় টাঙ্গায় উঠিনি, কিন্তু উঠলেও আজ টাঙ্গায় যেরকম আনন্দ হল, সেরকম আনন্দ নিশ্চয়ই হত না। কারণ, আজকের সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে প্রত্যেক জিনিসকে নতুন করে দেখার, নতুন করে উপভোগ করবার আনন্দ। কলকাতায় সেই আনন্দ কোথায় পাওয়া যাবে?

বাজার ছাড়িয়ে কিছুদূর আসার পরই শুরু হল লাল মাটির রাস্তা। রাস্তা হঠাৎ বেশ কিছুটা ঢালু হয়ে গেছে আবার উপরে উঠেছে। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম অসংখ্য বাগানবাড়ি ফাঁকা পড়ে রয়েছে প্রত্যেকটা বাড়িই নাকি বাঙালীদের। বছরে একবার হয়ত অবসর বিনোদনের জন্য আসে, নতুবা বাড়ি ফাঁকাই থাকে। অসমান্তরাল রাস্তা দিয়ে অতিকষ্টে ঘোড়া যখন আমাদের টাঙ্গাটিকে "জ্যোতির্ময়ী কানন' নামক বাড়িটার সামনে নিয়ে এল আসল তখন দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

স্কেচ্ : রণেন মজুমদার (সভ্য, সিনিয়র)

জননী জগদ্ধাত্রী ঃ বাহন সিংহ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

দুর্গাপূজার সময় আমরা যে প্রতিমা দেখি, সেই প্রতিমার মধ্যে ফুটে ওঠে অসুরদলিনী মা দুর্গার মূর্তি। মা দুর্গা মহিষাসুরকে নিধন করে দেবতাদের ভয়-ভীতি দূর করেন এবং স্বর্গরাজ্যকে উদ্ধার করেন প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের কবল থেকে। দুর্গাকে আমরা তাই বলি দুর্গতিনাশিনী।

মা দুর্গা অসুরকে বধ করলেন। অথচ দেবতারা সেটা ভুলেই গেলেন। তাঁরা মনে করলেন, তাঁদের শক্তিতেই মহিষাসুর ধ্বংস হয়েছে। দারুণরকম আত্মতুষ্ট তাঁরা। নিজেরাই নিজেদের ক্ষমতা ও অহংকারে ডগমগ।

একদিন চারজন দেবতা স্বর্গে বসে নিজেরাই নিজেদের বড়াই করছেন। এই চারজন হলেন অগ্নি, বায়ু, বরুণ আর চন্দ্র। তাঁরা নিজেরা বলাবলি করতে থাকেন, আমরাই অসুরকে খতম করেছি। আমরা চারজনই শ্রেষ্ঠ দেবতা। আমাদের চার জনকেই পরমেশ্বর বলা উচিত। এই চারজন দেবতা ভুলেই গেলেন যে, বিপন্ন দেবতাদের উদ্ধার করতে মহাশক্তি মহামায়া আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং তিনি দশহাতে দশটি অস্ত্র দিয়ে অসুরকে নিধন করেন।

দেবতারা যখন এরকম অহঙ্কারে আত্মহারা, ঠিক তখনই তাঁরা দেখলেন, একটু দূরে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তাঁরা দারুণ অবাক হলেন। এ আবার কী! তাঁরা দেখলেন, কোটি কোটি সূর্যের জ্যোতি নিয়ে সিংহবাহিনী এক চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তি সেই আলোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। এরকম জ্যোতির্ময়ী সিংহবাহিনীকে দেখে দেবতারা প্রথমে দারুণ ঘাবড়ে গেলেন, ভাবলেন, কে ইনি? তাঁরা দেখলেন দেবীর চারটি হাত, গায়ের রং প্রভাতের সূর্যের মত লালচে সোনার মত। প্রসন্ন মুখ। তাঁরা ভাবলেন কে ইনি?

কে ইনি? এই প্রশ্নের সমাধান করার জন্য অহংকারে ডগমগ পবন দেবতা এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। পবন হচ্ছেন বায়ুর দেবতা। পবন দেবতা প্রশ্ন করলেন : কে আপনি? উত্তরে সেই মহাদেবী বললেন : কে আমি, সে প্রশ্নের উত্তর পাবে পরে। তার আগে আমি দেখতে চাই, তোমার শক্তি

কত ? একথা শুনে পবনদেব একটু মুচকি হাসলেন। ভাবলেন, আমার শক্তি দেখলে আপনার তাক্ লেগে যাবে, মুখে বললেন, বেশ বলুন কী করতে হবে। দেবী তাঁর সামনে একটা খড় রাখলেন, বললেন, এটা একটা তুচ্ছ তৃণ। আপনি তো বায়ুর দেবতা কত বড় বড় জিনিস উড়িয়ে নিয়ে যান। এই খড়-টাকে উড়িয়ে নিয়ে যান তো। অহঙ্কারে মত্ত পবন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে একটা ফু দিয়ে খড়টাকে ওড়াতে গেলেন, পারলেন না। শেষ পর্যন্ত নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি খড়টাকে ওড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। ক্লান্ত ও অবসন্ন পবনদেব লজ্জায় মাথা নিচু করে ফিরে গেলেন। দেবীর মুখে তখনও সেই প্রসন্ন হাসি।

এবার এলেন অগ্নিদেবতা—যিনি কত নগর গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন। দিয়েওছেন। দেবী তাঁকে বললেন, এই ছোট্ট তৃণখণ্ডটিকে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার শক্তি প্রমাণ করুন। অগ্নিদেব নিজের সমস্ত তেজ ও শক্তি উজাড় করে দিলেন। কিন্তু তাতেও খড়টা পুড়ল না। এই দৃশ্য দেখে অগ্নিদেব রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন, ভাবলেন, এওকি সম্ভব ? বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পরাজিতের মতই ফিরে গেলেন।

তারপর একে একে এলেন জলের দেবতা বরুণ এবং চন্দ্র। দুজনেরই অবস্থা সেই আগের মতই হল। শেষ পর্যন্ত চারজনই বুঝলেন, তাঁদের শক্তি কত কম। তাঁরা মিথ্যা অহঙ্কারে ভুলেই গিয়েছিলেন নিজেদের দুর্বলতার কথা। তখন তাঁরা সেই জ্যোতিঃরূপা দেবীর সামনে হাতজোড় করে বসলেন, শুরু করলেন প্রার্থনা: দেবী প্রসীদ। হে দেবি, আপনি প্রসন্ন হোন। এই দেবীই জননী জগদ্ধাত্রী।

মা দুর্গার মতই দেবী জগদ্ধাত্রীরও বাহন সিংহ। আসলে যিনি দুর্গা তিনি জগদ্ধাত্রী। হিমালয়ের কন্যা মা দুর্গা শক্তি, বীর্য ও সাহসের প্রতীক সিংহকে নিজের বাহন রূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই কারণে জগদ্ধাত্রীর বাহনও সিংহ। আমরা মা দুর্গাকে স্মরণ করি দুর্গতিনাশিনী এবং বরাভয় দায়িনীরূপে—যিনি জগজ্জননী। আর জগদ্ধাত্রী হচ্ছেন বিশ্বের ধাত্রী—যিনি জগৎ সংসারকে লালন পালন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁর মুখে সদাপ্রসন্না জননীর মধুর হাসি লেগেই থাকে।

ভ্রম সংশোধন

১৯ পাতার এ্যানেকডোট্‌সে 'পঠিত' কথাটির স্থানে 'পর্বত' হবে, এবং 'সম্মানিত হয়েছিল'র স্থানে 'সম্মানিত করা হয়েছিল' হবে। ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

শখ

অভিজিৎ দে (সভ্য, সিনিয়র)

শহর থেকে অনেকদূরে ছোট্ট একটা গ্রাম, যে গ্রামের কথা অনেকেই জানে না। সেই ছোট্ট গ্রামটির নাম পটলপুর। এই গ্রামের ভিতর দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তার পাশে ছোট্ট এক কুঁড়ে ঘর। এই কুঁড়ে ঘরে বাস করে তিন ভাই। তাদের আপনজন বলতে কেউ পৃথিবীতে নেই। অতিকষ্টে কোনরকমে তাদের দিন চলে। বড় ভাইয়ের নাম ছিটকানি ধর, মেজভাইয়ের নাম চেপেচুপে ধর ও ছোট ভাইয়ের নাম চিংড়ি ধর। অনেকেই ভাবছে যে পৃথিবীতে এত নাম থাকতে তাদের মা বাবা এরকম নাম রাখলেন কেন। তাদের এরকম নাম হবার কারণ, বড়ভাই ছোটবেলায় সবসময় দরজার ছিটকানি নিয়ে খেলা করত, তাই তার মা বড় ছেলেকে ছিটকানি বলে থাকত। ছোটবেলায় মেজভাই ভয়ে সবাইকে জড়িয়ে ধরত, সেইজন্য গ্রামের সবাই তাকে দেখলেই চেপেচুপে ধর বলে ডাকত। এইভাবেই তার নাম হয়ে গেল চেপেচুপে ধর এবং ছোট্টবেলায় ছোট ভাই খুব চিংড়ি মাছ খেতে ভালবাসত তাই তার দাদু চিংড়ি বলে ডাকত। সেই সঙ্গে এদের পদবী ছিল ধর। এইভাবেই তিনভাইয়ের এই অদ্ভুত নামকরণ হয়েছিল।

যা হোক তাদের বয়স যখন ১৪, ১২ ও ১০ বছর তখন তাদের বাবা মারা যান। বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মাও মারা যান। এই অবস্থায় তিন ভাই লোকের বাড়ি কাজ করে এবং তাদের বাবা যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন সেইসব দিয়ে কোনরকমে তাদের দিন চালায়।

সেবার গ্রামে দুর্গাপূজার সময় গান-বাজনার দল আনা হয়। সেই গানবাজনা শুনে তিন ভাইয়ের খুব ভাল লাগে। তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করল যে এরকম গান বাজনা করবে, লোকেদের শোনাবে আর পয়সা রোজগারের সুবিধে হবে। এর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন সকালে গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এই হৈ চৈ-এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল, সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে তিন ভাইয়ের মধ্যে যে বড়ভাই অর্থাৎ ছিটকানিবাবু একটা পুরনো ভাঙ্গা দু' চারটে রিড নেই এরকম একটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে বেসুরো হেঁড়ে গলায় গান করছেন, মেজভাই একটা পুরনো তবলা নিয়ে তাতে উল্টোপাল্টা চাঁটি মারছেন এবং ছোটভাই পুরনো তার নেই এমন একটা সেতার বেসুরো ভাবে বাজিয়ে চলেছেন। সব মিলিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ শোনাচ্ছে। অতিকষ্টে গ্রামের লোকেরা জানতে পারল তেনাদের শখ হয়েছে তেনারা সব বড় শিল্পী হবেন এবং তারজন্যই নাকি এই সাধনা। এরপর থেকে রোজ তাদের বড় শিল্পী হবার সাধনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। তাদের এই বিদঘুটে ঐক্যতান শুনে গ্রামের লোকেরা আর থাকতে পারল না, শেষমেশ গ্রামের লোকেরা সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা উপায় ঠিক করল। দুদিন পর গ্রামের এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তাদের তিনভাইকে সেখানে গানবাজনা শোনাতে আমন্ত্রণ জানাল। একথা বলাতে তিন ভাইয়ের তো খুব আনন্দ। অনুষ্ঠানে তারা যখন গান শুরু করল তখন তাদের হেঁড়ে গলার গান ও

অদ্ভুত বাজনা শুনে কতকগুলো কুকুর তাদের দিকে ছুটে এল। অবশ্য এই কুকুরগুলোকে আগে থেকেই এইখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তিনভাই যখন গান শুরু করল তখন সেই কুকুবগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের দিকে। কুকুরগুলোকে তেড়ে আসতে দেখে তারা হারমোনিয়াম তবলা ফেলে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। ওদের ছুটতে দেখে কুকুরগুলোও ওদের পেছনে ছুটতে শুরু করল। অবশেষে কুকুরগুলোর হাত থেকে বাঁচার আর কোন উপায় না দেখে তারা সামনেই একটা পচা ডোবা দেখে তাতেই লাফ দিল এবং ডোবায় দাঁড়িয়ে পোকামাকড় ও মশার কামড় খেতে থাকল ততক্ষণ, যতক্ষণ না কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেল। কুকুরগুলো সেখান থেকে চলে গেলে সেই পচা ডোবায় দাঁড়িয়ে তিনভাই প্রতিজ্ঞা করল যে আর জীবনে কোনদিন তারা গানবাজনা করবে না। সেইদিন থেকে তাদের বড় শিল্পী হওয়ার শখ চিব জীবনের মত বন্ধ হয়ে গেল এবং গ্রামের লোকেরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

বড়দিন : সুপ্রভাত

প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমের ঘোরে দেখলো খোকন
আবছা সে এক মূর্তি—
ভয় পেলো না অবাক হ'ল
জাগল মনে স্ফূর্তি।
"স্বপন-বুড়ো" ডাকল কাছে
ঘুম ভেঙ্গে যায় কারোর পাছে
ভারী নীচু স্বরে,
"ভয় পেয়ো না আমি হলাম
সান্তাক্লজ-বুড়ো—
শীঘ্র এস ব্যস্ত আমি
আজ দারুণ তাড়াহুড়ো।
তোমার মত সব শিশুরাই
আমার প্রাণের মিতে
সবার কাছেই যাব যে আজ
উপহারটি দিতে ॥"

এমন সময় মায়ের ডাকে
ভাঙ্গল খোকার ঘুম—
গল্প শুনে খোকার গালে
একে দিলেন চুম ॥

বিরলে
রিচার্ড ই. বায়ার্ড

অনুবাদকঃ কনাদ মল্লিক
(প্রভু. জীনয়র)

(৩য় পর্ব)

রস তুষার প্রাচীরের যে জায়গাটায় অ্যাডভান্স কেন্দ্রের অবস্থান, সেখানটা কোথাও উঁচু নিচু নয়, সবটুকুই একেবারে সমতল। যতদূর চোখ যায় কেবল সাদা আর সাদা; দৃষ্টির শেষ সীমায় মিশেছে আকাশের গাঢ় নীলের সঙ্গে, এই সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে আমরা, আমাদের ঘেঁসাঘেঁসি করে খাটানো তাঁবু—সবই নিতান্ত ছোট, তুচ্ছ।

মাটির (বরফের) নীচে আবহাওয়া কেন্দ্রের ঘর তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই ১৫ ফুট লম্বা, ১১ ফুট চওড়া আর ৮ ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে। মেরুর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে ঘরটাকে মুক্ত রাখার জন্যই এইরকম ব্যবস্থা। জমির ওপরে ঘর তৈরি করলে ঐ হাড়ে হাড়ে, দাঁতে দাঁতে বাজনা-বাজানো হিমেল বাতাসই ঘরের বাসিন্দার কাছে প্রাণান্তকর হয়ে উঠত। ক্যাপ্টেন ইনেস-টেলর প্লেনে চড়ে ট্রাক্টর বাহিনী পরিদর্শন করে এলেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে তারা শম্বুক গতিতে অ্যাডভান্স কেন্দ্রের মালমশলা আর রসদ নিয়ে আসছে।

অ্যাডভান্স কেন্দ্র তৈরির মালমশলা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে খুব কম সময়ের মধ্যেই সেগুলোকে জোড়া লাগিয়ে ঘর তৈরি করা যায়। জোড়া দেওয়ার কাজটা খুব জটিল নয়; ঠিক জায়গায় ঠিক অংশটা বসিয়ে নাট-বল্টু দিয়ে এঁটে দিলেই হল। পাছে রাতে তুষার ঝড়ে অনেক কষ্টে কাটা গর্তটা বুজে যায় এই আশঙ্কায় রাতের মধ্যেই ঘর তৈরির কাজ শেষ করব ঠিক করলাম, সকলে মিলে পাগলের মত কাজ করে চললাম। বিকেলবেলা তাপমাত্রা দাঁড়াল—৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়, তারও ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম, আমাদের প্রত্যেকের মুখেই তখন তুষার ক্ষতের (Frost Bite) চিহ্ন সুস্পষ্ট। পাঁচটার সময় মেরুর বুকে রাত্রি নামল, উষ্ণতা—৬১° সেন্টিগ্রেড; তখনও ঘরের ছাদ তৈরি করা হয় নি। উচ্চ চাপ কেরোসিন বাতির আলোয়, ষ্টোভের তাপের মধ্যে আমরা এতক্ষণ কাজ করছিলাম, কিন্তু ঠাণ্ডা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতির কেরোসিন জমে কঠিন হয়ে গেল, আলো গেল নিভে। ব্যাটারি ফ্লাশলাইটও ব্যাটারি জমে যাওয়ার জন্য অচল, শেষ পর্যন্ত, ছুটো গ্যাসোলিন বাতিব মৃদু আলোতে কাজ চলতে লাগল।

দেহ তো বটেই: মনে হল মন প্রাণও যেন ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই—ঘুমোতে যাবার আগেই আশ্রয়ের ঘর তৈরি না করলেই নয়। মিঃ টিঙ্গলফের দস্তানা বরফে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। কাজ করতে করতে যখন তিনি দস্তানা খুললেন, তখন দেখলাম তাঁর হাত অসংখ্য হলুদ ফোস্কায় ভরে গেছে। মিঃ সাইপল কাজের ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে ধরছিলেন—তাঁর হাত ঠাণ্ডার প্রকোপে অস্বাভাবিক রকম ফুলে উঠেছিল। অত্যধিক ঠাণ্ডা বাতাসে

আমাদের প্রত্যেকেরই শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল কাশি। কিন্তু, গরজ বড় বালাই, সেই অবস্থাতেই কাজ করে চলতে হল।

—৬৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে রাত একটা নাগাদ আমরা ঘরের ছাদ তৈরির কাজ শেষ করলাম, লক্ষ্য করলাম, ঘরের ছাদের তল বরফের জমির উপর প্রায় দু'ফুট জেগে আছে অর্থাৎ গর্তের গভীরতা যা হওয়া উচিত ছিল, তার থেকে ঐ ফুট দুয়েক কম হয়েছে। ফলে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে যে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে তাতে সন্দেহ রইল না। ভুলটা মারাত্মক হলেও সংশোধন করার উপায় তখন আর ছিল না।

মিঃ সাইপল ষ্টোভ জ্বেলেছিলেন। ঘরের মধ্যে নেমে এসে সেই আগুনের তাপে বেশ আরাম বোধ হল। এক সময় কথায় কথায় ক্যাপটেন ইনেস টেলর বললেন, "দেখুন, মনে হচ্ছে আমার পায়ের পাতা দুটো জমে গেছে।" সত্যিই তাই, আমি দলাই-মলাই করে তাঁর পা দুটোতে সাড় আনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা; কিছুই হোল না। প্রচলিত প্রথায় বলে এসময়ে শরীরের জমে যাওয়া অংশে বরফ ঘষতে হয়, কিন্তু সেদিন তা করা সম্ভব ছিল না। তার কারণ—৬০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নীচে বরফ দানা দানা আর পাথরের মত কঠিন হয়ে যায়। এই অবস্থায় গায়ে বরফ ঘষা বা শিরীষ কাগজ ঘষা একই কথা। আমরা যা করেছিলাম, মেরু অভিযাত্রীদের কাছে সেটা অত্যন্ত পরিচিত। মিঃ পেইন জামার বোতাম খুলে তাঁর পেটের উপর ক্যাপ্টেনের পা দুটো চেপে ধরলেন যাতে তাঁর শরীরের তাপ ক্যাপ্টেনের পা দুটোকে গরম করে তুলতে পারে, এতে ফল হল, মিনিট কুড়ি পরে ক্যাপ্টেনের পায়ে রক্ত চলাচল আবার শুরু হল। এই সময়, যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে তাঁর কপাল ঐ হাড় কাঁপানো শীতেও ঘামে ভিজে উঠল।

পরদিন সকালে আমরা বোলিং অ্যাডভান্স কেন্দ্রে মালপত্র নামাতে আরম্ভ করলাম। সে এক এলাহি কাণ্ড। রসদের মধ্যে ছিল ৩৫০টা মোমবাতি, তিনটা ফ্লাশলাইট, ৩০টা ব্যাটারি, ৪২৫ বাক্স দেশলাই, ২টা কেরোসিন বাতি, একটা উচ্চ শক্তির গ্যাসোলিন লণ্ঠন, দুটো স্লিপিং ব্যাগ (একটা লোমের, অপরটা পালকের), দুটো ষ্টোভ, ৯টা আগুনে বোমা, একটা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, তিনটে অ্যালুমিনিয়ামের বালতি, দুটো হাত-মুখ ধোওয়ার পাত্র, দুটো আয়না, একটা ক্যালেণ্ডার, একটা অগ্নিনিরোধক কম্বল, তিন ডজন পেন্সিল, পাঁচ গ্যালনের একটা টিন ভর্তি টয়লেট পেপার, ৪০০টা কাগজের রুমাল আর এক বাক্স রবার ব্যাণ্ড। এ ছাড়াও ছিল দু'রিম লেখার কাগজ, তিন বাক্স সাবান আর কাপড় কাচার উপকরণ, একটা থার্মোফ্লাস্ক ও দু' প্যাকেট তাস, খাবার দাবারের মধ্যে ছিল ৩৬০ পাউণ্ড মাংস, ৭৯২ পাউণ্ড তরিতরকারী, ৭৩ পাউণ্ড টিনে করা ঝোল, ১৭৬ পাউণ্ড টিনে করা ফল, ৯০ পাউণ্ড শুকনো ফল, ৫৬ পাউণ্ড মিষ্টি, চাটনি ইত্যাদি এবং আধটন দানা শস্য। আরও নানা রকমের টুকিটাকি জিনিসও ছিল। এই সমস্ত রসদ পত্র নীচে নামানোর পর মিঃ সাইপল আর আমি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতিগুলোকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম।

১৯৩৪ সালের ২৩শে মার্চ বোলিং অ্যাডভান্স কেন্দ্র 'অভিযানে' অংশ নেবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত

হল, ক্যাপ্টেন ইনেস-টেলর ও তাঁর সহকর্মীদের বিদায় উপলক্ষ্যে একটা ভোজের আয়োজন করা
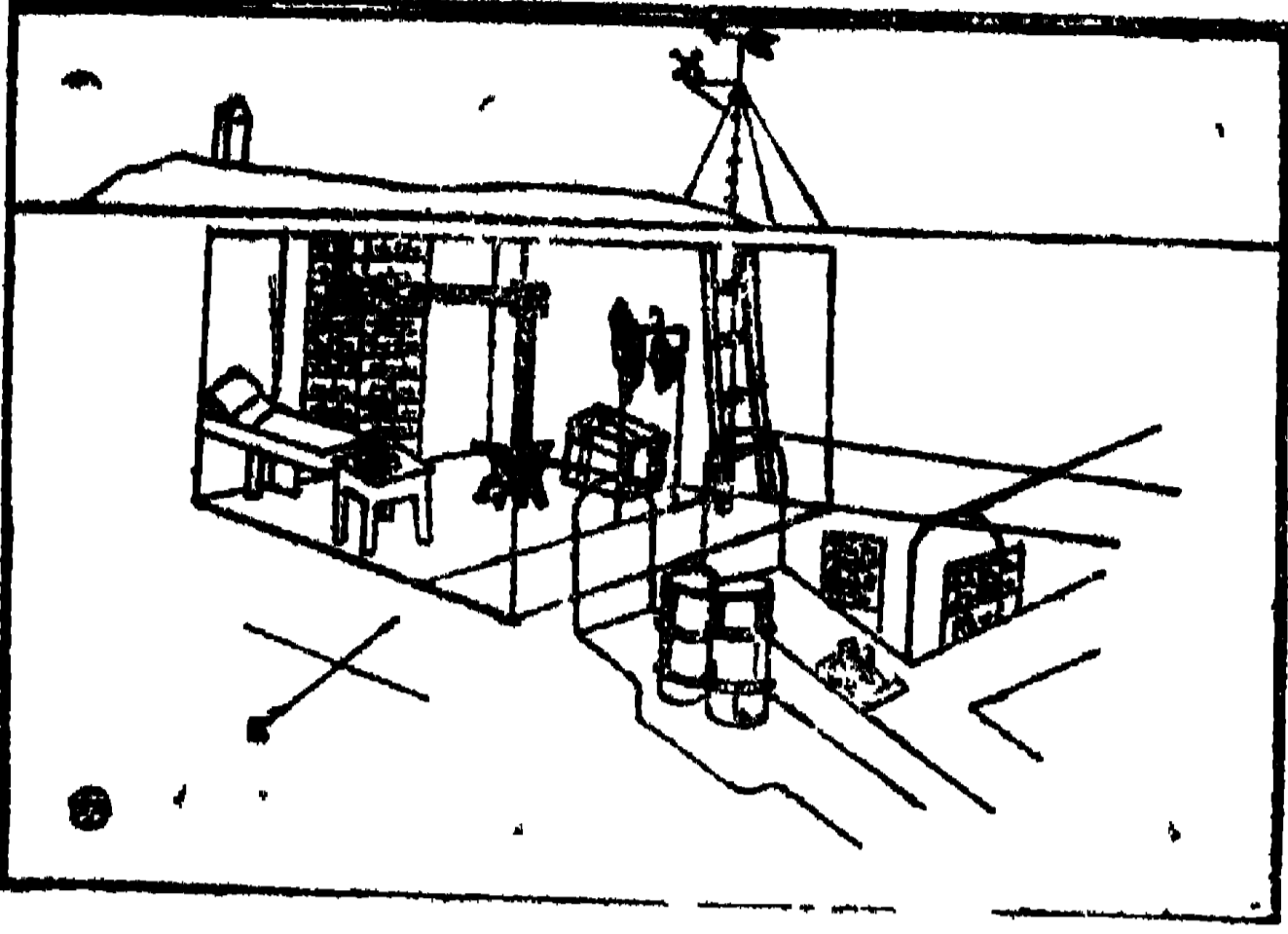
হল, কারণ স্থির ছিল পরের দিন সকালে অথাৎ ২৪শে মার্চ তাঁরা উত্তরে লিটল আমেরিকার দিকে যাত্রা করবেন। বিদায়ী 'অতিথি'রা আমার ভাঁড়ার থেকে বাব করলেন তিনটে বড ছাড়ানো মুর্গী। মাংস ঠাণ্ডায় জমে ইঁটের মত হয়েছিল। শেষে ব্লোল্যাম্প দিয়ে সেগুলোকে নরম কবে খাওয়া হল। সকলে মিলে মিঃ ইনেস টেলরকেই রান্না করার ভার দিয়েছিলাম। ঘরের মেঝেতে বসে খেলাম আমরা ন'জন আর বাকি পাঁচজন বসবাব জায়গাই পেল না, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 'ভোজ' খেল। খাওয়া শেষে যেরকম ঢেকুর তোলার ধুম পড়ে গেল, তা' থেকে বুঝতে কষ্ট হল না যে দিনের পর দিন জেলখানার লপ্‌সি-সদৃশ খাবার খাওয়ার পর একটা বড় রকমের মুখ-বদল হল।

বিদায় ভোজটা কিন্তু আগাম হয়ে গিয়েছিল, কারণ, প্রবল তুষার ঝড়ের জন্য ২৪ তারিখে ক্যাপ্টেনদের যাওয়া হল না। ২৫ তারিখ রবিবারে তাঁরা তৈরি হলেন। যাত্রার পূর্বে লিটল আমেরিকার সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করা হল, পরের কয়েকদিন আবহাওয়া ভাল যাবে কিনা দেখা হল (এরকমটা করা সম্ভব হল কারণ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতিগুলো কাজ করতে শুরু করেছে)। এরপর, ব্লোল্যাম্পের আগুনে ট্রাক্টরগুলোর ইঞ্জিন গরম কবে চালু করতে করতেই ঘণ্টা-দুয়েক কাটল; সন্ধ্যা পাঁচটাব সময় তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু, সাতটা নাগাদ তাঁদের ফিরে আসতে হল। মাইল চারেক যাবার পরেই মিঃ জুনের ট্রাক্টরের রেডিয়েটার ঠাণ্ডায় অচল হয়ে পড়েছিল আর সেটাকে সচল করতে গিয়ে মিঃ জুন স্বয়ং দু'হাত ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলেছেন। আবহাওয়া কেন্দ্রের ঘরেব গরমে হাত দুটোকে সুস্থ করে তুলতে তিনি ফিরে আসা মনস্থ কবেন; তাঁর সঙ্গে পুরো দলটাও।

২৮ তাবিখ বুধবার ভর দুপুরবেলা দলটি আবাব যাত্রা করল। যাবার আগে আমি তাঁদের বললাম, "দেখুন, বেতার যন্ত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। সুতরাং, সাময়িক, হয়ত বা স্থায়ী-ভাবেই বর্হিজগতের সঙ্গে আমি বেতার সংযোগ হারাতে পারি; কিন্তু তাতে আপনারা অহেতুক দুশ্চিন্তা কববেন না। নিশ্চিত জেনে বাখুন এইখানে এই ঘবেব মধ্যে আমি আপনাদের থেকে অনেক নিরাপদে, অনেক আবামে থাকব। সেইজন্যে, বেতারযন্ত্র বিকল হওয়ার ফলে যদি আপনাদেব সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলেও আপনারা এখানে ফিরে আসার কোনরকম চেষ্টা কববেন না। আমার নির্দেশ, মেক বাত্রি কাটার মাসখানেক পরে আপনারা আমাকে নিতে আসবেন তার আগে নয়।

দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ট্রাক্টরগুলো

ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের লাল ক্যানভাসের তৈরি দৈত্যাকৃতি মাথাগুলো ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। গাড়িগুলোর ফেলে যাওয়া পোড়া ধোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাসে স্থির হয়ে ভাসছিল, মনে হল, আমার আর বাকি জগতের মধ্যে একটা অর্ধস্বচ্ছ পর্দা ক্রমশঃ পুরু হয়ে উঠে বিরাট ব্যবধান রচনা করছে। নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে নীচে, ঘরের মধ্যে এলাম। এই সেই ঘর যা কিছুক্ষণ আগেও কতগুলো ডানপিটে মানুষের স্পর্শে চঞ্চল, সজীব ছিল। এখন, কোথাও সে পরিবেশের চিহ্নমাত্র নেই। হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যে আর সময় নেই। ছুটে এলাম ওপরে। জীবন্ত চলমান কিছুকে আপাততঃ শেষবারের মতো দেখা, কারণ পরবর্তী ক'মাস সে সুযোগ একেবারেই থাকবে না। ট্রাক্টরগুলো শেষ পর্যন্ত দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেও ভারী বাতাসে ভর করে ভেসে আসছিল তাদের প্রাণস্পন্দনের শব্দ—"বীপ্, বীপ্, বীপ্"।

[ক্রমশঃ]

ভিখারী রাম

শান্তনু চক্রবর্তী (সভ্য, ১৩)

ছেলেটির নাম রামলাল
  পথের ধারে থাকে,
দরিদ্র সে, জোটে না কিছুই
  কেবলই ভিক্ষা মাগে।
কাতর কণ্ঠে বলে, 'ওগো,
  তোমরা মোর পানে চাও
তিনদিন আমি খাইনি কিছুই
  আজ কিছু দিয়ে যাও।'
পা দু'খানা পঙ্গু যে তার
  হাত দু'খানা বাঁকা—
সঙ্গে তার কেউ থাকে না
  ভিক্ষা করে একা।
পরণে ছেঁড়া জামা আর
  শরীরে মাখা ধুলি,
তেলের অভাবে জট পেকেছে

কারও মনে দয়া হলে
  যদি কিছু দেয় তাকে—
অতি সামান্য সেই ভিক্ষান্ন
  দেয় রাম তুলে মুখে।
মানুষ হয়ে জন্মেও তার
  সবই ব্যতিক্রম,
জীবনে যে তার সুখ নেই,
  আছে শুধুই শ্রম।

শিশু দিবস ঃ নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

চাচা নেহরুর জন্মোৎসব বিধান শিশু উদ্যানে সকলের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হল। ১৪ই নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন 'শিশু দিবস' হিসেবে চিহ্নিত। এদিন শিশুদেরই উৎসবের দিন। এবারে ডাঃ রায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে দু'দিন ব্যাপী শিশু উৎসব উদযাপিত হল।

১৪ই নভেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির সদস্যদের ও শিশু উদ্যানের সভ্য-সভ্যাদের উপস্থিতিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন শ্রীঅপরেশ ভট্টাচার্য। তিনি নেহরুজী সম্পর্কে দু'চার কথা ছেলেমেয়েদের কাছে বলেন। সবশেষে, সদস্যরা ব্যাণ্ডসহ পথ পরিক্রমা করে।

বিকেলবেলা অনুষ্ঠান শুরু হয় সাড়ে চারটায়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীঅপরেশ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রথমে জওহরলালের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। উদ্বোধনসংগীত পরিবেশন করে বিধান কলাকেন্দ্রের সভ্য-সভ্যারা। এরপর, উদ্যানের সভ্য-সভ্যারা আবৃত্তি করে শোনায়। শ্রী ভট্টাচার্য নেহরু সম্বন্ধে ছোটদের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখেন। শ্রী ভট্টাচার্যের পর শ্রীঅতুল্য ঘোষ জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। উদ্যান সংগীতের মধ্য দিয়ে 'এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৫ই নভেম্বর ছিল ডাঃ রায় জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল আবৃত্তি, গান ও যেমন খুশি সাজ। প্রতিযোগিতায় ৬-১০, ১০-১৪ ও সিনিয়রদের জন্য যথাক্রমে (ক), (খ) ও (গ) বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল। বেলা তিনটেয় যেমন খুশি সাজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। (ক) বিভাগে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করে—কাগজ কুড়োনীরূপে কুমারী মালা সাহা ও পাগলীরূপে কুমারী শুক্লা কর্মকার। (খ) বিভাগে শুধুমাত্র একটি পুরস্কার দেওয়া হয়, এই পুরস্কারটি লাভ করে পূজারী বধূরূপে শ্রীমান্ অমিত লাহিড়ী।

চারটে থেকে শুরু হয় আবৃত্তি ও গানের প্রতিযোগিতা। আবৃত্তির (ক) বিভাগে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করে কুমারী অদিতি লাহিড়ী ও সুচিবা সেন, (খ) বিভাগে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করে শ্রীমান বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী টিংকু খান্না। (গ) বিভাগে শুধু ১ম পুরস্কার দেওয়া হয়, এটি লাভ করে শ্রীমান সুপ্রতীক রায়। গানে (খ) বিভাগে ১ম হয় কুমারী পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ২য় কুমারী নন্দিনী নিয়োগী এবং (গ) বিভাগে ১ম হয় শ্রীমান দেবাশিস সাহা ও ২য় হয় কুমারী মধুমিতা মণ্ডল। প্রতিযোগীদের জানানো হয় যে, তাদের পুরস্কার ২৬শে জানুয়ারী প্রদান করা হবে।

প্রতিযোগিতার পর উদ্যানের সভ্য সভ্যারা বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করে। এরপর এদিনের উৎসব শেষ হয়।

শিশু দিবসের দু'দিন ব্যাপী উৎসবে উদ্যানের গাছে গাছে আলোর জৌলুস উদ্যানের শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল এবং সারাদিন শিশুদের কলহাস্যে উদ্যান মেতে উঠেছিল।

যে চিন্তা—সব সময়ের, সব কালের

ইন্দিরা রায়

আমাদের পাশের বাড়ির টুকুনকে দেখি—রোজ সকালবেলা দরজায় দাঁড়িয়ে ভিখিরীদের ভিক্ষে দিতে। রোজই ভিক্ষে পাবার আশায় ওদের বাড়িতে ভিখিরী আসারও শেষ নেই। তবে, ইদানীং বেশির ভাগই চোখে পড়ে টুকুনকে এগিয়ে এসে ভিক্ষে দিতে। সেদিন সকালবেলা চোখোচোখি হতে টুকুন হাসল। আমি আমাদের বাড়ি আসতে বললাম। অবশ্য টুকুনকে বলতে হয় না। যখনই সময় পায় আমাদের বাড়ি চলে আসে। ওর সমবয়সী সঙ্গী আমাদের বাড়িতে না থাকলে কী হবে—পাকাপাকা কথার জন্য বাড়ির মা, ঠানদিরাই ওর সঙ্গী, বন্ধু। আমরাও যেন তার বন্ধু—তাই আমাদের সঙ্গে 'তুই তুই' বলেই কথা বলে। কথাগুলো মিষ্টি শোনায় বলে আমরাও বাধা দিই না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরেই দেখি—টুকুন এসেছে। আমায় দেখেই তো তার যত রাজ্যের গল্প শুরু হল। বলল—জানিস, কালকে আমি বাবার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেসলাম, সেখানে একটা অন্ধ ছেলে কী সুন্দর গান করছিল। আমি না ওর গান শুনে ওকে অনেক পয়সা দিয়েছি। আর জানিস—অনেক লোক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। আমার না ওর জন্য ভীষণ দুঃখ হচ্ছিল। এ কথা সে কথার পর পাশের ঘরে টি, ভি, চালাতেই ও আমায় টেনে নিয়ে গেল। সেখানেও গিয়ে দেখি—অন্ধ, মূক, বধিরদের নিয়ে কী একটা প্রোগ্রাম চলছে। ঘরে যারা ছিল, তারা প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে ওদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছিল, তখনই যার যে চেনা পঙ্গু আছে তাদের প্রসঙ্গ তুলল। এদের আলাপ আলোচনা শুনে আমার মনে হল—ইদানীং লোকেদের সত্যিই কি দুঃস্থ, অসহায়দের প্রতি মমত্ববোধ জেগেছে নাকি! তাহলে তো ··ভাবতে ভাবতেই টি, ভি তে ঘোষণা—প্রতিবন্ধীবর্ষ উপলক্ষ্যে অমুক অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। তখনই আমার ধারণা স্পষ্ট হল—ওহো! সকলের এত সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার কারণ হল এ বছর প্রতিবন্ধী বর্ষ বলে।

তোমরাও হয়ত এ বছরে প্রতিবন্ধী ভাইবোনেদের কথা ভেবেছ, কত দানধ্যান করেছ, কিসে তাদের ভালো হয়, সে সব চিন্তাভাবনা করেছ। কিন্তু, তোমাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন—তোমাদের এই দয়া মমতা প্রতিবন্ধীদের প্রতি—এ বছরেই শুরু এবং এ বছরেই কী শেষ! প্রতিবন্ধী যারা—তারা তো একবছরের জন্যই প্রতিবন্ধী নয়। প্রতিবন্ধকতা তাদের সারা জীবন ধরে। সুতরাং তারা চিরকালই অসহায়, স্বাবলম্বনহীন। তাদের কথা কী আমাদের সারা জীবন ধরে আমাদের কাজের মাঝে চিন্তা করা উচিত নয়, আজ তোমাদের মধ্যে টুকুনের মত যারা ভিখিরী বিশেষত, খোঁড়া, অন্ধ, কানাদের দেখে কিছু ভিক্ষা দিচ্ছ, ওদের বিকলাঙ্গর জন্য কষ্টবোধ করছ—তারা শুধু এ বছরের জন্যই নয়, সবসময়ে, সব

(শেষাংশ ৫০ পাতায়)

সর্বনাশা লোডশেডিং

পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, ১৩)

আজকাল লোডশেডিং সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। চব্বিশ ঘণ্টার প্রায় বার ঘণ্টাই এই লোডশেডিং সিংহাসনে বসে শাসন করছে। সারা দুপুর বসে মনে মনে ঠিক করলাম যে, সন্ধ্যার পর পরীক্ষার শেষ পর্বের কাজ সমাধা করব। কাল ইংরাজী পরীক্ষা। বুকে দুরু দুরু কম্পন, মনে শিহরণ, আশা—আনন্দ-ভরসা-অনিশ্চয়তার দোলা--সব নিয়ে আজকের দিনটা শুরু। ইংরেজী পরীক্ষার পরের দিন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অর্থাৎ অঙ্ক পরীক্ষা আমার সম্মুখ সমরে এসে উপস্থিত হবে। ঠিক করেছি যে সন্ধ্যেবেলায় একবার সব পড়া ঝালিয়ে নেব।

বিকেল থেকেই মনের মধ্যে ঝড় বইছে। অনেকগুলো প্রশ্ন দেখে নিতে হবে ভাল করে। অনেক-গুলো প্রশ্নের উত্তর এখনও মনের মধ্যে দানা বাঁধেনি। তাই তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে নিয়ে পড়তে বসতে হবে। শীগগির বিকেলের আলো মিলিয়ে এল।

সন্ধ্যাবেলা আমি সারা ঘরে পায়চারি করতে করতে আমার প্রশ্নোত্তরের পয়েন্টস্‌গুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম। আজকে একটু বেশি পড়তে হবে কথাটা চিন্তা করে বেশ জোরে জোরে মন দিয়ে পড়তে লাগলাম।

এমন সময় সর্বনাশের রাত্রির মত অন্ধকার নেমে এল—দপ করে নিভে গেল টেবিল ল্যাম্পের বালবটা। চিৎকার করে মাকে ডাকলাম এবং জানালাম যে বালবটা ফিউজ হয়ে গেছে। মা বললেন—লোডশেডিং, শুনে তো আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কাল পরীক্ষা আর আজ লোডশেডিং দেখে আমি বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লুম। বার্ষিক পরীক্ষা। আমি অসহায়ের মতন টেবিলে বসে থাকলাম।

একটু পরেই বাড়ির লোক মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরখানিকে দেওয়ালীর রাত্রি করে তুললেন। আমার প্রয়োজন—তাই এই আয়োজন। কিন্তু এই পরিবেশে কি আর পরীক্ষার পড়া করা যায়, শেষবারের মত একবার চোখ বুলিয়ে না নিলে কি আর কিছু করা যায়!

যাহোক, এই অবস্থায় আবার পড়তে বসব বলে সমস্ত মনকে সংযত করছি। এমন সময় দমকা হাওয়ায় মোমবাতিটা গেল নিভে। ব্যস, আবার সেই অন্ধকার। রাস্তার লোকজন সন্ত্রস্তের মত হাঁটছে। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। সব মানুষ সতর্ক ও সাবধান। রাহাজানি ছিনতাই তো লেগেই আছে। আমার পড়া তো সব তালগোল পাকিয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে।

এদিকে আবার পাশের বাড়িতে কান্না-কাটি হট্টগোল শোনা গেল। জানলা খুলে পাশের

বাড়ির ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ওদের বাড়ির কে একজন হাসপাতালে—পাশেই হাসপাতাল। কিন্তু সেখানেও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য অপারেশন বন্ধ, তাই আসন্ন বিপদের কথা ভেবে ওরা খুবই ভেঙে পড়েছে।

জানলা বন্ধ করে দিলাম। ওদের কথা ভেবে আমার লাভ নেই। আমার নিজেরই বিপদের অন্ত নেই। মোমবাতি জ্বালিয়ে এবং তার সামনে খাতাগুলো খুলে বসলাম। কিছুই ভাল লাগছে না নিজের এবং আমার মত পরীক্ষার্থীদের ভাগ্যের কথা মনে হল। মনে হলে এই সর্বনাশা লোডশেডিং আমাকে এবং আমি ছাড়া বহু মানুষেব বিপদকে টেনে আনছে।

(৪৮ পাতার শেষাংশ)

কাজে, জীবনের সব স্তরেই এই সব প্রতিবন্ধীদের কথা মনে করবে। তাদের যদি সামান্য কিছু সাহায্য করলে তাদের উপকারে আসে, তাতে কোন কুণ্ঠা করবে না। সবক্ষেত্রেই যাতে তাদেরও সুযোগ দেওয়া হয়, পঙ্গু বলে সরিয়ে দেওয়া না হয়, সেদিকে নজর রাখবে। তোমরা এ বছরে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছ কাগজে, রেডিও, টি, ভিতে এমন সব প্রতিবন্ধীদের, যারা নিজেদের কোন সময়ই সাধারণ পাঁচজনের থেকে আলাদা মনে করে না, সব কাজেই তারাও যে এগিয়ে যেতে পারে তার পরিচয় দিচ্ছে তাদের কাজের মধ্য দিয়ে।

১৯৮১-র শেষ মাস ডিসেম্বরে একটা কথা ভেবেই ভয় পাওয়ার কথা যে, '৮১ সালের প্রতিবন্ধীবর্ষ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধীদের প্রতি চিন্তাভাবনারও কি সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু, তা কখনই করা উচিত নয়। কারণ, যারা আজ বিকলাঙ্গ, অক্ষম, তারা তো আমাদেব সকলেরই হয় পাড়াপ্রতিবেশী নয় তো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সুতবাং পরিবাবের সকলের মংগল কামনার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ওই সব ভাইবোনেদের মংগল কামনা করবে, তোমাদের পাশাপাশি যাতে তারাও সমান তালে চলতে পারে।

টুকুনকেও এ সব বোঝাতে সে খুব খুশি। সত্যিই তো, মেয়ে পুতুলটারও পা ভেঙে গেছে, তা'বলে কী সে তাকে ফেলে দিচ্ছে। কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রেখেছে। সেভাবেই সে অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করবে।

আদর্শ ক্রিকেটার

কৌশিক দত্ত (সভ্য, সিনিয়র)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নামক দেশটি আসলে অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি। এই দ্বীপগুলির কয়েকটির নাম বার্বাডোজ, জামাইকা, ত্রিনিদাদ। অসংখ্য নারকেল, আখ আর পাম গাছে দ্বীপগুলো পরিপূর্ণ। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে ছোট বড় মাঠ। সেই মাঠে ছোট বড় সব ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। বড়রা খেলে উইলো কাঠের মজবুত ব্যাটে। ছোটরা নারকেল গাছের ডাঁটা দিয়ে ব্যাট আর ন্যাকড়া দিয়ে বল বানিয়ে খেলে। দেশের বড় বড় টেস্ট খেলোয়াড়দের ওরা অনুকরণ করে। ওদের কেউ হতে চায় গোমেজ, কেউ বা হল, আবার কেউ কেউ জন গডার্ডও হতে চায়। ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে বুড়ো বুড়িরাও মাঠের ধারে বসে সেই খেলা দেখে আর উৎসাহ দেয়।

এম্পায়ার ক্রিকেট গ্রাউণ্ড বার্বাডোজের বেশ নাম করা মাঠ। এই মাঠের গায়ে লাগানো একটা বাড়ির ছোট্ট একটা ছেলে ক্রিকেটকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। সে স্বপ্ন দেখে যে সে মস্ত টেষ্ট ক্রিকেটার হবে। ছোটদের মধ্যে সে বেশ ভালোই খেলে। বাঁ হাতে আস্তে আস্তে বল করে। ব্যাটের হাতও বেশ ভাল। তার ইচ্ছে সে বড়দের সঙ্গে খেলে। কিন্তু সে ছোট বলে বড়রা তাকে পাত্তাই দেয় না। একদিন তার স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা নেট প্র্যাকটিস করছিল। সেদিন অনেকেই নেটে হাজির হয়নি। উঁচু ক্লাসের একজন ছেলে তাকে বল করতে বলল। সে এইরকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল। বল করতে শুরু করল। আশ্চর্য ব্যাপার। বল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যায়। যারা ব্যাট করছিল তাদের কেউই তার বল আস্থার সঙ্গে খেলতে পারছিল না। বেশিরভাগ ছেলেই বোল্ড আউট হচ্ছিল। এই সময় তাদের স্কুলের এক মাস্টারমশাই মাঠের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলেন ছেলেটার লেগব্রেক বলে কিভাবে সবাই আউট হচ্ছে। এমন একটি রত্ন যে তাঁদের স্কুলে রয়েছে তা তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। এই রত্নের নামই ফ্রাঙ্ক ওরেল। পুরো নাম ফ্রাঙ্ক ম্যাকগ্লিন ওরেল—স্বর্ণাক্ষরে লেখার মত জ্বলজ্বলে একটা নাম।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বার্বাডোজ দ্বীপের ফ্রাঙ্ক ওরেল স্কুল টীমে চান্স পেয়ে গেলেন। প্রথম দিকে ভাল রাণ না পেলেও উইকেট পেতে লাগলেন। তারপর আস্তে আস্তে স্কুল টীমের অপরিহার্য খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এক দ্বীপের সঙ্গে আর এক দ্বীপের ক্রিকেট খেলা হয়। আমাদের এখানকার মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডানের খেলার মতই সেই খেলা গুলো দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। খেলায় জয়পরাজয়ের ওপর দ্বীপের মান-সম্মান নির্ভর করে। ওরেল বার্বাডোজের পক্ষে খেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সেবার তাঁদের বিপক্ষ টীম ছিল ত্রিনিদাদ। ফ্রাঙ্ক সেই খেলায় বলে তেমন সুবিধে করতে পারলেন না, কিন্তু ব্যাটে দেখালেন অদ্ভুত দক্ষতা। কাগজে কাগজে বের হল তাঁর ছবি। সেই শুরু…।

তারপর ব্যাটে বলে অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আন্তঃ দ্বীপ ক্রিকেট খেলাগুলো মাতিয়ে রাখলেন। একদিন টেস্ট খেলার সুযোগও পেলেন। ততদিনে ব্যাটিং-এ তিনি বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন। জীবনের প্রথম টেস্টে তার বিপক্ষ দল ছিল ইংল্যাণ্ড। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। সে খেলায় মাত্র তিনটি রানের জন্য পারলেন না শত রানের মুখ দেখতে। অল্প কয়েকদিন বাদেই ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে তিনি আমন্ত্রিত হলেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি সাতটি সেঞ্চুরি করলেন ও সেই মরশুমে তাঁর মোট রান সংখ্যা দাঁড়াল ১৬৯৪। এরপর তিনি বহু টেস্ট খেলেছেন, করেছেন বহু সেঞ্চুরি। খেলায় জিতেছেন, হেরেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়কও হয়েছেন।

ততদিনে তিনি আর ফ্রাঙ্ক ওরেল নন—স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল। এত বড় খেলোয়াড়টির কিন্তু অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর মন যে কতখানি সহানুভূতিতে ভরা সে কথাই এবার বলছি।

একবার ভারত গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। ভারতের অধিনায়ক তখন নরী কনট্রাকটর এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওরেল। প্রথম দুটি টেস্টে ভারত যথাক্রমে ১০ উইকেট এবং ১ ইনিংস ও ২৮ রানে হারল। তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে বার্বাডোজের সঙ্গে ভারতের খেলা। বার্বাডোজের চার্লি গ্রিফিথ কনট্রাকটরকে বল করছেন। ভয়ংকর জোর বল। প্রথম বল কনট্রাকটরের কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। পরের বল কাঁধের ওপর দিয়ে। তৃতীয়টি তিনি আটকালেন। পরের বল বাম্পার। পঞ্চম বলটা গ্রিফিথ ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল কনট্রাকটরের খেলোয়াড় জীবন। প্রচণ্ড জোরে বলটা কপালে আঘাত করল। নাক ও কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। পরীক্ষা করে দেখা গেল মাথার খুলির হাড়ে ফাটল। রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। প্রাণ রক্ষা করতে হলে মাথায় অস্ত্রোপচার করতেই হবে। করা হল অস্ত্রোপচার। কিন্তু রক্ত আবার জমাট বাঁধতে শুরু করল। ইতিমধ্যে ভারতীয় ডাক্তার খৌরলাল হাজির হয়েছেন। তিনি করলেন আবার অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচার শেষ হল। কিন্তু অবস্থা অনিশ্চিত। তখন ভারতের সমস্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে যিনি কাটিয়েছেন বিনিদ্র রজনী ; কনট্রাকটরের জন্য দিয়েছেন প্রয়োজনীয় রক্ত, তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং ফ্রাঙ্ক ওরেল। কনট্রাকটর সুস্থ হলেন, কিন্তু জীবনে তিনি আর টেস্ট খেলতে পারেননি।

এই ঘটনাটি শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কত বড় আদর্শ খেলোয়াড়োচিত এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল। এর কিছুদিন পর অবসর নিলেন ক্রিকেটের রাজা ফ্রাঙ্ক। সোবার্সকে তিনি পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করলেন। এর কিছুদিন পরেই ওরেল পেলেন নাইটহুডের সম্মান।

তারিখটা ছিল ১৩ই মার্চ। বিশ্বের সমস্ত ক্রিকেট রসিককে কাঁদিয়ে ওই দিন পরলোক গমন করলেন আদর্শ ক্রিকেটার স্যার ফ্রাঙ্ক ম্যাকগ্লিন ওরেল। সেই সঙ্গে শেষ হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তথা বিশ্বের ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

খেলার খোশ-খবর

শ্রীকলমচি

ভারতের প্রথম ক্রিকেট বীমা

ভারতবর্ষে আমরা কয়েক রকম বীমার প্রচলন দেখেছি, যদিও বিদেশের বীমার সুযোগের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। এদেশে বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শেষতম সংযোজন হল ক্রিকেট খেলা নিয়ে বীমা। এটি শুধু ভারতীয় বীমা জগতেই নয় ভারতের ক্রিকেট জগতেও প্রথম।

ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত (২৭ শে নভেম্বর শুরু) প্রথম ক্রিকেট টেষ্ট খেলা নিয়ে এই বীমা।

অবশ্য খেলা অথবা খেলোয়াড়ের কোন স্বাচ্ছন্দ্য বা উন্নতি বিধানের কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থের ব্যাপারেই এই বীমা হচ্ছে। ঐ খেলা যদি বাতিল হয় তবে বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন, ওরিয়েণ্টাল ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে ষোল লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে ঐ বীমার জন্য। ক্রিকেট বেওসায়ীরা যুগ যুগ জীও।

আন্তর্জাতিক ফুটবল এই শহর থেকেই যাত্রা শুরু করে

১৯৮২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ঠা মার্চ জওহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতি-যোগিতার উদ্বোধনী বছরের খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম বছরের প্রতিযোগী দেশ-গুলির মধ্যে বুলগেরিয়া, চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়া ইতিমধ্যেই যোগদানে সম্মতি জানিয়েছে এবং রুমানিয়া ও ইটালিরও যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

মাইকেল ফেরেরা বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় আবার অদ্বিতীয়

ভারতের মাইকেল ফেরেরা এখন দ্বিতীয়ের ফেরে পড়েছেন, যদিও প্রথম—তবুও।

মাইকেল ফেরেরা এই বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মোট দুবার ঐ খেতাব পেলেন। ইতিপূর্বে উইলসন জোন্স দু'বার ঐ খেতাব জয় করায় ফেরেরা দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ঐ খেতাব দুবার পেলেন।

আর বিলিয়ার্ডসই একমাত্র খেলা যে খেলায় ভারতের দু'জন বিশ্ব খেতাব জয় করেছেন এবং দু'বার করে। আর কোন খেলায় এ নজীর নেই।

সম্প্রতি দিল্লীতে- অনুষ্ঠিত ২৩তম বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস-এর খেতাবী প্রতিযোগিতায় ভারতের মাইকেল ফেরেরা ইংল্যাণ্ডের প্রথম সারির খেলোয়াড় নর্মান ড্যাগলেকে উত্তেজনাপূর্ণ ফাইন্যাল খেলায় ২৭২৫—২৬৩১ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। ইতিপূর্বে মাইকেল ফেরার ১৯৭৭ সালে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে ইংল্যাণ্ডের বব ক্লোজকে পরাজিত করে এই খেতাব পেয়েছিলেন।

২৩তম প্রতিযোগিতায় ড্যাগলে প্রথম বাছাই ও ক্লোজ তৃতীয় বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন।

অতীতে ভারতের উইলসন জোন্স ১৯৫৮ এবং এবং ১৯৬৮ সালে বিশ্ব খেতাব জয় করেছিলেন।

হাতের কাজ
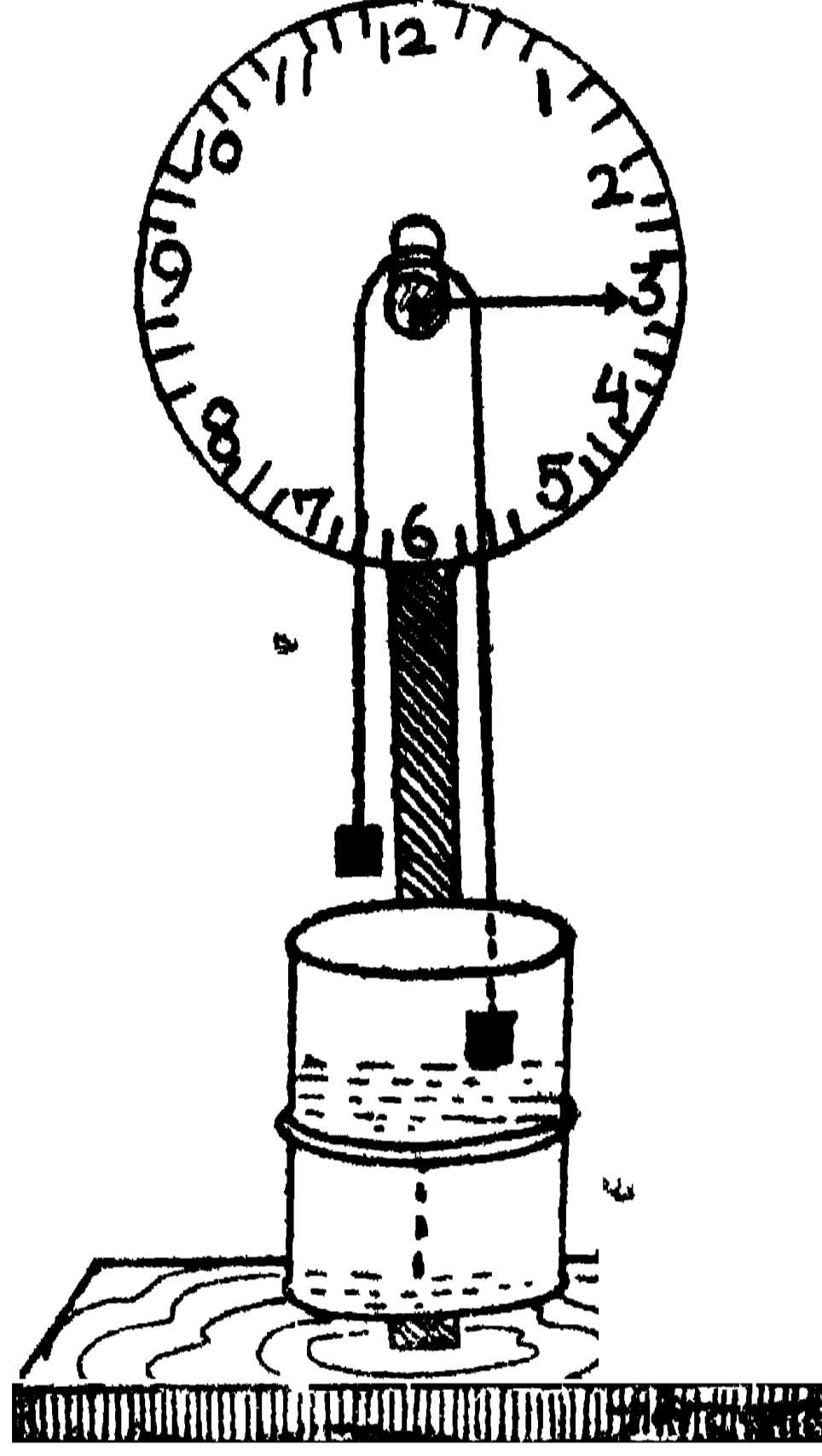
তৈরি কর মজার ঘড়ি

—সুদর্শনদা, তোমার ঘড়িতে কটা বাজে দেখতো।

—এখন বাজে সাড়ে আটটা। আচ্ছা মালবিকা, তোমার এই রকম একটা ঘড়ি তৈরি করতে ইচ্ছা করে, তাই না।

—তোমাকে তো কতদিন বলেছি কি করে তৈরী করতে হয় শিখিয়ে দিতে, তুমি তো শিখিয়েই দাও না।

—ঠিক আছে আজকেই তোমাকে বলছি কি করে তৈরি করতে হয় এই মজার ঘড়ি।

প্রথমে সংগ্রহ কর দু'টো প্রায় ৮ ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট প্লাস্টিকের বালতি বা কোন টিনের পাত্র। এছাড়া ছয় ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি প্লাইউডের গোল টুকরো। একটি দু'ফুট লম্বা

প্রায় দু'ইঞ্চি চওড়া কাঠের টুকরো। একফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রাকার একটি কাঠের টুকরো। একটা কাঠের গুলি (সেলাই মেশিনের জন্য সুতো জড়ানো ববিন), একটা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, একইঞ্চি চওড়া টিনের পাত, প্রয়োজন মতো কাঠের টুকরো, সুতো, পেরেক ইত্যাদি।

এবার প্রথমেই বর্গক্ষেত্রাকার কাঠের টুকরোর উপর এক ফুট লম্বা, দু'ইঞ্চি চওড়া কাঠের টুকরো দুটি দুদিকে পেরেকের সাহায্যে আটকাও। এবার দু'ফুটলম্বা, দু'ইঞ্চি চওড়া কাঠের টুকরোটিকে বর্গক্ষেত্রাকার কাঠের সঙ্গে আটকাও, এমনভাবে যেন ওটা বর্গক্ষেত্রাকার কাঠটির সঙ্গে "অক্ষরের" মতো থাকে। এবার ছয় ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তাকার প্লাইউডের টুকরোটির কেন্দ্রটা কাঠটির একেবারে কোনার দিকে লাগাও। এরসঙ্গে বৃত্তাকার প্লাইউডের কেন্দ্রে একটা গোল কাঠের টুকরোও লাগিয়ে নাও যেন গুলিটি তার উপর সহজে ঘুরতে পারে। এখন পাত্র দু'টির একটির নীচে খুব ছোট্ট একটা ফুটো কর। ফুটো হয়ে গেলে ফুটো করা পাত্রটি ভাল পাত্রটির উপর বসাও এবং ঐ বৃত্তাকার প্লাইউডের নীচে বর্গক্ষেত্রাকার পিঁড়িটির উপর বসাও। এবার গুলির সঙ্গে পাঁচ ইঞ্চি টিনের পাতটি লাগিয়ে নাও। পাতটি লাগাবার আগে ওর একদিকে ছুঁচোল করে নাও। এখন গুলিটিকে বৃত্তাকার প্লাইউডের উপর আটকানো গোল কাঠের টুকরোর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এবং ওটা যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে তার জন্য কাঠটির মাথার দিকে একটা পেরেক আটকে দাও। এবার দু'ফুট মাপের একটা (টন্) সুতা ছোট (প্রায় একইঞ্চিলম্বা একইঞ্চি চওড়া আধ ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট) একটা কাঠের টুকরোর মধ্যে হুক লাগিয়ে বাঁধ এবং ঐ কাঠের টুকরোটা থেকে হালকা আর একটা কাঠের টুকরো নাও, সেটারও মধ্যে হুক লাগিয়ে সুতোটার অপর প্রান্ত বাঁধ। এবার ঐ কাঠ আটকানো সুতোটাকে গুলির উপর একটা পাক্ দিয়ে জড়িয়ে নাও। আর ওর ভাবী কাঠটিকে কৌটোয় জল ভরে বসিয়ে দাও, দেখবে কৌটোয় ফুটো থাকায় জলস্তর আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে ফলে গুলিটাও টিনের পাতটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরছে! এবার আমাদের তৈরি করতে হবে ঘড়ির ডায়াল। ডায়ালটি তৈরি করার সময় দেখতে হবে যে, এক ঘণ্টায় গুলিটি জল নামার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি ঘুরে আসছে এবং যতটা ঘুরবে ততটা চিহ্নিত কর আর ঐ মাপ নিয়ে পর পর ঘণ্টা চিহ্নিত করে নাও (অবশ্য যদি তোমার পাত্রটি সমান ব্যাস বিশিষ্ট হয়)। এবার প্রত্যেক ভাগকে সমান তিন ভাগে ভাগ কর। ঐ তিন ভাগের একভাগ হোল পনেরো মিনিট, অর্থাৎ টিনের পাতটি যখন বারোটার পরের প্রথম ঘরটার থাকবে তখন ঘড়িটার সময় নির্দেশ করবে বারোটা পনেরো মিনিট।

—মালবিকা ঘড়িটা দেখে নাও (এখানে ছবি) আর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে কাজে হাত দাও।

বিঃ দ্রঃ—সুদর্শনের বাড়িতে এই ঘড়ি আজও ঠিকঠিক সময় দিয়ে আসছে, যদিও ঘড়িটার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তোমার ঘড়িও ঠিক ঠিক সময় নির্দেশ করবে যখন তোমার ডায়ালটি ঠিকঠিক ভাবে তৈরি করতে পারবে।

ধাঁধা
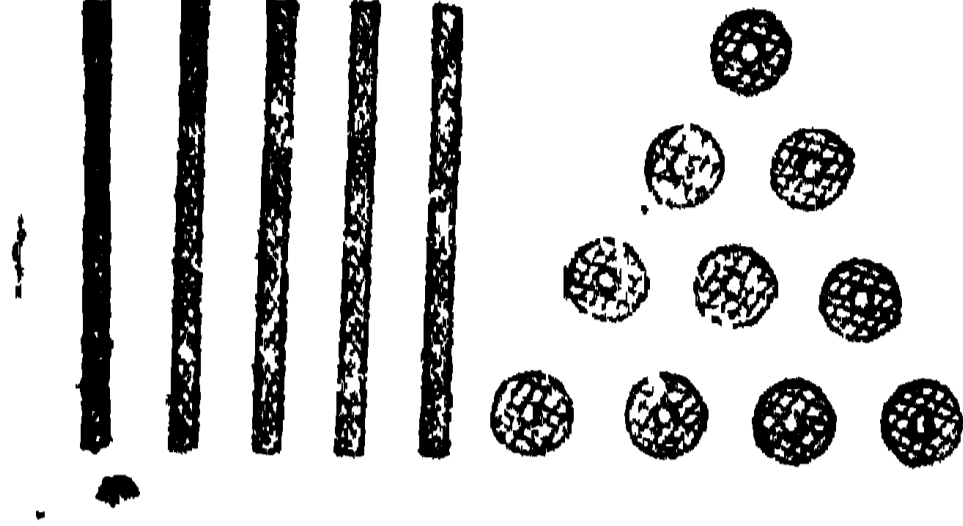
১। তোমাদের সামনে পাঁচটা লোহার দণ্ড দশটি লোহার চাকতি রাখলাম। তোমরা ঐ লোহার চাকতি গুলো লোহার দণ্ডগুলোর ওপরে এমনভাবে সাজাও, যাতে প্রত্যেক লোহার দণ্ডতে অন্তত চারটি করে চাকতি থাকে।

পলাশ দাস (সভ্য, সিনিয়র)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(ক) বউ কথা কও; (খ) চড়াই; (গ) সারি; (ঘ) ফুলটুসি; (ঙ) বউএর খোকা হোক; (চ) ময়না; (ছ) বেনে বউ; (জ) কাক; (ঝ) শ্যামা; (ঞ) নাইটিঙ্গেল।

সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

তিনটি বা তার বেশি উত্তর যারা পাঠিয়েছ, তাদের নাম দেওয়া হল :—
সোমনাথ দাশগুপ্ত (সভ্য, সিনিয়র); কৌশিক দত্ত (সভ্য, সিনিয়র); কিংশুক দত্ত (সভ্য, ১৪)

এ সংখ্যায় যারা এঁকেছে

পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (সভ্যা, সিনিয়র); রণেন মজুমদার (সভ্য, সিনিয়র); শ্যামল পোদ্দার (সভ্য, সিনিয়র)।

'খেয়ালখুশীর ছোট্ট বন্ধুরা—তোমরা যারা নিয়মিত পত্রিকা পড়, যারা গ্রাহক—তোমরা তোমাদের পরীক্ষা শেষের অবসরে তোমাদের নিজেদের লেখা গল্প, প্রবন্ধ, ধাঁধা পাঠাতে শুরু কর।